একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের তাফসীর: মনের শান্তির পথ - অধ্যায় 2 আল বাকারাহ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের তাফসীর: মনের শান্তির পথ - অধ্যায় 2 আল বাকারাহ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2025 দ্বারা প্রকাশিত

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের তাফসীর: মনের শান্তির পথ - অধ্যায় 2 আল বাকারাহ

দ্বিতীয় সংস্করণ। 24 জানুয়ারী, 2025।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নে পবিত্র কুরআনের আল বাকারাহ অধ্যায় 2 এর একটি সম্পূর্ণ-উল্লেখিত এবং সহজে বোঝার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য (তাফসীর)। এটি বিশেষভাবে হাইলাইট করে এবং আলোচনা করে যে ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা উচিত এবং উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলতে হবে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 1

"আলিফ, লাম, মীম।"

এই আয়াতের সঠিক অর্থ অজানা। কিন্তু এই আয়াতটি এই সত্যের ইঙ্গিত দিতে পারে যে পবিত্র কুরআন আরবি অক্ষর এবং শব্দ দ্বারা গঠিত যা আরবরা যারা প্রথম শুনেছিল তারা খুব পরিচিত ছিল। এর অর্থ হল, পবিত্র কুরআনের সত্যতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোন অজুহাত ছিল না, কারণ তারা এর অলৌকিক শব্দগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিল, যে শব্দগুলি তারা আরবি ভাষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও অর্থ, কমনীয়তা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে মিলতে পারেনি। স্পিকারদের মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত হিসাবে নিজেদের কাছে. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এমনকি কেউ যদি একটি মার্জিত এবং ছন্দময় আরবি বাক্য তৈরি করে তবে তারা কখনই এর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে মিলিত হতে পারে না, যা মানুষের স্বভাব, মানসিকতা এবং মনোভাবের একেবারে সারাংশ অনুপ্রবেশ করে। তারা সহজে বোঝার ক্ষমতার সাথে মেলাতে পারেনি, এমনকি অশিক্ষিত লোকেদের দ্বারা এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যায়। যেহেতু এটি মানুষের প্রকৃতিকে সম্বোধন করে, এটি নিরবধি উপদেশ যা প্রতিটি ব্যক্তি, স্থান এবং প্রজন্মকে উপকৃত করে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এ ব্যাপারে মিলিত হতে পারে না বা হবে না। এর ঐশ্বরিক উত্সের আরেকটি প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর শিক্ষাগুলি সহজ উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়ে শিক্ষিত

ছিলেন না। পবিত্র কুরআন প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে যাতে প্রতিটি পরিবার ও সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অধিকাংশ কবিতা এবং গল্পের বিপরীতে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যা বলে না। পবিত্র কুরআনের সমস্ত ছোট এবং দীর্ঘ আয়াত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপকারী, তাদের লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক অবস্থান বা অন্য কিছু নির্বিশেষে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় তখন বিভিন্ন পাঠ তুলে ধরা হয়েছে। অন্য সব বই থেকে ভিন্ন, পবিত্র কুরআন সত্য সন্ধানকারীকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন তার সতর্কতা ও প্রতিশ্রুতিকে অনস্বীকার্য প্রমাণ ও প্রমাণ সহ সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যাকে বিমূর্ত বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, তখন এটি ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়নের একটি সহজ উপায় প্রদান করে। এটি একজনকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সরলভাবে কিন্তু গভীরভাবে। এটি সঠিক পথকে পরিষ্কার এবং আবেদনময় করে তোলে যে কেউ উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য কামনা করে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি, কারণ এটি মানব প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে, যা নিরবধি, এবং তাই প্রতিটি যুগ, সমাজ এবং প্রজন্মের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময়, যখন এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েতের নির্দেশে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি প্রতিটি সমস্যার সমাধান যা একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজ কখনও সম্মুখীন হতে পারে। যেসকল সমাজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছে তারা ন্যায় ও শান্তির প্রসারে সফল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে দেখার জন্য শুধুমাত্র ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে তবুও পবিত্র কুরআন তার বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে কারণ মহান আল্লাহ তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য কোনো বই এই গুণের অধিকারী. অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক হব।"

পবিত্র কুরআন হল মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক, যা তিনি তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই যে সত্যের সন্ধান করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তবে তারা এটি থেকে উপকৃত হবে। তাদের আকাঙ্ক্ষার সন্ধানকারী কেবল এটি থেকে চেরি বাছাই করবে এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 1:

"আলিফ, লাম, মীম।"

জ্ঞানের প্রধান উপাদান হল অক্ষর। অতএব, এই আয়াতটিও জ্ঞানের গুরুত্ব নির্দেশ করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিস অনুসারে জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা ইসলামে সকলের জন্য একটি কর্তব্য। অজ্ঞতা কেবল পাপ এবং বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ জ্ঞান ছাড়া পাপ এড়ানো যায় না এবং সঠিক পথনির্দেশও পাওয়া যায় না। এটি ছাড়া

প্রাপ্ত। একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে, কারণ জ্ঞান নিজে থেকে কার্যকর হয় না যতক্ষণ না এটি কার্যকর করা হয়। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মানচিত্র ব্যবহার না করা পর্যন্ত গন্তব্যের মানচিত্র যেমন উপযোগী হয় না, তেমনি অনুশীলন ছাড়া জ্ঞান সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 2-5

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

“এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক।

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর।

এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা নিশ্চিত [বিশ্বাসে]।

তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [সঠিক] পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

কিতাব, পবিত্র কুরআন হল সঠিক পথনির্দেশের জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা প্রার্থনার প্রতিক্রিয়া। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6-7:

“আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

অতএব, মুসলমানদের কাছে পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অধিকার পূরণের মাধ্যমে সাড়া দেওয়া ছাড়া আর কোন অজুহাত অবশিষ্ট নেই। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিয়মিত এবং সঠিকভাবে এটি পাঠ করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে এটির উপর আমল করা অন্তর্ভুক্ত, নিজের ইচ্ছার সাথে মানানসই আয়াতগুলিকে চেরি বাছাই না করে। এটা তাদের মনোভাব যারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন।

পবিত্র কুরআনের উদ্ভব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এটি কমনীয়তা, ব্যবহারিক প্রয়োগ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মানব প্রকৃতির প্রতিটি দিককে আচ্ছাদিত করার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অতুলনীয়। মানুষের স্বভাব যেমন নিরবধি, তেমনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও নিরবধি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পবিত্র কুরআন একজনকে উভয় জগতের সাফল্যের পথ দেখায়, যেমনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি জানেন যে তিনি যাঁদের সৃষ্টি করেছেন তাদের জন্য কী ভাল।

মূল আয়াতে উল্লিখিত দিকনির্দেশনা খোলা রাখা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে পবিত্র কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেবে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে না কেন, সেই সময়ে তাদের জন্য কী সবচেয়ে ভাল, এমন কিছু যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। এটি পবিত্র কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতি নির্দেশ করে আরেকটি নিদর্শন। এটি এই ভ্রান্ত ধারণাকেও দূর করে যে পবিত্র কুরআন কেবল একজনকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। এটি প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই মানুষকে মানসিক ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তারা যে সময় বাস করে বা অন্য কোনো বাহ্যিক কারণ নির্বিশেষে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু উভয় জগতে এই সঠিক নির্দেশনা কেবলমাত্র তাদের জন্যই পাওয়া যায় যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারা একাই তাদের ইচ্ছা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষা নির্বিশেষে পবিত্র কুরআন বোঝার এবং আমল করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে।

যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করবে। যদি তারা পাপের মধ্যে পড়ে তবে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে। এর মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত না করে, একই বা অনুরূপ পাপের দিকে ফিরে না যাওয়ার

প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার পূরণ করা। আল্লাহ, পরাক্রমশালী, এবং মানুষের সম্মানে লঙঘন করা হয়, যতক্ষণ না পরবর্তীটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এটা লক্ষ করা জরুরী যে, মহান আল্লাহর ভয়, অর্থ, তাকওয়া অবলম্বন করার একটি দিক হল হালাল জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যা হারামের দিকে যেতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল হালাল পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় কারণ এটি তাকওয়ার পরিপন্থী। পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হওয়া নিরর্থক জিনিসের দিকে নিয়ে যায়, যা বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জন্য একটি বড় আফসোস হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সম্পদকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাদের দেওয়া পুরষ্কার দেখে। এছাড়াও, নিরর্থক জিনিসগুলি প্রায়ই পাপপূর্ণ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা প্রায়ই মিথ্যা, গীবত এবং অন্যদের অপবাদের দিকে নিয়ে যায়।

যদিও পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এটি কেবল তাদেরই সঠিক পথ দেখাবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং বিচার দিবস অদৃশ্যের অংশ। অদৃশ্য হল এমন জিনিস যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অদেখা জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ কারণ আপাত কিছুতে বিশ্বাস করার বাস্তব মূল্য নেই। এ কারণে যে বিচার দিবসের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং জাহান্নাম ও জান্নাতের মতো অদেখা উপাদানের সাক্ষী থাকে তার বিশ্বাস মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ত্বরান্বিত হবে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে। অথচ, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাদের কর্মের পরিণতিকে ভয় করে না, তাদের বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাই তারা পবিত্র কুরআনকে উপেক্ষা করবে। এই মনোভাব তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যথেষ্ট যারা সত্যিকারের আল্লাহ, মহান

এবং তাদের জবাবদিহিতা এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে। উপরন্তু, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা পবিত্র কুরআন থেকে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার জন্য চেরি বাছাই করবে না, অথবা তারা তাদের বিভ্রান্তিকর উপায়কে ন্যায্য করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এর শিক্ষার অপব্যাখ্যা করবে না। তারা বরং তাদের ইচ্ছা এবং অন্যের ইচ্ছা নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সমস্ত শিক্ষা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 2-3:

“এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই দাবি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে কেউ কোনো কিছুতে বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এটি উপলব্ধি করে এবং এটি বুঝতে না পারে কারণ এই পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা অদৃশ্য তবুও লোকেরা তাদের বিশ্বাস করে এবং সেগুলি ব্যবহার করে। . উদাহরণ স্বরূপ, খুব কম লোকই তাদের গ্রহণ করা ওষুধের কার্যপ্রণালী বোঝেন তবুও তারা

সেগুলি ব্যবহার করেন। এমনকি যারা তাদের স্বাস্থ্যের কোনো সুস্পষ্ট উন্নতি দেখতে ব্যর্থ হয় তারা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে না কারণ তারা নিশ্চিত যে এটি তাদের সাহায্য করে, এমনকি যদি এই সাহায্য তাদের কাছে অদৃশ্য হয়।

এটা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান রহমত যে, তিনি আশা করেন যে মানুষ অদৃশ্যে বিশ্বাস করবে এবং তাদের কাছে অদেখা বিষয় বোঝার আশা করেন না, কারণ তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। একজনকে বিশ্বাসী হিসাবে গণ্য করার জন্য কেবল তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, যদিও অদেখা জিনিস পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না, মহান আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা নির্দেশ করে নিদর্শন ও প্রমাণ রেখেছেন। যেমন, বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পুঁতে ফেলার পর মৃত বীজ কীভাবে জীবিত হয় তা যখন কেউ দেখে, একইভাবে মানুষ নামের মৃত বীজকেও জীবিত করা হবে। যদি কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে , যেমন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, জলচক্র, সমুদ্র এবং মহাসাগরগুলির নিখুঁত ঘনত্ব, যা তাদের মধ্যে জীবন বজায় রেখে জাহাজগুলিকে তাদের উপর চলাচল করতে দেয়, পৃথিবীর ঘনত্ব এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম, তারা অনুমান করবে যে মানুষের ভারসাম্যহীন ক্রিয়াকলাপ, যেখানে লোকেরা তাদের কর্ম অনুসারে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ পায় না। বিশ্ব, একদিন ভারসাম্যপূর্ণ হবে: বিচার দিবস। যদি কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে দিন এবং রাত, ঋতু এবং অন্যান্য সিস্টেমের নিখুঁত সমন্বয় পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি সব এলোমেলো হতে পারে না। যদি একাধিক ঈশ্বর থাকে তবে তা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, যেমন প্রতিটি ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন জিনিস চাইবেন। মহাবিশ্বের অগণিত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা একক স্রষ্টাকে নির্দেশ করে: আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 2-3:

“এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করবে, যা নিশ্চিত করে যে তারা তাদের বাধ্যতামূলক নামায কায়েম করবে, যার মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ শর্ত এবং শিষ্টাচারের সাথে তাদের পূরণ করা জড়িত, যেমন তাদের সময়মত আদায় করা। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের গুরুত্ব বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঈমান ও নামাজকে পরস্পর পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে নামাজ ছাড়া কোনো ঈমান নেই। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যা নির্দেশ করে যে যারা প্রথম প্রার্থনার দিকে মুখ করেছিল তাদের প্রার্থনা বৃথা যায়নি। এটি সহীহ বুখারী, 40 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 143:

“এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী সম্প্রদায় বানিয়েছি যে, তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হবে এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন। আর আমরা

নামাযের দিকটি তৈরি করিনি যে দিকে আপনি মুখ করে থাকতেন, এই জন্য যে আমরা স্পষ্ট করে দেই যে কে রসূলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন। এবং আল্লাহ কখনই আপনাকে আপনার বিশ্বাস [আপনার পূর্বের প্রার্থনা] হারাতে দেবেন না..."

অন্যান্য স্থানে, মহান আল্লাহ নামায না পড়ার সাথে কুফরীকে বেঁধেছেন। অধ্যায় 75 আল কিয়ামাহ, আয়াত 31:

"এবং তিনি বিশ্বাস করেননি এবং তিনি প্রার্থনাও করেননি।"

অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসেও সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 2-3:

“এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

অতএব, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা তাই তাদের বাধ্যতামূলক নামায কায়েম করবে এবং তারা প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলি একটি ঋণ, উপহার নয়। একটি উপহার ইঙ্গিত দেয় যে তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন, যেখানে ঋণ ইঙ্গিত দেয় যে মালিকের দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে: আল্লাহ, মহান। এই আচরণটি তাদের মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহান, পবিত্র কুরআন, অন্যান্য আসমানী কিতাব, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস ও নিশ্চিততার বাস্তব প্রমাণ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 4:

" *এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং আখেরাতের প্রতি তারা নিশ্চিত।*

একজনকে অবশ্যই বিশ্বাসের দৃঢ়তা অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে রয়েছে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি লাভ করে। 4 নং আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ) এর রেওয়ায়েত শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চিততা অর্জিত হয়।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে 4 নং আয়াতে শুধুমাত্র বিশ্বাসের পরিবর্তে পরকালে নিশ্চিততার কথা বলা হয়েছে। একজন ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি না নিয়েই বিশ্বাস করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। তার উপর অথচ যে আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিত সে কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিবে। উপরন্তু, পরকালে নিশ্চিত হওয়া মানে একজন ব্যক্তি তার বাস্তবতা অনুযায়ী বিচার দিবসে বিশ্বাসী। যেখানে, বিচার দিবসে মানুষের বিচার কীভাবে করা হবে এবং বিচার দিবসের তীব্রতা সম্পর্কে একটি বাঁকানো এবং কলুষিত বিশ্বাস ধারণ করে একজন বিচারের দিনে বিশ্বাস করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে তারা যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতির অন্তর্ভুক্ত, তারা মহান আল্লাহর প্রিয় এবং মনোনীত ব্যক্তি এবং তাই তাদের পরিণতি ভোগ না করেই সহজে ক্ষমা করা হবে। মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অবিরাম অবাধ্যতা। এটি ছিল একই বাঁকানো বিশ্বাস যা পূর্ববর্তী জাতিগুলির রয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে এর সমালোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ..."

অন্যান্য মুসলিমরা জাহান্নামের গুরুতরতাকে ছোট করে এবং বিশ্বাস করে যে এর শাস্তি এত কঠিন নয়। তারা এটিকে একটি পার্থিব কারাগারের সাথে তুলনা করে যাতে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকার জন্য নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলে। অন্যান্য মুসলমানরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা আজকে মুসলমান হওয়ায় তাদের বিশ্বাসের সাথে এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাই তারা দাবি করে যে তারা জাহান্নামে গেলেও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে। একই ধরনের দাবি পূর্ববর্তী জাতিগুলোও করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

"এবং তারা বলে, "আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, [কয়েকটি] গণনা দিন ছাড়া।" বল, "তুমি কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?"

তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কেউ তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না এবং কেউ যত বেশি আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তত বেশি সম্ভাবনা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। উপরন্তু, জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেও তার চেয়ে বেশি সময় সেখানে অবস্থান করে কীভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে? মহান আল্লাহ এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য পবিত্র কুরআনে জাহান্নাম ও এর ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য মুসলমানরা মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা পাপের উপর অবিচল থাকতে পারে এবং অন্য কেউ তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে, যেমন পবিত্র

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। যদিও তার সুপারিশ একটি সত্য, তবুও কিছু মুসলিম জাহান্নামে যাবে। এটি হাদিসগুলিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যা বিচার দিবসে তাঁর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়।

আখিরাতের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে আরো অনেক বাঁকানো ও কলুষিত বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। এটি 4 নং আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 2-4:

"এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর। আর যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত।

এটি ইসলামের সংক্ষিপ্তসার এবং এটি কীভাবে একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে তারা যোগাযোগ করে এবং তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে ইসলামকে বাস্তবায়িত করবে, সে যে কোনো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিক পথ পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বজায় রাখবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে

তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এটি পরিবর্তে আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

অসুবিধার সময়ে, তারা তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখবে, এটি স্বীকার করে যে তিনি জড়িত প্রত্যেকের জন্য সেরাটি বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এর ফলে উভয় জগতে একটি অগণিত পুরস্কারের দিকে পরিচালিত হবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যিনি ইসলামকে বাস্তবায়িত করেন তিনি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের আশা করার যোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি এই আচরণে ব্যর্থ হয় এবং মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয় জগতে সফলতা দান করার প্রত্যাশা করে সে একজন ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ইসলামে এই মনোভাবের কোনো মূল্য নেই। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এমনকি অতীতের জাতিগুলিও তাদের নবীদেরকে ভালবাসতে দাবি করেছিল, কিন্তু তারা বাস্তবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পদাঙ্ক তারা পরের পৃথিবীতে তাদের সাথে একত্রিত হবে না. ভালবাসা অবশ্যই কর্ম দ্বারা সমর্থিত হবে, অন্যথায় এর কোন মূল্য নেই।

যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে সে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং তারা উভয় জগতেই দেহ ও মনের শান্তি লাভ করবে। এটাই চূড়ান্ত সাফল্য। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 5:

"তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [সঠিক] পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সঠিক আচরণ করা মহান আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিহিত, কারণ সঠিকভাবে আচরণ করার এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং সুযোগ তাঁর রহমত থেকে আসে। এটা মনে রাখা একজনকে অহংকার অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখবে, যার ফলে উভয় জগতে তাদের পুরস্কার ও সঠিক পথনির্দেশ নষ্ট হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 2-5:

"এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর। এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা নিশ্চিত [বিশ্বাসে]। তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [সঠিক] পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে, উভয় জগতেই সঠিক পথনির্দেশ ও সফলতা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে বাস্তবিকভাবে অনুসরণ করলেই পাওয়া যায়। তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা নির্দেশনার এই দুটি উত্স মেনে চলে এবং তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে যে কিছু নিহিত নয় তা মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। নির্দেশের এই দুটি উৎস প্রথম বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত অন্য ভালো জিনিসের ওপর কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। একজন অন্য বিষয়ে যত বেশি আমল করবে, তত কম তারা নির্দেশনার এই দুটি উৎসের উপর আমল করবে। এতে বিপথগামী হয়।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 6-7

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

“নিশ্চয় যারা কাফের, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের জন্য সমান- তারা ঈমান আনবে না।

আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা পূর্ণ ঈমান গ্রহণ করবে। এর মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস যা মহান আল্লাহর আনুগত্যে শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও আশীর্বাদ। তার উপর হতে অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করা এবং নিজের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অবিশ্বাস করা , মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়ে, সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় না। বিশ্বাস হল একটি উদ্ভিদের মত যাকে শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা পুষ্ট করতে হবে। একটি উদ্ভিদ যেমন পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও হতে পারে যে আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা, একজন ব্যক্তি তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যেই থাকবে। এটি তাদের বিশ্বাস ধীরে ধীরে মারা যেতে পারে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যুর সময় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এটি প্রকাশ্য ক্ষতি।

মূল আয়াতগুলি তাদের বোঝায় যারা ইতিমধ্যেই তাদের মন তৈরি করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা মেনে চলার ব্যাপারে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণের প্রতি আগ্রহী নয় এবং তারা সত্যকে অনুসরণ করতে চায় না, কারণ এটি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হবে। পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই একজনকে অবশ্যই মুক্ত মন অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করে যখন তা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ সহ উপস্থাপন করা হয়। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর অবিচল থাকা এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা: তাদের উদ্দেশ্য, যা মহান আল্লাহকে মান্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে, কেবল তাদের মানসিক শান্তি থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। উভয় জগতের শরীর, এমনকি যদি তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব অর্জন করতে এবং ধরে রাখতে পারে। এই জিনিসগুলি উভয় জগতে তাদের জন্য শুধুমাত্র চাপ এবং

উদ্বেগের উৎস হয়ে উঠবে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে তা অর্জন করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার একটি প্রধান কারণ হল অন্ধ অনুকরণ, যা মক্কার অমুসলিমরা নিমজ্জিত হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 170:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়াতে হবে এবং তার পরিবর্তে তাদের নিজের জন্য সত্য নির্ণয়ের জন্য দেওয়া সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি

ব্যবহার করতে হবে। এমনকি ইসলাম দ্বারা অন্ধ অনুকরণের সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ মহান আল্লাহ চান যে লোকেরা স্পষ্ট প্রমাণ এবং বোঝার ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করুক, নিজের পরিবারের অন্ধ অনুকরণ নয়। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন [নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)], "এটাই আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই, আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে..."

পরিশেষে, সত্য এই যে, মিথ্যা দেবতার প্রত্যেক উপাসকই কেবল নিজের ইচ্ছার পূজা করে। উপাসক সম্পূর্ণরূপে সচেতন যে তাদের মিথ্যা দেবতা তাদের জীবনযাপনের জন্য একটি আচরণবিধি দেবে না। তাই তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী এই আচরণবিধি আহরণ করবে। এটি তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে দেয়, পশুর মতো, নিজেদেরকে ধর্মীয় পোশাকে আবৃত করে। এটি সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা হয় মানবসৃষ্ট বা মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু ইসলামকে মহান আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষিত করেছেন, এটিই একমাত্র আচরণবিধি যা তাঁর কাছ থেকে উদ্ভূত এবং তাই এটি অনুসরণ করা একজন ব্যক্তিকে পশুর স্তরের বাইরে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 6:

"নিশ্চয় যারা কাফের, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের জন্য সমান - তারা বিশ্বাস করবে না।"

একজনকে অবশ্যই অন্যদেরকে ভাল কাজ করার পরামর্শ দিতে হবে এবং খারাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে হবে, এমনকি যদি তারা তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। এই আয়াতগুলো একজন মুসলিমকে অন্যদের উপদেশ ও সতর্ক করা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয় না। একজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত তাদের দেওয়া উপদেশ ও সতর্কবাণী শুনবে কি না, একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তাই, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, বিশেষ করে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন করা উচিত। তাদের তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত কিন্তু ভাল পরামর্শ দেওয়া এবং খারাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করা উচিত। উপরন্তু, তাদের ভাল জিনিসগুলিতে সাহায্য করা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এটি তাদের মন্দ পথ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

তদ্ব্যতীত, একজন ব্যক্তির লোকদের উপর অভিভাবক হিসাবে কাজ করা উচিত নয় যাতে তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঠিক নির্দেশনা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল অন্যদেরকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে সদয়ভাবে উপদেশ দেওয়া, উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া, কিন্তু তাদের দায়িত্ব মানুষকে সরল পথে পরিচালিত করা নয়। এই মনোভাব অবলম্বন করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং একজন ব্যক্তি অন্যদের প্রতি তিক্ত এবং রাগান্বিত হতে পারে যারা তাদের ভাল পরামর্শ শুনতে ব্যর্থ হয়। এই তিক্ততা এমনকি একজনকে অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দিতে পারে। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

“সুতরাং [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে স্মরণ করিয়ে দিন, আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 6-7:

"... আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের জন্য সমান - তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর স্থাপন করেছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর একটি পর্দা রয়েছে..."

এই আয়াতগুলি দ্বারা নির্দেশিত, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার একগুঁয়ে মানসিকতার উপর অটল থাকা, কারণ এটি কারও ইচ্ছার বিরোধিতা করে, একজন ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা, উপকার থেকে ক্ষতি এবং খারাপ থেকে ভাল পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে অন্ধভাবে বিচরণ করবে, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা হয় তা উপলব্ধি করবে না বা পূরণ করবে না। তারা বরং তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতার উপর অটল থাকবে। এতে উভয় জগতেই অসুবিধার সৃষ্টি হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 7:

"... আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ মানুষের উপর হেদায়েত চাপিয়ে দেন না, কারণ এটি এই দুনিয়া, পরীক্ষা ও পরীক্ষার দুনিয়ার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করবে। পরিবর্তে, তিনি মানুষকে সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেন এবং তাদের কাছে তা উপস্থাপন করেন। যদি তারা সত্যকে অবলম্বন করে এবং কাজ করে যা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করা, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য উত্তম। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে তাদের উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তাকে তাদের বেছে নেওয়া পথে চলতে দেওয়া হবে। তারা এই পৃথিবীতে দুঃখ ভোগ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাসস্থল, এবং তারা পরকালে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 115:

" যদি কেউ রসূলের বিরোধিতা করে, তার কাছে হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, আমরা তাকে তার মনোনীত পথের উপর ছেড়ে দেব- আমরা তাকে জাহান্নামে পুড়িয়ে দেব, যা একটি মন্দ স্থান।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 6-7:

"... আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের জন্য সমান - তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর স্থাপন করেছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর একটি পর্দা রয়েছে..."

ইসলামী শিক্ষায় প্রদত্ত সতর্কবাণী ও উপদেশ মেনে চলার মাধ্যমে একজনকে এই পরিণতি এড়াতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামের শেখানো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করবে, যেমন ধৈর্য, এবং তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন লোভ দূর করবে। আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখন একজনকে তাদের বাকি ইন্দ্রিয়গুলি যেমন তাদের শ্রবণশক্তি এবং

দৃষ্টিশক্তিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করার দিকে নিয়ে যায়, যা উভয় জগতের আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। পক্ষান্তরে, ইসলামী শিক্ষায় প্রদত্ত সতর্কবাণী ও উপদেশ উপেক্ষা করা, এমনকি যদি কেউ ইসলামে বিশ্বাস করে, তবে কেবল একটি কলুষিত আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলস্বরূপ তাদের শরীরের বাকি অংশ এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কলুষিত কর্মের দিকে পরিচালিত করে। সহীহ বুখারীর ৫২ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এই ব্যক্তি উভয় জগতে দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও অসুবিধা থেকে নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 8-10

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"এবং মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছি' কিন্তু তারা ঈমানদার নয়।

তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কিছু করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।

তাদের অন্তরে রোগ আছে, তাই আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কারণ তারা মিথ্যা বলত।"

এই আয়াতগুলো মদিনায় বসবাসরত ভন্ডদের উল্লেখ করে যারা জাগতিক কারণে যেমন সম্পদ ও সুরক্ষা লাভের জন্য মুসলিম হওয়ার ভান করেছিল। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং তাদের এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তারা তাদের মতো আচরণ না করে, যে ব্যক্তি একটি দলের মতো আচরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উত্তম সাহচর্য অবলম্বনের গুরুত্ব প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে একক ব্যক্তি একটি দলের পক্ষে কথা বলে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য এবং মনোভাব গ্রহণ করে তা নেতিবাচক বা ইতিবাচক, সূক্ষ্ম বা আপাত। সহীহ বুখারী নং 5534-এ পাওয়া একটি হাদিসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই সৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে। আধ্যাত্মিক হৃদয়ের রোগ, যা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের রূপ নেয়, যেমন লোভ এবং হিংসা, বাস্তবে সংক্রামক এবং সহজেই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ একজন অসুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের সাথে থাকে, তবে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ও রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার। এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাই উভয় জগতেই অসুবিধা হয়।

একজনকে অবশ্যই তাদের মনোভাব অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা তাদের জিহ্বা দিয়ে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু তাদের কর্মে তা দেখাতে ব্যর্থ হয়। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। যে ব্যক্তি তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তার কাছে বিচার দিবসে দেখানোর

জন্য কোন সমর্থনকারী প্রমাণ থাকবে না এবং ফলস্বরূপ, তারা ভন্ডদের ভাগ্য ভাগ করে নিতে পারে। প্রকৃত বিশ্বাস বাহ্যিক কর্ম দ্বারা সমর্থিত অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস জড়িত।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 8-9:

" আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি' কিন্তু তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে প্রতারণা করার [মনে করে] কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কিছু করে না এবং [তা বুঝতে পারে না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল প্রতারণা করেছিল। নিজেদের, যেহেতু তাদের মনোভাব শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষতি করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

একটি উল্লেখ করা উচিত যে যদিও মুনাফিকরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল, তবুও মহান আল্লাহ তাদের মনোভাবকে তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার সমান। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

" যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এটি পবিত্র কুরআনের মতো ইসলামিক জ্ঞানকে বোঝার এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আলোকে, কারণ তিনি হলেন বাস্তবসম্মত ইসলামি রোল মডেল যা অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। একজনের জীবনের দিক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

উপরন্তু, একজনকে যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতারণামূলক আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এই আচরণ থেকে তারা যে কোনো পার্থিব জিনিস লাভ করবে তা

উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা এই ফলাফল উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 55:

" সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে প্রভাবিত না করে। আল্লাহ পার্থিব জীবনে তাদের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিতে চান..."

মূল আয়াতে উল্লিখিত মুনাফিকির প্রথম লক্ষণ হল মিথ্যা বলা। মিথ্যা একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। যে মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানোর জন্য, তাই তাদের উদ্দেশ্য তাদের ধোঁকা দেওয়া নয়, জামে আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই মিথ্যার বিপদ বোঝা যায়। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর কাজ করা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, এর পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং তার উপর আমল করে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে এই ব্যক্তির কী হবে তা বোঝার জন্য কোনো প্রতিভা লাগে না। যদিও মিথ্যা বলাকে তুচ্ছ করা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 8-9:

" আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে প্রতারণা করার [মনে করে] কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কিছু করে না এবং [তা বুঝতে পারে না।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মৌখিকভাবে ইসলামে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করে মুনাফিকের মতো আচরণ করা এড়াতে হবে এবং বাস্তবে এটিকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হলে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও আশীর্বাদ লাভ করবে। যে এইভাবে আচরণ করে সে কেবল নিজের সাথে প্রতারণা করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মহান আল্লাহর রহমতের আশা নয়, এটি কেবল ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা, যার ইসলামে কোনো মূল্য নেই। মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা তাঁর ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। অন্যদিকে, ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হওয়ার সাথে জড়িত এবং এখনও বিশ্বাস করে যে তারা উভয় জগতে রহমত ও আশীর্বাদ পাবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা অবলম্বন করে সে বুঝতে ব্যর্থ হবে যে তাদের মনোভাব কেবল তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কাছাকাছি নিয়ে যায়, কারণ তারা লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়। ভাল কাজের সঙ্গে তাদের বিশ্বাস গাছপালা. ফলস্বরূপ , তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যা ক্যান্সারের মতো আচরণ করে, কেবলমাত্র বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকবে, আরও বেশি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 10:

"তাদের অন্তরে রোগ আছে, তাই আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন..."

তারা যত বেশি আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকবে, উভয় জগতে তাদের শাস্তি তত বেশি হবে। তারা শপথ করতে থাকবে যে তারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী যারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে, কিন্তু তাদের অসৎ উদ্দেশ্য এবং মিথ্যাবাদী মনোভাবের কারণে তারা বুঝতেও পারবে না যে তারা কিভাবে এবং কেন পার্থিব নেয়ামত তাদের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। . তবে এই ব্যক্তির জন্য এই পৃথিবীর বাইরে যা রয়েছে তা আরও বিপর্যয়কর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 10:

"...এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কারণ তারা [অভ্যাসগতভাবে] মিথ্যা বলত।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই আচরণ ও পরিণতি এড়িয়ে চলতে হবে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার মাধ্যমে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাকে এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে এবং নেতিবাচকগুলিকে সরিয়ে দেয় যা ফলস্বরূপ একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কর্মের দিকে পরিচালিত করে। এই ব্যক্তি উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

"আর যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো সংস্কারক।

নিঃসন্দেহে, তারাই দুর্নীতিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"

আয়াত 11 মন্দ আপত্তি গুরুত্ব নির্দেশ করে. প্রত্যেক মুসলমানকে জ্ঞান ও সঠিক আচার-আচরণ অনুযায়ী মন্দের আপত্তি করতে হবে। যদি কেউ অন্যের মন্দ কাজে আপত্তি করার ফলে আরও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তার উচিত অন্তত অন্তরে খারাপ জিনিসটিকে ঘৃণা করা। অন্যথায়, তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী মৌখিক বা শারীরিকভাবে খারাপের আপত্তি করবে। সুনানে আবু দাউদ, 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে শারীরিকভাবে খারাপের বিরুদ্ধে আপত্তি করার অর্থ এই নয় যে একজনকে লড়াই করা উচিত, কারণ এটি সমাজে দুর্নীতিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুর্নীতি হ্রাস ও নির্মূল করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অন্যের মন্দকে উপেক্ষা করা গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তারা নিজেরাই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে। একটি পচা আপেল অন্যদেরকে সংক্রমিত করবে যতক্ষণ না পুরো সমাজ মন্দতায় নিমজ্জিত হয়। একজনের উচিত অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করা এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবেই অন্যের খারাপ কাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

এই আয়াতে ভন্ডামির আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো দুর্নীতি ছড়ানো। যখন কেউ একটি কপট মনোভাব গ্রহণ করে যার ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তা তাদের বাহ্যিক কর্মের বিরোধিতা করে, এটি সর্বদা তাদের এবং অন্যদের জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দুই মুখের ব্যক্তি বিভিন্ন লোককে খুশি করার জন্য তাদের বক্তৃতা এবং কাজগুলিকে মানিয়ে নেয়। তাদের কপট মনোভাবের ফলে , তারা শুধুমাত্র নিজের এবং অন্যদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, কারণ তারা যা বলে এবং করে তার বেশিরভাগই মিথ্যা এবং প্রতারণার উপর ভিত্তি করে।

একজন মুনাফিক ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মানুষকে একত্রিত করছে এবং দ্বিমুখী মনোভাব অবলম্বন করে পুনর্মিলন ঘটাচ্ছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যেহেতু সম্পদ এবং সম্মানের মতো পার্থিব লাভের উপর ভিত্তি করে, তাদের আচরণ সংস্কার নয় দুর্নীতির দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, মুনাফিকরা পার্থিব লাভের জন্য সত্য এবং যা সঠিক তার সাথে সহজে আপস করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা অন্যায়ভাবে বিশ্বাস করবে যে সত্যের সাথে আপস করে তারা অন্যদের উপকার করছে। কিন্তু মিথ্যা যেমন সবসময় সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, তেমনি তাদের মনোভাব সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকরা সত্য ও ন্যায়ের সাথে আপোষ করে মক্কার মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মিটমাট করতে চেয়েছিল এবং বিশ্বাস করেছিল যে তারা জিনিসের সংস্কার করছে, যদিও তাদের মনোভাব। শুধু সমাজে আরও অন্যায় ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 11-12:

"আর যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো সংস্কারক। নিঃসন্দেহে, তারাই দুর্নীতিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"

উপরন্তু, এই আয়াতগুলি থেকে কেউ বুঝতে পারে যে তারা যদি সমাজের মধ্যে সংস্কার চায় তবে তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলতে হবে, কারণ মহান আল্লাহই জানেন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে সমাজের কী উপকার হবে এবং কী হবে না। মানুষ যখন তাদের অদূরদর্শীতা, জ্ঞানের অভাব এবং স্বাভাবিক পক্ষপাতের উপর ভিত্তি করে পছন্দ করে, তখন তারা কেবল সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে, এমনকি যদি তারা এটি সংস্কার করতে চায়। অধ্যায় 38 সাদ, আয়াত 26:

"...সুতরাং মানুষের মধ্যে সত্যের সাথে বিচার করুন এবং [নিজের] ইচ্ছার অনুসরণ করবেন না, কারণ এটি আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে..."

এটাও লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি ভাল উদ্দেশ্যকে একত্রিত করতে হবে, যা সঠিক কর্মের সাথে সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সংস্কার করা। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়। কখনও কখনও, যে সমস্ত মুসলিমরা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক সংস্কার করতে চায় তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য ধারণ করে তবে ইসলামী জ্ঞান এবং আচরণের অজ্ঞতার কারণে তারা কেবল আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই, মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শেখা এবং আমল করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সঠিক কর্মের সাথে যুক্ত করে এবং তাই নিজেদের মধ্যে সংস্কার ঘটাতে পারে। সমাজে দুর্নীতি ছড়ানোর বদলে।

একটি অনুরূপ মনোভাব যা সমাজে, বিশেষ করে পরিবারের মধ্যে দুর্নীতি ও অনৈক্য ছড়িয়ে দেয়, প্রায়শই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় যারা সত্যিকার অর্থে তাদের পরিবারের মধ্যে ঐক্য তৈরি করতে চায় কিন্তু অজ্ঞতা এবং তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা কেবল তাদের পরিবারে দুর্নীতি ও অনৈক্য সৃষ্টি করে। . উদাহরণস্বরূপ, অনেক প্রবীণ তাদের পরিবারের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে, যেমন তাদের সন্তান। ফলস্বরূপ, তাদের পরিবার, যেমন তাদের সন্তান, তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে। সময়ের সাথে সাথে, এই অনুভূতিগুলি ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটা আশ্চর্যজনক যে খুব বড় যারা তাদের আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় তারা তাদের পরিবারের মধ্যে অনৈক্য নিয়ে হাহাকার করে। শুধুমাত্র অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে কথা বলার মাধ্যমে এই মনোভাব পরিহার করতে হবে, যা সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে যাতে কেউ সমাজের মধ্যে ঐক্যের উৎস হয়ে ওঠে, অনৈক্য ও দুর্নীতির উৎস নয়।

উপরন্তু, যদি কেউ জনগণের মধ্যে ঐক্যের উত্স হতে না পারে, তবে তারা অন্তত যা করতে পারে তা হল সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অনৈক্যের উত্স হওয়া এড়ানো। তাদের জন্য দুর্নীতি ও অনৈক্যের উৎস হয়ে ওঠার চেয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা অনেক ভালো যেখানে কেউ সমাজকে বাধাগ্রস্ত বা উপকৃত করবে না। সহীহ মুসলিমের ২৫০ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন আচরণ, যার মাধ্যমে কেউ তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে, আসলে এটি একটি দাতব্য কাজ যা একজন নিজের জন্য করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 11-12:

“আর যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো সংস্কারক। নিঃসন্দেহে, তারাই দুর্নীতিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"

মুনাফিকরা যেমন ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তেমনি পরোক্ষভাবে তারা সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাচ্ছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন ব্যতীত একটি সমাজ কখনই শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে না। এর কারণ হল, মহান আল্লাহর ভয় সর্বদা অন্যায়কে প্রতিরোধ করবে এমনকি যখন আইন তা প্রতিরোধ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, এটা মহান আল্লাহর ভয়, যা একজন ব্যক্তিকে অন্যের উপর অন্যায় করতে বাধা দেয়, বিশেষ করে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা পুলিশ থেকে পালাতে পারে। মহান আল্লাহর ভয় ব্যতীত, একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে অন্যায় করার এবং অপরাধ করার সুযোগ গ্রহণ করবে যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে যে সে আইন থেকে বাঁচতে পারে। মহান আল্লাহর ভয়ের এই অভাব সর্বদা সমাজে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটাবে। তাই ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মুনাফিকরা এবং আধুনিক যুগে পাওয়া মুনাফিকরা সমাজের অভ্যন্তরে শুধু অন্যায়-অবিচার ছড়াচ্ছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে যাতে তারা সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে দিতে তাদের ভূমিকা পালন করে, যদিও তারা সমাজকে জাতীয় পর্যায়ে প্রভাবিত করতে না পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 12:

"নিঃসন্দেহে, তারাই দুর্নীতিকারী, কিন্তু তারা [এটি] উপলব্ধি করে না।"

এই আয়াতটি একটি অন্ধ এবং অজ্ঞ মনোভাব গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যার ফলে কেউ তাদের কর্মের পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ ও বুঝতে ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যমে এবং অন্যের কর্ম ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের কর্মের পরিণতি শিখতে ব্যর্থ হয়, তারা অবশেষে এমন একটি স্তরে পৌঁছে যাবে যেখানে তারা খারাপ কাজ করে তবুও বিশ্বাস করে যে তারা সমাজে কল্যাণ ছড়াচ্ছে। এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার শাস্তির সম্মুখীন হবে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা তাদের অবিশ্বাসকে তাদের ক্রমাগত চাপ, উদ্বেগ এবং মানসিক সমস্যার সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরকালে তারা যা সম্মুখীন হবে তা হবে আরও খারাপ। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 13

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ
وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

এই আয়াতের শুরুটা অন্যদেরকে ভালো জিনিসের ওপর উপদেশ দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং বর্ধিত করে, খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়। ইসলামী জ্ঞান ও আচার-আচরণ অনুযায়ী সদয় ও নম্রভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব, এবং আরও অনেকগুলি সঠিকভাবে পূর্ণ হয় যখন একজন আন্তরিকভাবে অন্যদের জন্য ভালবাসে যা তারা নিজের জন্য চায়। যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবে সে অন্যকে সঠিক উপদেশ দেবে।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন সাহাবায়ে কেরামের মত বিশ্বাসী মানুষের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বিশ্বাসী। যে কেউ তাদের জীবন অধ্যয়ন করে, তারা স্পষ্টভাবে এমন লোকদের দেখতে পাবে যারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করেছিল, যার মধ্যে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত ছিল। তার উপর এটা স্পষ্ট যে, অন্য কোন প্রকার বিশ্বাস যেমন মৌখিকভাবে নিজের বিশ্বাস ঘোষণা করা এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়া, মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 115:

"আর যে ব্যক্তি পথপ্রদর্শন সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, আমরা তাকে যা সে গ্রহণ করেছে তাকে দেব এবং তাকে জাহান্নামে তাড়িয়ে দেব, এবং তা মন্দ গন্তব্য।"

সুতরাং, মুসলমানদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এবং তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে হবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যেভাবে তা

করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছিলেন। এর সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলা জড়িত। একজনকে অবশ্যই অন্য জিনিসের উপর কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। সত্য হল এই যে, কেউ অন্য বিষয়ে যত বেশি আমল করবে, তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে। এটি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যারা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে যারা সর্বদা সৎকাজ করতে আগ্রহী হয় নির্দেশের দুটি উত্স থেকে নেওয়া হয়নি। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যে কোন কাজ যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নেই তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাদেরকে মানুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য যে বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা কঠিন কাজ নয়, যা কেবলমাত্র কয়েকজন বিশেষ পূরণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ ইসলামকে সহজে গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছেন, কারণ এটি মানুষের প্রকৃতির জন্য তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যদেরকে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দিয়ে ইসলামের সহজ প্রকৃতির উপর জোর দিতেন এবং নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়ার জন্য। সহীহ বুখারী, 39 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেননি যা তারা বহন করতে এবং পালন করতে পারে না, তাই নিজের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করবে এবং মানসিক শান্তি পাবে। এবং উভয় জগতের শরীর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 13:

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

ইসলাম যেহেতু মানুষকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানায়, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এটি এই আশীর্বাদগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করার বিরোধিতা করে। নিজেকে খুশি করা এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তারা যতক্ষণ না ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় ততক্ষণ তারা জাগতিক জিনিসগুলি নির্বিশেষে মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাবে না। মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

যারা এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয়, যারা এই সত্যটি বোঝে এবং সঠিকভাবে কাজ করে তাদের পর্যবেক্ষণ করে বোকা – বোকা যারা তাদের বাসনাকে বন্য পশুর মতো মুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জীবন যাপন করে। তাদের জ্ঞান ও বোধগম্যতার অভাব তাদেরকে প্রকৃত বোকা করে তোলে, কারণ তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করা এবং ফলস্বরূপ তারা চাপ, উদ্বেগ, মানসিক ব্যাধি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এমনকি যদি তাদের মজা এবং বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

যদি তারা তওবা করতে এবং তাদের পথ সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করেছে, তবে তাদের দুঃখ আখেরাত পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এটি সবচেয়ে বড় হেরে যাওয়া এবং বোকা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 13:

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

মূল আয়াতগুলি এমন একটি বাস্তবতাও নির্দেশ করে যা কালের সূচনাকাল থেকে মানুষকে প্রভাবিত করেছে। যখনই একজন ব্যক্তি এমন একটি পথ বেছে নেয় যা তার আশেপাশের লোকদের পথের থেকে ভিন্ন, তখন তারা কঠোরভাবে সমালোচিত হবে, এমনকি তারা যে পথটি বেছে নেয় তা খারাপ না হলেও। এই সমালোচনার বেশিরভাগই আসলে নিজের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে আসে। আন্তরিকতা অবলম্বন করা এবং তাদের আত্মীয়দের একটি ভাল পথের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য উত্সাহিত করার পরিবর্তে, তারা পছন্দ করে যে তারা তাদের পথে তাদের সাথে যোগ দেয়, যদিও সেই পথটি নিকৃষ্ট বা এমনকি খারাপও হয়। একজন মুসলিম যে ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে চায় তারা তাদের মুসলিম আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও

এটি অনুভব করবে। কিন্তু তাদের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দ্বারা কখনই নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়, কারণ এটি একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া, এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাদের আন্তরিক নিয়তের উপর অবিচল থাকতে হবে এবং বিশ্বাসের মাধুর্য না পাওয়া পর্যন্ত সমালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটি এতদূর পর্যন্ত, তারা যে কোন সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে বা তাদের মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে তারা হারাতে পারে এমন কোনো সমালোচনাকে ছাড়িয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 13:

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

এই আয়াতটি অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। অজ্ঞরা ধরে নেবে যে নিজের ইচ্ছা পূরণ করলে মনের শান্তি ও সফলতা আসে, যেখানে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর পরিবর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে

তা ব্যবহার করলে মনের শান্তি বা সাফল্য আসবে না। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা এই সত্যটি বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহই মানুষের ভাগ্য এই দুনিয়া এবং পরকালের নিয়ন্ত্রণ করেন। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে সে উভয় জগতে শান্তি ও সফলতা পাবে, যদিও এই জগতে তাদের সাফল্য স্পষ্ট নয়। অথচ যারা তাঁর অবাধ্য তারা উভয় জগতে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। ইসলামিক জ্ঞান একজনকে এই দুটি ফলাফলের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করার অনুমতি দেবে, কারণ তারা অতীতের উদাহরণগুলি শিখবে যা এই সত্যটি প্রদর্শন করে এবং তাদের বর্তমান জীবনেও আরও উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। অথচ, অজ্ঞ থাকা একজনকে সঠিক পথ চিনতে বাধা দেবে এবং তার পরিবর্তে অন্যকে গবাদি পশুর মতো অন্ধভাবে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করবে। তারা কোনটা খারাপ থেকে সত্যিকারের ভালো এবং ব্যর্থতা থেকে সফলতা আলাদা করতে ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, তারা খারাপ পথ বেছে নেবে যা উভয় জগতে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায় এবং ধরে নেয় যে তারা ভাল এবং সফল পথ বেছে নিয়েছে। যারা সফল পথ বেছে নিয়েছে তাদের তারা ঠাট্টা করবে তারা বিশ্বাস করে যে তারা বোকা, কিন্তু বাস্তবে তারাই বোকা। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 13:

"...নিঃসন্দেহে, তারাই বোকা, কিন্তু তারা জানে না।"

উপরন্তু, সত্যিকারের বিশ্বাসের জন্য একজন ব্যক্তিকে কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে যে আশীর্বাদগুলি তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। . কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, তারা যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে বোকা বলে পালন করবে। কিন্তু বাস্তবে, তারাই বোকা কারণ তারা এমন একটি পথ বেছে নিয়েছে যা নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই কষ্ট পাবে। তাদের উদাহরণ সেই রোগীর মতো যাকে তাদের ডাক্তার কঠোর ডায়েট মেনে চলতে বলেছেন। এই বোকা ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করবে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। তাই তারা তাদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস চালিয়ে যাবে এবং ফলস্বরূপ তারা ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মতো অগণিত মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগবে। অন্যদিকে, যে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে বিরোধিতা করতে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বাধ্য করা যেতে পারে তবে এটি তাদের একটি ভাল এবং সুস্থ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 13:

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

এই মনোভাব জাগতিক জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাদের পার্থিব জ্ঞান তাদের এই চিন্তায় বিভ্রান্ত করে যে তারা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার পরিবর্তে সঠিক দিকনির্দেশনা অর্জনের জন্য তাদের পার্থিব জ্ঞান এবং বুদ্ধি তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। এই মনোভাব একজনকে যারা ইসলামী জ্ঞান অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়ন করে তাদের মূর্খ বলে আখ্যা দিতে পারে। পার্থিব জ্ঞান প্রশংসনীয় হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যে ব্যবহার করা হবে, তা কম নয়, সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য তা কখনই যথেষ্ট হবে না। পার্থিব জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না যে কীভাবে একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক এবং দেহের শান্তি অর্জন করতে পারে। এটি কেবলমাত্র ইসলামী জ্ঞান, পবিত্র কুরআন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামিক ও উপকারী পার্থিব জ্ঞান দুটোই অধ্যয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, কোনটিই পরিত্যাগ না করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 13:

"এবং যখন তাদের [মুনাফিকদের] বলা হয়, "মানুষেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, সেভাবে তোমরাও ঈমান আন," তারা বলে, "আমাদের কি মূর্খেরা যেমন ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনব?" সন্দেহাতীতভাবে, তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা জানে না।"

মুসলিমদের জন্য ইসলামের জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে বিশ্বাসের নিশ্চিততা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা আলোচনার মূল আয়াতে উল্লিখিত মনোভাব গ্রহণ করা এড়াতে পারে। যারা বিশ্বাসের নিশ্চিততা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়

তারা দেখতে ব্যর্থ হবে যে একজনের বিশ্বাস কতটা বাস্তবসম্মত, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। শান্তি ও বরকত তাদের উভয় জগতে উপকৃত হবে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজনকে বুঝতে দেয় যে এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি প্রায়শই বাস্তব নয়, যেমন সম্পদ বা কর্তৃত্ব অর্জন। পরিবর্তে, এই সুবিধাগুলি প্রায়ই পর্যবেক্ষণ করা কঠিন, যেমন মনের এবং শরীরের শান্তি। কেবলমাত্র বিশ্বাসের নিশ্চিততার মাধ্যমেই কেউ এই অপ্রকাশ্য সুবিধাগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সেইজন্য সেগুলি পেতে চেষ্টা করে। কেউ যদি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে অবহেলা করে তবে তারা এই অপ্রকাশ্য সুবিধাগুলি পালন করতে ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করবে না। তারা এর পরিবর্তে যারা এই অপ্রকাশ্য সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদেরকে বোকা হিসেবে দেখবে, যদিও তারা মূর্খ।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 14-16

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্টদের সাথে একা থাকে, তখন তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা ছিলাম উপহাসকারী।"

[কিন্তু] আল্লাহ তাদের উপহাস করেন এবং তাদের সীমালংঘনে তাদের দীর্ঘায়িত করেন [যদিও] তারা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়।

এরাই তারা যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের লেনদেন কোন লাভ বয়ে আনেনি এবং তারা সৎপথে পরিচালিতও হয়নি।"

প্রথম আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে ভন্ডামির একটি চিহ্ন হল যখন কেউ ক্রমাগত অন্যদের মনে করিয়ে দেয় যে তাদের ভাল গুণাবলী রয়েছে। মুনাফিকরা প্রতিনিয়ত সাহাবায়ে কেরামকে স্মরণ করিয়ে দিত, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তারা ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী যারা ইসলামের জন্য নিবেদিত ছিলেন। একজন বক্তা এবং একজন কর্মকারীর মধ্যে পার্থক্য হল যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি তাদের ভাল গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলতে ভাল, যেমন তারা সবসময় অন্যদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা ভাল মুসলিম হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, তবুও তারা সমর্থন করে না কর্মের সাথে তাদের মৌখিক ঘোষণা। অন্যদিকে, কর্মকারী, কথা কম এবং কাজ বেশি করে। তাদের অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই যে তারা কথিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করার কথা বলার পরিবর্তে তারা বাস্তবিকভাবে সেগুলি পূরণ করে। আলোচনাকারীরা কেবল অলস কারণ মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা তারা বহন করতে পারে না বা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই ভন্ডামিপূর্ণ মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য কতটা কঠোর চেষ্টা করছে সে সম্পর্কে কম কথা বলে এবং সাহাবায়ে কেরামের মতো, যেমনটি আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, বাস্তবিকভাবে সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

উপরন্তু, যে এই মনোভাব ধারণ করে সে অন্যদের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়, ফলস্বরূপ তারা অন্যদের মনে করিয়ে দিতে পারে যে তারা কথিত ভাল গুণাবলী এবং তারা যে ভাল কাজ করেছে তা স্মরণ করিয়ে দিতে। যখন কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তখন এটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষকে প্রভাবিত করার পরিবর্তে ভাল কাজ করার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে বিচারের দিন তাকে বলা হবে যে তারা তাদের ভাল কাজের জন্য তাদের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, যা বাস্তবে সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই সঠিক মনোভাবের একটি চিহ্ন হল তারা মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা আশা করবে না বা আশাও করবে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রদর্শন এড়াতে তাদের ভাল কাজ এবং গুণাবলী গোপন রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 14:

“আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্টদের সাথে একা থাকে, তখন তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা ছিলাম উপহাসকারী।"

এই আয়াতটি খারাপ সাহচর্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ একজন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে ভালো বা খারাপ, সূক্ষ্ম বা আপাত। সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি তাদের

ভালবাসা প্রমাণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালে তাদের সাথে শেষ হবে, কারণ তারা অনিবার্যভাবে ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে যা জান্নাতে নিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই আয়াতটি ভন্ডামির আরেকটি বৈশিষ্ট্যকেও নির্দেশ করে, তা হল দ্বিমুখী হওয়া। এটি তখনই হয় যখন লোকেরা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য তাদের মনোভাব এবং কথাবার্তা পরিবর্তন করে। এই আচরণ সর্বদা উভয় জগতেই অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি একজন ব্যক্তি এমন আচরণ করে বাহ্যিকভাবে কিছু পার্থিব সুবিধা লাভ করে। তারা যাদেরকে খুশি করার লক্ষ্য রাখে তারা তাদের অপছন্দ করবে এবং তারা যে কোন বৈষয়িক সুবিধা পাবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে, এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 15:

" [কিন্তু] আল্লাহ তাদের উপহাস করেন এবং তাদের সীমালংঘনে তাদের দীর্ঘায়িত করেন [যদিও] তারা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়।"

আয়াত 15 মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মহান আল্লাহর শাস্তি সর্বদা সুস্পষ্ট নয়, যেমন বজ্রপাতে আঘাত করা বা শাস্তি অবিলম্বে নেমে আসে না। এই বাস্তবতাকে কখনই তাদের এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা তাদের আচরণের পরিণতির মুখোমুখি হবে না অন্যথায় তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে থাকবে, যা কেবলমাত্র উভয় জগতে তাদের পরিণতি বাড়াবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 16:

"এরাই তারা যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের লেনদেন কোন লাভ বয়ে আনেনি এবং তারা সৎপথে পরিচালিতও হয়নি।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আয়াত 16 সতর্ক করে যে যারা অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা সঠিক দিকনির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবে, যা উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়, বিপথগামী থেকে, যা উভয় জগতে উদ্বেগ, চাপ এবং শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়, তারা তাদের কষ্টের উৎস উপলব্ধি না করে, তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকা সত্ত্বেও তারা একটি কঠিন এবং চাপযুক্ত জীবনযাপন চালিয়ে যাবে। পরিবর্তে, তারা তাদের চাপপূর্ণ জীবনের জন্য অন্যান্য বিষয়কে দায়ী করবে, যেমন তাদের স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন, এবং ফলস্বরূপ তারা এই জিনিসগুলির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তবে এটি এই পৃথিবীতে তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ

বাড়িয়ে তুলবে, কারণ এই জিনিসগুলি তাদের সমস্যার উত্স ছিল না। তাদের আচরণের কারণে তারা এই পৃথিবীতে যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে না, যেমন একটি প্রিয়জনের মৃত্যু, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার গভীরে নিমজ্জিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 16:

"এরাই তারা যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের লেনদেন কোন লাভ বয়ে আনেনি এবং তারা সৎ পথে পরিচালিতও হয়নি।"

মুসলমানদের অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে হবে, নিয়ত ও কর্মে অকৃত্রিমতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা পরিহার করে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যাতে তারা উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি পান। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 16:

"এরাই তারা যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের লেনদেন কোন লাভ বয়ে আনেনি এবং তারা সৎপথে পরিচালিতও হয়নি।"

মুসলমানদেরকে নির্দেশনার দুটি উৎস দেওয়া হয়েছে: পবিত্র কোরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তারা উভয়ই স্পষ্ট করে দেয় যে কীভাবে একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। যারা হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর শিক্ষা ও আমলকে উপেক্ষা করে, যদিও তারা এগুলোর প্রতি ঈমান আনে, তারা পথনির্দেশকে ভ্রান্তির সাথে বিনিময় করবে, কারণ তাদের অজ্ঞতা তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। 16 শ্লোকের শেষে সতর্ক করা হয়েছে, এই মনোভাব বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাবে। এই ফলাফলটি তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ নির্দেশনার দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করার চেষ্টা করে।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 17-18

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

" তাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালালো, কিন্তু যখন তা তার চারপাশে আলোকিত করে দিল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিলেন [যাতে] তারা দেখতে পেল না।

বধির, বোবা ও অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

যিনি আগুন জ্বালিয়েছিলেন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উল্লেখ করতে পারেন, যিনি মানবজাতির উপকার করার জন্য ঈমানের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 1:

"...[এটি] একটি কিতাব যা আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন - পরাক্রমশালী, প্রশংসিতের পথে।"

কিন্তু অমুসলিমরা তাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। মক্কার অমুসলিমদের সম্মানের ক্ষেত্রে, যেহেতু তারা তাদের সমগ্র জীবন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কাটিয়েছে, তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। যেহেতু তারা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল, তারা জানত পবিত্র কোরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয় অন্যথায় তারা এটির মতো কিছু তৈরি করত, যার ফলে এটি ঐশ্বরিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের সম্পর্কে, তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল কারণ উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু উভয় গোষ্ঠীর কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তারা ধন-সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসগুলি হারানোর ভয়ে একগুঁয়েভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ভয় করত যে ইসলাম তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে, যা তাদের আরও পার্থিব জিনিস অর্জন করতে বাধা দেবে এবং এটি তাদেরকে আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধ্য করবে। যেহেতু তাদের পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের উপর পরাভূত হয়েছিল, তারা সত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে পারেনি এবং পরিবর্তে তাদের সামাজিক অবস্থান রক্ষা করার জন্য এর বিরোধিতা করা বেছে নিয়েছে। এ কারণেই ইতিহাসের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই সর্বপ্রথম নবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল। তাদের

মনোভাবের কারণে, মহান আল্লাহ ঈমানের আলোকে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা এর থেকে কোন উপকার করতে না পারে এবং ইসলামের আগুনকে থাকতে দেয়, যাতে এটি তাদের ধ্বংস করে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 17:

"...কিন্তু যখন এটি তার চারপাশে যা ছিল তা আলোকিত করে, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নেন এবং তাদের অন্ধকারে রেখে দেন [যাতে] তারা দেখতে পায় না।"

অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 8-9:

"তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু কাফেররা তা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ করে দেবেন। তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহ সকল ধর্মের উপর প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছেন, যদিও যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তারা তা অপছন্দ করে।"

আলো সরে গেলে কেউ তাদের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের উপকারী জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না যা তাদের ক্ষতি করবে। উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভের জন্য তারা সঠিক পথে পর্যবেক্ষণ করতে এবং যাত্রা করতে সক্ষম হবে না। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি এক সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াবে, মনের শান্তি বিহীন জীবন যাপন করবে, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। যেহেতু তারা সত্যকে স্বীকার করে না বা স্বীকার করে না, তাই তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের

দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে না, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। . এতে উভয় জগতেই তাদের অসুবিধা বাড়বে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 17:

"...কিন্তু যখন এটি তার চারপাশে যা ছিল তা আলোকিত করে, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নেন এবং তাদের অন্ধকারে রেখে দেন [যাতে] তারা দেখতে পায় না। বধির, বোবা ও অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল যখন তারা ইসলামের সত্যতা মেনে নেয় এবং তার উপর কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের উপকারের থেকে ক্ষতিকারক জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতেই মন ও শরীরের শান্তি আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 17-18:

"তাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালালো, কিন্তু যখন তা তার চারপাশে আলোকিত করে দিল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিলেন [যাতে] তারা দেখতে পেল না। বধির, বোবা ও অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

এই আয়াতগুলো একজন মুসলমানের জন্য ঈমানের আলোর মাধ্যমে অন্যদের উপকার করার গুরুত্বও নির্দেশ করে। ইসলামকে সঠিকভাবে তাদের কর্ম ও বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই এটি অর্জন করা সম্ভব। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে। যখন একজন মুসলমান এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তারা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে। বাকি বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বে ব্যর্থ হওয়া এমন

একটি বিষয় যা একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে বা বিচার দিবসে ছাড়বে না। এটি এমন একটি দায়িত্ব যা প্রতিটি মুসলমানের কাঁধে পড়ে যখন তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস এবং জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে।

উপরন্তু, মূল আয়াতগুলি এটাও স্পষ্ট করে যে, তাদের দেওয়া ইন্দ্রিয় ও ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার একমাত্র উপায় হল ঈমানের আলো ও নির্দেশনা। ঈমানের আলো নিভে গেলে ইন্দ্রিয় অন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে তারা উভয় জগতেই কেবল অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি জাতীয় স্তরেও পর্যবেক্ষণ করা বেশ স্পষ্ট। যখন একটি সমাজ বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং এর গুরুত্বকে ছোট করে, তখন এটি সর্বদা অন্যায় এবং তার সদস্যদের জন্য সুস্থতার অভাবের দিকে নিয়ে যায়। এই সমাজের আইন যতই ভালো হোক না কেন, মানুষ যে মুহূর্তে অনুভব করবে যে তারা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে পালাতে পারবে, তখনই তারা পার্থিব কিছু লাভের জন্য অন্যায় করবে। একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়, যা ঈমানের আলোর প্রত্যক্ষ ফল, এই মনোভাবকে প্রতিরোধ করতে পারে। বিশ্বাস ব্যতীত, কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং পক্ষপাতের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং ফলস্বরূপ তারা কখনই অন্যদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে না। এতে সমাজে অন্যায় ছড়িয়ে পড়বে।

উপরন্তু, যখন কারো ইন্দ্রিয় অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সমাজকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে। এই জিনিসগুলি তাদের জন্য ঈশ্বর হয়ে উঠবে, ঈশ্বর যা তাদেরকে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করার আদেশ দেবে। তারপর তারা তাদের সারা জীবন এই ঈশ্বরকে খুশি করার চেষ্টা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা সেই জিনিসগুলিকে অবহেলা করবে যা তাদের সুখের দিকে নিয়ে যায়। এটি উভয় জগতে তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার ক্ষতি করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 18:

"বধির, বোবা এবং অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

পক্ষান্তরে, যখন কেউ ঈমানের আলোকে তাদের ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে, তখন তারা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না, যিনি কেবল তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসের আদেশ ও নিষেধ করেন। তারা সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো একাধিক ঈশ্বরের পরিবর্তে শুধুমাত্র এক ঈশ্বরকে ধারণ করবে এবং মেনে চলবে। এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধি করবে, ঠিক একজন কর্মচারীর মতো যারা একাধিক সুপারভাইজারের পরিবর্তে শুধুমাত্র একজন সুপারভাইজারকে উত্তর দেয়। তারপর তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে, যা উভয় জগতের মানসিক এবং দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 17-18:

"তাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালালো, কিন্তু যখন তা তার চারপাশে আলোকিত করে দিল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিলেন [যাতে] তারা দেখতে পেল না। বধির, বোবা ও অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

ঈমানের আলো ছাড়া মানুষের জীবন অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে তারা তাদের উদ্দেশ্য না বুঝেই অন্ধভাবে এই পৃথিবীতে বিচরণ করবে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

তাদের মনোভাবের কারণে, তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা জড়িত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা একটি উদ্ভাবনের মতো হয়ে যায় যা তার প্রাথমিক কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করলেও। ফলস্বরূপ, তারা একটি শূন্য এবং অর্থহীন জীবন যাপন করবে। যদি তারা সত্যকে চিনতে এবং গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে বিচার দিবসে পৌঁছানোর পরে, তারা এমনভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে, যেমন একটি জিনিস যা তার সৃষ্টির প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 - আল বাকারাহ, আয়াত 19-20

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"অথবা [এটি] আকাশ থেকে ঝড়ের মতো যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ। মৃত্যুর ভয়ে তারা বজ্রপাতের বিরুদ্ধে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। কিন্তু আল্লাহ কাফেরদের বেষ্টন করে আছেন।

বজ্রপাত প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। যখনই এটি তাদের জন্য [পথ] আলোকিত করে, তখনই তারা সেখানে চলে। কিন্তু যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এই আয়াতগুলো মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের উল্লেখ করে, যারা যুদ্ধের গনীমতের মতো পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণের ভান করেছিল। বজ্রপাত এবং বজ্রপাত হতে পারে ইসলাম এবং এর সাথে সংযুক্ত দায়িত্বের কথা, যেমন আশীর্বাদ ব্যবহার করা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ, শান্তি এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। মুনাফিকরা যেমন ইসলামের দায়িত্বকে অপছন্দ করত, তারা সেগুলিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করত, ঠিক তেমনি যে কেউ তাদের আঙ্গুল দিয়ে তাদের কান অবরুদ্ধ করে তাদের যা বলা হয় তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। আসমান থেকে যখনই পবিত্র কুরআনের নতুন আয়াত নাজিল হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টির মতোই যেন তাদের উপর মৃত্যু নেমে এসেছে, কারণ এই আয়াতগুলো তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিল। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 64:

"মুনাফিকরা আতঙ্কিত যে তাদের সম্পর্কে একটি সূরা নাযিল হবে, যা তাদের অন্তরে যা আছে তা তাদের জানিয়ে দেবে..."

এবং অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 4:

"... তারা মনে করে প্রতিটি চিৎকার তাদের বিরুদ্ধে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 19-20:

"...তারা মৃত্যুর ভয়ে বজ্রপাতের বিরুদ্ধে তাদের কানে আঙুল দিয়েছিল... বজ্রপাত তাদের দৃষ্টি প্রায় কেড়ে নেয়।"

এই ধরনের লোকেরা অন্যদেরকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা একনিষ্ঠ মুসলিম তবুও মহান আল্লাহ তাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 19:

"... কিন্তু আল্লাহ কাফেরদের বেষ্টন করে রেখেছেন।"

তাদের মন্দ উদ্দেশ্যের ফলস্বরূপ, তাদের ভাল কাজগুলি এই পৃথিবীতেই নষ্ট হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করবেন যে তারা উভয় জগতে অপমানিত হবেন। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 23:

"এবং তারা যা করেছে, আমরা তার নিকটবর্তী হব এবং তাদেরকে ধূলিকণার মতো করে দেব।"

যেহেতু তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলামের আলো তাদের দেখানো হলে তারা এর সহজ দিকগুলো পূরণ করে। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম গ্রহণের অনিবার্য পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখনই তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 20:

"... যখনই এটি তাদের জন্য [পথ] আলোকিত করে, তারা সেখানে চলে; কিন্তু যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে, তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে..."

এটি সেই মুসলিমের মতো যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মোকাবেলা করে কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা রাগান্বিত ও অবাধ্য হয়, যেন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করা উচিত। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে বা না করুক না কেন, তারা এই পৃথিবীতে পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে, কারণ এটাই এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

একজন ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পরীক্ষা করা হয় যে তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে। এবং একজন ব্যক্তি ধৈর্য ধরে থাকে কিনা তা দেখার জন্য অসুবিধার সময় পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে একজনের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকা অন্তর্ভুক্ত। যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে তাদের মুখোমুখি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সফল হবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিশ্বাসের দৃঢ়তা অবলম্বন করে এই সত্যকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলিমকে সহজ ও অসুবিধা উভয় সময়েই অটল থাকতে সাহায্য করবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শেখা ও আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চিততা অর্জিত হয়, যাতে উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার পরিণতি বুঝতে পারে। স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধার সময় এবং তা করতে ব্যর্থ হওয়ার পরিণতি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 19:

"অথবা [এটি] আকাশ থেকে ঝড়ের মতো যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ। মৃত্যুর ভয়ে তারা বজ্রপাতের বিরুদ্ধে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। কিন্তু আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছেন।"

একজন মুসলমান পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে এই আয়াতে উল্লিখিত মনোভাবকে অনুকরণ করতে পারে, যেন তারা শুনতে, বুঝতে এবং অস্বীকার করে তাদের কানে আঙ্গুল আটকে রেখেছে। নির্দেশনার এই দুটি উত্সের উপর কাজ করুন। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে অজ্ঞতার ধারণাটি পরমানন্দ, মহান আল্লাহর দরবারে কখনই টিকবে না। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব জাগতিক পরিস্থিতিতেও ধরে রাখে না, কারণ যে ব্যক্তি একটি দায়িত্ব নিয়েছেন, যেমন লাইসেন্সপ্রাপ্ত চালক হওয়ার, তিনি এটির সাথে সংযুক্ত নিয়মগুলি শিখতে এবং কাজ করতে বাধ্য, যেমন গতির সীমাকে

সম্মান করা। . একইভাবে, যে ইসলাম কবুল করেছে, সে তার সাথে থাকা দায়িত্বগুলো গ্রহণ করেছে, যেমন হেদায়েতের দুটি উৎসের ওপর শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করার দায়িত্ব। তাই ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে জাহেলিয়াত দাবি করা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। উপরন্তু, অজ্ঞান সুখী মনোভাব তাদের ইহকাল বা পরকালে তাদের কর্মের পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধা দেবে না। এই আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এটি একটি অনিবার্য এবং অনিবার্য বাস্তবতা প্রতিটি একক ব্যক্তি সম্মুখীন হবে. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 19:

"... *কিন্তু আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছেন।*"

উপরন্তু, অজ্ঞতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ যে অজ্ঞ তার আনুগত্য করার জ্ঞানের অভাব রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অতএব, ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতাই দুনিয়াতে দুঃখজনক জীবন এবং পরকালের কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 20:

“বাজ প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। যখনই এটি তাদের জন্য [পথ] আলোকিত করে, তখনই তারা সেখানে চলে। কিন্তু যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

যদিও এই ধরনের ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে মুনাফিক আচরণ করে এবং শুধুমাত্র পার্থিব লাভের জন্য এবং শুধুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর আনুগত্য করে, তবুও মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের পথ সংশোধনের সুযোগ দেন। . তিনি তাদের অনুষদগুলিকে অক্ষত থাকার অনুমতি দেন যাতে তারা সঠিক দিকনির্দেশনাকে চিনতে এবং গ্রহণ করতে পারে, কারণ তারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বাসের আলোকে গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তির বিপরীতে, যিনি বিশ্বাসের আলোকে অস্বীকার করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাদের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলি সিল করা হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 17-18:

“তাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালালো, কিন্তু যখন তা তার চারপাশে আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিলেন [যাতে] তারা দেখতে পেল না। বধির, বোবা ও অন্ধ - সুতরাং তারা [সঠিক পথে] ফিরে আসবে না।"

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগগুলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগে গ্রহণ করতে হবে। তারা যে খারাপ কাজই করুক না কেন, মহান আল্লাহর রহমত থেকে তাদের কখনোই আশা হারাতে হবে না। যদি তারা স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তবে ক্ষমা ও করুণার দরজা প্রশস্ত। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে পাপের জন্য অনুশোচনা করা, তাদের কাছে ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, এবং এতে কোনও অধিকার আদায় করা জড়িত। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেমন একজন ব্যক্তির অবিরাম অবাধ্যতার কারণে তার ইন্দ্রিয় ও ক্ষমতা কেড়ে নিতে সক্ষম যাতে তারা এই পৃথিবীতে অন্ধভাবে বিচরণ করতে থাকে, তিনি পাপীকে ক্ষমা করতে এবং পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 20:

"বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়...আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 21-22

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।

[যিনি] তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা [বিস্তৃত] এবং আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের জন্য রিযিকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জানলেও আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।"

লক্ষণীয় প্রথম জিনিসটি হল যে ইসলাম, অন্যান্য অনেক ধর্মের মত নয়, সমস্ত মানুষের জন্য একটি ধর্ম, তাদের লিঙ্গ, জাতি বা অন্য কোন পার্থিব বাধা নির্বিশেষে যা মানুষকে একে অপরের থেকে পৃথক করে। যে জিনিসটি একজনকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা এই আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে: মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং ঐতিহ্যের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 21:

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন..."

এবং অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

“হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

যেহেতু সকলের স্রষ্টা এক, এর অর্থ হল সকলেই তাঁর দৃষ্টিতে সমান এবং কেউ তাকে কতটা আন্তরিকভাবে মেনে চলে তা ছাড়া অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

সব কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহর ইবাদত শুধুমাত্র কিছু দৈনিক, মাসিক এবং বার্ষিক আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য জড়িত এবং কীভাবে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যা অভ্যন্তরীণ, যেমন একজনের স্বাস্থ্য, এবং সেই সমস্ত আশীর্বাদ যা বাহ্যিক, যেমন একজনের সম্পদ এবং সময়। শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি হল এই দুটি জিনিসকে আলাদা করা যাতে একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে উপাসনা করে বিশ্বাস করার জন্য বোকা বানানো হয়, শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিদিনের জীবনে কী করেন তা নিয়ে পরোয়া করেন না। কার্যকলাপ বা কিভাবে তারা মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার.

সত্য যে, মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং ক্রমাগত অগণিত নিয়ামত দিয়ে থাকেন, তা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য যথেষ্ট। একজন ব্যক্তির কখনই অন্য ব্যক্তির দাস হওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি তাদের মতোই সৃষ্টি। এটি ঘটতে পারে যখন একজন মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অন্য ব্যক্তির আনুগত্য করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো মানুষের পার্থিব আবিষ্কারের দাস হওয়া উচিত নয়। এটা ঘটতে পারে যখন কেউ এই বিষয়গুলো অনুসরণ করাকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। যেহেতু সমস্ত মানুষ সমান, একজনকে কেবল তাদের স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য করা উচিত: মহান আল্লাহ। যে একাধিক প্রভু গ্রহণ করে সে একটি চাপযুক্ত এবং কঠিন জীবনযাপন করবে, ঠিক সেই কর্মচারীর মতো যে একাধিক সুপারভাইজারকে উত্তর দেয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, সে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সহজ-সরল জীবন লাভ করবে, যেমন মহান আল্লাহ এমন কিছু দাবি করেন না যা একজন ব্যক্তি সহ্য করতে পারে না এবং তিনি যা আদেশ করেন তা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো উপকারে আসে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এবং অধ্যায় 39 আয যুমার, 29 নং আয়াত:

" আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করেছেন: একজন ব্যক্তি [অর্থাৎ, ক্রীতদাস] ঝগড়াকারী অংশীদারদের মালিকানাধীন এবং অন্যটি একচেটিয়াভাবে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন - তারা কি তুলনাতে সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

যখন কেউ কেবলমাত্র মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর আনুগত্য করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। , তারা ধার্মিকতার পথ অবলম্বন করবে যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 21:

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।"

এবং গ অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল আয়াতগুলিতে অতীতের লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একজনকে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পর্যবেক্ষণ করতে উত্সাহিত করা হয়, তারা যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিল, অর্থ, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করবে কি না, এবং তাদের পছন্দের পরিণতিগুলি। একমাত্র এইটুকুই বোঝার জন্য যথেষ্ট যে উভয় জগতের কল্যাণ, শান্তি ও সফলতা নিহিত রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের মধ্যে যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 21:

" হে মানুষ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।"

মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার আদেশের সাথে অতীতের লোকদের উল্লেখ করা, মানুষকে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন না করার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি ঘটতে পারে যখন কেউ তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষের

ধার্মিকতার উপর নির্ভর করে আশা করে যে তারা বিচারের দিনে তাদের একই রকম করবে। সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ এই ভ্রান্ত ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তাই তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারাও তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষদের মতো ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে , একজন মুসলিম ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা হালাল হওয়ার ভয়ে তা তাদেরকে হারাম কিছুতে নিয়ে যেতে পারে। এই হাদিসটি মূর্খতার মনোভাব দূর করার জন্য যথেষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু হালাল আছে, ততক্ষণ তা করা উচিত এবং করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র একজনকে একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার মানে এই নয় যে তাদের এটি করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে অতিরিক্ত খাওয়াকে পাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, তবুও একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অতিরিক্ত খাওয়াবেন না কারণ এটি অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। মানুষের অধিকাংশ পাপ হালাল কাজ থেকে শুরু হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গীবত করা এবং অন্যদের অপবাদ দেওয়া প্রায়শই অসার বক্তৃতা থেকে পরিণত হয়, যা ইসলামে বৈধ। কিছু লোকের সাথে বন্ধুত্ব করলে লোকেরা প্রায়শই অপরাধের জীবনে পড়ে। এই ধরনের লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব করা কোন পাপ নয়, তবুও এটি অনেকের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নিয়ামত নষ্ট করা সহজ, যেমন তাদের সম্পদ, যখন তারা তাদের হালাল অথচ অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ব্যবহার করে। কিভাবে একটি হালাল জিনিস হারাম জিনিস হতে পারে তার উদাহরণ কার্যত অন্তহীন. অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই

তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করার মাধ্যমে এই ফাঁদ থেকে বিরত থাকতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা বৈধ জিনিসগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া কমিয়ে দেবে যা তাদের সম্ভাব্য বেআইনি জিনিসগুলিতে নিয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 22:

" *যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা [বিস্তৃত] এবং আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তার দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে...*"

যখন কেউ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র যা সৃষ্টিকে সুস্বাদু জল এবং ক্রমবর্ধমান ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় জল , মহাসাগরের নিখুঁত ঘনত্ব নিশ্চিত করে। এবং সমুদ্র, যাতে জাহাজগুলি তাদের উপরে যাত্রা করতে পারে যখন সমুদ্রের জীবন তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে, পৃথিবীর নিখুঁত কাঠামো, যেখানে দুর্বল থাকা অবস্থায় এর উপরে ভবন তৈরি করা যেতে পারে। ফসল এবং গাছপালা এর মধ্যে থেকে ফেটে যেতে পারে, এবং আরও অনেক সিস্টেম, তারা বুঝতে পারবে যে এই সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি এলোমেলোভাবে ঘটতে পারে না। বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ প্রত্যেকেই ভিন্ন কিছু কামনা করবে, যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এই সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

যখন কেউ আন্তরিকভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাগুলিকে খোলা মনে চিন্তা করে, তখন তাদের কাছে মহান আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এটি 22 আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 22:

"... *সুতরাং তোমরা জানলেও আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।"*

কিন্তু এই সত্য স্বীকার করা অনেক লোকের জীবনধারাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, তারা মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার করে, হয় প্রত্যক্ষভাবে মিথ্যা দেবতাদের পূজা করে বা পরোক্ষভাবে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পালন করে। বা অন্যদের ইচ্ছা, যেমন সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। কিন্তু এটি তাদের উভয় জগতেই দুঃখ, চাপ এবং উদ্বেগের পথে নিয়ে যায়, কারণ তাদের আচরণের মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে তা তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে, যেমন তাদের পরিবার, সম্পদ, পেশা এবং ব্যবসা। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মুসলমানদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরীক করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যা মেনে চলা এবং অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 23-24

وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٣

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤

“আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে.

কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সন্দেহের মূল হল অজ্ঞতা। যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখতে ও আমল করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং হুমকির বিষয়ে সন্দেহের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ , কেউ তাঁর প্রতিশ্রুতি অর্জনের চেষ্টা করবে না বা তাঁর হুমকিগুলি এড়াতে পারবে না, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে। সঠিকভাবে নির্দেশিত ব্যক্তিরা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে সন্দেহ এড়িয়ে চলে। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 2-5:

"এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা নিশ্চিত। তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [সঠিক] পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী এবং যারা কেবল তাদের বিশ্বাসের উপর অনড় তাদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তীরা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের আচরণ ও কর্মের উন্নতি করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করে। অথচ, একগুঁয়ে মুসলমান ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করে। যেহেতু তারা ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করা এড়িয়ে চলে, তাই সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের আচরণ ও কর্মের উন্নতি ঘটাবে না এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের ধৈর্য ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে, এমনকি তারা তাদের

বিশ্বাসকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও। একজনকে অবশ্যই একগুঁয়েমি পরিহার করতে হবে, যার মূলে রয়েছে অন্ধ অনুকরণ, এবং এর পরিবর্তে ইসলামি জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে বিশ্বাসের নিশ্চিততা গ্রহণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে এবং তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করতে পারে এমন সন্দেহ থেকে দূরে থাকবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

" *এবং আপনি যদি আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর] যা [কুরআন] নাযিল করেছি সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন...*"

এর পরের বিষয় হল, একজন ব্যক্তি যে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে তা হল মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া। যদি এর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে অনুযায়ী ডাকতেন। এমনকি নবুওয়াত নিজেই মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে নিহিত। এ কারণেই নবুওয়াতের মর্যাদা এত উঁচু ও সুউচ্চ। তাই একজনকে অবশ্যই পার্থিব পদমর্যাদা এড়িয়ে চলতে হবে, যা প্রকৃতিগতভাবে চঞ্চল এবং উভয় জগতেই মানসিক চাপ ও ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও মারাত্মক যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভেড়ার পালের উপর। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, সে মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতে কঠিন জীবনযাপন করবে, যদিও তাদের পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

বরং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ কার্যত আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মহান আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে, একজনকে বান্দা হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং লোকেদের দাস হওয়া থেকে রক্ষা করে, একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু অমুসলিম আরবরা আরবি ভাষার কর্তা ছিল, তাই মহান আল্লাহ তাদের জন্য এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন যাতে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের অনুরূপ একটি অধ্যায় তৈরি করা যায় যে এটি ঐশ্বরিক নয়। . অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 23-24:

"আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু আপনি যদি না করেন - এবং আপনি কখনই পারবেন না ... "

এই চ্যালেঞ্জটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের ছন্দময় শৈলীর সাথে মেলে এমন আয়াত তৈরি করা নয় বরং একটি আয়াত এবং একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে মেলে, যেমন এর সমস্ত জুড়ে থাকা প্রকৃতি, প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। প্রতিটি স্থান এবং সময়, অজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা বোঝার এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতা, ব্যবহারিক পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা যা সহজেই একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে উপস্থাপিত ধারণা যা দরকারী শোনাচ্ছে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এতে সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে।

এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 23-24:

"আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

মহান আল্লাহ বিশেষভাবে মক্কার অমুসলিমদের এবং কিতাবধারীদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন, কারণ তারা পবিত্র কুরআনের উৎপত্তি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাকে মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল এবং তারা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের সাথে মিল রাখতে না পারায় এর স্বর্গীয় উত্সকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল এবং যেহেতু তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছিল, তারা জানত যে তিনি একজন মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মদিনার কিতাবের লোকেরা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ তাদের ঐশী কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

একমাত্র জিনিস যা উভয় দলকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিল তা হ'ল পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের ভালবাসা যা তারা তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা অনুসরণ করে অর্জন করেছিল, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হল তাদের আচরণ করতে হবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 24:

"... *অতঃপর সেই আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আগুন কাফেরদের বাসস্থান কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"*আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।*"

যেমন একটি জিনিস যা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে ব্যর্থতার তকমা লাগানো হয় এবং বাতিল করা হয়, তেমনি মানুষ নামের উদ্ভাবনটিও বাতিল হয়ে যাবে যদি তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 - আল বাকারাহ, আয়াত 25

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا
وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥

"আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান [জান্নাতে] যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে সেখান থেকে ফল-ফসলের রিযিক দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, এটা তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল। এবং এটি তাদের উপমা দেওয়া হয়. এবং সেখানে তাদের পবিত্র জীবনসঙ্গী থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতগুলির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে যা অহংকারী এবং অবাধ্যদের শাস্তির হুমকি দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 23-24:

"আর আমরা আমাদের বান্দার উপর যা [কুরআন] নাযিল করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

মুসলমানদের জন্য শাস্তির ভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যা একজনকে পাপ এড়াতে সাহায্য করে এবং ঐশ্বরিক রহমতের আশা, যা একজনকে সৎকর্ম সম্পাদনের দিকে উৎসাহিত করে। উভয় দিকে খুব চরম হওয়া বিপথগামী হতে পারে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ভয় পায়, যা এই দিনে এবং যুগে খুবই বিরল, সে মহান আল্লাহর রহমতে হাল ছেড়ে দিতে পারে। যে ব্যক্তি ভারসাম্যহীনভাবে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে, সে ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা অবলম্বন করবে। এটি তার অবাধ্যতার সাথে জড়িত থাকা এবং বিশ্বাস করে যে একজনকে ক্ষমা করা হবে। জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে, ইসলামে ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার কোন মূল্য নেই। একজনকে অবশ্যই উভয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে যাতে তারা সরল সঠিকভাবে পরিচালিত পথে থাকে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 25:

"আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে..."

লক্ষণীয় পরের বিষয় হল যে সুসংবাদ শুধুমাত্র তাদের জন্যই উপযোগী যারা এগুলোর উপর কাজ করে, ঠিক যেমন সতর্কবার্তা শুধুমাত্র তাদের জন্য উপযোগী যারা এগুলোর উপর কাজ করে, যেমন রাস্তার বিপদ সংকেত। এই সুসংবাদগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রধান আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করা যা বাস্তবে প্রমাণিত, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত।

এই আয়াতটি, অগণিত অন্যদের মতো, এটা স্পষ্ট করে যে অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস একজনকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না এটি শারীরিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সমর্থিত হয়, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের আকারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বিশ্বাসকে কর্ম থেকে আলাদা করা শয়তানের অন্যতম বড় কৌশল। তিনি মুসলমানদের বোঝান যে ইসলামে বিশ্বাস করাই উভয় জগতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মুসলমানদের মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম বড় কারণ, যদিও তারা সত্যে বিশ্বাস করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 25:

“আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান [জান্নাতে] যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে সেখান থেকে ফল-ফসলের রিযিক দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, এটা তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল। এবং এটি তাদের প্রতিরূপ দেওয়া হয়..."

আগে তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় যে ফল খেয়েছিল তা উল্লেখ করা যেতে পারে। জান্নাতের ফলগুলো দুনিয়ার ফলের মতো দেখতে হলেও তাদের ভালো স্বাদ হবে অনেক বেশি। এর আগেও জান্নাতে একই ফল প্রদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জিনিসগুলি বারবার করা হলে বিরক্ত হওয়া বা বিরক্ত হওয়া মানুষের প্রকৃতির অংশ। কিন্তু জান্নাতে এটা ঘটবে না। স্বর্গের মধ্যে বারবার অভিজ্ঞতা সবসময়

উপভোগের একটি নতুন এবং ভিন্ন ছায়া থাকবে যা চিরকাল ঘটতে থাকবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 25:

"...এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

এই বাস্তবতা অনুধাবন করা উচিত একজন মুসলিমকে জান্নাতের লক্ষ্যে উৎসাহিত করা। মূল আয়াতের শুরুতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

জান্নাতের প্রকৃত উপলব্ধি মানুষের বোধগম্যতার বাইরে হলেও, মহান আল্লাহ জান্নাতের কিছু জিনিস যেমন ফল-মূলের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মানুষ সীমিত পরিসরে বুঝতে পারে, যাতে তারা জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে পারে। অনেক মুসলমানের পক্ষে এমন কিছুর জন্য চেষ্টা করা কঠিন হবে যা তারা একেবারেই বুঝতে পারে না। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে যা সকল মানুষ সহজেই অনুধাবন করতে পারে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্বিশেষে, যেমন তাদের সামাজিক শ্রেণী। এটি পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞানগুলির মধ্যে একটি কারণ এটি সর্বদা সর্বজনীন শ্রোতার স্তর এবং উপলব্ধি অনুসারে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে।

পরিশেষে, পরকাল যে চিরন্তন, তা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এবং অস্থায়ী ভোগের জন্য একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনন্তকাল ত্যাগ করা উচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। পরিবর্তে, তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে তারা যে মুহূর্তটি এই দুনিয়ায় এবং অনন্ত আখেরাতে কাটাবে সেই মুহুর্তে মনের প্রশান্তি লাভ করবে, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 25:

"...এবং সেখানে তাদের পবিত্র জীবনসঙ্গী থাকবে..."

মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের পরিশুদ্ধ জীবনসঙ্গী দান করবেন যাতে তারা তাদের সাথে আরাম ও শান্তি পায়। যে ব্যক্তি এই বিশেষ আশীর্বাদ কামনা করে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত এই পৃথিবীতে এমন একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা যিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবেন। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাকওয়ার খাতিরে কাউকে বিয়ে করার জন্য সতর্ক করেছিলেন, অর্থাৎ তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, এবং শুধুমাত্র এবং প্রাথমিকভাবে

পার্থিব কারণে নয়। সম্পদ, বংশ বা সৌন্দর্য, অন্যথায় তারা ক্ষতি ছাড়া কিছুই পাবে না। সহীহ বুখারীর ৫০৯০ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সহজ করে বললে, দুনিয়াতে একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী পরকালে পরিশুদ্ধ জীবনসঙ্গী পেতে উৎসাহিত করবে।

উপরন্তু, একজন শুদ্ধ পত্নী কেবল তাকেই দেওয়া হবে যে শুদ্ধ হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজনকে অবশ্যই তাদের চরিত্রের সমস্ত দিক শুদ্ধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য শুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা কামনা বা আশা না করে। তাদের কথাবার্তা শুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা ভালো কথা বলে বা চুপ থাকে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে তাদের কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এবং তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করে তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করবে সে একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় পাবে। এটি উভয় জগতে নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং 26 অধ্যায় আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারাহ, আয়াত 26-27

۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا
مَثَلًا يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

“ নিশ্চয়ই, আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ছোট উদাহরণ পেশ করতে ভীরু নন। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে এটা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তারা বলে, এর দ্বারা উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ কি চেয়েছিলেন? সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া।

যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”

মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি মহান রহমত যে তিনি মানবজাতিকে তাদের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা এবং উপলব্ধি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া তাঁর অসীম মর্যাদার নীচে দেখেন না। একজনকে তাদের সৃষ্ট স্তর অনুসারে এই ঐশ্বরিক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের শেখানো শিষ্টাচার ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী, ভালো ও উপকারী বিষয়ের সাথে যুক্ত কোনো কিছু করতে কখনোই লজ্জাবোধ করা উচিত নয়, যেমন জ্ঞান অন্বেষণ করা বা অন্যদের ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করা। লজ্জাকে কখনোই দুর্বলতা বলে ভুল করা উচিত নয়। লজ্জাশীলতা একজনকে যা সঠিক তা করতে বাধা দেয় না যখন দুর্বলতা করে।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের একটি মহৎ গুণ হল যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষা দেন যা বোঝার জন্য সহজ এবং বাস্তবিকভাবে সকল মানুষের জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তাদের উপলব্ধি বা জ্ঞানের স্তর নির্বিশেষে। . এই শিক্ষাগুলি নিরবধি কারণ এগুলি যে কোনও সময়ে এবং সমস্ত লোকের দ্বারা, সময়ের শেষ অবধি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিক উত্স নির্দেশ করে এমন একটি অলৌকিক ঘটনা। এই অলৌকিক ঘটনাটি বিশ্বাসীরা বোঝেন, যারা পবিত্র কুরআনের কাছে মুক্ত মন নিয়ে, এর উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তারা জানে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 26:

" নিশ্চয়ই, আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ছোট উদাহরণ পেশ করতে ভীরু নন। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে এটা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য..."

কিন্তু যারা উচ্চতর কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করতে পারে না এবং এমন আচরণবিধি মেনে জীবনযাপন করতে পারে না যা মানবতার জন্য উপযোগী, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, তারা পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক ঘটনাটি বুঝতে পারবে না এবং বরং প্রশ্ন করবে কিভাবে মহান আল্লাহ, কিভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রভু? বিশ্ব, যেমন একটি মশা হিসাবে যেমন ছোট এবং তুচ্ছ জিনিস সম্পর্কে কথা বলতে পারে. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 26:

"... *কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তারা বলে, "উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন?"...*

তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর কাছে একটি মশার আকারের সমান, তাই তিনি যদি আকারে বড় কিছু, যেমন সূর্য, বা মশার মতো ছোট কিছু নিয়ে আলোচনা করেন তাতে কোন পার্থক্য নেই।

পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক ঘটনাটি বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যারা তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই চায় না তারা এটি থেকে দূরে সরে যায়। যেহেতু তারা পবিত্র কুরআনের সত্য এবং এর সরল অথচ গভীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া বেছে নেয়, মহান আল্লাহ তাদের বিমুখ হতে দেন এবং উভয় জগতে অন্ধভাবে বিচরণ করতে দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 26:

“...সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া।"

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 115:

"যদি কেউ রসূলের বিরোধিতা করে, তার কাছে হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, আমরা তাকে তার মনোনীত পথে ছেড়ে দেব- আমরা তাকে জাহান্নামে পুড়িয়ে দেব, যা একটি মন্দ স্থান।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 26:

“...সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া।"

কিন্তু এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক ঘটনাটি বোঝে এবং উন্মুক্ত মন নিয়ে এর সাথে যোগাযোগ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে এটির শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তারা এর শিক্ষাগুলি বোঝার এবং তার উপর আমল করার জন্য পরিচালিত হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক ঘটনাটি বোঝার জন্য একজনকে দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করে যাতে তারা এর অলৌকিক প্রকৃতির প্রশংসা করতে পারে। অজ্ঞতা একজনকে পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিকতা বুঝতে বাধা দেবে এবং তাই তাকে এটি শেখা এবং তার উপর কাজ করা থেকে বিরত রাখবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 26-27:

“...সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া। যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে চুক্তিবদ্ধ করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

যখন কেউ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ও শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে। একজন ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাকে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করা, এমন একটি জিনিস যা মহান আল্লাহ তায়ালা সংযুক্ত হতে আদেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা ছিল এই পৃথিবীতে পাঠানোর আগে সমগ্র মানবজাতির কাছ থেকে নেওয়া অঙ্গীকার, কারণ এটি মহান আল্লাহকে নিজের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 172:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটা] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"

যে ব্যক্তি মুক্ত মনে পবিত্র কুরআনের কাছে যায়, সুস্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করতে এবং এর শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়, তবে এই চুক্তিটি, যা মানুষের আত্মার গভীরে গেঁথে আছে, পুনরাবির্ভূত হবে যাতে তারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক মুসলমান মহান আল্লাহর সাথে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার এই অঙ্গীকারটি পুনরুদ্ধার করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যখন তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হলে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 26-27:

“...সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া। যারা আল্লাহর সাথে চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে..."

যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন এটি কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্মচারী, নিয়োগকর্তা, প্রতিবেশী প্রভৃতি বন্ধনের অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। এটি আল্লাহর ভয়। উন্নত, এবং তাঁর কাছ থেকে নেওয়া অঙ্গীকার বজায় রাখা যা মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখে। অপরাধ দমনেই সরকার এতদূর যেতে পারে। সমাজে তখনই ন্যায়বিচার ও শান্তি বিরাজ করতে পারে যখন মহান আল্লাহর ভয় থাকে। এটি নিশ্চিত করে যে একজন অন্যের প্রতি অন্যায় না করে এবং পরিবর্তে তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করে। এই বাস্তবতা খুব স্পষ্ট হয় যখন কেউ এমন সমাজকে লক্ষ্য করে যারা ঈমান ত্যাগ করেছিল এবং ইতিহাসে যারা ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছিল এবং মহান আল্লাহর ভয়ের অধিকারী ছিল। যখন মানুষ, পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে বন্ধন সঠিকভাবে বজায় রাখা হয় না তখন এটি আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্তরের মতো মানবিক মিথস্ক্রিয়ার প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে। এর পরিণতি বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির বিস্তার। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 26-27:

"...সে এর মাধ্যমে অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং অনেককে পথ দেখায়। আর তিনি বিভ্রান্ত করেন না অবাধ্যদের ছাড়া। যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে চুক্তিবদ্ধ করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হবে, তারা মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেবে এবং সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেবে। এই ফলাফল মহান আল্লাহকে প্রভাবিত করে না। এটি শুধুমাত্র অপরাধীদের উপর প্রতিফলিত হয় কারণ

এটি তাদের উভয় জগতের সমস্যা, চাপ, অসুবিধা এবং ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 27:

"... তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।"

এবং অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 41:

"মানুষের হাত যা উপার্জন করেছে তার [কারণে] স্থল ও সমুদ্র জুড়ে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে যাতে তিনি [অর্থাৎ, আল্লাহ] তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা [পরিণাম] আস্বাদন করতে দেন যাতে তারা ফিরে আসে। ন্যায়পরায়ণতা]।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 28-29

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করবে যখন তোমরা ছিলে প্রাণহীন এবং তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।

তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বর্গের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞাত।"

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, এই আনুগত্যের কারণেই মহান আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 28:

"আপনি কিভাবে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করতে পারেন যখন আপনি প্রাণহীন ছিলেন এবং তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন..."

এবং অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, 56 নং আয়াত:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

উপরন্তু, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মক্কার অমুসলিম এবং মদিনার কিতাবের লোকেরা, প্রথম দুটি দল যাকে পবিত্র কুরআন দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল, তারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা তার সাথে জিনিসগুলিকে যুক্ত করেছে এবং তার সাথে অংশীদার বলেছে, যেমন মূর্তি বা পণ্ডিতদেরকে বিশ্বাসের নিয়ম-কানুন নির্দেশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, এই আয়াতে তাদের অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত বিশ্বাস শুধুমাত্র আন্তরিকভাবে নির্দেশিত হওয়ার দুটি উত্স: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং অনুসরণ করার মধ্যে নিহিত। এর থেকে কোনো বিচ্যুতি বিভ্রান্তি এমনকি অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ইসলামের মূলে নেই এমন যে কোনো বিষয় মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে / অতএব, একজনকে অবশ্যই অন্য কাজগুলি এড়িয়ে চলতে হবে যেগুলি নির্দেশনার দুটি উত্সের মধ্যে নিহিত নয়, যদিও সেগুলি ভাল কাজই হয় এবং পরিবর্তে তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টাকে শেখার এবং পরিচালনার দুটি উত্সের উপর মনোনিবেশ করা উচিত, কারণ মনের শান্তি এবং সাফল্য কেবল এতেই নিহিত। . অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 132:

"আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 28:

"... আপনি প্রাণহীন ছিলেন এবং তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন..."

যেহেতু পৃথিবীতে একজনের সময়কাল খুবই সীমিত এবং অজানা, তাই এই পৃথিবীতে মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার জন্য তাদের দেওয়া প্রতিটি সুযোগ এবং আশীর্বাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে, যা পাওয়া যায় সবচেয়ে বড় পার্থিব আশীর্বাদ, এবং শান্তি। মনের এবং পরকালে সাফল্য। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর

প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু কেউ যদি তাদের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করে এবং তার পরিবর্তে এই পৃথিবীতে তাদের স্বল্প অবস্থানে তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে পছন্দ করে, তবে তারা উভয় জগতেই সংকীর্ণ ও দুঃখের জীবন যাপন করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একটি ক্ষণস্থায়ী উপভোগের এক মুহূর্তের জন্য অনন্তকালের আনন্দকে উৎসর্গ করবেন না, যা উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যায়। একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বিলম্ব করা উচিত নয়, এই বিশ্বাস

করে যে তারা বৃদ্ধ বয়সে তা করবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলোর একটি। তিনি মুসলমানদের বোঝানোর চেষ্টা করেন না যে পরকালের অস্তিত্ব নেই, কারণ এটি নিরর্থক প্রচেষ্টা। পরিবর্তে, তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বিলম্ব করতে উত্সাহিত করেন এবং তাদের বোঝান যে পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানসিক শান্তি। যে তার উপদেশের জন্য পড়ে সে উভয় জগতেই হেরে যায়, কারণ মহান আল্লাহকে উপেক্ষা করে, উভয় জগতেই কেবল দুঃখ ও চাপের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি কেউ সমগ্র বিশ্বকে একত্র করতে সক্ষম হয়। প্রধান আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ, মহান, একাই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য দান করবেন। কিন্তু যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয়, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে যা কিছু পাবে তা উভয় জগতেই তাদের মানসিক চাপ ও দুঃখের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।

উপরন্তু, একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তারা বয়স্ক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ অনেক সুস্থ যুবক সব সময় মারা যায়। এমনকি যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তবে তাদের দীর্ঘজীবনের আশা করার মনোভাব কেবল তাদের আল্লাহকে উপেক্ষা করার তাদের স্বাভাবিক অভ্যাস চালিয়ে যেতে অনুরোধ করবে, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের কাছে অপ্রস্তুত হয়।

যিনি মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ধূলিকণা ও হাড়ে পরিণত হলে তাদের ফিরিয়ে আনা সহজ করবেন, কারণ শূন্য থেকে কিছু তৈরি করা অংশ থেকে কিছু তৈরি করার চেয়ে কঠিন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 28:

"...তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন..."

এবং অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 51:

"...এবং তারা বলবে, "কে আমাদের পুনরুদ্ধার করবে?" বল, "যিনি তোমাকে প্রথম বার জন্ম দিয়েছেন।"...

28 শ্লোক দ্বারা নির্দেশিত, জীবন এবং পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়টি একজনের তাদের কবরে অবস্থানকে বোঝায়, যা কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে প্রত্যেকে অনুভব করবে। একজনের অন্ধকার কবরকে আলোকিত করতে এবং এর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য যে আলো প্রয়োজন তা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। একজন মুসলমান যেমন তাদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ঘরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তেমনি তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে আলোকিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে এবং এর বিপদ এই পৃথিবীতে যা মোকাবেলা করতে পারে তার চেয়েও বড়। যদি কেউ এই পৃথিবীতে এই আলো পাওয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, তবে তারা তাদের কবরের ভয়াবহতা এবং অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পুনরুত্থানের পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে।

কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পছন্দ করুক বা না করুক, বিচার দিবসে সকলকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছে কি না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 28:

"...তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

তাদের পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচার তাদের কিভাবে মারা গেছে তা বোঝার জন্য এই আয়াতের ক্রমটি অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের উপর মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা জড়িত। অতঃপর তাদেরকে উত্তম অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে তারা খারাপ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এই আয়াতের ক্রম অনুসারে তারা কীভাবে মারা যাবে তা নির্ধারণ করা যায়। অর্থ, একজনের জীবন কীভাবে মরবে তা নির্ধারণ করবে। যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, তবে তারা ভাল অবস্থায় মারা যাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, তবে তারা মারা যাবে এবং খারাপ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, আয়াত 28 ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য শুরু, মধ্য এবং চূড়ান্ত পরিণতি বেছে নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই তাদের তাঁকে ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করা উচিত নয়। যখন একজন ব্যক্তির সমগ্র অস্তিত্বের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তখন তাঁর অবাধ্য হওয়ার কোন মানে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, আয়াত 29 দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের জীবনে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাকে চিনতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই বাস্তবতা বোঝা অসুবিধার সময়ে একজনকে বাকি রোগীদের সাহায্য করবে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথার মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 28-29:

"...তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে। তিনিই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন..."

পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে থাকা আশীর্বাদগুলি মানবজাতির জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাতে তারা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে, এগুলিকে ব্যবহার করে এই পৃথিবীতে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে, সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর কাছে খুশি হওয়ার উপায়ে। সকল নেয়ামতের স্রষ্টা। যে এইভাবে আচরণ করে সে এই পৃথিবীর আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এর ফলে আরও আশীর্বাদ পাওয়া যায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

উপরন্তু, আয়াত 28-29 স্পষ্ট করে যে একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আল্লাহকে মান্য করার জন্য, এবং জাগতিক আশীর্বাদ সৃষ্টি করা হয়েছিল এই মহৎ উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করার জন্য। মহান আল্লাহকে উপেক্ষা করে কেবল পার্থিব আশীর্বাদ লাভ, ভোগ এবং সঞ্চয় করার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এমন আচরণ করে এই সত্যকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। একজনের এই পৃথিবীতে থাকা একটি কাজের ভিসায় বিদেশে থাকা একজন ব্যক্তির মতোই। সেই দেশে তাদের উদ্দেশ্য হল ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্পদ অর্জন করা। বিনোদন ও আনন্দের জন্য তারা সেই বিদেশে নেই। একইভাবে, এই পৃথিবীতে একজনের উদ্দেশ্য হল ভাল কাজগুলি সংগ্রহ করা, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা 29:

"তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে আছে..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ, তিনি আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির 50,000,000 বছর আগে একজনের বৈধ বিধান বরাদ্দ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের

৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কখনোই অধৈর্য বা লোভের বশবর্তী হয়ে হারামের অনুসরণ করা উচিত নয়। কারো নিয়ত যেমন তার ঈমানের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, তেমনি হালালের অনুসরণ ও ব্যবহার করাই হলো ঈমানের বাহ্যিক ভিত্তি। যদি কেউ বেআইনি ব্যবহার করে তবে তারা এটির উপর নির্মিত প্রতিটি কাজকে ধ্বংস করে দেবে। এটি উভয় জগতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, এই আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ চান না যে মানুষ জড়জগতকে পরিত্যাগ করুক, কোন না কোনভাবে বিশ্বাস করে এটাই পরকালে মুক্তির পথ। এই ধরণের সন্ন্যাসবাদ ইসলাম শেখায় না কারণ এটি এই বিশ্বের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম জড়জগত থেকে আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতার শিক্ষা দেয় সম্পূর্ণ শারীরিক নয়। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নেয়ামতগুলো ব্যবহার করে সে এসব নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু যদি তারা তাদের নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে, তাহলে তারা তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই জড় জগতের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এবং তাই একজনের কতটা বা সামান্য পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। একজন দরিদ্র ব্যক্তি কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করেই একজন পার্থিব ব্যক্তি হতে পারে যখন একজন ধনী ব্যক্তি কেবলমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার কারণে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা 29:

“ তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজেকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সাতটি আসমান বানিয়ে দিলেন..."

পৃথিবীর আশীর্বাদ যেমন মানুষের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি আকাশমণ্ডলীও এই কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবী হল দৈহিক রিযিকের আবাস, যা মানুষকে এই পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন যখন তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। যেখানে, আসমান হল আধ্যাত্মিক বিধানের প্রধান উৎস, যা মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করার জন্য প্রয়োজন। যখন কেউ স্বর্গ ও পৃথিবী এবং এর নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুসংগত ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, দিন ও রাতের সুনির্দিষ্ট সময়, ঋতু পরিবর্তন, মেঘের গতিবিধি এবং তাদের গতিবিধি। জলচক্র এবং অন্যান্য অনেক ব্যবস্থায় জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টা ও ধারক, মহান আল্লাহকে নির্দেশ করে। এই সমস্ত ব্যবস্থাও মহান আল্লাহর একত্বের দিকে ইঙ্গিত করে, কারণ একাধিক ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা ভিন্ন জিনিস এবং ফলস্বরূপ আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই ভারসাম্যপূর্ণ বা সুসংগত হবে না। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

যখন কেউ উন্মুক্ত মন নিয়ে আসমান ও যমীন সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন তারা আল্লাহর একত্ব, সর্বোত্তম এবং বিচার দিবসের অনিবার্যতাকে স্বীকার ও গ্রহণ করবে। সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম স্পষ্টভাবে একটি উদ্দেশ্য এবং এই সত্যকে নির্দেশ করে যে সমস্ত কিছুরই একটি শেষ আছে, যেমন রাতের পরের দিন।

মহাবিশ্বের মধ্যে একমাত্র প্রধান জিনিস যা এখনও ভারসাম্যপূর্ণ হয়নি তা হল মানুষের ক্রিয়াকলাপ। সৎকর্মকারীরা এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং অন্যায়কারীরা পূর্ণ বিচারের মুখোমুখি হয় না, যদিও তারা তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহ কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। মহাবিশ্বের মধ্যে সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, এই মহাবিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস, বিচারের দিনেও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"... এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

এই বাস্তবতাকে আলোচিত মূল আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে কারণ মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টিকে বিচার দিবসের সাথে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 28-29:

"...তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজেকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সাতটি আসমান বানিয়ে দিলেন..."

২৯ নং আয়াতের চূড়ান্ত অংশ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর এবং তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন ও ফয়সালা নিযুক্ত করার পর, তারা যা করে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বেখবর। মহান আল্লাহকে কখনই একজন জাগতিক রাজার সাথে তুলনা করা উচিত নয়, যার জমিনের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকতে পারে কিন্তু যেহেতু তিনি তার জনগণের উপর অবিরাম নজর রাখতে পারেন না, তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনি বেখবর। মহান আল্লাহ মানুষ, আসমান ও জমিন অনর্থক সৃষ্টি করেননি। কে পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং কারা করেনি এবং শেষ পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের মহান ভারসাম্যহীন জিনিস, মানুষের কর্মের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিচার দিবস প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ যেহেতু সব বিষয়েই জ্ঞান রাখেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 29:

"...এবং তিনি সব কিছুর জ্ঞাত।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারাহ, আয়াত 30-34

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١

قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢

قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা সৃষ্টি করব।" তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন

একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" তিনি [আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।"

এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন - তাদের সব। অতঃপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদেরকে দেখিয়ে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও।

তারা বলল, আপনি মহিমান্বিত, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, হে আদম, তাদের নাম জানিয়ে দাও। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাদের নাম জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য [দিক] জানি? আর আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।"

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”

এই আয়াতগুলো মানবজাতির উদ্দেশ্যকে রূপরেখা দেয়, যথা, পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর দূত হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে ইসলামের আসল চেহারা বিশ্বের কাছে দেখানো হয়। এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যখন তারা সচেতনভাবে ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে একজন বাদশাহ তাদের অবাধ্য দূতের উপর সন্তুষ্ট হবেন না, মহান আল্লাহও সেই সমস্ত মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যারা তাঁর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করব।"...

পৃথিবীতে কোনো পার্থিব কর্তৃত্ব যে কখনোই স্থায়ী হয় না, তাই একজন মুসলমানকে আল্লাহর দূত হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করতে বিলম্ব করা উচিত নয়, তাদের জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তারা পৌঁছাতে পারে না।

আয়াত 30 দ্বারা নির্দেশিত, যখন কেউ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। ফলে তারা আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করবে। এটি কেবল সমাজে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করে কেবলমাত্র যখন কেউ

আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখনই তারা তা পূরণ করবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার। এতে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রসার ঘটবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা হল যেভাবে একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণতার প্রশংসা ও ঘোষণা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা সৃষ্টি করব।" তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" ..."

ফেরেশতাদের প্রতিক্রিয়া মহান আল্লাহর পরিকল্পনার সমালোচনা ছিল না, কারণ তারা এমন আচরণ করে পবিত্র। তারা কেবল মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং বোঝার অভাব স্বীকার করছিল। একজনের জ্ঞান এবং বোঝার অভাব স্বীকার করা নম্রতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজনের যতই জ্ঞান থাকুক না কেন তারা যা শিখতে পারে তার তুলনায় তা সর্বদা ছোট হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 76:

"...কিন্তু প্রত্যেক জ্ঞানের অধিকারী একজন [আরো] জ্ঞানী।"

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করাও অন্যদের শেখানোর এবং পথ দেখানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজনকে কখনই স্বীকার করতে লজ্জা করা উচিত নয় যে তাদের

জ্ঞানের অভাব রয়েছে, কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের ভুল জ্ঞান প্রদান করা পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরেশতাদের এই নম্রতা এই অধ্যায়ের পরবর্তী আয়াতে আরও তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 32:

" তারা বলল, "আপনি মহিমান্বিত, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা সৃষ্টি করব।" তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" ..."

ফেরেশতাদের প্রতিক্রিয়াও মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা এবং আনুগত্যকে তুলে ধরে। তারা সৃষ্টির মধ্যে কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা কামনা করেনি। তারা পরিবর্তে সমস্ত সৃষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে চেয়েছিল, ঠিক যেমন তারা করেছিল। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"... তারা [ফেরেশতারা] আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, বরং তারা যা আদেশ করে তাই করে।"

মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি এই ধরনের সংরক্ষিত ঈর্ষা অবলম্বন করা মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। তাদের নিজেদের বা অন্যদেরকে তাঁর অবাধ্য হতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের উচিত আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং যখনই তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পাপ করা আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা থেকে বিরত থাকবে এবং যে কোনও অধিকার আদায় করবে। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ইসলামের শেখানো আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার অনুযায়ী তাদের মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা উচিত। ঠিক যেমন ফেরেশতারা মানবজাতির সম্ভাব্য অবাধ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি পচা আপেল সর্বদা অন্যদের কলুষিত করবে, কারণ লোকেরা তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। সহীহ বুখারী, 5534 নং হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, কেউ যদি অন্যের অবাধ্যতাকে উপেক্ষা করে, এমনকি যদি তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের আচরণ দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। সহীহ বুখারী, 2686 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। শুধুমাত্র যখন কেউ ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তখনই তারা অবাধ্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

কিন্তু যদি কেউ কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে, তবে এটি আশঙ্কা করা হয় যে অন্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের বিপথগামী হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা সৃষ্টি করব।" তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" তিনি (আল্লাহ) বললেন, "নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানো না।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে কর্তৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের কাউকে প্রশ্ন করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না ভাল আচরণ দেখানো হয়। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রতিক্রিয়ায় রাগান্বিত হননি, যদিও তাঁর রাগান্বিত হওয়ার পূর্ণ

অধিকার ছিল, কারণ তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ইচ্ছা অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণরূপে অনেক মুসলিমের মনোভাবের সাথে বিরোধিতা করে যারা প্রশ্ন ছাড়াই প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজনের আধ্যাত্মিক গুরুকে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার গুরুত্বের পক্ষে। এই ভুল মনোভাব শুধুমাত্র তাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল যারা নেতৃত্ব এবং অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে। মহান আল্লাহ যদি বিশ্বজগতের প্রতিপালক হয়েও ফেরেশতাদের প্রশ্নে বিরক্ত না হন, তাহলে কোন নশ্বর ও দুর্বল প্রাণী তাদের প্রশ্ন করলে কেমন করে বিরক্ত হবে? মানবজাতির পথপ্রদর্শক, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট সাহাবীদের দ্বারা সঠিক মনোভাব বোঝা এবং তার উপর কাজ করা হয়েছিল। তারা যখনই কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করত তখন তারা একে অপরকে নিয়মিত প্রশ্ন করত, এমনকি যদি তারা নিজেদের থেকে সিনিয়র বলে বিবেচিত কাউকে প্রশ্ন করে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা সম্মান ও সদাচরণ বজায় রেখেছিল যখন তারা তা করেছিল। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল যখন উমর ইবনে খাত্তাব সহ অনেক সাহাবী ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যারা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করেছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে প্রশ্ন করায় অসন্তুষ্ট হননি, তিনি কেবল তাদের কাছে তাঁর যুক্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার পরে তারা তা গ্রহণ করেছিলেন। এটি সহীহ বুখারি, 7284 এবং 7285 নম্বরে পাওয়া হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সেইসব লোকদের এড়িয়ে চলতে হবে যারা এই ধরনের অদ্ভুত এবং অনৈসলামিক ধারণার পক্ষে কথা বলে এবং পরিবর্তে এমন মনোভাব গ্রহণ করে যাতে তারা উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যদেরকে সম্মানজনকভাবে প্রশ্ন করে। . এটি 12 অধ্যায় ইউসুফ, 7 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

" নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের মধ্যে নিদর্শনাবলী ছিল যারা জিজ্ঞাসা করে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"...তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, যখন আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" তিনি (আল্লাহ) বললেন, "নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানো না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের পক্ষে জীবনের সাথে মোকাবিলা করার সময় এবং এটি কী নিয়ে আসে তার খুব সীমিত জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা বোঝা এবং গ্রহণ করা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুসারে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস চয়ন করেন, মানুষের খুব সীমিত জ্ঞান বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল কঠিন সময়ে ধৈর্য্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা, যার মধ্যে মৌখিক বা শারীরিকভাবে অভিযোগ করা এড়িয়ে যাওয়া এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আশীর্বাদ ব্যবহার করে একজনকে দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রশান্তি ও আশীর্বাদ নিয়ে ভ্রমণ করবে। সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ক্রোধ দেখানোর পরিবর্তে, মহান আল্লাহ তাদের তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করার কারণ প্রকাশ করবেন যা তাঁর অবাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 31:

"এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন - সেগুলি সব..."

হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান দান করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি কারণ এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করার সময় এটি বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। জ্ঞান অর্জনের জন্য একজনকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে তবে তাদের চাওয়া এবং প্রশ্ন করা উচিত এমন বিষয়গুলির উপর যা তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং উপকারী। সহজ করে বললে, বিচার দিবসে যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা, একজনকে অবশ্যই এই জ্ঞানের সন্ধান করতে হবে এবং কাজ করতে হবে। কিন্তু হাশরের দিনে যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, তাহলে তাদের উচিত এই জ্ঞান অন্বেষণ করা এড়িয়ে যাওয়া, কারণ এটি তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে দরকারী জ্ঞান দান করেছেন। জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কারো মঙ্গল কামনা করেন তখন তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের পূর্বপুরুষ হযরত আদম (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরনের উপকারী জ্ঞান অন্বেষণ ও আমল করার মাধ্যমে, যাতে তারা উভয় জগতে নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে।

মহান আল্লাহ, তারপরে ফেরেশতারা পূর্বে প্রশ্ন করার পরে মানবজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 30-31:

"তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পূর্ণতা ঘোষণা করি?" তিনি [আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।" এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন- তাদের সব। অতঃপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদেরকে দেখিয়ে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও।

মানবজাতিকে জ্ঞান দান করার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অন্যান্য অনেক সৃষ্টির উপর অনুগ্রহ করেছেন, কারণ এটি তাকে চিনতে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার উত্স। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। যদিও মানুষ তাদের প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বড় বড় খারাপ কাজ করার ক্ষমতা রাখে, তবুও তারা মহান আল্লাহর দূত হিসাবে তাদের

ভূমিকা পালন করার জন্য পশুদের স্তরের উপরে উঠার ক্ষমতা রাখে। এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 31-33:

"এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন - সেগুলি সব। অতঃপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদেরকে দেখিয়ে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও। তারা বলল, আপনি মহিমান্বিত, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম, তাদের নাম জানিয়ে দাও। এবং যখন তিনি তাদের তাদের নাম জানিয়েছিলেন..."

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করেন, যা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন তার সম্মানে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম, "আদমকে সেজদা কর"...

মহান আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তখন তারা তাদের জ্ঞানের অভাব স্বীকার করে তাদের নম্রতা প্রদর্শন করেন এবং যোগ করেন যে সমস্ত জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 31-33:

"এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন - সেগুলি সব। অতঃপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদেরকে দেখিয়ে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও। তারা বলল, আপনি মহিমান্বিত, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম, তাদের নাম জানিয়ে দাও। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাদের নাম জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়গুলো জানি?..."

যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজের জ্ঞানের অভাব স্বীকার করা প্রজ্ঞার লক্ষণ এবং অহংকার মারাত্মক পাপকে প্রতিরোধ করার জন্য সকলকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার একজনকে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যখন তা অন্যের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং এতে অন্যদের অবজ্ঞা করা হয়। উভয় উপাদানই মূর্খ কারণ মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য সত্যের প্রয়োজন এবং তাই সর্বদা গ্রহণ করা উচিত এবং যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিণতি অজানা, তাই অন্যকে অবজ্ঞা করা বোকামি। যেই জ্ঞান বা মর্যাদা অর্জন করা হোক না কেন, এটি একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে, অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং একটি সফল ফলাফল অর্জনের সুযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই অহংকার অবলম্বন না করে তাদের দুর্বলতা এবং তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করতে হবে । উপরন্তু, অন্যদের বিপথগামী এড়াতে একজনের অজ্ঞতা স্বীকার করাও প্রয়োজন।

ফেরেশতারাও মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রজ্ঞা একজনকে তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। যখন একজন ব্যক্তি প্রজ্ঞা গ্রহণ করে, তখন তারা তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে যাতে তারা উভয় জগতে নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে জ্ঞান শুধুমাত্র নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকারী এবং দরকারী যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। মহান আল্লাহর ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উল্লেখ ইঙ্গিত করে যে পৃথিবীতে ক্রমাগত কর্তৃত্ব সৃষ্টির পছন্দ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে নিহিত। এটি নির্দেশ করে যে এই পৃথিবীতে মানুষের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, পৃথিবীতে তাদের উপস্থিতি এলোমেলো বা দুর্ঘটনা নয়। সি অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করা একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে সাহায্য করবে, যা হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়, সে তাদের সমস্ত কাজকর্ম, পার্থিব বা ধর্মীয়, তাদের উদ্দেশ্যের মূলে থাকা নিশ্চিত করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে প্রতিটি কাজ এবং শব্দ বলেছে তা তাদের পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করবে। যিনি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন তিনি পৃথিবীতে একটি অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অস্তিত্বের নেতৃত্ব দেবেন, যা উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করবে সে এই পৃথিবীতে একটি লক্ষ্যহীন এবং অর্থহীন অস্তিত্বের নেতৃত্ব দেবে, যদিও তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করে। যেমন একটি বস্তু যা তার সৃষ্টির প্রাথমিক কারণ পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে ব্যর্থতার লেবেল দেওয়া হয়, যদিও তার আরও অনেক ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি মানব নামের উদ্ভাবনকেও ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করা হবে যদি তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। একজনের উদ্দেশ্য উপেক্ষা করা তাদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, উদ্বেগ এবং অসুবিধা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 33:

“তিনি বললেন, হে আদম, তাদের নাম জানিয়ে দাও। এবং যখন তিনি তাদের তাদের নাম জানিয়েছিলেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদের দরকারী জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। একজনের কখনই তাদের জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মানুষের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবকে হ্রাস করে। শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যে, যারা তাদের দরকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল তারাই মানবজাতির শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল যেখানে, যারা লোভের সাথে তাদের জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গেছে।

মহান আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রাণীদের বোধগম্যতার বাইরে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 33:

“তিনি বললেন, হে আদম, তাদের নাম জানিয়ে দাও। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাদের নাম জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়গুলো জানি?..."

তাই নিজের এবং তাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখতে হবে, যদিও তাদের পিছনের জ্ঞান তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে। তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জন্য যা সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করেন এবং একজনের কর্তব্য হল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার

উভয় সময়েই কেবল তাঁর আনুগত্য বজায় রাখা, যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মহান আল্লাহ তখন তাঁর জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট দিক তুলে ধরেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 33:

"...তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য [দিক] জানি? এবং আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যাতে তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য এবং বাহ্যিক কর্মগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য পরিচালিত হয়। ইসলামের ভিত্তি হল মানুষের গোপন উদ্দেশ্য। যদি এটি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে একজনের সমস্ত কাজই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এটি সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ এবং কথা বলতে চায়, অন্যথায় তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে। বিচার দিবসে যা সম্ভব হবে

না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কারো ভালো নিয়তের একটি চিহ্ন হল যে তারা কারো কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান কামনা করে না এবং আশা করে না এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করে। এই মনোভাব অবশ্যই একজনের সমস্ত কাজ এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত, যেমন জীবিকা অর্জন এবং নিজের সন্তানদের লালনপালন করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 33:

"...তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য [দিক] জানি? এবং আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।"

এই বক্তব্যটি শয়তানের জন্যও একটি সতর্কবাণী ছিল যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি তার লুকানো অহংকার ও হিংসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তার উচিত ছিল এই সুযোগ গ্রহণ করা এবং সতর্ক করা এবং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বারবার সুযোগগুলো কাজে লাগাতে শিখতে হবে এবং দ্বিতীয় সুযোগ, মহান আল্লাহ তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই দান করেন। প্রতিটি মুহূর্ত হল একটি নতুন সুযোগ যার জন্য একজনের পথ পরিবর্তন করতে হবে এবং আগামীকাল পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই বলে এটিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কেউ রাতারাতি সাধু হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় না তবে তাদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শিখে এবং আমল করে, যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

"এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি সেখানে [পৃথিবীতে] কোন প্রাণীই রেখে যেতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সেজদা করল..."

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেছিলেন তার সম্মানে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, এটি ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। ফেরেশতাদের কৃতিত্বে অগণিত ইবাদত ছিল কিন্তু হযরত আদম (আঃ) জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তাঁর মর্যাদা ছিল উচ্চতর। তাই একজনকে অবশ্যই অত্যধিক ইবাদতের চেয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ জ্ঞান ছাড়া পরবর্তীটি সঠিকভাবে করা যায় না। সহজ করে বললে, জ্ঞান অনুযায়ী সম্পন্ন করা কয়েকটি ইবাদত অজ্ঞতায় করা অনেক ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় নামাজের 100টি চক্র পড়া এবং কিছু শেখার চেয়ে উত্তম। ইসলামিক জ্ঞানের একক বিষয় স্বেচ্ছায় নামাজের 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

ইবলিস, শয়তান, কোন ফেরেশতা ছিল না, কিন্তু জ্বীনদের ছিল। অধ্যায় 18, শ্লোক 50।

"... ইবলিস ছাড়া। সে জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল"...

কিন্তু তার প্রচুর ইবাদতের কারণে তাকে ফেরেশতাদের স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল এবং সেজদা করার আদেশ তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। শয়তান নিজেকে হযরত আদম (আঃ) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখে ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 12:

" [আল্লাহ] বললেন, "আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তখন তোমাকে সেজদা করতে কিসে বাধা দিল?" [শয়তান] বললো, "আমি তার চেয়ে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করছ এবং তাকে মাটি [পৃথিবী] থেকে সৃষ্টি কর।"

একজনের বাহ্যিক চেহারা তাদের পদমর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না তা তিনি অহংকারীভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। পদমর্যাদা মহান আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহান হিসাবে গ্রহণ করে, তিনি এর বিরোধিতা করবেন না। শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করতে তড়িঘড়ি করে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা উপেক্ষা করে। একজনকে অবশ্যই এই চেরি বাছাই করার মনোভাব এড়াতে হবে যাতে তারা নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করে। এই মনোভাব একজন ব্যক্তিকে সবসময় নেতিবাচক উপায়ে

জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে, যা ফলস্বরূপ আরও পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, পরচর্চা এবং অপবাদ। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দিয়েছেন যে, অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাহ্যিক চেহারা বা জাগতিক মান, যেমন সম্পদ, জাতিগততা বা লিঙ্গ, একজনকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করে না। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি তার সাথে জড়িত যে কতটা মহান আল্লাহকে ভয় করে। এর সাথে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা জড়িত যাতে কেউ তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তার ঔদ্ধত্যের কারণে, শয়তান স্পষ্টতই মহান আল্লাহকে ভয় করেনি এবং তাই সে হযরত আদম (আ.)-এর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, যদিও সে মাটির তৈরি হয়।

অহংকার একটি মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যা এড়ানো উচিত কারণ এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, একজন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অণু পরিমাণ অহংকারও যথেষ্ট। অহংকার একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, কারণ এটি সরাসরি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং যেহেতু এটি আসেনি। মহান আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন তা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে শয়তান সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অহংকারও একজন মানুষকে ছোট করে দেখে, এই ভেবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। অহংকার উভয় পরিণতি গ্রহণ করা বোকামি কারণ একজনের জন্য পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য সত্য প্রয়োজন। অতএব, এটি কার কাছ থেকে এসেছে তা নির্বিশেষে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অন্যের প্রতি অবজ্ঞা করা অত্যন্ত বোকামি, কারণ মহান আল্লাহর কাছে কেউ নিজের মর্যাদা বা অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয়। যেহেতু পরকালে মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি অজানা, তাই অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ কেউ নিশ্চিত করতে পারে না যে তারা বিশ্বাসের সাথে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। উপরন্তু, প্রত্যেকটি পার্থিব নিয়ামত যার কাছে আছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই তিনিই সকল নেয়ামতের সহজাত মালিক। এমন কিছুর জন্য গর্ব করা যা বাস্তবে অন্য কারোর, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অন্য কারো প্রাসাদ নিয়ে গর্ব করে। তাই অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, এবং যে কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করবে সে উভয় জগতেই শাস্তি পাবে। সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তান দ্বারা গৃহীত অন্য মারাত্মক বৈশিষ্ট্য ছিল হিংসা। হিংসা একটি বড় পাপ কারণ এটি সরাসরি মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নেয়ামতের বরাদ্দকে চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তায়ালা অন্য কাউকে না দিয়ে বিশেষ নিয়ামত দান করতে ভুল করেছেন। শয়তান এমন আচরণ করলো যেন

হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তা তারই। একজনকে অবশ্যই ঈর্ষা এড়াতে হবে এই বোঝার দ্বারা যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম যা দান করেন এবং তাই তাদের অবশ্যই তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং অন্যদের যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে নিজেকে চিন্তা না করে। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

" আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

একজনকে অবশ্যই হিংসার অনুভূতিকে অপছন্দ করতে হবে এবং ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির প্রতি তাদের বক্তৃতা বা কর্মকে কখনই প্রভাবিত করতে দেবেন না। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তবে আশা করা যায় তাদের হিংসার জন্য ক্ষমা করা হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , অন্যরা তাদের আশীর্বাদ হারাতে না চাওয়া ছাড়া যা মঞ্জুর করা হয়েছে তার অনুরূপ জিনিস কামনা করা বৈধ কিন্তু পার্থিব বিষয়ে অপছন্দনীয়। যদি একজনকে অন্যদের কাছে অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চান তবে তাদের ধর্মীয় আশীর্বাদের সাথে সংযুক্ত করা উচিত, যেমন দরকারী জ্ঞান এবং দাতব্য হওয়া। এটি সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

উপরন্তু, এই ঘটনাটি নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে। শয়তান পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদা

কামনা করেছিল এবং অনুভব করেছিল যে সে এটির আরও যোগ্য। এই নেতৃত্বের জন্য তার চরম আকাঙ্ক্ষা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন অহংকার ও হিংসার দিকে ঠেলে দেয়। এটি একটি কারণ যার কারণে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে নেতৃত্ব ও সম্পদের লালসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েদের চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী। ভেড়ার পাল মুক্ত করা হয়। কারণ এই দুটি জিনিসের জন্য অত্যধিক আকাঙ্খা সহজেই কাউকে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, যখন সেগুলি অর্জন করে, সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং বৃদ্ধি করে। নিজের প্রয়োজন এবং দায়িত্ব অনুযায়ী হালাল জিনিস অনুসরণ করা সর্বদা নিরাপদ। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা একজন ব্যক্তিকে উভয় জগতের মানসিক চাপ এবং সম্ভাব্য শাস্তি থেকে বাঁচায়।

তদুপরি, একজনকে অবশ্যই সেই ফেরেশতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যারা দাসত্বের বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিল, অর্থাৎ, মহান আল্লাহর হুকুমকে চ্যালেঞ্জ না করে এবং পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। শয়তান একজন প্রভুর মত আচরণ করত এবং তার নিজের চিন্তাকে মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রয়োগ করত। এই মনোভাব দাসত্বের বিরোধিতা করে, যেহেতু একজন চাকর সর্বদা তাদের প্রভুর কথা শোনে এবং মান্য করে, কেবলমাত্র প্রভুকে জেনেই সিদ্ধান্ত নেন যে সমস্ত পরিস্থিতিতে তাদের জন্য কী ভাল। শয়তানই ছিল প্রথম উদ্ভাবক কারণ সে তার নিজের চিন্তাভাবনাকে আল্লাহর আদেশের প্রতি বশ্যতা স্বীকার না করে প্রয়োগ করেছিল। একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং এর পরিবর্তে ফেরেশতাদের পথ অনুসরণ করতে হবে যারা উদ্ভাবন এড়িয়ে চলেন এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে তিনি আদেশ করেছেন। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয়ের মূলে ইসলাম, অর্থ, পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত নেই। তাকে, মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত। এটি সুনান আবু

দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজনকে অবশ্যই নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর শিক্ষা ও কাজ করার জন্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অন্য কাজগুলি এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলি ভাল দেখায়। সরল সত্য হল যে একজন অন্য জিনিসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তারা তত কম শিখবে এবং নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে। এটি শুধুমাত্র বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে।

উপরন্তু, শয়তান সর্বপ্রথম একটি চেরি বাছাই করার মনোভাব গ্রহণ করেছিল কারণ সে মহান আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করেনি বা তাঁর উপাসনাও করেনি বরং হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার একক আদেশকে অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা। একজন মুসলিম একইভাবে আচরণ করতে পারে যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ ও অনুসরণ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে তা বেছে নেয়। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে তাদের বিশ্বাসকে একটি জামার মতো মনে করে যা তারা পরে এবং যখন ইচ্ছা খুলে ফেলে। এটি একটি মুসলিমের সংজ্ঞার বিপরীত, যা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা থেকে চেরি বাছাইয়ের শয়তানী মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে প্রতিটি পরিস্থিতির কাছে যেতে হবে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। এবং মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করুন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, চেরি বাছাই করার মনোভাব অবলম্বন করা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহকে ভুলে যেতে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। এটি উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি কেউ ইসলামের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মেনে চলে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অহংকারী ছিলেন ..."

এই ঘটনাটি মহান আল্লাহর অধিকারের সাথে একত্রে সৃষ্টির অধিকার পূরণে সচেষ্ট হওয়ার গুরুত্বও নির্দেশ করে। শয়তানের সমস্যা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের হক আদায় করা, মহান আল্লাহর হক পূরণ না করা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই ভারসাম্যহীনতা এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে প্রথমে মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক এবং সৃষ্টির অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যার মধ্যে তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা জড়িত যেভাবে একজন মানুষ ব্যবহার করতে চায়। একজনকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করাই সফলতার জন্য যথেষ্ট। ইসলাম সুস্পষ্ট করে বলেছে, বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা অন্যদের উপর জুলুম করেছে, এমনকি তারা মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করলেও, তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচারের দিনে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"...সে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অহংকার করেছিল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।"

এই আয়াতটিও একটি ভীতিকর বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়গুলি ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাহলে তারা ঔদ্ধত্য অবলম্বনের বিপদে পড়ে। এটি কেবল তাঁর প্রতি একজনের অবাধ্যতা বাড়ায় এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। শয়তান অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিল, তবুও তার অবাধ্যতার কারণে সে অহংকারে পরিণত হয়েছিল, সে কাফের হয়ে গিয়েছিল। যদি একজন মুসলিম একই আচরণ করে, কার্যত মহান আল্লাহকে মানতে অস্বীকার করে, এমনকি যদি তারা অভ্যন্তরীণভাবে তাকে বিশ্বাস করার দাবি করে, তবে তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে এবং অমুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি ঘটে কারণ একজনের বিশ্বাসকে ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে পুষ্ট করা উচিত ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদকে জল, সূর্যালোক এবং পুষ্টি দিয়ে পুষ্ট করা উচিত। একটি উদ্ভিদ যেমন পুষ্টির অভাবে মরে যায়, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে যদি তারা মহান আল্লাহর বাস্তবিক আনুগত্যের মাধ্যমে তা লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়।

34 নং আয়াতের শেষ অংশটি শয়তানের লুকানো কলুষিত অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে, কারণ এটি অতীতকালে তার অবিশ্বাসকে বর্ণনা করে, যেন সে সবসময়ই অবিশ্বাসী ছিল, তার লুকানো দুর্নীতির অভিপ্রায় এবং অহংকার এবং হিংসার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ফলে। . যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং কথা বলে এবং তাদের অবশ্যই শিখতে এবং আমল করে সঠিকভাবে কাজ ও কথা বলে নিশ্চিত করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিক উদ্দেশ্য, কর্ম, বক্তৃতা এবং ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার মতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, যা

উভয় জগতে তাদের উপকার করবে। এটি তাদেরকে শয়তানের পথ থেকে দূরে রাখবে এবং তাদের পূর্বপুরুষ হযরত আদম (আঃ) এর পথের কাছাকাছি রাখবে।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 35-39

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٣٥

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٣٦

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩

"এবং আমরা বললাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] যেখান থেকে ইচ্ছা খাও।

কিন্তু শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে [জান্নাত] পিছলে নিয়ে গেল এবং যে [অবস্থা] তারা ছিল সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দিল। এবং আমরা বলেছিলাম, "তোমরা সবাই একে অপরের শত্রু হয়ে নেমে যাও, এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি স্থায়ী বাসস্থান ও জীবিকা থাকবে।"

অতঃপর আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে [কিছু] বাণী গ্রহণ করলেন এবং তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিঃসন্দেহে তিনিই তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

আমরা বললাম, তোমরা সবাই সেখান থেকে নেমে যাও। আর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারাই হবে জাহান্নামের সঙ্গী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে মানবজাতির আদি ও স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত। এটি নির্দেশ করে যে এই পৃথিবীতে একজনের জীবন একটি ভ্রমণের অংশ এবং একটি স্থায়ী গন্তব্য নয়। তাই সহীহ বুখারি, 6416 নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত উপদেশের উপর আমল করা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাউকে এই পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন যেন তারা ভ্রমণে বা অপরিচিত। বিদেশী জমি এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যাতে তারা এই পৃথিবী অতিক্রম করে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে পৌঁছায়। তারা কখনই এই পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করবে না যার ফলে এটিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। ছুটিতে থাকা ব্যক্তি যেমন তাদের ভ্রমণের সময় মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে নিজেকে যথেষ্ট রাখে, এই পৃথিবীতে একজনের এই পদ্ধতিতে আচরণ করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের স্থায়ী এবং আসল বাড়িতে ফিরে আসবে যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে স্বাধীন হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 35:

"এবং আমরা বললাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্য সহকারে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও..."

উপরন্তু, একজনকে এই পৃথিবীতে সঠিক সাহচর্য গ্রহণ করা উচিত, যেমন সঠিক জীবনসঙ্গী, যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী এবং আসল বাড়িতে পৌঁছাতে সহায়তা করে। সহীহ বুখারি, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নির্দেশিত, একজন ব্যক্তি সর্বদা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা নেতিবাচক বা ইতিবাচক, সূক্ষ্ম বা স্পষ্ট যাই হোক না কেন। বিবাহের ক্ষেত্রে, একজনকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে হবে যাতে তাদের জীবনসঙ্গী নিরাপদে তাদের স্থায়ী এবং আসল বাড়িতে পৌঁছাতে সহায়তা করে। একজনকে অবশ্যই একজন জীবনসঙ্গী বাছাই করতে হবে যে তারা কতটা

আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও আশীর্বাদ। তার উপর হতে যদি তারা পার্থিব কারণের ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে , যেমন সম্পদ, বংশ বা সৌন্দর্যের জন্য, তাহলে তাদের বিয়ে থেকে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে না, সে তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে না এবং তারা যখন বিরক্ত হবে তখন তারা সহজেই তাদের উপর জুলুম করবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যকেও একই কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 35:

"এবং আমরা বলেছিলাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, পাছে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

এটি কী ধরণের গাছ ছিল তা নিয়ে আলোচনা বা গবেষণায় তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ এই ইভেন্ট থেকে যে শিক্ষা নেওয়া দরকার তার জন্য এটি প্রাসঙ্গিক নয়। হাশরের দিনেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জন্য সর্বদা এমন জ্ঞান অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যকীয়, যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা এবং বিচার দিবসে যে

বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে সেগুলি নিয়ে গবেষণা করা। . যদি কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা এই বিভাগের মধ্যে না পড়ে তবে তাদের প্রশ্ন করা বা অধ্যয়ন করার সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

উপরন্তু, আয়াত 35 নির্দেশ করে যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে মহান আল্লাহ তাদের আশীর্বাদ দান করতে পারেন। তারা উভয় জগতে কষ্ট ভোগ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি. অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

কিন্তু এই নিয়ামতগুলো অর্জন করতে হলে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হলে একজন প্রাণীর মতো আচরণ করবে এবং তাই বাকি সৃষ্টির থেকে মানবজাতির পার্থক্য হারিয়ে যাবে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতে চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে।

অধিকন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তায়ালার নিষেধাজ্ঞার পিছনে প্রজ্ঞা হল একজন ব্যক্তিকে নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করা, ঠিক যেমন হযরত আদম (আঃ)-কে আহার থেকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছিল।

নির্দিষ্ট গাছ, কারণ তার পরিণতি তার ক্ষতি করবে, মহান আল্লাহ নয়। মানুষের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিকর বিষয়গুলোই মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। কেউ এই ক্ষতিগুলি স্বীকার করুক বা না করুক তা বাস্তবে অসম্মানজনক। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই সত্যকে উপলব্ধি করা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করবে, ইতিবাচক মানসিকতার সাথে সেগুলিকে বোঝা মনে না করে। এই ইতিবাচক চিন্তা একজনের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেবে। ইসলামে হালাল সমস্ত জিনিস হয় উপকারী বা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। সুতরাং একজন মুসলমান এই জিনিসগুলি উপভোগ করার জন্য স্বাধীন যতক্ষণ না তারা তাদের আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিভ্রান্ত না করে, যা ক্ষতিকারক এবং তাই নিষিদ্ধ। এটি স্পষ্ট করে যে ইসলাম একটি সোজা এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর কাছে দ্বীনের সবচেয়ে প্রিয় দিক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 35:

"এবং আমরা বলেছিলাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, পাছে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

উপরন্তু, যদিও নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র গাছ থেকে খাওয়ার সাথে জড়িত তবুও মহান আল্লাহ তাদের এর কাছে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন। এটি বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গাছের কাছে যাওয়া বৈধ ছিল, শুধু তা থেকে খাওয়া ছিল না। এটি

ইঙ্গিত দেয় যে শুধুমাত্র কিছু বৈধ বলে এর অর্থ এই নয় যে এটি করা উচিত। এমন অনেক কিছু আছে যা হালাল কিন্তু সেগুলো করলে সমস্যা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত খাওয়া পাপ নয়, তবুও এটি অনেক মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, পাপের প্রথম ধাপ প্রায়ই জায়েজ এবং নিরর্থক জিনিস। উদাহরণস্বরূপ, মিথ্যা, গীবত এবং অপবাদের মতো পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়শই জায়েজ এবং নিরর্থক কথাবার্তা দিয়ে শুরু হয়। যারা বিপথগামী জীবনধারা অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি যদি কেউ চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিপথগামীতা একযোগে ছিল না। এতে অনেক বৈধ পদক্ষেপ জড়িত ছিল যা অবশেষে একটি পাপপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করে। তরুণরা কীভাবে দলবদ্ধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তার একটি ভালো উদাহরণ। অতএব, একজনকে অবশ্যই সেসব বিষয়ের সাথে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যা উভয় জগতের জন্য তাদের সরাসরি উপকার করবে এবং যে জিনিসগুলি তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বের সাথে সরাসরি জড়িত এবং যেগুলি হালাল হলেও তা এড়িয়ে চলতে হবে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা হালাল জিনিস ত্যাগ করার ভয়ে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 35:

"এবং আমরা বললাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কিন্তু শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে [জান্নাত থেকে] পিছলে ফেলল এবং তাদেরকে সেই [অবস্থা] থেকে সরিয়ে দিল যে অবস্থায় তারা ছিল..."

যেহেতু হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে তাকে একটি গাছ থেকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং শয়তানকে পবিত্রতার বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

" এবং, যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একটি ধারাবাহিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করব।"

শয়তান হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর আন্তরিক বন্ধু ও উপদেষ্টা হওয়ার ভান করেছিল এবং তাই সে তাদেরকে নিষিদ্ধ গাছ থেকে খাওয়ার জন্য প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছিল। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 19-22:

"এবং "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, পাছে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" কিন্তু শয়তান তাদের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল যেন তাদের গোপনাঙ্গের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তিনি বললেন, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এই গাছটি নিষেধ করেননি যে, তুমি ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা অমর হয়ে যাও। এবং তিনি তাদের [আল্লাহর কসম করে] শপথ করলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন আন্তরিক পরামর্শদাতা।" তাই তিনি প্রতারণার মাধ্যমে তাদের পতন ঘটালেন..."

যেমনটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, এটি খারাপ সঙ্গীদের এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ তারা তাদের সঙ্গীদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে, এমনকি এটি অনিচ্ছাকৃত হলেও। একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সাথে থাকবে যারা মহান আল্লাহকে মানতে চেষ্টা করে, যাতে তারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। একজনকে অবশ্যই তাদের সঙ্গীদের সাথে সতর্ক থাকতে হবে, যেমন তাদের আত্মীয়, কারণ তারা প্রায়শই অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের এমন কিছু করার পরামর্শ দিতে পারে যা তাদের মহান আল্লাহর রহমত থেকে পিছলে যেতে পারে। এই কারণেই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা কেবল ভাল সঙ্গীই গ্রহণ করে না বরং তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করে। প্রিয়জন, যেমন তাদের আত্মীয়।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, শয়তান এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে সে মানবজাতির চরম শত্রু এবং তাই তাকে অবশ্যই শত্রুর মতো আচরণ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলো শিখে এবং আমল করে, কারণ এগুলো তাদের শেখাবে কীভাবে তাদের শপথকারী শত্রুর কৌশল চিনতে হবে এবং তাদের পরাস্ত করতে হবে যাতে তারা বেঁচে থাকে। মহান আল্লাহর রহমতের মধ্যে, উভয় জগতে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অবশেষে শয়তানের আনুগত্য করবে এবং ফলস্বরূপ সে তাদেরকে উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত থেকে পিছলে যাবে, যেমন সে মানবজাতির পিতামাতাকে জান্নাত থেকে পিছলে যেতে বাধ্য করেছিল। তার প্রতারণা

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম (আ.)-এর মিশন তখন শুরু হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 36:

“ *কিন্তু শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে [জান্নাত] পিছলে নিয়ে যায় এবং যে [অবস্থা] তারা ছিল সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়। এবং আমরা বলেছিলাম, "[তোমরা সবাই] একে অপরের শত্রু হিসাবে নেমে যাও..."*

বহুবচন, যা দুটির বেশি নির্দেশ করে, পৃথিবীতে নেমে যাওয়া এবং একে অপরের শত্রু হওয়ার আদেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এই নির্দেশটি হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী (সা.) এবং শয়তানকে নির্দেশ করে। সুতরাং এটি ইঙ্গিত দেয় যে শয়তান শুধুমাত্র মানবজাতির একটি প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট শত্রু নয় কিন্তু মানুষ একে অপরের শত্রুও হতে পারে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি ভাল সাহচর্য অবলম্বনের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ কেউ তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে তাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার হিসাবে নির্ধারণ করবে, ততক্ষণ তারা মানুষ ও শয়তানের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পৃথিবীতে মানবজাতির পরীক্ষা তখন রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 36:

"...এবং আমরা বলেছিলাম, "[তোমরা সবাই] একে অপরের শত্রু হিসাবে নেমে যাও, এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি স্থায়ী বসতি এবং রিযিক থাকবে।"

পৃথিবীতে মানবজাতির পরীক্ষা হল তারা তাদের প্রদত্ত রিজিক, পার্থিব আশীর্বাদের আকারে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে কি না। যে এগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে সে এই দুনিয়ায় স্বল্প অবস্থানে মানসিক শান্তি এবং পরকালে মানসিক শান্তি পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত বিধানের অপব্যবহার করবে সে এই দুনিয়ায় স্বল্প অবস্থানের সময় একটি চাপযুক্ত জীবন এবং পরকালে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, আয়াত 36 নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যে বিধান প্রয়োজন তা ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি এবং বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তির বৈধ বিধান আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 বছর আগে বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, তাদের রিযিক না পাওয়ার ভয় তাদের কখনই হারামের দিকে ধাবিত হতে দেবে না। এটি কেবল উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি যা হালাল তা অর্জন এবং ব্যবহার করা। কারও ভিত্তি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তবে তারা তার উপরে যা তৈরি করে তা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 36:

"...এবং আমরা বলেছিলাম, "[তোমরা সবাই] একে অপরের শত্রু হিসাবে নেমে যাও, এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি স্থায়ী বসতি এবং রিযিক থাকবে।"

যেহেতু এই পৃথিবীতে একজনের বসতি ক্ষণস্থায়ী, তাই এই পৃথিবীতে থাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাদের দেরি করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি কীভাবে আচরণ করুক না কেন, এই পৃথিবীতে তাদের বসতি ক্ষণস্থায়ী, তারা পৃথিবীতে তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ হওয়ার পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফিরে

আসবে। যেহেতু এই প্রত্যাবর্তন অনিবার্য, তাই অন্য সমস্ত জিনিস এবং ক্রিয়াকলাপের চেয়ে এই বিশ্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজনের চূড়ান্ত বিচারের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য।

শয়তানের বিপরীতে, যে মহান আল্লাহর প্রতি তার অবাধ্যতার ত্রুটি দেখতে এবং স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল, হযরত আদম (আ.) তার ভুলের দায় স্বীকার করেছিলেন এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং যে কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে যেতে চায় তার জন্য এই রীতি প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 37:

"অতঃপর আদম তার প্রভুর কাছ থেকে [কিছু] বাক্য গ্রহণ করলেন এবং তিনি তার তওবা কবুল করলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

এবং অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 23:

"তারা বলল, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, আল্লাহ, মহান এবং অন্য যে কারোর কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা হবে না এবং যেকোনও জন্য ক্ষমা করা। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর রহমতের আশায় ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে, যার অর্থ, কেউ তাদের পথ সংশোধন করার চেষ্টা করবে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকবে। যদিও, ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা। ইসলামে ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার কোন মূল্য নেই। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে এই পার্থক্যটি স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যটি পরবর্তী আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 38:

"আমরা বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। আর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আন্তরিক তওবা করার অংশ হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উন্নতি সাধন এবং তার উপর অটল থাকা। এই নির্দেশনার চূড়ান্ত রূপ এসেছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েতের আকারে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আয়াতটি ঐশ্বরিক নির্দেশনায়

বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেনি বরং এটিকে কার্যত অনুসরণ করার কথা উল্লেখ করেছে। এর অর্থ হল বাস্তবিক আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য মৌখিকভাবে বিশ্বাস ঘোষণা করা যথেষ্ট ভাল নয়। এই কারণেই অনেক মুসলমান এই আয়াতে উল্লিখিত মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়। একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে, যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবহারিক আনুগত্যের মাধ্যমেই উভয় জগতের ভয় ও শোক থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হবে না, কারণ সমস্যার মুখোমুখি হওয়া এই বিশ্বের পরীক্ষার একটি অংশ। এর মানে হল যে যদিও কেউ উদ্বেগ, চাপ এবং দুঃখের সময় অনুভব করতে পারে তবুও এই অনুভূতিগুলি কখনই চরম হবে না, যেমন ভয় এবং দুঃখ। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলি কাটিয়ে উঠবে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, যে ব্যক্তি কার্যত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে চরম আবেগ এবং নেতিবাচক অনুভূতির সম্মুখীন হবে, যেমন ভয় এবং শোক, যা তাদের সারা

জীবন কাটিয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে বসবাস করবে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতে আরও চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয় সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তির আবাস। অতএব, যদি কেউ আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের মানসিক প্রশান্তি দেবেন, যদিও তারা নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হন। পক্ষান্তরে, যে তাঁর অবাধ্য হয় সে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। এই সত্য যে ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করে তার কাছে স্পষ্ট। অতএব, ৩৪ শ্লোক দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মনের শান্তির পার্থিব জিনিসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, পেশা বা বন্ধুবান্ধব। মনের শান্তি সরাসরি স্বর্গীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণের সাথে জড়িত যাতে তারা যে আশীর্বাদগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে তা পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। তার উপর হতে

উপসংহারে, একজনকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে ঐশ্বরিক নির্দেশনা তাদের সুখী জীবন পেতে বাধা দেবে। ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে যে একজন তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। যদিও, ঐশ্বরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করা একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যা উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা একজন ডাক্তারের মতো যে একজন রোগীর জন্য তিক্ত ওষুধ এবং খাবারের বিধিনিষেধ লিখে দেয় যাতে তারা ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করে। ডাক্তারকে উপেক্ষা করা যেমন খারাপ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, তেমনি ঐশ্বরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 38:

"আমরা বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। আর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, কোনো ব্যক্তি বা সমাজ বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত না করে ভয় বা শোক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। এর কারণ হল একটি সমাজের মধ্যে একটি ভাল আইন শুধুমাত্র লোকেদের অন্যদের উপর অন্যায় করা এবং অপরাধ করা থেকে বিরত রাখবে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা কর্তৃত্ব থেকে পালাতে পারবে না। কিন্তু যখনই কেউ বিশ্বাস করে যে তারা কর্তৃত্ব থেকে পালাতে পারবে তখন তারা অপরাধ করবে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে। এটি সমাজকে শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জনে বাধা দেবে।

পরিবর্তে, এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, সমাজ ভয় এবং শোকের মধ্যে বসবাস করবে। এটি কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে, কারণ এটি মহান আল্লাহর ভয় এবং তাদের কর্মের পরিণতির ভয়ের দিকে পরিচালিত করে। এই ভয়ই একজনকে অন্যের উপর অন্যায় করা এবং অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে এমনকি যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা পুলিশের মতো জাগতিক কর্তৃত্ব থেকে পালাতে পারবে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যে সমাজগুলোকে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়িত করেছে বাস্তবিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস।

উপরন্তু, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র চরম আবেগ থেকে রক্ষা পাবে, যেমন দুঃখ এবং ভয়, এবং একটি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করবে যখন তারা কঠোরভাবে ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করবে। এর অর্থ হল একজনকে অবশ্যই ধর্মে উদ্ভাবন এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে করা হয়। সরল সত্য হল এই যে, কেউ যত বেশি অন্য সৎকাজের উপর আমল করবে তত কম তারা এই দুটি পথ নির্দেশনার উপর আমল করবে। এটি তাদের ভয় এবং শোক থেকে সুরক্ষা পেতে বাধা দেবে।

একজনের কার্যত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণের অভাবের স্তরের উপর নির্ভর করে, তারা বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। এটি ঘটতে পারে কারণ বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মতো যা আনুগত্যের ব্যবহারিক কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন পুষ্টির অভাবে মারা যেতে পারে, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও হতে পারে যে কার্যত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 39:

“আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারা হবে জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

তাই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এই ফলাফল এড়াতে ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে তাদের বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, কেউ ইসলামকে মৌখিকভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যবহারিকভাবে অস্বীকার করতে পারে। এটি অবশ্যই এড়ানো উচিত কারণ উভয় জগতে ভয় এবং শোক থেকে সুরক্ষা কেবলমাত্র তাদেরই দেওয়া হয় যারা কার্যত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 38:

"...যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে- তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

যদিও জাহান্নামে বাস করা কঠোর এবং কঠোর, তবুও যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের ঈশ্বর, স্রষ্টা, মালিক, পালনকর্তা এবং লালন-পালনকারীকে অস্বীকার করে তাদের জন্য এটি উপযুক্ত শাস্তি। যিনি ক্রমাগত তাদের অসংখ্য আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। যেভাবে একটি উদ্ভাবন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তা বাতিল করা হয়, একইভাবে মানুষ নামের উদ্ভাবনটি বিচারের দিন বাতিল হয়ে যাবে যদি তারা

তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, যা তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার জন্য। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

উপরন্তু, যেমন মহান আল্লাহ, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, এই পরিণতি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে এবং এই সিদ্ধান্তকে এড়ানো বা থামানো যাবে না, একজনকে হয় তাঁর আইন মানতে হবে বা এমন একটি মহাবিশ্ব খুঁজে বের করতে হবে যেখানে তাঁর আইন প্রযোজ্য নয়। . যেহেতু পরবর্তীটি সম্ভব নয়, তাই একজনকে অবশ্যই খোলা মন নিয়ে ইসলামিক জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে যাতে উভয় জগতের সত্যতা এবং উপকারিতা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 40-46

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ﴿٤٠﴾

وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٤٢﴾

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

۞ أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٤٤﴾

وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾

“হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর।

আর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তোমাদের কাছে [ইতিমধ্যেই] রয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এতে সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার নিদর্শনসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে নিয়ো না এবং আমাকে ভয় কর।

আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপন করো না যখন তোমরা তা জান।

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

আপনি কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেন এবং কিতাব পাঠ করার সময় নিজেকে ভুলে যান? তাহলে কি যুক্তি দেখাবে না?

আর সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। এবং প্রকৃতপক্ষে, নম্রভাবে বিনয়ী [আল্লাহর কাছে] ব্যতীত এটি কঠিন।

যারা নিশ্চিত যে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে।"

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সরাসরি সম্বোধন করে তাদেরকে ইসলামের সত্যকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান, যা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল। যেহেতু পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআন উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 40-41:

“হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার

পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর। আর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তোমাদের কাছে [ইতিমধ্যেই] রয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এতে সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার নিদর্শনসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্যে বদলাবেন না এবং আমাকে ভয় করুন।"

প্রকৃতপক্ষে, কিতাবের লোকেরা শুধুমাত্র মদিনায়ই বসবাস করত কারণ তারা জানত যে শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে হিজরত করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইউশা নামে একজন ইহুদি পণ্ডিত মদিনায় বসবাস করতেন এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে অন্যদের উপদেশ দিতেন এবং মদিনাবাসীকে তিনি আসার পর তাকে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। কিন্তু যখন তিনি তা করেছিলেন, তখন ইউশা এবং তার বেশিরভাগ সহযোগী পণ্ডিতরা তাদের ঐশ্বরিক কিতাবগুলিকে হেরফের করার মাধ্যমে তাদের অর্জিত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা হারানোর ঈর্ষা ও ভয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 212-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিংসা করত, যেহেতু তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন, বরং তাঁর ভাই হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর না হয়ে তাঁর মত। তারা ছিল ভ্রাতৃত্ব এবং রক্তের প্রতি এই ভালবাসা তাদের উৎসাহিত করেছিল যখন সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অহংকারপূর্ণ আচরণ করেছিল, যেমন শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল। হযরত আদম (আঃ) এবং শয়তানের কাহিনী আলোচনার পর এই বইয়ের লোকদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। উপরন্তু, তারা আশা করেছিল যে শেষ নবী (সাঃ) তাদের প্রশংসা করবেন, তাদের কর্তৃত্বের পদ অর্পণ করবেন এবং সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য তাদের বিশ্বাস ব্যবহার

করার মন্দ আচরণ উপেক্ষা করবেন। যখন তাদেরকে ইসলামের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং সত্য শেখার ও আমল করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল , তখন তারা তাদের অর্জিত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে ভীত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাই, মহান আল্লাহ তাদের অগণিত আশীর্বাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেমন পবিত্র নবীদের মাধ্যমে খোদায়ী দিকনির্দেশনা, তাদের উপর শান্তি, সেইসাথে তাওরাত এবং বাইবেলের মতো আসমানী কিতাবসমূহ, এবং তাদের পূরণ করতে উত্সাহিত করেছেন। আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার এবং সত্যকে যখনই তাদের কাছে আসে তখনই তা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি, বিশেষত, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং চূড়ান্ত খোদায়ী ওহী, পবিত্র কুরআন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 155-157:

"আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আমাদের নিয়োগের জন্য মনোনীত করেছিলেন সত্তর জন। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, তখন সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি আগে তাদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন? এটা আপনার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম ফয়সালা করুন [যা] ভাল এবং [ও] পরকালে, আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি। [আল্লাহ] বললেন, "আমার শাস্তি - আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দেই, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে।" সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য [বিশেষ করে] নির্ধারণ করব যারা আমাকে ভয় করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে। যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে], যিনি তাদের সৎ কাজের

আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য যা হালাল করেন। ভাল এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয় যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সমর্থন করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করেছে, তারাই সফলকাম হবে।"

মহান আল্লাহ তাদের আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার সময় মানুষকে ভয় না বা সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস হারানোর ভয় না করার জন্য উত্সাহিত করেছেন। যদি তারা তা করে তবে তিনি তাদের মানসিক শান্তি এবং বিনিময়ে উভয় জগতেই সাফল্য দান করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 40:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দিয়েছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর।

এবং অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 66:

"এবং যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের প্রতি তাদের পালনকর্তা [কুরআন] থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যদি [আইন] বজায় রাখত, তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে [রিযিক] খেয়ে ফেলত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 40:

“হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর।"

মহান আল্লাহ তায়ালা কিতাবধারীদেরকে যে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ দান করেছিলেন তা হল তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 122:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

কিন্তু যেহেতু তারা তাকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার মধ্যে একজনের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য জড়িত, এই সম্মান তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং মুসলিম জাতিকে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

“তোমরা মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

কিন্তু এই আয়াতে যেমন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মুসলিম জাতি কেবল তখনই মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করবে, যখন তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাঁকে খুশি করার উপায়ে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। যেভাবে কিতাবধারীরা তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে মহান আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছিল, তেমনি মুসলমানরাও যদি মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 40:

“হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দিয়েছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে সর্বদা কঠিন ও স্বাচ্ছন্দ্য উভয় সময়ে মহান আল্লাহ তায়ালার অগণিত এবং অবিচ্ছিন্ন অনুগ্রহ স্মরণ করতে স্মরণ

করিয়ে দেয়, যাতে তারা অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে। . ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। কৃতজ্ঞতা বলতে একজনকে দেওয়া আশীর্বাদ যেমন তাদের জিহ্বা এবং ধন-সম্পদ ব্যবহার করা জড়িত, যা পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে।

তারা স্বেচ্ছায় ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করে, অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তখন তাদের গৃহীত অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান আল্লাহর অধিকার এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মানুষের অধিকার পূরণ করা। পরেরটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। আয়াত 40, মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকারের সাথে আপস করবেন না, মানুষের ভয়ে এবং তাদের সমালোচনার কারণে বা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যেমন সম্পদ ও কর্তৃত্ব অর্জনে হারানোর ভয়ে। বিনিময়ে, মহান আল্লাহ তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু কেউ যদি তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পার্থিব জিনিস ও মানুষের স্বার্থে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতের মানসিক শান্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন না এবং এর পরিবর্তে তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করেছিলেন। তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ এবং অসুবিধার উৎস হয়ে উঠবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এটি একটি অনিবার্য পরিণতি কারণ মহান আল্লাহ একাই একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাই তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন যে কেউ মানসিক শান্তি পাবে কি না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

সংক্ষেপে বলা যায়, মহান আল্লাহকে ভয়ের মধ্যে রয়েছে যে কোনো পরিস্থিতিতে তার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যে আশীর্বাদগুলো একজনকে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে, যা পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এবং পার্থিব লাভের জন্য এর সাথে আপস করা এড়িয়ে চলুন।

পবিত্র কুরআন অতীতের ঐশ্বরিক উদ্ঘাটন, তাওরাত এবং বাইবেলের অপরিবর্তিত দিকগুলিকে নিশ্চিত করেছে এবং সেই দিকগুলিকে সংশোধন করেছে যা মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 41:

"এবং আমি যা নাযিল করেছি তাতে বিশ্বাস কর যা তোমার কাছে [ইতিমধ্যে] রয়েছে তার সত্যায়নকারী..."

অতএব, আহলে কিতাবের জ্ঞানীদের কাছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার কোনো অজুহাত ছিল না। অশিক্ষিত মক্কার মূর্তিপূজারীদের থেকে ভিন্ন, কিতাবের লোকেরা ঐশী ওহীর অলৌকিক প্রকৃতি এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিদর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল। কিন্তু মদিনার অধিকাংশ কিতাবধারী ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের আসমানী কিতাবের অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাদের অর্জিত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে। তাই তারা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করেছিল, যেভাবে সে সময়ের অন্য কোনো সম্প্রদায়, এমনকি অশিক্ষিত মূর্তিপূজারীরাও তা করেনি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 89-90:

"এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব [কুরআন] এসেছিল যা তাদের কাছে ছিল তার সত্যায়ন করে - যদিও আগে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করত - কিন্তু [তারপর] যখন তাদের কাছে এমন কিছু এল যা তারা চিনত, তারা এতে অবিশ্বাস করা; সুতরাং কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। কতই না নিকৃষ্ট বিষয় যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে- যে তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অবিশ্বাস করবে [তাদের] ক্রোধের কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করবেন। তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে [অর্জিত] ফিরে গেল..."

তারা ঐশ্বরিক জ্ঞান ও নির্দেশনা বিনিময় করেছিল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল যা স্পষ্টভাবে জাগতিক লাভের জন্য ইসলামের সত্যতাকে নির্দেশ করে, যদিও তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল না। তাদের সবার আগে ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই অবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 41:

"এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তোমার কাছে [ইতিমধ্যেই] রয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এতে প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার নিদর্শনসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্যে বদলাবেন না এবং আমাকে ভয় করুন।"

বিষয়টিকে আরও খারাপ করে তুলেছিল যে, কিতাবধারী আলেমরা যখন ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও তাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন তারা অন্ধ অনুকরণে অনেক

অজ্ঞ লোককে ইসলামে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল। জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে , একজন ব্যক্তি যখন অন্যদেরকে গুনাহ করার উপদেশ দেয় তখন তার পাপ বৃদ্ধি পায়, যদিও সে নিজে গুনাহ না করে। এটি ছিল আরেকটি কারণ যার কারণে তারা মহান আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তিকে গবাদি পশুর মতো অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা ও সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাকে যে বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে। ইসলামে অন্ধ অনুকরণ অপছন্দের কারণ প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 41:

"এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তোমার কাছে [ইতিমধ্যেই] রয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এতে প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার নিদর্শনসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্যে বদলাবেন না এবং আমাকে ভয় করুন।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে যখন কেউ মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, তখন তারা অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হবে যারা উচ্চতর নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করতে অপছন্দ করে। আচরণ এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে চান, হালাল বা অবৈধ হোক না কেন. প্রকৃতপক্ষে, সমালোচনার বেশিরভাগই আসে নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে, যদিও তারাই সর্বপ্রথম তাদের সাহায্যকারী হওয়া উচিত আল্লাহর আনুগত্যের পথে। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি এবং মুসলিমদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের মাধ্যমে তাদের এই সমালোচনা ও চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিস তাদের মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না, যেখানে মহান আল্লাহ তাদের মানসিক প্রশান্তি দিয়ে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা সুস্পষ্ট না হয়। তাদের এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 41:

"এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তোমার কাছে [ইতিমধ্যেই] রয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এতে প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার নিদর্শনসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্যে বদলাবেন না এবং আমাকে ভয় করুন।"

কিতাবধারীরা অহংকারবশত ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করতে এবং গোপন করার জন্য দৃঢ়ভাবে অটল ছিল ঐশ্বরিক জ্ঞানের অংশগুলি যা তাদের দেওয়া হয়েছিল যা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা দেয়। ধনী এবং প্রভাবশালীদের অনুকূল রায় দেওয়ার

জন্য তারা ঘুষ গ্রহণ করবে, এমনকি যদি এর অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক আইন ও নির্দেশনাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 42:

"এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করবেন না বা সত্যকে গোপন করবেন না যখন আপনি জানেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তি সমাজের বাকি অংশের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নয় এমন অনুশীলনগুলি গ্রহণ করে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা যত বেশি অনৈসলামিক আচার-আচরণে কাজ করবে, যদিও তারা পাপী নাও হয়, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তার উপর এটি কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাবে। উপরন্তু, কেউ সত্য লুকিয়ে রাখতে পারে, যখন তারা বেছে নেয় এবং বেছে নেয় ইসলামের কোন দিকগুলোর উপর কাজ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে। এই ব্যক্তি ইসলামকে একটি কোটের মতো আচরণ করে যা তারা উপযুক্ত মনে করে পরে এবং খুলে ফেলে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তাকে ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করে বলে মনে হতে পারে তবুও তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করে এবং উপাসনা করে। তাদের মনোভাব শুধুমাত্র তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যা উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 42:

"এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করবেন না বা সত্যকে গোপন করবেন না যখন আপনি জানেন।"

কিতাবধারীদেরকে তাদের ভ্রষ্ট পথের সংস্কার এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করার অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে ঈমানের স্তম্ভগুলোকে সমুন্নত রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল: সাহাবায়ে কেরামের মতোই ফরজ নামাজ কায়েম করা এবং দান-খয়রাত করা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

সালাত কায়েম করার সাথে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারের সাথে তাদের পূরণ করা জড়িত, যেমন তাদের সময়মত আদায় করা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে , ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করছে। এর কারণ হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হল মহান আল্লাহর সাথে নিয়মিত সম্পর্ক। তারা বিচার দিবসের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক। যেমন মহান আল্লাহর সামনে দিনে পাঁচবার দাঁড়ায়, বিচার দিবসে তারা তাঁর সামনে দাঁড়াবে এবং তাদের কৃতকর্মের জবাব দেবে। যে এগুলিকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাকে বিচার দিবসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তারা এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত হয়। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ফরজ সালাত কায়েম করতে ব্যর্থ হয় সে কিয়ামতের দিন তাদের জবাবদিহিতার কথা সহজেই ভুলে যাবে। ফলস্বরূপ, তারা এটির জন্য প্রস্তুতি নিতে বিরক্ত করবে না এবং পরিবর্তে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এই ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হবে এবং যদি তারা এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের বিশ্বাসের মৃত্যু হতে পারে কারণ এটি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। একটি উদ্ভিদ যেমন পুষ্টি ছাড়াই মারা যায় তেমনি আনুগত্যের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে পুষ্ট না হলে তার বিশ্বাসও হতে পারে। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

বাধ্যতামূলক দাতব্য অফার করা একজন ব্যক্তির উপর প্রাপ্য আর্থিক দায়বদ্ধতার সমস্ত দিককে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন তার নির্ভরশীলদের আর্থিকভাবে সমর্থন করা। এটি একজনের ভালবাসার বাস্তব প্রমাণ এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া, তাদের কাছে থাকা পার্থিব জিনিস যেমন ধন-সম্পদ উপভোগ করার চেয়ে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

বাধ্যতামূলক দাতব্য দানের লক্ষ্য হল একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয় থেকে জাগতিক জিনিসের অতিরিক্ত ভালবাসাকে শুদ্ধ করা যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করার উপর মনোনিবেশ করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। যে লোভী সে এমন আচরণ করতে পারবে না। ফলে তারা মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি হয়ে যাবে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উপরন্তু, বাধ্যতামূলক দান করা অন্যের প্রতি নিজের আন্তরিকতা পূরণের একটি উপায়, যা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সহীহ মুসলিম নং 196-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

যারা রুকু তাদের সাথে নত হওয়া বিশেষভাবে জামাতের প্রার্থনার গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে একটি এবং তাই একে নিজের শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। এটা জানাই যথেষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জামাতে নামায পড়েনি তাকে মুনাফিক বলে গণ্য করতেন। সুনান আবু দাউদ, 550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এটি ইসলামের চারপাশে একজনের জীবনকে ঢালাই করার একটি চমৎকার উপায় কারণ যে ব্যক্তি একটি মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়ে তাকে নামাজের সময় অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম সাজাতে বাধ্য করা হয়। এটি একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে সাহায্য করে, যে আশীর্বাদগুলি একজনকে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে, যা পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সা.

উপরন্তু, যারা রুকু করেন তাদের সাথে রুকু করা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের দ্বারা নিযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে শিখতে এবং তার উপর আমল করতে হবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়, কারণ যত বেশি কেউ অন্য জিনিসের উপর আমল করে। কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্স শিখবে এবং কাজ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোন বিষয়ের মূল দুটি হিদায়াতের উৎসের মধ্যে নেই তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে
।

যারা রুকু তাদের সাথে রুকু করাও ভাল সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অর্থ, একজনকে অবশ্যই তাদের সঙ্গী হতে হবে যারা কার্যত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। একজন ব্যক্তি সর্বদা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, নেতিবাচকভাবে বা ইতিবাচকভাবে, সূক্ষ্মভাবে বা আপাতভাবে। যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা লোকদের সঙ্গ দেয়, তারা দেখতে পাবে যে তারাও মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের সঙ্গী তারা দেখতে পাবে যে তারাও তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত হয়েছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 119:

" হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 27-28:

"আর যেদিন অন্যায়কারী তার হাত কামড়াবে [অনুশোচনায়] সে বলবে, "হায়, আমি যদি রসূলের সাথে একটি পথ গ্রহণ করতাম, হায়, আমার হায়, আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম।""

এবং অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

যারা নত হয় তাদের সাথে মাথা নত করাও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন জিনিসগুলিতে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অন্যদের সমর্থন করা এড়িয়ে চলে। একজনকে কখনই অন্যদের সমর্থন করার বা তাদের সাথে তাদের সম্পর্কের উপর সমর্থন না করার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করা উচিত নয়, কারণ এটি প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে কেউ কী করছে এবং যদি কার্যকলাপটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

“ তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

অনুযায়ী অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন বৈশিষ্ট্য যা মুসলিম জাতিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

“ তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভাল উপদেশ এবং মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করার শর্তগুলির মধ্যে একটি হল যে ব্যক্তি প্রথমে নিজেকে উপদেশ দেয় এবং তাদের নিজস্ব চরিত্রে তাদের উপদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের উপদেশ উপেক্ষা করে এবং তবুও অন্যদের উপদেশ দেয়, তাকে সহীহ বুখারী, 3267 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি হাদিসে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনের পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রয়োজন নেই, কারণ এটি সম্ভব নয় বা প্রত্যাশিত নয় কিন্তু তারা অন্যদের কাছে তা প্রেরণ করার আগে তাদের জ্ঞান বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাকে সর্বদা ভাল পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত এমনকি যদি উপদেষ্টা ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণ করছেন বলে মনে হয়। তাদের ভণ্ডামি তাদের এবং মহান আল্লাহ তায়ালার

মধ্যে, এবং তাই যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তার উচিত তাদের উপদেশ গ্রহণ করা এবং কাজ করা যতক্ষণ না এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। .

একজনকে মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ততক্ষণ কার্যকর নয় যতক্ষণ না তার উপর আমল করা হয়। জ্ঞানের উপর কাজ করাই এটিকে উপযোগী করে, অন্যথায় এটি অকেজো। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

অতএব, একজনকে কেবল দরকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যই সচেষ্ট হতে হবে না বরং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতে নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

" তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এই আয়াতটি প্রদর্শনের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। কেউ এইভাবে আচরণ করতে পারে যখন তারা অন্যদেরকে ধার্মিক কাজ করার জন্য উপদেশ দেয় যাতে তারা নিজেরাই ধার্মিক কাজগুলি করতে অবহেলা করে। কারও বিশ্বাসের ভিত্তি হল তাদের উদ্দেশ্য। যদি তাদের উদ্দেশ্য কলুষিত হয়, অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ না করে, তাহলে তাদের সমস্ত কাজই নষ্ট হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, অকৃত্রিম ব্যক্তিকে বিচারের দিন বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের ভাল কাজের পুরস্কার পেতে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। তাই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করবে। একজনের আন্তরিকতার একটি চিহ্ন হল যে তারা মানুষের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা করে না বা আশা করে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

" তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, বাস্তবিকভাবে কাজ না করে কেবলমাত্র ঐশী কিতাব পাঠ করা উভয় জগতেই সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন যে কিতাবধারীরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করে কিন্তু তারা এর উপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের সমালোচনা করেছে। মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনকে তেলাওয়াতের বই হিসাবে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তাদের জীবনে তা বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হবে। পরিবর্তে, তারা অবশ্যই এটিকে শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে

একটি নির্দেশনার বই হিসাবে বিবেচনা করবে। যেমন একটি মানচিত্র তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করে যে ব্যক্তি কেবল এটি অধ্যয়ন করে তার কোন উপকার হবে না এবং যে ব্যক্তি কেবল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে তারও কোন লাভ হবে না এবং এটিকে বোঝার এবং আমল করার চেষ্টা না করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

বিশেষভাবে, এই আয়াতটি মদিনায় বসবাসরত বইয়ের লোকদের মধ্যে থেকে কিছু পণ্ডিতদেরও সমালোচনা করেছে যারা অন্যদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেমন তাদের প্রিয়জনদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করার জন্য, তবুও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের সাথে আপস করার মাধ্যমে তারা প্রাপ্ত পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ এবং কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে। এটি তাদেরও সমালোচনা করে যারা অন্যদেরকে মদিনায় শেষ নবী (সাঃ) এর আগমন এবং তাঁকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেয়, কিন্তু অবশেষে যখন তিনি তাদের কাছে আসেন তখন তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 45:

"এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাও..."

এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে পরীক্ষা করা যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে কি না। নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তখনই সম্ভব যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করে। ধৈর্যের প্রয়োজন একজনের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাতে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার না করে। দুনিয়ার অসুবিধার মোকাবিলা করা প্রয়োজন যাতে কেউ তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তার পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। যতদিন তারা কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য উভয় সময়েই আজ্ঞাবহ থাকবে, ততদিন তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং পরলোকগত জীবনেও সফল হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাদের ধৈর্য অবলম্বন করতে সাহায্য করার জন্য একজনকে সর্বদা তাদের অসুবিধাগুলিকে অন্যদের মুখোমুখি হওয়া কঠিন সমস্যার সাথে তুলনা করতে হবে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা যতই অসুবিধার সম্মুখীন হোক না কেন তা সর্বদা আরও খারাপ হতে পারে এবং যারা মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় ছিলেন, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চেয়েও বেশি এবং কঠোর

অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত একটি অসুবিধার সূচনা থেকে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে, কারণ কেউ অধৈর্যতা দেখিয়ে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে। কিছু সময় পর কোনো অসুবিধাকে মেনে নেওয়া ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণ। সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় একটি কঠিন শুরু থেকেই। সহীহ বুখারি, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য এবং এমন একটি অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া এড়ানো অসম্ভব যা মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির জন্য মোকাবেলা করতে চান। অতএব, অধৈর্য দেখানোর কোনো মানে হয় না কারণ একজন তার নির্ধারিত অসুবিধার মুখোমুখি হবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে যে পুরস্কার অর্জন করতে পারত তা হারাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করে, সে তাদের নামায কায়েম করা সহজ হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 45:

" এবং ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর..."

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নামাজ কায়েম করা বিচারের দিনকে স্মরণ করতে এবং তাদের কর্মের জবাব দিতে সাহায্য করে। নামাযের সময় যেভাবে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, কিয়ামতের দিনও তারা তাঁর সামনে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে প্রার্থনা করে সে সর্বদা একটি বিনয়ী জীবনযাপন করবে, কারণ তারা তাদের চূড়ান্ত বিচারের ফলাফল জানে না এবং তারা অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এবং আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা সহজ পাবে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তারা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের নামায

কায়েম করে না বা ধৈর্য্য অবলম্বন করে না সে এমনটি করে কারণ তারা নিশ্চিত নয় যে তারা বিচার দিবসে তাদের কর্মের জবাব দেবে, অন্যথায় তারা তাদের সালাত কায়েম করে এবং সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন করে কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে। সম্ভবত এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 45-46:

" আর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং প্রকৃতপক্ষে, নম্রভাবে বিনয়ী [আল্লাহর কাছে] ব্যতীত এটি কঠিন। যারা নিশ্চিত যে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে।"

যে কেয়ামতের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস রাখে সে কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিবে। এর একটি দিক হল ঐশ্বরিক জ্ঞানকে গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, এমনকি তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলেও। যে গর্বিত সে এটা করতে পারবে না, যে নম্রতা অবলম্বন করবে সে পারবে। এটি সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপর আমল করাকে উপেক্ষা করে সে প্রকৃত বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, যদিও তারা মৌখিকভাবে অন্যথা দাবি করে।

ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত শিখে এবং আমল করে । একজনের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা বিনীতভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করবে, কারণ তারা নিশ্চিত যে

বিচারের দিন তারা তাদের কর্মের জবাব দেবে। তারা ইসলামী শিক্ষার নিদর্শনগুলির পাশাপাশি মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলির মাধ্যমে বুঝতে পারবে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমস্ত কিছুরই শুরু আছে, শেষ আছে, যেমন দিন ও রাত পেরিয়ে যাওয়া। তারা তাদের চারপাশের ধ্রুবক ইঙ্গিতগুলির প্রতি মনোযোগ দেবে যা তাদের কেয়ামতের দিনের কথা প্রমাণ করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন অনুর্বর মৃত জমি যা স্বর্গ থেকে জল পাওয়ার পরে জীবিত হয় এবং দিন ও রাতের জীবন ও মৃত্যু চক্র, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের মৃত্যু এবং জীবন এবং কীভাবে একজন ব্যক্তি প্রতিদিন একটি ছোট পুনরুত্থান অনুভব করে যখন তারা ঘুমাতে যায় এবং তারপরে আবার জেগে ওঠে। বিশ্বাসের নিশ্চয়তা এইভাবে প্রতিনিয়ত কেয়ামতের একটি দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এর জন্য কার্যত প্রস্তুত হতে উত্সাহিত হয়। যে এটি করবে সে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 40:

“ হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যে আমি তোমাদের [আমার কাছ থেকে] অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং [কেবল] আমাকে ভয় কর।

উপসংহারে বলা যায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে মুসলমানদের অতীতের জাতিগুলোর কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করতে হবে যাতে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। তাদের অবশ্যই মৌখিকভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কার্যত অবিশ্বাস করতে হবে, যেমন অতীতের জাতিগুলি তাদের আসমানী কিতাবের ব্যাপারে করেছিল। বাস্তবিকভাবে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে পার্থিব লাভের জন্য এর শিক্ষার সাথে আপস করতে হবে। এই পরিণতি এড়ানোর জন্য সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে। একজনকে বিশ্বাস করার জন্য বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থতার জন্য অবিলম্বে শাস্তি পায়নি তার মানে এই নয় যে তারা কখনই শাস্তি পাবে না। শাস্তি বিলম্বিত হওয়া কোন শাস্তির মত নয়। উপরন্তু, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের উপর কার্যত আমল করতে ব্যর্থ হয় এবং এর পরিবর্তে এর শিক্ষার সাথে আপস করে তাকে সূক্ষ্মভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করে তা তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে। সুতরাং তারা যত বেশি পার্থিব জিনিস যেমন ধন-সম্পদ লাভ করবে, তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের চাপ এবং অসুবিধা ততই বৃদ্ধি পাবে যাতে তারা তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকা সত্ত্বেও অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জীবনযাপন করে। কিন্তু এর পরে যে শাস্তি হয় তা আরও তীব্র। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 47-48

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٧

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ٤٨

“হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোনো প্রাণই অপর কোনো প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, তার কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।"

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসরত কিতাবধারীদেরকে তিনি যে অগণিত আশীর্বাদ প্রদান করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন, যেমন অসংখ্য নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে, বিশেষ করে যখন এর সত্যতা ছিল। তাদের ঐশ্বরিক কিতাবে তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সব বড় আশীর্বাদ দিয়েছেন তা হল পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের নিয়োগ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 47:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যাকে ইসরাইলও বলা হতো। মহানবী ইয়াকুব (আঃ) যেমন মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন, আহলে কিতাব, তাঁর বংশধরদেরও তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল। এই ভূমিকার একটি দিক ছিল ইসলাম গ্রহণ করা এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন তারা তাঁর মুখোমুখি হয় এবং তাকে যে আসমানী কিতাব দেওয়া হবে, পবিত্র কুরআন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 155-157:

“আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আমাদের নিয়োগের জন্য মনোনীত করেছিলেন সত্তর জন। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, তখন সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি আগে তাদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন? এটা আপনার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম ফয়সালা করুন [যা] ভাল এবং [ও] পরকালে, আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি। [আল্লাহ] বললেন, "আমার শাস্তি - আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দেই, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে।" সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য [বিশেষ করে] নির্ধারণ করব যারা আমাকে ভয় করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে। যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে], যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য যা হালাল করেন। ভাল এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয় যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান

করেছে, তাকে সমর্থন করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করেছে, তারাই সফলকাম হবে।"

কিন্তু তাদের আসমানী কিতাবের সাথে আপোষ করে তাদের অর্জিত পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ ও কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়েছিলেন। এই খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে একটি শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল। মদিনা ত্যাগ করার সময় এই প্রতিনিধিদলের দুই সদস্য আবু হারিথা এবং কুরজ বিন আলকামা একে অপরের কাছাকাছি ছিলেন। আবু হারিথার খচ্চর হোঁচট খেয়েছিল এবং হতাশা থেকে কুর্জ পরোক্ষভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমালোচনা করেছিল। জবাবে আবু হারিথা তার সমালোচনা করেন। যখন কুর্জ তার উত্তর নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন আবু হারিথা তাকে বলেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন, তারা অপেক্ষা করছিলেন এবং তাদের ঐশীতে আলোচনা করা হয়েছিল। ধর্মগ্রন্থ যখন কুর্জ প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন তিনি এই সত্যটি বিশ্বাস করার পরেও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তখন আবু হারিথা উত্তর দিয়েছিলেন যে তাদের লোকেরা তাদের দেওয়া সম্মান, সম্পদ এবং কর্তৃত্বের কারণে তিনি এটি করেছিলেন এবং তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি সবকিছু হারাবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 75-76-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বইয়ের লোকেরা ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ভূমিকায় ব্যর্থ হওয়ায় এই সম্মান ও দায়িত্ব মুসলিম জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

“তোমরা মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ। আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। তাদের মধ্যে ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।”

কিন্তু এই আয়াতে যেমন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, মুসলিম জাতি তখনই সফলভাবে পৃথিবীতে মহান আল্লাহকে প্রতিনিধিত্ব করবে যখন তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি তাদের জন্য মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা বাকি বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু তারা যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ইহকাল ও পরকালে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ অতঃপর কিতাবধারীদেরকে এবং মুসলিম জাতিকে সম্প্রসারণ করে সতর্ক করেন যে, তারা যদি পৃথিবীতে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 47-48:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোনো প্রাণই অপর কোনো প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, তার কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।"

কিতাবধারীরা ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছিল যার ফলে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে পারে এবং পৃথিবীতে তাঁর সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হতে পারে এবং বিচারের দিন তারা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, নবী মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) এর

মতো কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যাতে তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করে। তারা এও বিশ্বাস করেছিল যে তারা তাদের অবাধ্যতার জন্য কেবল ক্ষমা চাইবে এবং মহান আল্লাহ এটিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং তাদের শাস্তি দেবেন না, কারণ তারা নিজেদেরকে তাঁর প্রিয় এবং সন্তান বলে মনে করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

তারা মিথ্যাভাবে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কেবল তাদের সমালোচনা করবে, যেমন একজন বাবা তার সন্তানদের সমালোচনা করে কিন্তু তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া এড়িয়ে যায়।

এই ধরনের ইচ্ছাপূরণের চিন্তা অত্যন্ত অসম্মানজনক কারণ এই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং বর্ণবাদী নন কারণ তিনি কেবল তাদের বংশের কারণে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একগুঁয়ে এবং অবিরাম অবাধ্যতাকে উপেক্ষা করবেন। তারা ধরে নিয়েছিল যে তিনি মন্দ কাজকারী এবং ভাল কাজকারীকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সমানভাবে ব্যবহার করবেন। একজন জাগতিক বিচারকের কঠোর সমালোচনা করা হবে এবং তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে যদি তারা এমন আচরণ করে, তাহলে এই বিচ্যুতিপূর্ণ মনোভাবকে মহান আল্লাহ, সর্বোত্তম, ন্যায়পরায়ণতাকে দায়ী করা যায় কিভাবে? অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

দুঃখজনকভাবে, এই ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে কেউ তাদের কেয়ামতের দিনে রক্ষা করবে, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বা মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কারণ তারা তাদের জাতির থেকে। তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যদিও তারা অবিরাম এবং একগুঁয়েভাবে তাঁর অবাধ্যতা করে। হাশরের দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত হওয়া সত্ত্বেও একটি সত্য, যা অনেক হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, কোনটি কম নয়, একটি অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে এটিকে উপহাস করা উচিত নয় এবং তারপরে তাদের রক্ষা করার জন্য তাঁর সুপারিশের আশা করা উচিত নয়। একজনকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশ সত্ত্বেও, অনেক অবাধ্য মুসলমান এখনও জাহান্নামে যাবে, যদিও তাদের অবস্থান হ্রাস করা হয়। তিক্ত সত্য এই যে, যারা অবিরামভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের ভয় করা উচিত যে তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে না, কারণ তারা মহান আল্লাহর বাস্তবিক আনুগত্যের সাথে সুপারিশ হিসাবে বিশ্বাসের গাছটিকে লালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করা হবে। উপরন্তু, তিনি মহান আল্লাহর ঐতিহ্য কারো জন্য পরিবর্তিত হয় না। মহান আল্লাহ যেভাবে পূর্ববর্তী জাতিদেরকে এই পৃথিবীতে শাস্তি দিয়েছেন এবং তাদের অবিরাম অবাধ্যতার জন্য পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন, একইভাবে মুসলমানরা তাদের মনোভাব ও জীবনধারা অবলম্বন করলে শাস্তি পাবে। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 23:

“আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পথ যা আগে হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর পথে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না।"

আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মৌখিকভাবে ভালোবাসার দাবি করার কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ না কেউ পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে তা প্রমাণ না করে। তার উপর অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তবেই তারা পরকালে যাদেরকে তারা ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি কর্মের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শেষ হবে না। অতঃপর, যেমন কিতাবীরা তাদের নবীদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মহান আল্লাহর রহমতে সত্যিকারের আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। সত্যিকারের আশা সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রচেষ্টার সাথে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও আশীর্বাদ। তার উপর বর্ষিত হোক, এবং যখনই কেউ পাপ করে, তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের আচরণ সংশোধন করে। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করে তার অধিকার আছে তাহলে আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও পরকালে ক্ষমা করবেন। যদিও, ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাকারী অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে এবং এখনও উভয় জগতে ক্ষমা ও আশীর্বাদ পাওয়ার আশা করে। ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা এই জগতে এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকবেন না এবং অনুমান করবেন যে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন আত্মীয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা বন্ধু, বিচারের দিনে তাদের রক্ষা করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তির বংশধর যদি তাদের ভালো কাজের অভাব থাকে তাহলে বিচার দিবসে তাদের কোন উপকার হবে না। সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে । অধ্যায় 80 আবাসা, আয়াত 34-37:

“যেদিন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

একজনকে অবশ্যই সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, এবং তারপর আশা করা যায় যে বিচারের দিনে অন্যরা তাদের উপকার করতে পারবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 48:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, তার কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এমন বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস গ্রহণের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে যে, বিচারের সময় মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করা হবে, যদিও তারা পাপ ও অবাধ্যতার জীবনযাপন করেছে। এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর সাথে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের সময়। কর্মের জবাব দেওয়ার সময় হল পরকাল। দুজনকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি অবাধ্যতা এবং আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবস সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 35:

"...সুতরাং সেদিন তাদের [জাহান্নাম] থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

উপরন্তু, 48 শ্লোক মানুষকে সতর্ক করে যে তারা যে পাপের জন্য অন্যদের দোষারোপ করতে পারবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 48:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য আত্মার জন্য যথেষ্ট হবে না..."

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব কর্মের জন্য দায়ী এবং তাই সেই অনুযায়ী বিচার করা হবে। পাপের কাজকারী এবং যারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানায় তারা উভয়ই তাদের অবাধ্যতার পরিণতির মুখোমুখি হবে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং যারা অবিরামভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে তাদের সঙ্গী হতে হবে, কারণ এটি কেবল তাদের অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। একজনকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের কী আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং কে তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবে কি না। যদি আমন্ত্রণটি ভাল কিছুর দিকে হয় তবে তাদের সাড়া দেওয়া উচিত তবে যদি এটি খারাপ কিছুর দিকে হয় তবে তাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং জড়িতদের সতর্ক করতে হবে, এমনকি যদি তাদের আমন্ত্রণকারীরা তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু হয়। সহজ কথায় যদি কেউ বিচারের দিন শয়তানকে দোষারোপ করলে তাদের

পাপের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, তাহলে অন্য কাউকে দোষারোপ করবেন কীভাবে? অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 28:

"হায়, হায় আমার! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম।"

এবং অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 48:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, তার কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

এই আয়াতটি মানুষকে সতর্ক করে যে অন্যদের উপর অন্যায় করবে না কারণ একজন নিপীড়ক বিচারের দিন তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে বা অন্য কোন পার্থিব উপায়ে, যেমন তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। পরিবর্তে তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচার দিবসে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

এই পৃথিবীতে অবিলম্বে বা সুস্পষ্ট উপায়ে বা তাদের প্রভাব, ক্ষমতা এবং সম্পদের মাধ্যমে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচার ক্ষমতার দ্বারা তাদের কখনই বোকা বানানো উচিত নয়। এই সমস্ত জিনিস এই পৃথিবীতে কাজ করতে পারে কিন্তু শেষ বিচারের দিন তারা অবশ্যই কাজ করবে না. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 48:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, তার কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 49-50

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে তোমাদের [তোমাদের পূর্বপুরুষদের] রক্ষা করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম আযাব দিয়েছিল, তোমাদের [নবজাতক] পুত্রদের হত্যা করে এবং তোমাদের কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর এতে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

আর [স্মরণ কর] যখন আমি তোমার জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম এবং ফেরাউনের লোকদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যখন তুমি তাকিয়ে ছিলে।"

মহান আল্লাহ, তিনি কিতাবের লোকদের দেওয়া কিছু অনুগ্রহ উল্লেখ করে চলেছেন, বিশেষ করে, তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের যে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু যদিও এই অনুগ্রহগুলি তাদের পূর্বপুরুষদের মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাদের ইতিবাচক প্রভাব মদীনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ যদি তাদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা না করতেন, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এখনও মিশরীয় সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে থাকত। মহান আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে উত্সাহিত করার জন্য এই অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত, তাহলে তারা যে আশীর্বাদগুলো তাদের দেওয়া হয়েছিল তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করত, যেমন তাদের দেওয়া আসমানী কিতাব, এবং ফলস্বরূপ তারা অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করত। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়ে কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল নিশ্চিত করা যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করবে তাকে বিচার দিবসে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের জন্য বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতার একটি স্পষ্ট নিদর্শন হল, তারা মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের প্রত্যাশা বা আশা করে না। পরবর্তীতে, তাদের অবশ্যই তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, ভাল কথা বলে বা নীরব থাকার মাধ্যমে। পরিশেষে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 49:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে তোমাদের [তোমাদের পূর্বপুরুষদের] বাঁচিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম আযাব দিয়েছিল, তোমাদের [নবজাতকের] পুত্রদের হত্যা করে এবং তোমাদের কন্যাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল..."*

কেউ তার কর্তৃত্ব এবং তার জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য, যা তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ফেরাউন ইস্রায়েলের সন্তানদের পরাধীন করে এবং তাদের দাসত্বের জীবনে বাধ্য করে। তাদের শক্তি বৃদ্ধি রোধ করার জন্য , তিনি নিয়মিত নবজাত ছেলেদের হত্যা করতেন এবং মিশরীয়দের সেবা করার জন্য মহিলাদের বাঁচতে দিতেন। মহান আল্লাহ, অত্যাচারীদের একটি সাধারণ মনোভাব নির্দেশ করেছেন যারা তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় করে। তারা নিরপরাধ লোকেদের, যেমন শিশুদের ক্ষতি করার অবলম্বন করবে, যাতে মানুষকে ভয় দেখায় যাতে তারা তাদের কর্তৃত্ব এবং তাদের মন্দ পথকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত রাখে। একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে কিভাবে অত্যাচারীরা এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল এবং যুদ্ধের সময়ও আচরণের সঠিক শিষ্টাচার মেনে চলেনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পরিবারের প্রতি এমন আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে তারা ভয়ের মাধ্যমে তাদের পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করার চেষ্টা করে। সম্মান এবং ভয় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। একজন মুসলমানের জন্য এমন আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তাদের আশেপাশের লোকেরা যেমন তাদের সন্তানরা তাদের সম্মান করে তবে তাদের এমন আচরণ করা উচিত নয় যা অন্যদের মধ্যে ভয় ছাড়া আর কিছুই না জাগায়। উপরন্তু, একজন ব্যক্তির সর্বদা পার্থিব লাভের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায় করা এড়িয়ে চলা উচিত, যেমন সম্পদ বা কর্তৃত্ব, কারণ এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি যদি দেখা যায় যে একজন অত্যাচারী এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে, বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং তা অনুসরণ করাকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন তা পাওয়ার জন্য অন্যের উপর জুলুম করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও

কর্তৃত্বের চরম লালসা একজন মুসলমানের বিশ্বাসের জন্য ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা পরিহার করতে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। যদি তারা কর্তৃত্ব বা সম্পদের পদে পরীক্ষিত হয়, তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 49:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে তোমাদের [তোমাদের পূর্বপুরুষদের] রক্ষা করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম আযাব দিয়েছিল, তোমাদের [নবজাতক] পুত্রদের হত্যা করে এবং তোমাদের কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর এতে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ছিল এক মহা পরীক্ষা।"

যেহেতু এই পৃথিবী পরীক্ষা এবং পরীক্ষার জায়গা, তাই যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন কেউ হতবাক হওয়া উচিত নয়। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সর্বোত্তম জিনিসটি বেছে নেন, যদিও তাঁর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচতে পারে না, তাই তাদের ধৈর্যের সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকা। উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই সেই সমস্ত লোকদের মনে রাখতে হবে যারা তাদের চেয়ে বেশি পরীক্ষা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে কারণ এটি তাদের জীবনে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 49:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে তোমাদের [তোমাদের পূর্বপুরুষদের] রক্ষা করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম আযাব দিয়েছিল, তোমাদের [নবজাতক] পুত্রদের হত্যা করে এবং তোমাদের কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর এতে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ছিল এক মহা পরীক্ষা।"

মহান আল্লাহ তাদের ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করার বিষয়টিকেও নির্দেশ করতে পারে। অর্থ, এক্ষেত্রে বড় পরীক্ষা হবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কি না। এর মধ্যে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, যেমন তাদের স্বাধীনতা, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সহজের সময়গুলি প্রায়শই অসুবিধার সময়ের চেয়ে একটি বড় পরীক্ষা এবং পরীক্ষা। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তি সমস্যার মুখোমুখি হন প্রায়শই তাদের বিকল্পগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার কোন বিকল্প নেই। যদিও, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মানে একজনের কাছে অনেক সম্ভাব্য বিকল্প রয়েছে যা তারা অনুসরণ করতে পারে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। এই কারণেই ধনীরা প্রায়শই মহান আল্লাহকে অবাধ্য করে, কারণ তাদের কাছে মাদক ও অ্যালকোহলের মতো অসন্তুষ্ট জিনিসগুলিতে তাদের বেশি প্রবেশাধিকার রয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করতে হবে, যেটি পরামর্শ দেয় যে একজন মুমিন সহজ ও অসুবিধা উভয় সময়েই আশীর্বাদ ও সাফল্য লাভ করবে, কারণ তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, যে আশীর্বাদ তাদের দেওয়া হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। কঠিন সময়ে, তারা ধৈর্য ধরে থাকবে, মৌখিক বা শারীরিকভাবে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলবে এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে, জেনে রাখবে যে তিনি শুধুমাত্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম কী তা বেছে নেন, যদিও তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 50:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম..."*

এটি ছিল হযরত মুসা (আঃ)-কে দেওয়া বহু অলৌকিক নিদর্শনের মধ্যে একটি, যা ইসরাঈলবাসীকে দেখানো হয়েছিল। মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাদের এটি দেখানো হয়েছিল। তাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করা হয়েছিল যাতে তারা নিরাপদে ফেরাউন ও তার বাহিনী থেকে পালিয়ে যেতে পারে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মতো এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা দান করা হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৭০৭৮ নম্বর হাদিসে আলোচিত হয়েছে, এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা। সময় দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং শুধুমাত্র উপস্থিত তারা তাদের সাক্ষী হতে পারে. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা হল পবিত্র কুরআন। অতএব, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং তার উপর কাজ করতে হবে যাতে তারা এটির অগণিত অলৌকিকতার প্রশংসা করতে পারে, যেমন বিমূর্ত জিনিসগুলিকে বাস্তব ধারণায় পরিণত করার ক্ষমতা যা যে কোনও সময় এবং স্থানে যে কোনও ব্যক্তি দ্বারা কাজ করা যেতে পারে। এটি যত বেশি করবে, তাদের বিশ্বাস তত শক্তিশালী হবে। একজনের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তাদের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা তত সহজ হবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এতে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 50:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা আপনার জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম এবং আপনাকে রক্ষা করেছি এবং ফেরাউনের লোকদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যখন আপনি তাকিয়ে ছিলেন।"

এই ঘটনাটি ইসরায়েলের সন্তানদের জন্য এবং তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের জন্য একটি শিক্ষা এবং একটি সতর্কতা ছিল। এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দান করা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং সময়ের মাধ্যমে। ধৈর্য অবলম্বন করার মাধ্যমে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখা, সমস্ত অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ মঞ্জুর করা হয়েছে, এমনকি যদি এই সময়ে এটি অসম্ভব বলে মনে হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর মত মহান আল্লাহ তাকে উভয় জগতেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে,

যদিও তাদের কাছে এই দুনিয়ার শাস্তি দৃশ্যমান না হয় বা খুব অসম্ভাব্য মনে হয়। তার ক্ষমতা ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুই তাকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব, একজনকে কখনই আপাত পরিস্থিতির দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় এবং এর পরিবর্তে দৃঢ়ভাবে মহান আল্লাহর ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের রক্ষা করা এবং যারা তাঁর অবাধ্য তাদের শাস্তি প্রদান করে। কিতাবের লোকেরা এই পাঠটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে অনেকেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। কিতাবের লোকেরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে ফেরাউনের ক্ষমতা ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন মহানবী মুসা (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তখন তিনি ধ্বংস হয়েছিলেন এবং যদি তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তার উপর, তারাও শাস্তি পাবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের বিরোধিতা করার এই মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যদিও তারা মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাস করার দাবি করে। এটি তখন ঘটতে পারে যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে তারা অন্যদের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ অনেক লোক তাদের কারণে ইসলাম গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 50:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা আপনার জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম এবং আপনাকে রক্ষা করেছি এবং ফেরাউনের লোকদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যখন আপনি তাকিয়ে ছিলেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে অবশ্যই পর্যবেক্ষক হতে শিখতে হবে। মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য তাদের সংকল্পকে দৃঢ় করার জন্য তাদের অবশ্যই অন্যদের আচরণ এবং তাদের আচরণের পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, মনের শান্তি এবং সাফল্য কেবল এতেই নিহিত রয়েছে। একজনকে অবশ্যই একটি আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্ম-শোষিত মনোভাব গ্রহণ করা এড়াতে হবে যাতে তারা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের আচরণ থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করতে উত্সাহিত করবে যখন তারা অন্যদের তাদের চেয়ে কঠোর অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 51-52

وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ٥١

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াজ করেছি। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে [উপাসনার জন্য] গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।

অতঃপর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

মহান আল্লাহ, হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে তাঁর এবং তাঁর জাতির জন্য আরও জ্ঞান ও নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাঁর সাথে একান্ত আলাপচারিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। মহানবী মূসা (আঃ) কে চল্লিশ দিন ধরে এই ঐশী সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল তা আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ধীরে ধীরে ব্যক্তির আচরণ ও আচরণের উন্নতির গুরুত্ব নির্দেশ করে। অর্থ, মহান আল্লাহ কাউকে রাতারাতি সাধু হওয়ার দাবি করেন না। বরং তিনি আশা করেন মানুষ ধীরে ধীরে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখবে এবং তাতে কাজ করবে, যাতে তারা তাঁর এবং মানুষের প্রতি ধাপে ধাপে তাদের আচরণ উন্নত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 51:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিলাম..."

পবিত্র কুরআনকে একযোগে নাজিল করে পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 32:

"...এভাবে [এটি] যাতে আমরা এর দ্বারা আপনার হৃদয়কে শক্তিশালী করতে পারি। এবং আমরা এটি স্পষ্টভাবে ব্যবধান করেছি।"

মহান আল্লাহ তখন উল্লেখ করেছেন যে কতজন ইসরাঈল বনী ইসরাঈল থেকে একটি সোনার বাছুরকে পূজা করতে শুরু করেছিল যা তাদের মধ্যে একজন মহানবী

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিদায়ের পর মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য তৈরি করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 51:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াজ করেছি। অতঃপর তুমি তার পরে [তার প্রস্থান] বাছুরটিকে [পূজা করার জন্য] গ্রহণ করেছিলে..."

মুসলমানদের অবশ্যই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এই ধরনের আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, এখন তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তার শিক্ষাকে উপেক্ষা করে। এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তার প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে হবে, যা সহীহ মুসলিমের 196 নম্বর হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি দিক , তাকে যে দুটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা শিখে এবং কাজ করে: পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 51:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াজ করেছি। অতঃপর তুমি তার পরে [তার প্রস্থান] বাছুরটিকে [পূজা করার জন্য] গ্রহণ করেছিলে..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল যে সোনার বাছুরটি একটি প্রাণহীন বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় যা তাদের চোখের সামনে একজন মানুষ তৈরি করেছিল। এর কোনো ঐশ্বরিক গুণ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে এর কোনো প্রশংসনীয় গুণ ছিল না, তবুও তারা এর পূজা করতে শুরু করে। সত্য হল যে একটি মিথ্যা দেবতার প্রত্যেক উপাসক, দেবতা একটি মূর্তি, একটি ধারণা বা অন্য কিছু, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন বা সংস্কৃতি, শুধুমাত্র তাই করে কারণ এটি তাদের উচ্চতর জীবনযাপনের পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেয়। আচরণবিধি যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সীমিত করতে শেখায় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। একটি মিথ্যা দেবতা, যেমন একটি মূর্তি, হয় তার উপাসকদের জন্য কোন আচরণবিধি প্রদান করবে না যার ফলে তারা তাদের নিজেদের তৈরি করতে অনুমতি দেবে, যা তাদের ইচ্ছা পূরণ করে । বা মিথ্যা দেবতা, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা মানুষকে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে উত্সাহিত করে। যেভাবেই হোক, ইস্রায়েলের সন্তানদের মতোই কেউ তাদের নিজেদের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই পূজা করছে না। সোনার বাছুরটি কোনও বিধিনিষেধ মুক্ত একটি জীবনধারার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের প্রশ্ন বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করার অনুমতি দেয়। এই বাস্তবতা 7 অধ্যায় আল আরাফ, 148 আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং মূসার লোকেরা [তাঁর প্রস্থানের পর] তাদের অলঙ্কার থেকে একটি বাছুর তৈরি করেছিল - একটি মূর্তি যার একটি নিচু শব্দ ছিল। তারা কি দেখেনি যে, এটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদের কোন পথ দেখাতে পারে না? তারা এটাকে [উপাসনার জন্য] গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল অন্যায়কারী।"

তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে এটি তাদের উচ্চতর আচরণবিধি দ্বারা কথা বলতে বা গাইড করতে পারে না যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে তবে তারা

ঠিক এটাই চেয়েছিল। তারা তাদের নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করতে চেয়েছিল যা তাদের বাধা ছাড়াই তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়। এই বাঁকানো মনোভাবই তাদের অন্যায় করে তুলেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 51:

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াজ করেছি। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে [অর্থাৎ তার প্রস্থানের জন্য] গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।"

তারাও অন্যায়কারী ছিল কারণ তারা সম্প্রতি হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত অনেক অলৌকিক ঘটনা এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা এবং লক্ষণগুলি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা উচিত ছিল এবং তাই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য, তবুও তারা তা পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষার পূজা করেছিল।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব পরিহার করতে হবে যাতে তারা মৌখিকভাবে ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই পূজা করে না। এটি ঘটে যখন কেউ স্বেচ্ছায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার না করে নিজের, অন্যান্য লোকেদের, সামাজিক মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। এটাই হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তার ইবাদত করা এবং নিজের ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এই মনোভাব পরিহার করতে হবে, যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একটি ভাল উদ্দেশ্যের সাথে দৃঢ় বিশ্বাস, একজনকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করবে।

বনী ইসরাঈলের আচরণ সত্ত্বেও, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 52:

"অতঃপর আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

এটি মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও ক্ষমাকে নির্দেশ করে। তারা যে পাপ করেছে তা সত্ত্বেও একজনকে কখনই তাঁর ক্ষমার আশা হারাতে হবে না। কিন্তু 52 নং আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজনকে অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করা এড়িয়ে চলতে হবে, যার ফলে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, যখন তারা মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও ক্ষমা তাদের মঞ্জুর

করা হবে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করতে হবে, যার মধ্যে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। আবার গুনাহ করা এবং আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যে কোনো অধিকার পূরণ করা এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা, শ্রেষ্ঠ এই সমস্তই আন্তরিক অনুতাপ এবং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 51-52:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছিলাম। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম। অতঃপর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

উপসংহারে, মহান আল্লাহ, কিতাবের লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কীভাবে তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের শিরক করার পরে ক্ষমা করেছিলেন, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবধারীরা সেই পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে গর্ব করত এবং পরিপূর্ণতাকে দায়ী করত। বইয়ের লোকেরা তাই মহান আল্লাহর ক্ষমার রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই তাদেরকে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাদের ক্ষতিকর মনোভাবের জন্য এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য

উত্সাহিত করা হয়েছিল। ইসলাম জেনেও এটা তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত সত্য। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে.."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তথাপি মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের প্রতি এই আহবান সত্ত্বেও, কিতাবের অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে অটল ছিলেন কারণ ইসলাম মধ্যপন্থী হবে এমন সমস্ত জাগতিক বাসনা পূরণের ভালবাসা তাদের এই ভালবাসাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল যেমনটি তাদের অতিক্রম করেছিল। পূর্বপুরুষ এবং তাদের উত্সাহিত করেছিলেন একটি প্রাণহীন বস্তুর পূজা করতে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা যদি একই আচরণ করে তবে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা তাদের একজন হিসাবে গণ্য হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 51:

“ হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের সহযোগী। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের মিত্র হয়, তবে সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 53

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মাপকাঠি দিয়েছিলাম যাতে আপনি সৎ পথে চলে যেতে পারেন।"

মহান আল্লাহ, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মহান অনুগ্রহের গ্রন্থের কথা যা তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন এবং তাওরাতের আকারে তাদের জন্যও। ধর্মগ্রন্থে সেই আইন ও বিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মহান আল্লাহ ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এই আইনগুলি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে সমাজে শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের তৈরি আইন সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং একদল লোককে অন্যদের উপর পক্ষপাত করবে যেখানে ঐশ্বরিক আইন এটি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত যা একটি সমাজকে ন্যায়বিচার ও শান্তি অর্জনে বাধা দেয়। একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে এবং সেই সমাজগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা ঐশ্বরিক আইনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিল এবং এর ফলে তারা যে শান্তি ও ন্যায়বিচার উপভোগ করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 53:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মানদণ্ড দিয়েছিলাম ..."

তাওরাত একটি মানদণ্ডের অর্থও ছিল, যখন কেউ শিখেছিল এবং এর শিক্ষার উপর কাজ করেছিল তখন তারা তাদের জন্য কী উপকারী এবং কোনটি ক্ষতিকর, প্রকৃত সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে এবং শান্তির পথ এবং উদ্বেগের পথের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। উভয় জগতে।

যখন উভয় উপাদান একত্রিত হয়, অর্থ, সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করা এবং তাওরাতের শিক্ষাগুলি ব্যবহার করে শান্তির জীবন এবং দুঃখের জীবনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তখন একজন সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 53:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মাপকাঠি দিয়েছিলাম যাতে আপনি সৎ পথে চলে যেতে পারেন।"

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদেরকে তাওরাতের সঠিক ও অপরিবর্তিত শিক্ষা মেনে চলার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা তাদের কাছে ছিল। এর মধ্যে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করা এবং স্বীকার করা অন্তর্ভুক্ত ছিল যখন তারা এটির মুখোমুখি হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু বইয়ের অধিকাংশ লোক ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভালবাসার কারণে তাওরাতের অপরিবর্তিত শিক্ষাগুলিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা জানত যে এর আইন অনুসারে জীবনযাপন করা এবং মানদণ্ড প্রাপ্ত করা তাদের কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পরিচালিত করবে । কিন্তু এটি তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করায় তারা আইন পরিবর্তন করে এবং মানদণ্ড পেতে অস্বীকার করে।

মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের আইন ও বিধিবিধান উপেক্ষা করে এবং এটি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে যে মানদণ্ড অর্জন করা যায় তা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে এই আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"রমজান মাসই [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং পথপ্রদর্শক ও মাপকাঠির সুস্পষ্ট প্রমাণ..."

যদি একটি সমাজ পবিত্র কুরআনের আইন ও বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে তবে তার সর্বত্র অন্যায় ছড়িয়ে পড়বে, কারণ মহান আল্লাহ একাই পক্ষপাত থেকে মুক্ত এবং একটি সমাজের জন্য কোনটি সর্বোত্তম তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। একজন মুসলমান যদি পবিত্র কুরআন শিখতে ও তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা মাপকাঠি পাবে না এবং ফলস্বরূপ তারা ভালো থেকে খারাপ, সফলতা থেকে ব্যর্থতা এবং দুশ্চিন্তার পথ থেকে শান্তির পথের পার্থক্য করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, অন্যদের ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং

সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে পছন্দ করবে যা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। এতে উভয় জগতে অন্ধকারময় জীবনের দিকে পরিচালিত হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যেখানে পবিত্র কুরআনের আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নকারী সমাজ শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভ করবে যেখানে সকল মানুষের অধিকার পূর্ণ হবে এবং সমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী সকল প্রকার বিপথগামী সামাজিক বাধা দূর হবে। এবং যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শিখবে এবং তার উপর আমল করবে সে ভালো-মন্দ, শান্তি ও সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা অর্জন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পরিচালিত হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 53:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মাপকাঠি দিয়েছিলাম যাতে আপনি সৎপথে চলে যেতে পারেন।"

এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 53:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মাপকাঠি দিয়েছিলাম যাতে আপনি সৎপথে চলে যেতে পারেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, পার্থিব জ্ঞানই এই পৃথিবীতে একজনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও কিছু পার্থিব জ্ঞান উপকারী কারণ এটি একজনকে তাদের বৈধ বিধান সঠিকভাবে পেতে সহায়তা করে, তবুও, কেউ তার পার্থিব জ্ঞানকে তাদের জীবনের অন্যান্য দিক যেমন তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না এবং অধিকার অর্জন করতে পারে না। নির্দেশিকা একজনের কাছে যতই পার্থিব জ্ঞান থাকুক না কেন, এটি তাদের আইন ও প্রবিধানগুলিকে অনুমান করার ক্ষমতা প্রদান করবে না যে সমাজকে অবশ্যই জীবনযাপন করতে হবে, কারণ তাদের মতামত এবং পছন্দগুলি সর্বদা এক ধরণের পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হবে

এবং সমাজের সম্পূর্ণ বোঝার অভাবের কারণে। এবং মানব প্রকৃতি, তারা সেরা নিয়ম এবং প্রবিধান নির্বাচন করতে সক্ষম হবে না. উপরন্তু, একজনের পার্থিব জ্ঞান তাদের এমন মানদণ্ড প্রদান করবে না যা তাদের প্রকৃত সাফল্য এবং ব্যর্থতা এবং চাপের পথ থেকে শান্তির পথের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয়। একমাত্র আল্লাহ যিনি সব কিছু জানেন, মহান আল্লাহ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস, তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তাই পবিত্র কুরআন এবং এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে তা চাইতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

উপরন্তু, আয়াত 53 এটাও স্পষ্ট করে যে, পবিত্র কুরআনে পাওয়া ঐশী জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলা ছাড়া সঠিক পথনির্দেশনা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে এমন সব কাজ এবং প্রথাগত অভ্যাস যা এই দুটি নির্দেশনার উৎসের মূলে নেই, এমনকি যদি সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে করা হয়। সত্যটি হল যে অন্য জিনিসের উপর যত বেশি কাজ করবে, এমনকি যদি সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে করা হয়, তবে তারা তত কম শিখবে এবং নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে। এবং আয়াত 53 এ নির্দেশিত হিসাবে, যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 53:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও মাপকাঠি দিয়েছিলাম যাতে আপনি সৎপথে চলে যেতে পারেন।"

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে সঠিক দিকনির্দেশনা শুধুমাত্র ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক দাবি করা তাই সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না এটি কর্ম দ্বারা সমর্থিত হয়। একটি মানচিত্র যেমন কার্যকর হয় না যতক্ষণ না এটি বাস্তবে কার্যকর করা হয়, তেমনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যেও ঐশ্বরিক জ্ঞান পাওয়া যায় না, কারণ নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে একটি ব্যবহারিক যাত্রার ইঙ্গিত দেয় শুধু একটি নয়। বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 54

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা [ইবাদতের জন্য] বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হও এবং নিজেদেরকে হত্যা কর [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে অপরাধী]। তোমার সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।" অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

মহানবী মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে যেভাবে সম্বোধন করেছিলেন তাতে কেউ আন্তরিকতা অনুভব করতে পারে, যদিও তারা সোনার বাছুরকে উপাসনার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর অবাধ্য হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ..."*

হাদিস অনুসারে, অন্যদের প্রতি এই ধরনের আন্তরিকতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। তাদের প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। এটি সহীহ বুখারী, 13 নম্বর একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ..."*

বনী ইসরাঈলরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের চোখের সামনে যে সোনার বাছুরটি মানুষের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল তা পূজার যোগ্য নয়। সোনার বাছুরটি যা তাদের উপাসনা করতে প্রলুব্ধ করেছিল সেটাই। সোনার বাছুরটি একটি নিষ্প্রাণ বস্তু হওয়ার কারণে তাদের জীবনযাপনের জন্য একটি উচ্চতর আচরণবিধি প্রদান করা সম্ভব ছিল না যা তাদেরকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করে। এটি তাদের নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করার অনুমতি দেবে, যা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে তারা সমাজের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক দেখাতে গিয়ে তাদের সমস্ত জাগতিক ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। এই বাস্তবতা প্রতিটি মিথ্যা দেবতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা সে মূর্তি, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা সমাজ যাই হোক না কেন। যে এইভাবে আচরণ করে সে পশুর মতো তাদের কামনা-বাসনার পূজা করে। অধ্যায় 45 এ; জাথিয়াহ, আয়াত 23:

" আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার [নিজের] ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

এই মনোভাবটিই প্রাথমিক কারণ যে কারণে অনেক অমুসলিম ক্রমাগত এবং গঠনমূলকভাবে ইসলামের সমালোচনা করে কারণ এটি মানুষকে একটি উচ্চতর আচরণবিধির দ্বারা জীবনযাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করে তাদের নির্দেশ দেয় যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা লাভ করে। মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। কিন্তু এই লোকেরা সমাজের বাকি অংশের কাছে পশুর মতো না দেখায় পশুর মতো বাঁচতে চায় বলে তারা নিরলসভাবে ইসলামের সমালোচনা করে।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপাসনা এড়াতে হবে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করাই উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। একজন ডাক্তার যেমন তেতো ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে তাদের অসুস্থ রোগীর ইচ্ছাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করে , ইসলামও তাই করে। একইভাবে একজন রোগী যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে, একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখতে ও আমল করতে ব্যর্থ হবে। মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, এবং তাই তিনি বেছে নেন কাকে মানসিক শান্তি দেওয়া হবে এবং কারা মানসিক সমস্যায় ভুগছে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

" এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

যারা ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করবে তারা বিনোদন ও মজার মুহূর্তগুলো উপভোগ করবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা নিঃসন্দেহে দুর্বিষহ জীবনযাপন করবে। তারা যে জিনিসগুলি পেয়েছে তা কেবল তাদের চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার উত্স হয়ে উঠবে। এই বিশ্বের সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।”

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজনকে অবশ্যই এই সহজ শিক্ষা এবং এই বিশ্বের মানুষদের প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে যারা ইসলামের শিক্ষা এবং তাদের পছন্দের ফলাফলকে উপেক্ষা করেছে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে। , যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্যে বর্ণিত

হয়েছে, যাতে তারা উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। পৃথিবী অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার কওম, তোমরা [ইবাদতের জন্য] বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ"।

এই আয়াতটি মানুষকে সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা শুধুমাত্র নিজের ক্ষতির কারণ হয়, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি উভয় জগতেই তাদের অবাধ্যতার পরিণতি ভোগ করবে। এই দুনিয়ায় মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যা অর্জন করে, তা তাদের জন্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং পরবর্তী জগতে যা আসবে তা হবে আরও বিপর্যয়কর। এই কারণেই যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে তারা দুঃখজনক জীবনযাপন করে, যদিও তাদের পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। উপরন্তু, যখন কেউ অন্য লোকেদের উপর অন্যায় করে এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তখন তারা এই পৃথিবীতে চাপের সম্মুখীন হবে এবং বিচারের দিন তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের

কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, যখন কেউ অন্যের ক্ষতি করে তখন সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

“যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; এবং যে মন্দ কাজ করে, এটা তার [আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা [ইবাদতের জন্য] বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হও এবং নিজেদেরকে হত্যা কর [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে অপরাধী]। তোমার সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।" তারপর তিনি আপনার তওবা কবুল করলেন..."

নিজেদেরকে হত্যা করা বলতে বোঝায় যারা সোনার বাছুরের পূজা করার জন্য দোষী ছিল তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এটি এই পদ্ধতিতে বলা হয়েছিল যে তারা একক এবং পরিবার যদিও তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং খুব ভিন্ন জীবনযাপন করে। এটি মুসলমানদের

মনে করিয়ে দেয় যে তারা অন্যরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় তাদের সাথে আচরণ করে একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে। একজনকে অবশ্যই অন্যদের জন্য ভাল কামনা করতে হবে যেমন তারা নিজের জন্য এটি কামনা করে। এটি কেবল কথার মাধ্যমে নয় একজনের কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে।

যদিও কিছু ইসরাঈল সোনার বাছুরকে পূজা করেছিল তবুও তাদের সবাইকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। যারা সোনার বাছুরের পূজা করেনি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি সমাজের মধ্যে ভাল আদেশ এবং মন্দ নিষেধের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ সমাজের প্রতিটি সদস্য সাধারণ জনগণের কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। সহীহ বুখারী, ২৬৮৬ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, এই বাস্তবতা দুটি স্তর বিশিষ্ট একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত না করতে চায় তাই তারা সরাসরি জলে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য নৌকায় একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় । উপরের স্তরের লোকজন যদি এদের ঠেকাতে না পারে তাহলে সবাই ডুবে যাবে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদেরকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দেওয়া এবং মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং তবেই তারা উভয় জগতের সমাজের নেতিবাচক পরিণতি থেকে নিরাপদ থাকবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা [ইবাদতের জন্য] বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হও এবং নিজেদেরকে হত্যা কর [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে অপরাধী]। তোমার সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।" তারপর তিনি আপনার তওবা কবুল করলেন..."

এই শাস্তি কঠোর মনে হতে পারে তবে এটি তাদের জন্য উপযুক্ত ছিল কারণ তারা খুব সম্প্রতি স্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যা হযরত মুসা (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল, যেমন তাঁর লাঠি একটি বিশাল সাপে পরিণত হয়েছিল এবং তারা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করেছিল। একটি অলৌকিক ঘটনায় ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর ডুবে যাওয়া। যেহেতু তারা এই ঘটনাগুলো শারীরিকভাবে প্রত্যক্ষ করেছে তাই তাদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পড়ার কোন কারণ ছিল না, বড় পাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল শিরক। এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত ছিল যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। মুসলমানদের অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ পবিত্র কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য তাদের দেওয়া হয়েছে। তাদের উপর অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে তাদের ঈমান মজবুত হবে এবং এর ফলে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত হবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা [ইবাদতের জন্য] বাছুর গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হও এবং নিজেদেরকে হত্যা কর [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে অপরাধী]। তোমার সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।" তারপর তিনি আপনার তওবা কবুল করলেন..."

এই শাস্তি মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম বিচার ছিল, কারণ যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তারা মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে এবং যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা এই আচরণের পুনরাবৃত্তি এবং এমনকি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকেও কঠোরভাবে নিবৃত্ত হবে। , অন্যান্য বিষয়ে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতের সাথে জড়িত প্রত্যেকের জন্য সুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। তাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বদাই বাছাই করেন যেটি প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর পছন্দের পিছনের

জ্ঞানগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে যাতে তারা যাই হোক না কেন তার আনুগত্য থেকে বিরত না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মহান আল্লাহকে তাদের স্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল কারণ এটি একটি শক্তিশালী অনুস্মারক ছিল যে তাদের একজন তৈরি করা বস্তুর উপাসনা করার পরিবর্তে তাদের স্রষ্টা, মহান আল্লাহকে উপাসনা করা এবং আনুগত্য করা উচিত ছিল। কীভাবে কেউ নিজের হাতে মূর্তি তৈরি করে তারপর তাকে তাদের দেবতা বলে ঘোষণা করতে পারে? এমনকি যদি দেবতার আত্মা মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করে তবে এর অর্থ হবে যে দেবতা এটিকে একটি দেহ তৈরি করার জন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল। একজন প্রকৃত দেবতা অন্য কারো উপর নির্ভরশীল নয় এবং প্রকৃতপক্ষে অন্য সকলেই তার উপর নির্ভরশীল।

বনী ইসরাঈল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার পর এবং যারা সোনার বাছুরের উপাসনায় পড়েছিল তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পর, মহান আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারোর কাছে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা থেকে

বিরত থাকবে। এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করুন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 54:

"...নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

মদিনায় বসবাসরত কিতাবধারীদের পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ক্ষতিকর আচরণ সত্ত্বেও, যদিও তারা স্পষ্টভাবে তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছিল, যা তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল, মহান আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সত্য যে তিনি সব ক্ষমাশীল যাতে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হতে উত্সাহিত হয়। তবে তাদের অনেকেই এই সুযোগটি গ্রহণ করেনি এবং পরিবর্তে ইসলাম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরোধিতা করতে থাকে। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একজনকে তার পাপের জন্য অবিলম্বে শাস্তি না দেওয়া তার মানে এই নয় যে তারা মোটেও শাস্তি পাবে না। এই সুযোগগুলি ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এবং তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগগুলি গ্রহণ করতে হবে, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে তাদের পথ সংশোধন করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 42:

"আর কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তাদের কেবল সেই দিনের জন্য বিলম্বিত করেন যেদিন চোখ তাকাবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 55-56

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব"; তাই বজ্রপাত আপনাকে নিয়ে গেল যখন আপনি তাকিয়ে ছিলেন।

অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

এই আয়াতগুলো সেই গর্বকে প্রতিফলিত করে যা ইস্রায়েলের কিছু সন্তানের মধ্যে ছিল। যখন তারা লোকেদের ভাল বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছিল, তারা প্রশ্ন করেছিল যে কেন হযরত মুসা (আঃ)-কে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার এবং তাঁর বাণী বহন করার সম্মান দেওয়া হয়েছিল। যদি তারা তার উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করত তাহলে তারা এমন অসম্মানজনক দাবি করত না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 55:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাব*"...

যেকোন মূল্যে অহংকার পরিহার করতে হবে কারণ একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকারী ব্যক্তি অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে যে তারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে যদিও তারা মহান আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। তারা তাদের মূর্খ বিশ্বাসের ভিত্তি জাগতিক মান, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার উপর ভিত্তি করে। একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে যে একজন ব্যক্তি কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, যেহেতু একজন ব্যক্তি সচেতন নয় যে তারা বা অন্য কেউ একজন মুসলিম হিসাবে মারা যাবে কি না, তাই তাদের অবশ্যই বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা যে ভালো কাজগুলোই করুক না কেন তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের যা কিছু আছে এবং প্রত্যেকটি ভাল কাজ যা তারা করে তা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ তিনি একাই একজনকে সুযোগ, শক্তি, অনুপ্রেরণা, জ্ঞান এবং সৎ কাজ করার বা অর্জন করার ক্ষমতা প্রদান করেন। একটি পার্থিব আশীর্বাদ।

অহংকারও একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। হযরত মূসা (আঃ) এর অনেক অলৌকিক ঘটনা এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর অলৌকিক ধ্বংসের দৈহিকভাবে বনী ইসরাঈল প্রত্যক্ষ করেছে তথাপি হযরত মুসা (আঃ)-এর আচরণবিধি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী করে এনেছিল। এটি এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 55:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাব"...*

মুসলমানদের অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং তার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে

শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করতে হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

বনী ইসরাঈলের অহংকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও, মহান আল্লাহ তাদেরকে বারবার আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের পথ সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 55-56:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব"; তাই বজ্রপাত আপনাকে নিয়ে গেল যখন আপনি তাকিয়ে ছিলেন। অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

মানুষকে কখনোই এই সত্যের দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহর শাস্তি সর্বদা মানুষের কাছে স্পষ্ট নয় এবং তা অবিলম্বে আসে না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

"এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীই ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

তাই তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের পথ সংশোধন করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের অনেক সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙঘন করা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সর্বাবস্থায় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে । তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভাল কাজ করবে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার আশা বা আশা করা উচিত নয়। তাদের অবশ্যই ভাল কথা বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং পরিশেষে তাদের অবশ্যই পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে কৃতজ্ঞতার সাথে আন্তরিক অনুতাপকে একত্রিত করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 55-56:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব"; তাই বজ্রপাত

আপনাকে নিয়ে গেল যখন আপনি তাকিয়ে ছিলেন। অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এটি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ, যে ব্যক্তি অগণিত সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ মানুষকে প্রসারিত করেন যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করতে পারে, তখন তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য চাপ এবং

উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি তাদের জন্য কিছু মুহূর্তও। মজা এবং বিনোদনের। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।”

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

সামগ্রিকভাবে, তারা এই পৃথিবীতে একটি দুঃখজনক এবং হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করবে এবং এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 57

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

"এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।" এবং তারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেনি - বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল।"

মহান আল্লাহ তাদের পূর্বপুরুষদের উপর এবং তাদের উপর বর্ধিতকরণের মাধ্যমে কিতাবের লোকদেরকে তিনি যে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বনী ইসরাঈলরা যখন মরুভূমিতে ছিল, ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর ধ্বংসের পর, মহান আল্লাহ তাদের জন্য অবিরাম ছায়া এবং রিযিকের ব্যবস্থা করেছিলেন যা তাদের কাছে ন্যূনতম প্রচেষ্টায় পৌঁছেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

" এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।"...

সূর্যের তাপ থেকে অবিরাম ছায়া আল্লাহর রহমতের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সর্বদা এই পৃথিবীর মানুষকে ছায়া দিচ্ছে। রহমত যা তাদের ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা করে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হয় এবং এটি তাদের উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এবং তিনি সৃষ্টিকে যে বিধান প্রদান করেন তার মধ্যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। সর্বাবস্থায় আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এই দুটি নির্দিষ্ট নেয়ামতই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। কৃতজ্ঞতার মধ্যে একজনকে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করাও অন্তর্ভুক্ত করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোন পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা কামনা না করে। এর সাথে ভালো কথা বলা বা চুপ থাকাও জড়িত। এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং এটি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু কেউ যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তবে তারা কেবল নিজের উপর জুলুম করছে, কারণ তাদের কর্মের পরিণতি উভয় জগতেই তাদের উপর ফিরে আসবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

"এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি

তা থেকে খাও।" এবং তারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেনি - বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল।"

মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে সমস্ত পার্থিব জিনিস পাওয়া যায়, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের কিছু মুহূর্ত লাভ করতে সক্ষম হয়। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

"..."আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।"...

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানুষকে সেই বিষয়ে উপদেশ দেন যা উভয় জগতে তাদের জন্য ভালো। তিনি কেবল সেই জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন যা একজন ব্যক্তির জন্য তার মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল গ্রহণের অনেক নেতিবাচক পরিণতি বোঝার জন্য একজনকে ডাক্তার হতে হবে না। অল্প বা বেশি পরিমাণে পান করলে এটি শুধুমাত্র মানসিক এবং শারীরিক সমস্যাই সৃষ্টি করে না, বরং অনেক সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি করে যা প্রায়ই সহিংস অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

“যারা রসূল, নিরক্ষর নবীকে অনুসরণ করে, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে] দেখে, যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য হালাল করেন। যা ভালো এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয়..."

যারা মহান আল্লাহর হুকুম ও নিষেধ মেনে চলে, তারা দুর্বল মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের বোঝা ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

অথচ যারা মহান আল্লাহর হুকুম ও নিষেধ পরিত্যাগ করে এবং তার নিষেধের পরিবর্তে ক্ষতিকর জিনিসে লিপ্ত হয়, তারা অগণিত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত হবে এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই দুর্বিষহ জীবনযাপন করবে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

"..." আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে আহার কর।" এবং তারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেনি - বরং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।"

জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন তাদের চিকিৎসকের কথা শোনে এবং মেনে চলে, যিনি তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে দেন, যেমন এটি ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মহান, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ

আল্লাহর নির্দেশ শুনবেন এবং মেনে চলবেন। , উভয় জগতে ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করার জন্য। যেহেতু মহান আল্লাহ আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তাই এটা অকল্পনীয় যে একজন ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হয়ে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

উপরন্তু, 57 নং আয়াতে উল্লিখিত ভাল জিনিস থেকে খাওয়ার মধ্যে কেবলমাত্র যা বৈধ তা প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা, অন্যদিকে ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যদি এর মধ্যে একটি বা উভয়ই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তবে একজনের সমস্ত কাজই কলুষিত হবে এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

"এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।" এবং তারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেনি - বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল।"

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে, তাদের পূর্বপুরুষদের মতো তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন না করার জন্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এই সতর্কবার্তাটি বধির কানে পড়েছিল, কারণ তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও তার বিরোধিতা করতে থাকে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মুসলমানদের অবশ্যই একই আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

“…তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি আলো এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব [অর্থাৎ, কুরআন]। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 58-59

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্যের সাথে এবং দরজায় প্রবেশ কর বিনীতভাবে এবং বল, 'আমাদের বোঝা [অর্থাৎ, পাপ] থেকে মুক্তি দাও।' আমরা [তাহলে] আপনার জন্য আপনার গুনাহ মাফ করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের [সৎকর্ম ও পুরস্কারে] বৃদ্ধি করব।

কিন্তু যারা যুলুম করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য কথায় পরিবর্তন করেছিল, তাই আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে শাস্তি [অর্থাৎ প্লেগ] নাযিল করেছি।"

মহান আল্লাহ কিতাবের লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের অনেক নেয়ামত দিয়েছিলেন এবং কিভাবে এই নেয়ামতগুলো অকৃতজ্ঞতার সাথে পূরণ হয়েছিল। তিনি মদিনায় বসবাসরত কিতাবদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের আচরণ এড়াতে এবং তার পরিবর্তে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য সতর্ক করছিলেন। এর মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতার একটি ইঙ্গিত হল যে তারা মানুষের কাছ থেকে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতার আশা করবে না বা আশা করবে না। যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করবে তাকে বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যখন কেউ ভালো কথা বলে বা চুপ থাকে তখন জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে নিজের কাজের সাথে কৃতজ্ঞতা দেখানো হয়। এই কৃতজ্ঞতার একটি দিক ছিল মদিনায় বসবাসকারী কিতাবধারীদের মহান আল্লাহকে দেখানো উচিত ছিল যখন ইসলাম তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা এর সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেয়। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 58:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্য..."

ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈলকে এমন একটি শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেটি মহান আল্লাহ তাদের জন্য মনোনীত করেছিলেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে। এই আয়াতগুলিতে এই শহরের নামকরণ করা হয়নি কারণ এই আয়াতগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি শেখায় তা শেখার জন্য এই তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক নয়। তাই একজনকে সর্বদা প্রাসঙ্গিক তথ্য গবেষণা ও অধ্যয়নের লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াতে সাহায্য করবে এবং বিচার দিবসে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে সেসব বিষয়ে অধ্যয়ন ও কাজ করতে হবে। উপরন্তু, এই আয়াতটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী উভয় জগতের আশীর্বাদ লাভ করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

" এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

ইসরায়েলের সন্তানদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তারা অত্যাচারী জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করার পরে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করবে যা সেই সময়ে সেই শহরে শাসন করছিল। তাই বুঝতে হবে যে, তারা যেমন প্রকৃত প্রচেষ্টা ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, তেমনি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম না করে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের আকারে আধ্যাত্মিক সাফল্যও পাবে না। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান তাদের বিনোদনের জন্য এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় এবং শক্তি খুঁজে পায় কিন্তু ইসলামী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার জন্য কোন সময় বা শক্তি খুঁজে পায় না যাতে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যদি একজন মুসলিম ন্যূনতম প্রচেষ্টা করা বেছে নেয়, যার মধ্যে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন জড়িত, তাহলে তারা সেই অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে। কিন্তু তারা যদি উভয় জগতের অধিক বরকত কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম অলসদের জন্য নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 58:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্য..."

অ্যালান, মহিমান্বিত, তাদেরকে সেই শহরে বসবাসকারী অত্যাচারী জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের আগেই বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের কাছ থেকে তাদের ঈমানের দাবীকৃত ত্যাগ স্বীকার করতে চায়নি এবং শুধুমাত্র তাদের পার্থিব বাসনা পূরণ করে জীবন যাপন

করতে চায়, তাই তারা মহান আল্লাহ ও হযরত মুসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 21-26:

" হে আমার কওম, বরকতময় ভূমি [অর্থাৎ ফিলিস্তিনে] প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং [আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে] পিছু হটবেন না এবং [এভাবে] ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না।" তারা বলল, হে মূসা, অবশ্যই এর মধ্যে তারা অত্যাচারী শক্তির জাতি, এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা কখনই সেখানে প্রবেশ করব না যতক্ষণ না তারা এটি ত্যাগ করে; কিন্তু যদি তারা তা ছেড়ে দেয়, তবে আমরা প্রবেশ করব।" যারা ভয় করত তাদের মধ্য থেকে দু জন লোক, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, "তাদের উপর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, কারণ যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে তখন তোমরাই প্রাধান্য পাবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" তারা বলল, "হে মূসা, আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারব না, যতক্ষণ তারা এর মধ্যে থাকবে; অতএব, আপনি এবং আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই অবস্থান করছি।" [মূসা] বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজেকে এবং আমার ভাই ছাড়া [অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ] অধিকার করি না, সুতরাং আমাদেরকে অবাধ্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করুন। [আল্লাহ] বললেন, "অতঃপর, এটা তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে চল্লিশ বছরের জন্য [যেদিন] তারা সারা দেশে ঘুরে বেড়াবে, সুতরাং অবাধ্যদের জন্য দুঃখ করো না।"

তাদের অবাধ্যতার ফলস্বরূপ, তাদেরকে 40 বছর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার, তাদের কাছ থেকে তাদের বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার এবং তাদের জন্য নির্ধারিত শহরে প্রবেশ করার আরেকটি সুযোগ দেন। অন্য এক মহানবী (সা.) এর নেতৃত্ব।

যদিও মহান আল্লাহ তাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তবুও তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের আস্থাহীনতার ইঙ্গিত দেয়। এটি ঘটে যখন একজন দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী হয়। মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীর প্রতি আস্থার অভাব এড়াতে দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করতে হবে। এটি কেবলমাত্র ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যাতে কেউ ইতিহাসের অগণিত উদাহরণগুলি বুঝতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণী পূরণ করেছিলেন। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে নিশ্চিত করবে যে, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী কেউ এড়াতে পারবে না।

উপরন্তু, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যখন একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা নেয় তখন তাদের অবশ্যই ভূমিকার শর্তগুলি পূরণ করার জন্য সেই ভূমিকার সাথে সংযুক্ত দায়িত্বগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার হওয়ার শর্ত পূরণ করার জন্য একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভারকে অবশ্যই রাস্তার নিয়ম মেনে চলতে হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এর সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর জন্য একজনকে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। নবী মুহাম্মদ সা. যে ব্যক্তি তার পেশার সাথে যুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় সে যেমন তার নিয়োগকর্তার সাথে সমস্যায় পড়বে, তেমনি যে ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে তবুও তার সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। একজনকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক কাজের সাথে

এটিকে সমর্থন করতে হবে, যার মধ্যে ত্যাগ স্বীকার করা জড়িত। কাজ ছাড়া কথার ওজন ইসলামে খুব কম।

মহান আল্লাহ, ইসরাঈল সন্তানদেরকে আরও একটি সুযোগ দিয়েছিলেন, অগণিত অন্যান্যদের মধ্যে, তাঁর অবাধ্যতার ভুল সংশোধন করার জন্য, তাদের জন্য মনোনীত শহরে প্রবেশের মাধ্যমে এবং বিজয় অর্জনের জন্য অত্যাচারী জাতির সাথে লড়াই করার জন্য যেটি এটি দখল করেছিল। তাদের আগেই নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই শহরটি তাদের জন্য সহজ করার জন্য দিয়েছিলেন যাতে তারা তাঁর আনুগত্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করবে। তাদের যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা হল তাঁর প্রতি নম্রতা দেখানো, যা মহান আল্লাহকে মান্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্র ব্যক্তি সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা সহজ মনে করবে, তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে। যদিও, অহংকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজের জন্য খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে চাইবে, কারণ তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে অন্যের আদেশের অধীন করা অপছন্দ করে। নম্রতার একটি দিক হল নিজের দোষ স্বীকার করা এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে নিজের আচরণ সংশোধন করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করা। যদি কেউ অনুতাপের সাথে নম্রতাকে একত্রিত করে তবে তারা সর্বাবস্থায় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও আশীর্বাদ ও পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 58:

" আর স্মরণ কর, যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্যের সাথে এবং দরজায় প্রবেশ কর বিনীতভাবে এবং বল, 'আমাদের বোঝা [অর্থাৎ, পাপ] থেকে মুক্তি দাও।' আমরা [অতঃপর] আপনার জন্য আপনার গুনাহ মাফ করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের [ভালোবাসা ও প্রতিদানে] বৃদ্ধি করব।"

এবং 14 অধ্যায় ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাই মুসলমানদের জন্য নম্রতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং যখনই তারা পাপ করবে তখন তাদের আন্তরিক অনুশোচনার পথ দেখাবে। নম্রতা অবলম্বন করা হয় যখন কেউ এই সত্যটি স্বীকার করে যে মহান আল্লাহ তাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের অগণিত এবং অবিচ্ছিন্ন আশীর্বাদ দিয়েছেন যদিও তারা তাদের উপার্জন বা প্রাপ্য ছিল না, তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাদের দোষগুলি ঢেকে রাখে এবং তাদের জন্য একটি মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা যে সামান্য পরিমাণ ভালো কাজ করে, যদিও তারা যে ভালো কাজগুলো করে তার উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, কারণ তিনিই তাদের অনুপ্রেরণা দেন, জ্ঞান, ক্ষমতা, ভালো কাজ করার সুযোগ। যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে তখন এই সত্যগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং এর ফলে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি বিনয় হবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছাড়াই বিনয় হবে। উপরন্তু, যিনি নম্রতা অবলম্বন করেন তিনি কোন আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করবেন এবং কোনটি উপেক্ষা করবেন তা বেছে নেবেন না। নম্রতা একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা মহান আল্লাহর একজন বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাই তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলেও প্রতিটি পরিস্থিতিতে শুনতে হবে এবং মান্য করতে হবে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তায়ালা যা আছে তা অনুসারে কেবল আদেশ এবং নিষেধ করেন। তাদের জন্য সেরা। অথচ, অহংকারী ব্যক্তি বেছে নেবে কখন আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং কখন তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাকে অমান্য করবে। সুতরাং দেখা গেলেও তারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য করে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 58-59:

" আর স্মরণ কর, যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্যের সাথে , এবং দরজায় প্রবেশ কর বিনীতভাবে এবং বল, 'আমাদের বোঝা [অর্থাৎ, পাপ] থেকে মুক্তি দাও।' আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের [ভালোবাসা ও প্রতিদানে] বাড়িয়ে দেব, কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথায় পরিবর্তন করেছিল, তাই আমরাও যারা অন্যায় করেছিল তাদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করা হয়েছিল কারণ তারা অবাধ্যতা করেছিল।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিনে কীভাবে আচরণ করা উচিত তা কার্যত দেখিয়েছিলেন। তিনি যখন মহান আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফের সান্নিধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে এতটাই নত হয়ে গেলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল প্রায় তাঁর জিনের স্পর্শে লেগেছিল। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 397-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অথচ, ইসরায়েলের সন্তানদের মধ্যে থেকে অনেকেই যে নম্রতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল তা তাদের দত্তক নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাদের অহংকার তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিল। মহান আল্লাহ, তারপর তাদের অবিরাম অবাধ্যতার জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছেন। একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ঔদ্ধত্য অবলম্বন করা এড়াতে পারে, কারণ এটির একটি পরমাণুর মূল্য তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে

এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার মানুষকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে যখন এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে, ঠিক যেমন ইসরায়েলের সন্তানরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যা ছিল আদেশ ও নিষেধ। মহান আল্লাহ। অহংকার একজনকে অন্যদেরকে অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে। এটি একটি মূর্খ মনোভাব কারণ কেউই মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয় এবং তারা বা অন্যরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে কিনা তা তারা জানে না। উপরন্তু, তাদের অধিকারী প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর দ্বারা সৃষ্ট এবং তা নয়। অতএব, একটি পার্থিব নিয়ামত যা বাস্তবে অন্যের জন্য, তার জন্য গর্ব করা নিছক বোকামি। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, নম্রতা অবলম্বন করার মাধ্যমে এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যা ইসলামি জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 58-59:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা খাও [স্বাচ্ছন্দ্যে এবং] প্রাচুর্যের সাথে এবং দরজায় প্রবেশ কর বিনীতভাবে এবং বল, 'আমাদের বোঝা [অর্থাৎ, পাপ] থেকে মুক্তি দাও।' আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের [ভালোবাসা ও প্রতিদানে] বাড়িয়ে দেব, কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথায় পরিবর্তন করেছিল, তাই আমরাও যারা অন্যায় করেছিল তাদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করা হয়েছিল কারণ তারা অবাধ্যতা করেছিল।"

এই আয়াতটি ঈমানের বিষয়ে নতুনত্ব আনার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অন্য জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে করা হয়, যেহেতু কেউ অন্য বিষয়ে যত বেশি কাজ করে, কম তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন। যদি ইসরায়েলের সন্তানরা উদ্ভাবন এড়িয়ে চলত এবং পরিবর্তে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি মেনে চলত তবে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও আশীর্বাদ লাভ করত।

উপরন্তু, এই আয়াতগুলি স্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব আশীর্বাদের সময়ের প্রলোভন ও পরীক্ষার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। বনী ইসরাঈলরা বিজয় ও একটি শহর জয়ের মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছিল এবং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে, তাদের দেওয়া নেয়ামতগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, তারা অহংকারী হয়ে ওঠে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি প্রায়শই কাটিয়ে উঠতে একটি কঠিন পরীক্ষা হয়, কারণ যিনি সমস্যার মুখোমুখি হন তিনি প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে, যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তার কাছে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে অপব্যবহার করে সহজেই মহান আল্লাহকে অমান্য করার জন্য সম্পদ এবং সুযোগ রয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে , যা পরামর্শ দেয় যে একজন মুমিন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে পুরস্কার ও আশীর্বাদ লাভ করবে, যখন তারা তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তাকে খুশি করার উপায়ে, এবং ধৈর্য অবলম্বন করে কঠিন সময়ে পুরস্কার ও আশীর্বাদ পান। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের

কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 59:

"কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা [সে কথাগুলোকে] যা বলা হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য কথায় পরিবর্তন করেছিল, সুতরাং যারা জুলুম করেছিল তাদের উপর আমি আকাশ থেকে একটি শাস্তি [অর্থাৎ প্লেগ] নাযিল করেছি কারণ তারা অবাধ্য ছিল।"

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা অহংকার অবলম্বন করে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার শাস্তি সর্বদা স্পষ্ট নয়, আকাশ থেকে এমন শাস্তি। এটি প্রায়শই সূক্ষ্ম হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের নেতিবাচক মনোভাব এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতাকে তাদের শাস্তির সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এই সূক্ষ্ম শাস্তিগুলি মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং ক্ষতিকারক পদার্থের প্রতি আসক্তির রূপ নেয়। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে এই লোকেরা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও তাদের কাছে এমন সব পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যেহেতু তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতাকে তাদের শাস্তির সাথে সংযুক্ত করতে পারে না, তাই তারা তখন তাদের আশেপাশের মানুষ এবং জিনিসগুলি যেমন তাদের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দোষারোপ করে এবং ফলস্বরূপ তারা এই সম্পর্ক এবং জিনিসগুলিকে ধ্বংস করে, যদিও এই জিনিসগুলি তাদের জীবনের একমাত্র শালীন জিনিস। তাই তারা নিজেদের হাতে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে। এই শাস্তি আকাশ থেকে নেমে আসা শাস্তির মতো মহাকাব্যিক নাও হতে পারে, তবুও এটি প্রায়শই আরও বেদনাদায়ক হতে পারে,

কারণ এই ব্যক্তি এমন একটি দুঃখের জীবন যাপন করে যা প্রায়শই মানসিক ভাঙ্গন এমনকি আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়, যদিও তাদের মজা এবং বিনোদনের মুহূর্ত রয়েছে। এবং তাদের পায়ে বিশ্ব আছে. অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 60

۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى
ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

"আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল, তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" এবং সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণা নির্গত হল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় [অর্থাৎ, গোত্র] তার জলের স্থান চিনল। "আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খাও ও পান কর, আর পৃথিবীতে অত্যাচার, ফাসাদ ছড়াবে না।"

মহানবী মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিক ছিলেন কারণ তিনি সর্বদা তাদের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য চিন্তিত ছিলেন। সহীহ মুসলিমের 196 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়ায় একজনকে অবশ্যই এই চমৎকার গুণটি গ্রহণ করতে হবে। অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা তখনই সর্বোত্তম অর্জিত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা ব্যবহার করতে চায়। পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলোতে তাদের সাহায্য করতে হবে এবং খারাপ ও অকেজো বিষয়ে সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 60:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন...*"

মিশর ত্যাগ করার পর এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর অলৌকিক ধ্বংস প্রত্যক্ষ করার পর, ইস্রায়েলের সন্তানরা মরুভূমিতে ভ্রমণ করছিল এবং তাই তাদের রিযিকের প্রয়োজন ছিল। মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুরোধে সরাসরি তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

" *এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।"...*

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 60:

" আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির জন্য প্রার্থনা করেছিল , তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" আর সেখান থেকে বের হল বারোটি ঝর্ণা..."

তাদের উচিত ছিল এই মহান নেয়ামতের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতা বলতে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল তারা মানুষের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান কামনা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং একজনের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা আল্লাহকে খুশি করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা আশীর্বাদ এবং পুরস্কার বৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 60:

" *আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" আর সেখান থেকে বের হল বারোটি ঝর্ণা..."*

মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই ঝর্ণাগুলোকে প্রবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতে এই অলৌকিক ঘটনাটি প্রদর্শনের অন্যতম কারণ। তার উপর, ইস্রায়েলের সন্তানদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ছিল। এটি একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি তাদের সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্যে করতে সহায়তা করবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রদত্ত কালজয়ী অলৌকিক ঘটনাগুলি অধ্যয়ন এবং শেখার মাধ্যমে বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হয়: পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্য। এতে কেউ যত বেশি আত্মনিবেদন করবে, তাদের ঈমান ততই মজবুত হবে এবং

এর ফলে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর তত বেশি অটল থাকবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এছাড়াও, হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতে পানির অলৌকিক ঘটনাও দেখানো হয়েছিল, যাতে বনী ইসরাঈলরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এটা স্পষ্ট যে তাদের অনেকেই তাকে সামান্য সম্মান করতেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 55:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনি বলেছিলেন, "হে মূসা, আমরা কখনই আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই"...

এবং অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 5:

"আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমার ক্ষতি করছ অথচ তোমরা নিশ্চিত জানো যে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল?"...

একজনের মহানবী (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তাদেরকে সর্বদা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে বাধা দেবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা ফরজ হওয়ার অন্যতম কারণ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি জিহ্বা দিয়ে সম্মান দাবি করা এবং তাঁর শিক্ষাকে উপেক্ষা করা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার স্পষ্ট লক্ষণ। তার জীবন ও শিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই তার প্রতি তাদের সম্মান লালন করতে হবে। মানুষকে পথ দেখানোর জন্য তিনি যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং অন্যদের প্রতি তাঁর অতুলনীয় আন্তরিকতাকে তারা যখন লক্ষ্য করবেন, তখন নিরপেক্ষ মনের অধিকারী ব্যক্তির কাছে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। ইসলামের শিক্ষাগুলো অধ্যয়ন করা মুসলমানদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ।

পরিশেষে, হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতে পানির অলৌকিক ঘটনা দেখানোর আরেকটি কারণ ছিল, মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনা সমর্থন করার গুরুত্ব এবং কর্মের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তাদের আস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। একজনকে কেবল প্রার্থনা করা উচিত নয় এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আশা করতে হবে। প্রতিটি মিনতি কার্যকর হওয়ার জন্য কর্ম দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"... তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ তা উন্নীত করে..."

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হল যে সম্পদ রয়েছে, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা। দ্বিতীয় দিকটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যে প্রতিটি পরিস্থিতির ফলাফল জড়িত প্রত্যেকের জন্যই সর্বোত্তম হবে, কারণ মহান আল্লাহ সর্বদা মানুষের জন্য সর্বোত্তম কী তা চয়ন করেন, এমনকি যদি তাঁর পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 60:

" *আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" আর সেখান থেকে বের হল বারোটি ঝর্ণা , এবং প্রত্যেক জাতি [অর্থাৎ, গোত্র] তার জলের স্থান চিনল..."*

যেহেতু বনী ইসরাঈলরা খুব গোত্রীয় লোক ছিল যারা অনেক সামাজিক বাধা তৈরি করেছিল যা মানুষকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আল্লাহ, মহান, তর্ক এড়াতে বারোটি আলাদা ঝরনা প্রবাহিত করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রদত্ত আচরণবিধি একতাকে উৎসাহিত করে এবং যেকোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে উৎসাহিত করে যা মানুষকে অন্য থেকে আলাদা করে যেমন জাতীয়তা, লিঙ্গ, সামাজিক শ্রেণী এবং জাতিসত্তা। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে একমাত্র জিনিস যা একজনকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

কিন্তু একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং তাদের অনেক কর্ম অন্যদের থেকে লুকানো হয় হিসাবে নোট করা গুরুত্বপূর্ণ, কেউ অনুমান করতে পারে না যে তারা অন্যদের চেয়ে ভাল। পরিবর্তে, তাদের উচিত অন্যদেরকে ভালো করার উপদেশ দেওয়া এবং অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিশ্বাস না করে তাদের খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে সতর্ক করা এবং মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার দিকে মনোনিবেশ করা, এই আশায় যে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103:

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না..."

ঐক্য অত্যাবশ্যক কারণ এটি একজনকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করে এবং প্রশংসনীয় বিষয়গুলিতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে, যার ফলে উভয় জগতে তাদের উপকার হয়। আল্লাহর আনুগত্যে ঐক্যের মাধ্যমে সমাজে সর্বত্র সুবিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

উপকারী ঐক্য অর্জিত হয় যখন প্রতিটি পরিবার ও সমাজ তার সদস্যদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। কিন্তু যখন একটি পরিবার ও সমাজের সদস্যরা রক্ত, জাতিসত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে একত্রিত হয়, তখন তা সর্বদা, শীঘ্র বা পরে, তার সদস্যদের মধ্যে অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু এই পার্থিব বন্ধনগুলি দুর্বল, সেগুলি ভেঙে যাওয়া এবং পরিবার ও সমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুসলমানদের অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যিনি সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও তারা বিভিন্ন গোত্র, জাতীয়তা এবং সামাজিক শ্রেণীর ছিল। এই ছিল তাদের শক্তির পেছনের রহস্য। বিশ্বাসের বন্ধন হল সবচেয়ে মজবুত বন্ধন এবং এর মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে যুক্ত হলে তা কখনো ছিন্ন হয় না। ঈমানের বন্ধন তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ একে অপরকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে এবং একে অপরকে তাঁর অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। যেখানে, পার্থিব বন্ধন সর্বদা একে অপরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে উৎসাহিত করবে, এমনকি যদি এর সাথে মহান আল্লাহর অবাধ্যতাও জড়িত থাকে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 60:

" আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" অতঃপর সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় [অর্থাৎ, গোত্র] তার জলের স্থান চিনল। "আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খাও ও পান কর..."

মহান আল্লাহ, ইসরায়েলের সন্তানদেরকে উৎসাহিত করেছেন যে তিনি তাদের দেওয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তারা তাকে সন্তুষ্ট করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তখন তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহর হক পূরণ করবে এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এতে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির বিস্তার নিশ্চিত হবে। কিন্তু যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তারা অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে এবং সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেবে। এটি 60 নং আয়াতের শেষে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 60:

"... আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খাও ও পান কর, আর পৃথিবীতে অত্যাচার করো না, ফাসাদ ছড়াবে না।"

মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। এর একটি দিক

ছিল ইসলাম গ্রহণ করা কারণ তারা স্পষ্টভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করার মতো মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত দিক যেমন তাদের উদ্দেশ্য, অন্যান্য বক্তব্য ও কর্মে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হবে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন দিক মেনে চলতে হবে যাতে উভয় জগতে তাদের আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কার দেওয়া হয়, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ
بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ
بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ
وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٦١

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের চাদরে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে [তাদের উপর] ফিরে এসেছিল। এটা এ জন্য যে, তারা [বারবার] আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করত।"

যদিও মহান আল্লাহ, ইসরায়েলের সন্তানদেরকে সুষম খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেছিলেন , যা পেতে তাদের সামান্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল না, তবুও তারা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 57:

" এবং আমরা তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি মান্না ও কোয়েল নাযিল করেছি, [বলেছি], "আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।"...

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 60:

" *আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমরা বললাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" আর সেখান থেকে বের হল বারোটি ঝর্ণা..."*

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

" *আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে তার সবুজ শাকসবজি, তার শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল*

বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই, তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।"..."

তারা এমন খাবারের জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন যা যেখানে মান ও মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্ট, কারণ তারা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি একজনের জীবনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অন্য সব কিছুর উপরে পূর্ণ করার লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ এটিই তাদের জীবনের মূল্য এবং অর্থ দেয়। যেমন একটি উদ্ভাবনকে ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করা হয় যখন এটি তার সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি যে মানুষ তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যদিও তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এটি একজনকে একটি অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ জীবন নিশ্চিত করবে যা মনের শান্তিতে পূর্ণ, এমনকি যদি তারা পথে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ইসরায়েলের সন্তানদের মনোভাব এবং অনুরোধ মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কী তা জানার জন্য অনুমান করা এড়াতে, যা প্রায়শই ঘটে যখন তারা তাদের থেকে বেশি পার্থিব জিনিসের অধিকারী অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে। এই অনুমান একজন ব্যক্তিকে এমন জিনিসের জন্য অনুরোধ করতে বাধ্য করবে যা মহান আল্লাহ তাদের মঞ্জুর করেননি, যেমন স্ত্রী, সন্তান এবং সম্পদ। পরিবর্তে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাব বুঝতে হবে এবং এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে যে তারা এমন কিছুর জন্য ভালভাবে অনুরোধ এবং আকাঙ্ক্ষা করতে পারে যা মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে নিকৃষ্ট এবং এটি সুস্পষ্ট না হলেও। তাদের কাছে অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই ধারণাটি প্রায়শই মানুষকে অকৃতজ্ঞতার দিকে চালিত করে যখন তারা যা চায় তা পেতে ব্যর্থ হয়। সত্য হল যে লোকেদের মধ্যে যারা তাদের চেয়ে বেশি পার্থিব আশীর্বাদের অধিকারী তারা প্রায়শই বেশি চাপের সম্মুখীন হয়। যে চাপ, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব নিয়ামত না দিয়ে তাদের রক্ষা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি

অবলম্বন এড়াতে যারা তাদের চেয়ে বেশি পার্থিব জিনিসের অধিকারী তাদের পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং বরং তাদের থেকে কম অধিকারীদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত। উপরন্তু, তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং প্রচেষ্টাকে তাদের কাছে যা আছে তার উপর মনোনিবেশ করা উচিত এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ মনের শান্তি কেবল এতেই নিহিত। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যদিও, তাদের কাছে মঞ্জুর করা হয়নি এমন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করা এবং অনুসরণ করা একজনকে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদের অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতে চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা, প্রায়ই একজন ব্যক্তিকে পার্থিব লাভের জন্য, যেমন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য করে। একজনকে অবশ্যই এই নির্দোষ আচরণ এড়াতে হবে কারণ ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি প্রকাশ করা হয়নি যাতে কেউ পার্থিব জিনিস পেতে ক্রেডিট কার্ড হিসাবে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ পার্থিব জিনিস ও পার্থিব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলিকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। যেমন, যে সন্তান চায় তাকে বিয়ে করা উচিত। ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল যাতে কেউ শিখতে পারে যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে এবং কেবলমাত্র পার্থিব লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করে, সে উভয় জগতে মানসিক চাপ ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না কারণ তারা নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুর ইবাদত করে না। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 61:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।"

এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছিল..."

বনী ইসরাঈল মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অপমান ও অপমানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

"... *এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং [তাদের উপর] আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছিল..."*

একজন মুসলমানকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে এই দুর্দশাজনক পরিণতি এড়াতে হবে। কৃতজ্ঞতা মানে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। একজনের আন্তরিকতার একটি চিহ্ন হল যে তারা মানুষের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখানো হয় যখন কেউ ভালো কথা বলে বা চুপ থাকে। একজনের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যদিও, অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা কেবলমাত্র একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেয়। যখনই এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়, তারা বিদ্রোহ করে এবং অকৃতজ্ঞতা এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার গভীরে ডুবে যায়। এমনকি এটি তাদের বিশ্বাসের ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার দিকে নিয়ে যেতে পারে যা তারা মৌখিকভাবে বিশ্বাস করার দাবি করে, কারণ তারা তাদের কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করতে উত্সাহিত করে। একজন ব্যক্তি যত বেশি অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় ডুবে যাবে তার কাজ তত বেশি জঘন্য হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের চাদরে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে[তাদের উপর] ফিরে এসেছিল। এটা এ জন্য যে, তারা [বারবার] আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করত।"

বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অকৃতজ্ঞতা তাদের ঐশী কিতাবের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা করার জন্য এবং মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও ক্ষতি করতে বাধ্য করেছিল, যা তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। তাদের বিচ্যুত এবং অকৃতজ্ঞ আচরণ সংশোধন করার জন্য।

মুসলমানরা একই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে। তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রায়শই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার রূপ নেয়, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে। মহান আল্লাহর কাছে। এটি মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করার সময় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অমুসলিমদের মতো আচরণ করতে পারে। এটি আল বাকারাহ, 152 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

"... আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা সবসময় একসাথে বাঁধা হয়েছে. এর অর্থ হল যে কেউ সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করবে সে কেবল বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যাদের মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা তাদেরকে কুফরের দিকে নিয়ে গেছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের চাদরে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে[তাদের উপর] ফিরে এসেছিল। এটা এ জন্য যে, তারা [বারবার] আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করত।"

এই আয়াতটি মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। ফেরাউন ও তার লোকদের হাতে দাসত্ব ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগের অবস্থার তুলনায় বনী ইসরাঈলরা স্বস্তির সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ধৈর্য সহকারে অসুবিধার সময়গুলি মোকাবেলা করা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে প্রায়শই সহজ, কারণ প্রাক্তনটি প্রায়শই একজন ব্যক্তিকে এবং তাদের জন্য উপলব্ধ বিকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করে। তাই ত্রাণের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। যদিও, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি প্রায়শই পার্থিব আশীর্বাদ এবং অসংখ্য বিকল্পের দিকে নিয়ে যায়, যার মধ্যে কিছু মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই কারণেই ধনীরা প্রায়শই মহান আল্লাহকে অমান্য করে, কারণ তাদের কাছে গরীবদের নেই এমন সম্পদের অ্যাক্সেস রয়েছে, যেমন সম্পদ। অতএব, একজনকে অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের পরীক্ষাটি মনে রাখতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সহীহ মুসলিম, 7500

নম্বর হাদীসে প্রদত্ত উপদেশ মেনে চলে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন আশীর্বাদ লাভ করে। এবং তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজ এবং অসুবিধা উভয় সময়ে পুরস্কার . স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং অসুবিধার সময় তারা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে ধৈর্য প্রদর্শন করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের চাদরে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে[তাদের উপর] ফিরে এসেছিল। এটা এ জন্য যে, তারা [বারবার] আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করত।"

মহান আল্লাহ মদিনায় বসবাসকারী কিতাবদেরকে সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা

এড়িয়ে চলতে। এই কৃতজ্ঞতার একটি দিক ছিল ইসলাম গ্রহণ করা কারণ তারা স্পষ্টভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু যেহেতু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যেহেতু তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রদত্ত নেয়ামতকে ব্যবহার করা ছেড়ে দিতে পারেনি, তাই তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষতি করে। মিশন এবং এমনকি বেশ কয়েকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের অকৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করেছেন এবং পরকালে যা হবে তা আরও কঠোর হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 61:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের চাদরে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে [তাদের উপর] ফিরে এসেছিল। এটা এ জন্য যে, তারা [বারবার] আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করত।"

মুসলিম জাতি বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন তাদের অপমানে ভুগতে দেখা দেয় তার একটি কারণ এই আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে বনী ইসরাঈলদের মনোভাব অবলম্বন করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানে ঢেকে দেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য তখনই প্রাপ্ত হবে যখন তারা সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তাদের মৌখিক ঘোষণাকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

উপসংহারে, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে অবমাননা এড়াতে হবে, যাতে তারা

পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যে বর্ণিত সমস্ত আশীর্বাদকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 62

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ
وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

“নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সাবেইন ছিল [হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বে] - [তাদের মধ্যে] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল - তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের পালনকর্তার কাছে, এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

যদিও এই আয়াতে উল্লিখিত সাবেইনরা ঠিক কারা তা নিয়ে অনেকেই বিতর্ক করেছেন, তবুও এই আলোচনার গভীরে প্রবেশ করা অপ্রয়োজনীয় কারণ এটি এই তথ্য জানার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিক আনুগত্য বাড়ায় না। এটা জানাই যথেষ্ট যে তারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের লোকদের একটি দল ছিল যাদেরকে ইসলাম, সঠিক ধর্ম ও জীবন বিধানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। একটি সাধারণ নোটে, একজনকে অবশ্যই সেই বিষয়ে গবেষণা করা এবং আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়ায় না, যেমন বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বিচার দিবসে যদি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা না হয়, তবে তা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে এড়িয়ে চলতে হবে।

উপরন্তু, এই আয়াতটি তাদের বোঝায় যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বাস্তবিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 62:

" *নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সাবেইন ছিল [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে - [তাদের মধ্যে] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের প্রভুর সাথে..."*

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে যারা এই ধরনের আচরণ করেছিল এবং তাঁর পরেও প্রযোজ্য, যতক্ষণ না এই দলগুলো তাকে এবং তিনি যে খোদায়ী আইন নিয়ে এসেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটি তাদের জন্য সত্য ছিল। এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা কিতাবের লোকদের জন্য সহজ ছিল কারণ তারা

স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল, যেমন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু সত্যের দিকে এই আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও, কিতাবধারীদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভালবাসার কারণে, যা ইসলাম মধ্যপন্থী হবে এবং তাদের অর্জিত পার্থিব জিনিসগুলি যেমন সামাজিক মর্যাদা এবং প্রাপ্তির প্রতি ভালবাসার কারণে। নেতৃত্ব

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 62:

" *...যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, যিনি সত্যই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, তিনি আনুগত্যের সাথে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করবেন। আর যে সত্যিকারের বিচার দিবসে বিশ্বাস করে সে কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিবে। এই উভয়ের মধ্যেই সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বিচার করা যায় তারা কতটা বা কম আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করে, তারা তাদের প্রদত্ত নেয়ামত কতটা সঠিকভাবে ব্যবহার করে। তারা যত বেশি তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাস তত বেশি শক্তিশালী হবে তবে তারা তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করবে না, তারা শক্তিশালী হওয়ার দাবি করলেও আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাস তত দুর্বল হবে। বিশ্বাস

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 62:

" *নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সাবেইন ছিল [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে] - [তাদের মধ্যে] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের প্রভুর সাথে...*"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সক্রিয়ভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁর সকল নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া সম্ভব নয়। এটি 4 অধ্যায় আন নিসা, 150-151 আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে বৈষম্য করতে চায় এবং বলে, "আমরা কিছুকে বিশ্বাস করি এবং অন্যকে অবিশ্বাস করি" এবং এর মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

উপরন্তু, আয়াত 62 এই সত্যকেও ইঙ্গিত করে কারণ এটি স্পষ্টভাবে সত্য বিশ্বাসীদেরকে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস থেকে পৃথক করে, যদিও কিতাবের লোকেরা, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হিসেবে গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

"আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে অবশ্যই তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য প্রতারিত হওয়া উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। ইসলামের অনুকরণে তৈরি না করা জীবনধারা কখনোই আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, তা তার বাঁকা এবং খোলামেলা, মূর্খ বিশ্বাস যাই হোক না কেন। যদি মহান আল্লাহ বিচার দিবসে সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন, যদিও অনেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে, তবে এটি এই পৃথিবীতে জীবনকে অর্থহীন করে তুলবে এবং এটি নির্দেশ করবে যে মহান আল্লাহ অন্যায়কারী, যেমন এই লোকেরা তার কাছে আশা করে। যে তাকে উপেক্ষা করেছে তার সাথে সমানভাবে আচরণ করা যে তাকে আন্তরিকভাবে মেনে চলে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 62:

" *নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সাবেইন ছিল [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে] - [তাদের মধ্যে] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের প্রভুর সাথে..."*

এই আয়াতটি ইসরাঈলের সন্তানদের এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বারবার অকৃতজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনা করে এমন আয়াতগুলির মধ্যে ব্যত্যয় ঘটিয়েছে, যাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে আন্তরিক অনুতাপ ও সংস্কারের দরজা সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। সংস্কারের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ চূড়ান্ত আইনের শিক্ষাকে কঠোরভাবে মেনে চলা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতের মানসিক এবং দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 62:

"নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সাবেইন ছিল [হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বে] - [তাদের মধ্যে] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল- তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের পালনকর্তার কাছে, এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাকে এই পৃথিবীতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, কারণ এই পৃথিবী একটি পরীক্ষার স্থান এবং বিচার এই আয়াতের অর্থ হল যে যখনই তারা চাপ এবং দুঃখের সম্মুখীন হয় তখন তাদের কেউই তাদের কাবু করবে না যাতে তারা ভয় ও শোকে ডুবে যায়। পরিবর্তে, তারা যে মানসিক চাপ এবং দুঃখের সময়গুলোকে

কাটিয়ে উঠবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বদা মানসিক শান্তি ধরে রাখে, বিশেষত অসুবিধা এবং চাপের সময়ে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ইসলামের আচরণবিধি অনুসরণ করা, এমনকি যদি এটি কারো ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, ঠিক তেমনি একজন চিকিত্সকের পরামর্শ অনুসরণ করার মতো, যিনি তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে দেন যাতে তাদের রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করে।

বিপরীতভাবে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের ব্যাপারে, তাদের মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণাকে সৎকর্ম দ্বারা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তাকে ভয় বা দুঃখ থেকে সুরক্ষা দেওয়া হবে না। পরিবর্তে তারা অসুবিধার মুহূর্তগুলি কাটিয়ে উঠবে, এমনকি যদি তাদের মাঝে মজা এবং বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। ফলস্বরূপ, তারা দুনিয়াতে একটি দুঃখজনক ও হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করবে এবং পরকালে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 63-64

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ٦٤

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে আপনি ধার্মিক হতে পারেন।"

অতঃপর এর পর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।”

মহান আল্লাহ, ইসরাঈল সন্তানদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য করেননি বরং তারা স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণের পর তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 63:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপর পর্বত তুলেছিলাম...

যেহেতু মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বিষয়, তাই কেউ অন্যকে মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করতে বাধ্য করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

এটিই কেবল তরবারির মাধ্যমে ইসলামের প্রসারিত মিথ্যা ধারণাকে মুছে দেয়। একটি তরবারি কারো শরীরকে বশীভূত করতে পারে কিন্তু তা কখনো কারো আধ্যাত্মিক হৃদয়কে বশীভূত করতে পারে না, যা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের আবাস।

তাদের উপর পর্বত উঠানো তাদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল এবং এটি এত বড় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে

তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি উপায় ছিল। এই সতর্কীকরণ এবং বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের তাওরাত শিখতে, বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে উত্সাহিত করার জন্য যা তাদের দেওয়া হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ন্যায়পরায়ণ আচরণ করেছে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 63:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।"

তাওরাতের মধ্যে যা আছে তা নির্ধারণ করা এবং মনে রাখার অর্থ হল তাওরাতের অন্তর্গত ঐশী শিক্ষাগুলি শেখার, বোঝার এবং তার উপর কাজ করার চেষ্টা করা, এবং তাই এটি কেবল না বুঝে পাঠ করার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত। কেবলমাত্র ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি বোঝার এবং বাস্তবায়নের এই পদ্ধতির মাধ্যমেই একজন ধার্মিকতা অর্জন করবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সংকল্প মানে পরিপূর্ণতা নয়, কারণ মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না বা আশা করেন না। ইসলামী শিক্ষায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়, কারণ মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 6:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

দৃঢ় সংকল্পের অর্থ হল, একজনকে অবশ্যই ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি বোঝার এবং বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, যার ফলস্বরূপ তারা নিশ্চিত করে যে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে এবং যখনই তারা পাপ করে, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং ভ্রমণ চালিয়ে যায়। মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথ। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা আবার একই বা অনুরূপ পাপ করা থেকে বিরত থাকবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দেবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

উপরন্তু, দৃঢ় সংকল্প এবং এতে যা আছে তা মনে রাখাও ঐশ্বরিক শিক্ষাকে কঠোরভাবে মেনে চলা এবং অন্যান্য বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে নির্দেশ করে, যদিও এগুলোকে ভালো কাজ বলে মনে করা হয়। সত্য হল যে অন্য উত্স থেকে নেওয়া জিনিসগুলির উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর কাজ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটিকে উপেক্ষা করা অনেক নেতিবাচক সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং বিশ্বাসের বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশের কারণ। উদাহরণস্বরূপ, একজনকে কেবলমাত্র মুসলিম বিবাহগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে তারা কতগুলি অমুসলিম ঐতিহ্য ও অনুশীলন গ্রহণ করেছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, পবিত্র কুরআন ও তার ঐতিহ্যের মূলে নেই এমন যে কোনো বিষয় মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। .

এর মধ্যে যা আছে তা নির্ধারণ করা এবং মনে রাখা প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ঐশ্বরিক শিক্ষার প্রয়োগকে বোঝায়। কখন ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর কাজ করতে হবে এবং কখন সেগুলিকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী উপেক্ষা করতে হবে তা এই আয়াতের আদেশের বিরোধিতা করে। তাদের বিশ্বাসকে একটি কোটের মতো আচরণ করা উচিত নয় যা তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পরে বা খুলে ফেলে। পরিবর্তে তাদের অবশ্যই ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলিকে মেনে চলতে হবে যেটি তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য উপযুক্ত হোক বা না হোক, কারণ এটি উভয় জগতে তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এর মধ্যে যা আছে তা নির্ধারণ করা এবং মনে রাখাও ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর অধ্যয়ন এবং কাজ করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যাতে একজন বিশ্বাসের নিশ্চিততা লাভ করে। দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে আনুগত্য করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে। এটি 63 নং আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 63:

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।"

পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রেও এই আয়াতটি মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। এর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়ে সুন্দর কন্ঠে তেলাওয়াত করা এবং এর উপর আমল করা পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কিতাব নয়, এটি একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। হেদায়েত তখনই অর্জিত হতে পারে যখন কেউ শিখবে এবং তার উপর আমল করবে। একটি মানচিত্র যেমন একজনকে তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাবে যখন তারা এটিতে কাজ করবে, একইভাবে, পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র একজনকে তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্যের গন্তব্যে নিয়ে যাবে যখন তারা এটি বুঝতে এবং আমল করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য পূরণ করা হল সেই অঙ্গীকার যা প্রত্যেক মুসলমান মহান আল্লাহর সাথে গ্রহণ করেছিল, যখন তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল, ঠিক তেমনি তাওরাতের উদ্দেশ্য পূরণ করে, শিখে এবং তার উপর কাজ করে, এটি ছিল আল্লাহর সাথে নেওয়া অঙ্গীকার। ইস্রায়েলের সন্তানদের দ্বারা মহান। কিন্তু মুসলমানরা যদি পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য পূরণের অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে উভয় জগতে তারা মানসিক শান্তি পাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 63-64:

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে আপনি ধার্মিক হতে পারেন।" তারপর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে..."

পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র তাদের কাছে থাকা নেয়ামতের অপব্যবহার হবে। এটি উভয় জগতেই অসুবিধা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কিন্তু যতক্ষণ একজন ব্যক্তি জীবিত থাকে, ততক্ষণ দ্বিতীয় সুযোগ ও সংস্কারের দরজা সর্বদা খোলা থাকে, কারণ মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অবাধ্যতার জন্য অবিলম্বে পাকড়াও করেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 64:

“তারপর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা না থাকত, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।”

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বিতীয় সুযোগ এবং সংস্কারের দরজা চিরতরে খোলা থাকবে না। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে হবে তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই, মহান আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করে, পবিত্র কুরআন বোঝার এবং আমল করার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

"এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীই ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।”

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 63-64:

“ আর [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলে

দিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে আপনি ধার্মিক হতে পারেন।" অতঃপর এর পর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।"

এই আয়াতগুলি এই পৃথিবীতে সাফল্য এবং ব্যর্থতার সঠিক সংজ্ঞা বোঝার গুরুত্বও তুলে ধরে। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলো শেখা এবং তার ওপর কাজ করা, যার মাধ্যমে কেউ তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, উভয় জগতেই সাফল্য নিশ্চিত করে। অথচ মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উপেক্ষা করলে উভয় জগতেই ক্ষতি হয়। এই বাস্তবতা কতটা সত্য তা উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজনকে অবশ্যই তাদের চারপাশের এবং অতীতের লোকদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সবচেয়ে জাগতিক বিলাসিতা যাদের আছে তারা প্রায়শই অন্য কারো তুলনায় সবচেয়ে বেশি চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত সাফল্য তাই সম্পদ, পরিবার, খ্যাতি এবং একটি অভিনব কর্মজীবনের মতো পার্থিব জিনিসগুলিতে নিহিত নয়, কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলি কেবল তার বাহকের জন্য চাপ এবং দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে যদি তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 63-64:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [হে বনী ইসরাঈল, তাওরাত মেনে চলার] এবং আমরা তোমাদের উপরে পর্বত তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে আপনি ধার্মিক হতে পারেন।" অতঃপর এর পর তুমি

মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।”

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা তাঁর সাথে তাদের চুক্তি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাওরাতের অপরিবর্তিত শিক্ষাগুলি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। এর একটি দিক ছিল ইসলাম গ্রহণ করা, যেমন পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআন তাওরাত ও বাইবেলে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু কিতাবের অধিকাংশ লোক তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল এবং তাওরাতের শিক্ষার উপর আমল করার প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করেছিল। তারা তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাদের ভালবাসায় অভিভূত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নিয়ামত ব্যবহার করতে বাধ্য করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে তাওরাতের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে তারা যে সামাজিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব অর্জিত করেছিল তা হারানোর আশঙ্কাও করেছিল। তারা তাদের দেওয়া দ্বিতীয় সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই হেরে যায়। মুসলমানদের অবশ্যই এই ধরনের আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করতে ব্যর্থ হলে তাদের এই পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য কারো কথায় বিশ্বাসের দাবি করা যথেষ্ট নয়। . একজনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের উভয় জগতেই আরও ভালভাবে সেবা করবে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান কঠোরভাবে মেনে চলে, এটা জেনে যে এটি তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে কাজ করবে। তাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা এবং তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করার চেয়ে স্বাস্থ্য ভাল।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 65-66

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾

فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

"এবং যারা বিশ্রামের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জানতে পেরেছিলে এবং আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা তুচ্ছ বানর হও।"

এবং আমরা এটাকে যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা করেছিলাম।"

65 শ্লোকের প্রথম অংশ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 65:

" *এবং যারা বিশ্রামবার সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছিলে..."*

জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য নেই যতক্ষণ না তা বাস্তবায়িত হয়। এটা জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের জন্যই সত্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে, পবিত্র কুরআন কঠোরভাবে তাদের সমালোচনা করেছে যারা ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী তবুও এটিতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

কর্ম ছাড়া জ্ঞান সেই ব্যক্তির মতো যার কাছে একটি নিরাপদ গন্তব্যের মানচিত্র রয়েছে কিন্তু নিরাপত্তা পৌঁছানোর জন্য এটিতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। উভয় জগতে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার জন্য জ্ঞান অন্বেষণের সমস্ত ধাপ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথম পর্যায় হল সঠিক নিয়ত অবলম্বন করা, যা হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। যারা ভুল উদ্দেশ্যের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজা, 253 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হল একটি নির্ভরযোগ্য

উৎস থেকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা। চূড়ান্ত পর্যায় হল এই জ্ঞানকে একজনের কথাবার্তা, কাজ এবং সাধারণ আচরণে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা করা যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। তিনটি পর্যায় পূর্ণ করা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 65:

" এবং যারা বিশ্রামবার সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছিলে..."

যদিও বনী ইসরাঈল থেকে যারা সাবাথ লঙ্ঘন করেছিল তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবের পূর্বপুরুষ ছিল, তথাপি মহান আল্লাহ তাদের উল্লেখ করেছেন। যদি তারা একই গ্রুপ থেকে হয়। কারণ যারা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মতো আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছ থেকে, যদিও তারা বিভিন্ন প্রজন্মের হয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কারণেই মুসলমানদের জন্য

আন্তরিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, যাতে তারা তাদের মধ্যে গণ্য হয়। পরকালে কিন্তু যদি তারা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে তবুও মুনাফিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শিক্ষা ও আমলকে উপেক্ষা করেছিল, তবে তারা তাদের একজন হিসাবে গণ্য হবে। মুনাফিকদের মহান আল্লাহ কিতাবধারীদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করছিলেন, অন্যথায় তারা তাদের একজন হিসাবে গণ্য হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 65:

"এবং যারা বিশ্রামের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জানতে পেরেছিলে এবং আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা তুচ্ছ বানর হও।"

যারা সাবাথ লঙ্ঘন করেছিল তাদের কাহিনী পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এবং শুধুমাত্র আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এই আয়াতগুলির উদ্দেশ্য হল কিতাবের লোকদের সতর্ক করা, এবং বর্ধিতভাবে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা। সম্প্রদায়, মহান আল্লাহকে অমান্য না করা, কারণ এটি উভয় জগতের সমস্যা এবং অন্যদের কর্মের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার গুরুত্বের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, অন্যান্য আয়াতে আলোচিত মূল পাঠ যা সাবাথ ভঙ্গকারীদের নির্দেশ করে, তা নির্দেশ করে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব এবং ভালোর আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 163-166:

"এবং তাদেরকে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত শহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন - যখন তারা বিশ্রামবারে সীমালঙ্ঘন করেছিল - যখন তাদের মাছ তাদের বিশ্রামবারে প্রকাশ্যে তাদের কাছে এসেছিল এবং যেদিন তাদের কোন বিশ্রামবার ছিল না তারা তাদের কাছে আসেনি।. এভাবেই আমি তাদের পরীক্ষা দিয়েছিলাম কারণ তারা ছিল অবাধ্য। আর যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "তোমরা কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ[বা সতর্ক কর] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন? তারা (উপদেষ্টাগণ) বলল, তোমার পালনকর্তার সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং সম্ভবত তারা তাকে ভয় করতে পারে। অতঃপর যখন তারা [অর্থাৎ উপদেশপ্রাপ্তরা] তা ভুলে গেল যার দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা তাদের রক্ষা করেছি যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেছিল এবং যারা অন্যায় করেছিল তাদের পাকড়াও করেছিলাম মন্দ শাস্তি দিয়ে, কারণ তারা অবাধ্যতা করত। অতঃপর যখন তাদের নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যাপারে তারা উদ্ধত হল, তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা বানর হয়ে যাও"।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 65-66:

"এবং যারা বিশ্রামের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জানতে পেরেছিলে এবং আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা তুচ্ছ বানর হও।" এবং আমরা এটাকে যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা করেছিলাম।"

এই আয়াতগুলি মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ এটি উভয় জগতে কঠোর শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পার্থিব জীবনে, মহান আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায়, তা তাদের বহনকারীর জন্য মানসিক চাপ ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই লোকেরা বুঝতে পারবে না কেন তারা স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং হতাশার মুখোমুখি হয় কারণ তাদের হাতে পৃথিবী রয়েছে এবং তাদের সমস্ত পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে আল্লাহই মহান, যিনি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, এবং তাই তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন যে কেউ মানসিক শান্তি পায় কি না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

ফলস্বরূপ, তারা তাদের আশেপাশের ভাল লোকদের যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের দোষারোপ করবে এবং তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এটি কেবল তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আরও ডুবে যেতে পারে। এই অন্ধকার এবং কঠিন যাত্রা প্রায়ই আত্মহত্যার মধ্যে শেষ হয়। কিন্তু পরকালে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এটি কেবল তখনই এড়ানো যেতে পারে যখন কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ঐতিহ্য অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

যারা বিশ্রামবার লঙ্ঘন করেছিল তারা বানরে পরিবর্তিত হয়েছিল কারণ তারা পশুদের মতো আচরণ করেছিল যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সম্পূর্ণভাবে কাজ করেছিল। মুসলমানদের অবশ্যই ভয় করতে হবে যে তারা একইভাবে আচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তারা আধ্যাত্মিকভাবে পশুতে রূপান্তরিত হবে। এই রূপান্তরটি কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে গভীরভাবে ডুবে যেতে পারে, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 65-66:

"এবং যারা বিশ্রামের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা আগেই জানতে পেরেছিলে এবং আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা তুচ্ছ বানর হও।" এবং আমরা এটাকে যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা তাদের

স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা করেছিলাম।"

এই আয়াতগুলি আত্মমগ্ন হওয়া এড়ানোর গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের চারপাশের জিনিস এবং মানুষ এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যের কর্মের পরিণতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে শিখতে হবে, এই লোকেরা তাদের পরিচিত হোক বা না হোক, তারা তাদের প্রজন্মের হোক বা না হোক। অন্যের কর্মের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া হল আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কীভাবে আচরণ করা উচিত তা শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির মধ্যে একটি। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখবে যে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকা সত্ত্বেও তারা ক্রমাগত যে মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তারা সেই নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাদের শান্তি দান করেন তাদের লক্ষ্য করেন। মনে, এই পৃথিবীতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

উপরন্তু, যাদের কাছে পার্থিব জিনিস কম আছে তাদের পর্যবেক্ষণ করাও একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে। কৃতজ্ঞতা বলতে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। অন্য কোনো কারণে যেমন লোকেদের জন্য কাজ করা

সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় যা ভালো তা বলা বা চুপ থাকা। এবং একজনের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতা হল পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যারা আরও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা ছোট করতেও উৎসাহিত করে। এটি একজনকে ধৈর্য ধরে থাকতে সহায়তা করবে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা।

অন্যদের দ্বারা নির্বাচিত পথ এবং তাদের পছন্দের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করা একজনকে একটি মূর্খ মনোভাব গ্রহণ করা এড়াতে সহায়তা করবে যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের মতো একই ভুল পথ বেছে নিতে পারে এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। যখন কেউ অন্যদের সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি অনুসারে জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করবে কিন্তু এটি উভয় জগতেই তাদের দুঃখের কারণ হবে। এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয় যখন একজন

অন্য ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে যারা অতীতে এবং বর্তমান সময়ে একই পছন্দ করেছে। কিন্তু আয়াত 66 এর শেষের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং উভয় জগতে তাদের কর্মের ফলাফলকে ভয় করে, তারা অন্যদের পর্যবেক্ষণ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত তার প্রতি মনোযোগ দেবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 66:

"এবং যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা [তাদের] স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য আমরা এটিকে একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা বানিয়েছি।"

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাদের কর্মের পরিণাম তার পরিবর্তে তাদের কামনা-বাসনাকে মুক্ত করবে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এবং ঠিক যেমন ইতিহাসে এবং বর্তমান সময়ে যারা একই পদ্ধতিতে আচরণ করে, তারাও সমস্যার মুখোমুখি হবে।

আয়াত 66 এও ইঙ্গিত দেয় যে কিতাবের লোকেরা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী যারা সাবাথ লঙঘন করেছিল, তারা মহান আল্লাহকে ভয় করে না, কারণ যারা তাকে ভয় করে তাদের আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 66:

"এবং যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা [তাদের] স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য আমরা এটিকে একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা বানিয়েছি।"

মদিনায় বসবাসকারী অধিকাংশ গ্রন্থের লোকেরা আল্লাহকে ভয় করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের কর্মের পরিণতি করেছে, যদিও এর সত্যতা তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল কারণ তারা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদকে চিনতে পেরেছিল। , শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হোক, যেহেতু তারা উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

ফলস্বরূপ, কিতাবের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো উভয় জগতে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 66:

"এবং যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা [তাদের] স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তাদের জন্য আমরা এটিকে একটি প্রতিরোধমূলক শাস্তি এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য একটি শিক্ষা বানিয়েছি।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 67-73

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ
بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ
ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ
لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟
ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
﴿٧٢﴾

فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ
ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তারা বলল, আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। [মূসা] বললেন, "[আল্লাহ] বলেছেন, 'এটি এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধও নয়, কুমারীও নয়, বরং এর মধ্যবর্তী, তাই তুমি যা আদেশ করা হয়েছে তা করো।"

তারা বলল, আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন আমাদের দেখান তার রং কেমন। তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন, 'এটি একটি হলুদ গাভী, বর্ণে উজ্জ্বল - পর্যবেক্ষকদের কাছে আনন্দদায়ক।'"

তারা বলল, "আপনার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। নিশ্চয়ই [সকল] গরু আমাদের কাছে একই রকম। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ পাব।"

তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা মাটিতে লাঙ্গল বা ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত নয়, তার গায়ে কোন দাগ নেই।'" তারা বলল, "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" তাই তারা তাকে জবাই করেছিল, কিন্তু তারা খুব কমই করতে পারে।

আর [স্মরণ করুন] যখন তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে।

অতঃপর আমরা বললাম, তাকে [হত্যা করা লোকটিকে] এর কিছু অংশ [জবেহ করা গরু] দিয়ে আঘাত কর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

গরু জবাই করার আদেশটি আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে কারণ এই আয়াতগুলিতে শেখানো একটি প্রধান শিক্ষা হ'ল হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি এবং মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বনী ইসরাঈলদের খারাপ আচরণ। . অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 67-73:

“এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" ... এবং [স্মরণ করুন] যখন তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন। . অতঃপর আমরা বললাম, তাকে [হত্যা করা লোকটিকে] এর কিছু অংশ [জবেহ করা গরু] দিয়ে আঘাত কর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন..."

পবিত্র কুরআন কোনো গল্পের বই বা ইতিহাসের বই নয় যা তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত। পরিবর্তে, এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ শেখানোর জন্য ইতিহাসের কিছু দিক তুলে ধরে। পবিত্র কুরআনও নির্দিষ্ট পাঠ শেখানোর জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার সময় প্রায়শই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি করে। তাই একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শৈলীকে গ্রহণ করতে হবে এবং উল্লেখ করা হয়নি এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে মহান আল্লাহ যা আলোচনা করেছেন তাতে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ তাদের শেখার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ শেখার প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, হযরত মুসা

(আঃ)-এর প্রতি তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মানের অভাব ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 67:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, "আপনি কি আমাদের উপহাস করছেন?"...

কিতাবের লোকেরা তাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তাঁকে এবং পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আরও খারাপ আচরণ করছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্মান করে একই ধরনের আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটি ঘটে যখন কেউ তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতি ভালবাসা এবং সম্মানের দাবি করে কিন্তু তার ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের কর্মে তা দেখাতে ব্যর্থ হয়। কারো জীবন, চরিত্র ও শিক্ষা না জেনে ভালোবাসার দাবি করাটা অকপটে অযৌক্তিক। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের চেয়ে এটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে। যারা তার প্রতি কার্যত তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় তারা পরকালে তার সাথে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ সহীহ বুখারি, 3688 নম্বর হাদিসটি পাওয়া যায়, যা পরামর্শ দেয় যে তারা পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে প্রযোজ্য। ব্যবহারিকভাবে তাদের ভালবাসা দেখান। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে লক্ষ্য করে যারা মৌখিকভাবে তাদের নবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও এটা স্পষ্ট যে তারা তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে না কারণ তারা তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 67:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, "আপনি কি আমাদের উপহাস করছেন?"...

বনী ইসরাঈলরা স্পষ্টতই গরু জবাই করার পেছনের হিকমত বুঝতে পারেনি কিন্তু যেহেতু তারা মহান আল্লাহকে তাদের রব এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে মেনে নিয়েছিল, তাই তাদের বিনা দ্বিধায় ইতিবাচক সাড়া দেওয়া উচিত ছিল। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 51:

"[সত্য] মুমিনদের একমাত্র বক্তব্য হল যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনি এবং মান্য করি। আর তারাই সফলকাম।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশ ও আদেশের পেছনের প্রজ্ঞা বোঝার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ, মহান, মানুষের জন্য যা ভালো তা বেছে নেন তা বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। মহান আল্লাহর হুকুম-আহকামের পেছনের সমস্ত হিকমত যদি মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বাস এতটা মূল্যবান হবে না, যেমন জাহান্নাম ও জান্নাতের মতো অদৃশ্য উপাদানের ওপর বিশ্বাস করাটাও তেমন মূল্যবান হবে না যদি ব্যক্তিকে এই অদেখা জিনিস দেখানো হয়েছিল। একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন অধ্যয়ন করতে হবে, দৃঢ়ভাবে বুঝতে হবে যে আল্লাহ, মহান, আদেশ ও আদেশ সবকিছুই জড়িত লোকদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি তাদের পিছনে প্রজ্ঞা থাকলেও। তাদের কাছ থেকে লুকানো। এই বাস্তবতা বোঝার জন্য একজনকে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও ভাবতে হবে। মানুষ কতবার এমন কিছু চেয়েছে যা তাদের জন্য খারাপ ছিল? কতবার মানুষ অপছন্দ করেছে শুধুমাত্র পরবর্তীতে গ্রহণ করা তাদের জন্য ভাল ছিল? অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

বনী ইসরাঈলরা এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা মহানবী হযরত মুসা (আঃ)-এর জিহ্বায় প্রদত্ত মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি অসম্মানজনকভাবে জবাব দিয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 67:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মহানবী মূসা (আঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর নির্দেশের সাথে সম্পৃক্ত রসিকতা করা একটি অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব যা পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত যেকোন কিছু নিয়ে উপহাস করা বা তামাশা করা এমনকি একজনের বিশ্বাস হারাতে পারে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 65-66:

"এবং যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা অবশ্যই বলবে, "আমরা কেবল কথা বলছিলাম এবং খেলছিলাম।" বল, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের

সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোন অজুহাত করবেন না; আপনি আপনার বিশ্বাসের পরে অবিশ্বাস করেছেন [অর্থাৎ, বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান]। আমরা যদি তোমাদের একটি দলকে ক্ষমা করি - তবে আমরা অন্য দলটিকে শাস্তি দেব কারণ তারা অপরাধী ছিল।"

কিন্তু এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মাঝে মাঝে বিধর্মী বিষয় নিয়ে কৌতুক করা যার মাধ্যমে সকল প্রকার পাপ পরিহার করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব মাঝে মাঝে এই পদ্ধতিতে রসিকতা করেছেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটিও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাপপূর্ণ উপায়ে অতিরিক্ত রসিকতা করার অর্থ এই নয় যে একজন দুঃখী ও বিষণ্ন মেজাজ অবলম্বন করা উচিত। অন্যদের সাথে হাসিখুশি হওয়া এবং অতিরিক্ত ঠাট্টা করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 67:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আরবী ভাষায় অজ্ঞতার সাথে আচরণ করাকে বোঝায় যে তাদের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই হযরত মুসা (আঃ) এর জবাবও অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ বুখারী, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসেও এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখনই তারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে তখনই নীরবতা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা তাদের কথায় পাপ না করে, কারণ কখনও কখনও কাজের চেয়ে কথার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি হতে পারে। আবেগপ্রবণ ব্যক্তিকে অন্যের প্রতি শারীরিকভাবে আঘাত করা এড়াতে একটি নিষ্ক্রিয় শারীরিক অবস্থানও গ্রহণ করা উচিত। দাঁড়ানো ব্যক্তিকে বসতে হবে এবং প্রয়োজনে বসে থাকা ব্যক্তিকে শুয়ে পড়তে হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তির জন্য পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে যাওয়াও ভাল ধারণা যতক্ষণ না তারা শান্ত হয়। তবেই তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 67-68:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারা বলল, "তোমার রবের কাছে ডাক, যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় এটা কি।"

হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি বনী ইসরাঈলদের অসম্মানের আরেকটি দিক হল, তারা তাঁকে আদেশটি স্পষ্ট করতে বলেনি, যেন তাঁর কথা তাদের জন্য যথেষ্ট ভালো ছিল না। তারা পীড়াপীড়ি করল যে সে যেন মহান আল্লাহর কাছে উত্তর চায়। মহানবী মূসা (আঃ) তাদের অসম্মানজনক আচরণ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন এবং তাই প্রথম থেকেই তাদের জানিয়েছিলেন যে মহান আল্লাহই তাদের একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও তাদের এই আদেশটি মেনে নেওয়া উচিত ছিল না। দ্বিধা এমনকি যদি তা সরাসরি হযরত মুসা (আঃ)-এর কাছ থেকে আসে। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবেও উল্লেখ করেনি, বরং তারা তাকে হযরত মুসা (আঃ)-এর রব বলে উল্লেখ করেছে। এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব মুসলমানদের দ্বারাও গ্রহণ করা যেতে পারে যখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিতে ব্যর্থ হয় যার আনুগত্য প্রতিটি পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক। কিছু মূর্খ লোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদা হ্রাস করার অপচেষ্টা করেছে, তাঁর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে, যদিও পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা ফরজ করা হয়েছে। এইসব বিপথগামী লোকেরা এমন মূর্খ আকিদা গ্রহণ করার জন্য পবিত্র কুরআন কি অধ্যয়ন করেছে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআন শরীফ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈমানের স্তম্ভে পরিণত করেছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

" যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 65:

"কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা [সত্যিকার] বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের মধ্যে যে বিষয়ে বিতর্ক করে তার বিচার না করে এবং তারপর আপনি যে বিচার করেছেন তাতে নিজেদের মধ্যে কোন অস্বস্তি না পান এবং [সম্পূর্ণ, স্বেচ্ছায়] বশ্যতা স্বীকার করেন।"

এগুলি অগণিত অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 67-68:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারা বলল, আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। [মূসা] বললেন, "[আল্লাহ] বলেছেন, 'এটি এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধও নয়, কুমারীও নয়, বরং এর মধ্যবর্তী, তাই তুমি যা আদেশ করা হয়েছে তা করো।"

তাদের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করার পর, হযরত মুসা (আঃ) তাদেরকে বিভ্রান্তিকর মনোভাব অবলম্বন করার পরিবর্তে মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যাতে কেউ অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং গবেষণা করে যা কেবল তাদের বিভ্রান্ত করে। মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই কেবল সেই ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে হবে যা তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ঐতিহ্যে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। এগুলি এমন বিষয় যা বিচার দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাই এই জ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা উচিত। অপ্রাসঙ্গিক ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে ডুব দেওয়া কেবল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা থেকে বিক্ষিপ্ত করে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের সম্পদকে ব্যস্ত করে। সহীহ মুসলিমের ৩২৫৭ নং হাদিসে সঠিকভাবে নির্দেশিত মনোভাবের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সঠিক পথনির্দেশিত মনোভাবই হযরত মুসা

(আঃ) তাঁর জাতিকে অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু তারা তা বুঝতে ও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন । পরিবর্তে, তারা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। প্রাথমিক নির্দেশ ছিল যে কোনো গরু জবাই করা কিন্তু তারা অপ্রস্তুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়, আদেশটি আরো সুনির্দিষ্ট এবং তাই বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 68-71:

" তারা বলল, "তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর যেন এটা কি তা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে।" [মূসা] বললেন, "[আল্লাহ] বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা বৃদ্ধও নয় এবং কুমারীও নয়, বরং এর মধ্যবর্তী, সুতরাং আপনি যা আদেশ করেছেন তাই করুন।'" তারা বলল, "আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদেরকে দেখান যা কি? তার রং। তিনি বললেন, তিনি বলেন, 'এটি একটি হলুদ গাভী, বর্ণে উজ্জ্বল- দর্শকদের জন্য আনন্দদায়ক।' তারা বলল, "আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। প্রকৃতপক্ষে, [সব] গরু আমাদের কাছে একই রকম দেখতে। আর আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আমরা হেদায়েত পাব।" তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা মাটিতে লাঙ্গল বা ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত নয়, তার গায়ে কোন দাগ নেই।'" তারা বলল, "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" তাই তারা তাকে জবাই করেছিল, কিন্তু তারা খুব কমই করতে পারে।"

যদিও বনী ইসরাঈল বাহ্যিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেছিল, তবুও তারা আন্তরিকভাবে তাঁর এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা রহমতের আশার পরিবর্তে ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিল। মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ। অর্থ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে

ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হলেন যারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করতে পারে, যদিও তারা মাঝে মাঝে পাপ করে। অথচ, মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা এবং তিনি রহমত ও ক্ষমা করবেন বলে বিশ্বাস করা কেবল ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এছাড়াও, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে একই জিনিস জবাই করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যা তারা আগে পূজা করত, একটি সোনার বাছুর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 51:

“এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য একটি ওয়াজ করেছি। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে [অর্থাৎ তার প্রস্থানের জন্য] গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।"

এই আদেশের পিছনে একটি প্রজ্ঞা ছিল তাদেরকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার গুরুত্ব শেখানো, কারণ তাদের সোনার বাছুরের উপাসনা ছিল এমন একটি জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা যা তারা পূরণ করতে স্বাধীন ছিল। সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের সমস্ত পার্থিব ইচ্ছা। নিষ্প্রাণ সোনার বাছুর তাদের আচরণবিধি দিতে পারে না, তাই তারা কেবল তাদের ইচ্ছার উপযোগী একটি তৈরি করবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 148:

“এবং মূসার লোকেরা [তাঁর প্রস্থানের পর] তাদের অলঙ্কার থেকে একটি বাছুর তৈরি করেছিল - একটি মূর্তি যার একটি নিচু শব্দ ছিল। তারা কি দেখেনি যে, এটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদের কোন পথ দেখাতে পারে না? তারা এটাকে [উপাসনার জন্য] গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল অন্যায়কারী।"

অতএব, গরু জবাই করা একটি শিক্ষা ছিল যা ইঙ্গিত দেয় যে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে নিজের ইচ্ছার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী নিজেকে বা অন্য লোকেদের সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। .

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 68-71:

" তারা বলল, "তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর যেন এটা কি তা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে।" [মূসা] বললেন, "[আল্লাহ] বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা বৃদ্ধও নয় এবং কুমারীও নয়, বরং এর মধ্যবর্তী, সুতরাং আপনি যা আদেশ করেছেন তাই করুন।'" তারা বলল, "আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদেরকে দেখান যা কি? তার রং। তিনি বললেন, তিনি বলেন, 'এটি একটি হলুদ গাভী, বর্ণে উজ্জ্বল-দর্শকদের জন্য আনন্দদায়ক।' তারা বলল, "আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। প্রকৃতপক্ষে, [সব] গরু আমাদের কাছে একই রকম দেখতে। আর আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আমরা হেদায়েত পাব।" তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা মাটিতে লাঙ্গল বা ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত নয়, তার গায়ে কোন দাগ নেই।'" তারা বলল, "এখন

আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" তাই তারা তাকে জবাই করেছিল, কিন্তু তারা খুব কমই করতে পারে।"

এই ঘটনাটি নিজের পথ নির্ধারণের পরিবর্তে ঐশ্বরিক শিক্ষা এবং আদেশগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ পরবর্তী মনোভাব শুধুমাত্র সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে মনে হয়। আসল বিষয়টি হল যে কেউ অন্য জিনিসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তারা হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর তত কম কাজ করবে। অন্যান্য বিষয়ের উপর কাজ করা হল মুসলমানদের জীবনে প্রবেশ করা বিদেশী অভ্যাসের প্রধান কারণ, অন্যান্য ধর্ম থেকে নেওয়া অনুশীলন। এই অনুশীলনগুলিকে প্রায়শই নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যা ফলস্বরূপ কেবল বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 72:

"আর [স্মরণ করুন] যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু তুমি যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন।"

মহান আল্লাহ, ইসরায়েলের সন্তানদের জন্য একজন ব্যক্তির হত্যার সমাধান করেছিলেন যাতে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে প্রত্যেকেরই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে, এমনকি এটি অন্য লোকেদের কাছ থেকে লুকানো একটি গোপন কাজ হলেও। অতএব, একজনকে ক্রমাগত তাদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ হয় কেননা বিচারের দিন কিছুই গোপন থাকবে না। যিনি বিচার করবেন এবং এই পৃথিবীতে তাদের আচরণ সংশোধন করবেন তিনি দেখতে পাবেন যে তাদের চূড়ান্ত বিচার সহজ হবে। কিন্তু যে এটা করতে ব্যর্থ হয় সে দেখবে যে তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 101 আল ক্বারিয়াহ, আয়াত 6-11:

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হয় [ভালো আমলে]। তিনি একটি সুখী জীবন হবে. কিন্তু যার দাঁড়িপাল্লা হালকা। তার আশ্রয় হবে অতল গহ্বর। এবং আপনি কি তা কি জানতে পারেন? এটি একটি আগুন, তীব্র গরম।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 72:

"আর [স্মরণ করুন] যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু তুমি যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন।"

মহান আল্লাহ যেমন তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট করেছেন এবং তারা একে অপরের প্রতি হত্যার মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বিচারের দিন মহান আল্লাহ কখনই অজুহাত এবং দোষারোপ কবুল করবেন না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, মানুষের পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় উৎস শয়তানকে উদ্ধৃত করেছেন, যখন তিনি এমন লোকদের সম্বোধন করবেন যারা তাকে দোষারোপ করে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে পালাতে চেষ্টা করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেদেরকে দোষারোপ করো।

মহান আল্লাহ যদি পরিষ্কার করে দেন যে, শয়তানকে দোষারোপ করে কেউ তাদের কর্মের পরিণতির সম্মুখীন হতে রেহাই পাবে না, তাহলে তিনি কীভাবে অন্য কোন অজুহাত গ্রহণ করবেন? তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজের জন্য সর্বদা দায়িত্ব নিতে হবে যাতে তারা বিচার দিবসে পৌঁছানোর আগে তাদের সংশোধন করে নেয় যখন তাদের সংশোধন করা সম্ভব হবে না।

লোকটির হত্যার সমাধানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে আরেকটি সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 72-73:

“ আর [স্মরণ কর] যখন তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে। অতঃপর আমরা বললাম, "তাকে [অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে] এর কিছু অংশ [জবেহ করা গরুকে] আঘাত কর।" এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

এত সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও, ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই এখনও দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী। মহান আল্লাহ তাদেরকে আরেকটি অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন যাতে তারা সাক্ষী হয়ে দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করতে পারে। দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক কারণ এটি একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ যুগে ইসলামি জ্ঞান শেখার ও আমলের মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করা হয়। ইসলামের সত্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিগুলি কীভাবে সর্বদা যুগে যুগে বাস্তবায়িত হয়েছে তার ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণগুলি যখন কেউ পর্যবেক্ষণ করে, তখন একজন মুসলমানের বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

উপরন্তু, এটা বিস্ময়কর যে মহান আল্লাহ কিভাবে একটি মৃত ব্যক্তিকে একটি মৃত মাংসের টুকরো দিয়ে জীবিত করেছেন। একইভাবে মহান আল্লাহ মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর তাদের ফিরিয়ে আনা এবং ধূলি ও হাড়ে পরিণত করা একটি সহজ কাজ। অন্যথায় বিশ্বাস করা কেবল অযৌক্তিক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 73:

"...এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি জীবনে পর্যবেক্ষক হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের জীবন, অন্যদের জীবন এবং মহাবিশ্বকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে তারা তাদের থেকে শিক্ষা নিতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কেউ দেখে যে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তারা অগণিত মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন উদ্বেগ, স্ট্রেস, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের পায়ের কাছে থাকা সত্ত্বেও, তারা অবশ্যই এই উপসংহারে পৌঁছাবে যে শান্তি। মন শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার মধ্যেই নিহিত। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

একজনকে অবশ্যই আসমান ও পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে স্থাপিত নিদর্শনগুলির প্রশংসা করতে হবে যা বিচার দিবসে পুনরুত্থানের বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ দিন ও রাত পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ রাত্রিকালে মৃত্যুর মতো অবস্থা

অনুভব করার পরে কীভাবে সূর্যালোকের মাধ্যমে পৃথিবীকে জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত জমিকে জীবন দান করেন এবং পৃথিবীতে রোপিত মৃত বীজকে জীবন দান করেন। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 39:

"এবং তাঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে যে, আপনি পৃথিবীকে স্তব্ধ দেখতে পান, অতঃপর যখন আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা কাঁপতে থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে, যিনি এটিকে জীবন দিয়েছেন তিনিই মৃতদের জীবন দানকারী। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

ঘুম জাগরণ চক্র একটি ছোট পুনরুত্থান যা প্রতিদিন ঘটে। ঘুম হল মৃত্যুর বোন, ঘুমের সময় যেমন মানুষ তার জ্ঞান হারায়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তা হারায়। যাদেরকে জীবন দেওয়া হয়েছে তাদের জাগ্রত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মহান আল্লাহ। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

যখন কেউ সারা বছর ধরে বিভিন্ন ঋতু এবং ফসল, গাছপালা এবং গাছের উপর তাদের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে তখন এটি পুনরুত্থানের বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ

করে। শীতকালে গাছগুলি তাদের পাতা ঝরে যায় এবং মৃত দেখায় তবে অন্যান্য ঋতুতে তাদের আবার জীবন দেওয়া হয়।

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই একটি পর্যবেক্ষক মানসিকতা অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন, অন্যের জীবন এবং বিশ্বের মধ্যে থাকা নিদর্শন থেকে শিক্ষা নেয় যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। এর ফলে তারা তাঁর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াতে উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 73:

"... এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

এবং অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 74

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ
وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤

“অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মতো বা তার চেয়েও কঠিন। কেননা, এমন পাথর আছে যেগুলো থেকে নদীগুলো বের হয়, আর তাদের মধ্যে কিছু পাথর আছে যেগুলো ফেটে যায় এবং পানি বের হয়, আর তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায়। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদের দেখানো কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেছে যা ফলস্বরূপ তাদের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করা উচিত ছিল। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাদের দেওয়া হয়েছিল তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলের সন্তানদের অন্তর তাদের পার্থিব বাসনা পূরণের নেশায় মত্ত ছিল, যা তারা একটি নির্জীব মূর্তির পূজা করার সময় স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল, তারা জেনেছিল যে এটি তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি দ্বারা জীবনযাপনের আদেশ দিতে পারে না, যা তাদের এই কোডটি তৈরি করতে দেয়। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ. ফলস্বরূপ, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি কঠোর হয়ে ওঠে, যার ফলে তারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৩৪ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যখন কেউ পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করে, ততই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় অন্ধকারে ঢেকে যায়। এই অন্ধকার মানুষকে ঐশ্বরিক শিক্ষার মধ্যে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলো থেকে উপকৃত হতে বাধা দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

" *অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন...*"

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে শিখে ও আমল করার মাধ্যমে কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এতে আলোচনা করা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা, এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিও এড়িয়ে যাবে, যেমন লোভ, হিংসা এবং অহংকার। যখন কেউ ভালো বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলে, তখন তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় কোমল ও পবিত্র হয়ে ওঠে। এই পবিত্রতা তখন তাদের কথা

ও কাজে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে। অর্থ, তাদের কথা ও কর্মের মূলে থাকবে কল্যাণ। এটি সহীহ বুখারি, 52 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় একজন ব্যক্তিকে নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবী অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি খোদায়ী শিক্ষায় আলোচিত উত্তম বৈশিষ্ট্য গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তার পরিবর্তে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, সে দেখবে যে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় কঠিন ও অপবিত্র হয়ে গেছে। এই কঠোরতা ও অপবিত্রতা তখন তাদের কথাবার্তা ও কাজে প্রতিফলিত হবে। এর ফলে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে, যার ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

শুদ্ধ এবং অপবিত্র আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং তাদের পরিণতির মধ্যে পার্থক্যটি আল আনআম, 125 নম্বর আয়াতেও নির্দেশিত হয়েছে:

"সুতরাং আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান - তিনি তার বক্ষকে [ধারণে] ইসলামের জন্য প্রসারিত করেন; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তিনি তার বক্ষকে শক্ত ও সংকুচিত করেন যেন তিনি আকাশে আরোহণ করছেন। এভাবে যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আল্লাহ অপবিত্রতা আরোপ করেন।

যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে সে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করাকে উপেক্ষা করে সে তাদের বেছে নেওয়া বিপথগামী পথে পরিত্যাগ করবে।

মহান আল্লাহ তারপর কিছু ভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক হৃদয় বর্ণনা করেন যা মানুষ গ্রহণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

" *অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন। কেননা, এমন পাথর আছে যেখান থেকে নদী বের হয়..."*

পাথর থেকে যেমন নদী বের হতে পারে, তেমনি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় ভালো কথা ও কর্মের প্রবাহের দিকে নিয়ে যায়। এই আধ্যাত্মিক হৃদয় ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে এর বাহক এবং অন্যদের উপকার করে। এই আধ্যাত্মিক হৃদয় থেকে যে জল বেরিয়ে আসে তাও ঐশ্বরিক জ্ঞানকে নির্দেশ করতে পারে, যা আকাশ থেকে নেমে আসে, যেমন বৃষ্টির জল আকাশ থেকে নেমে আসে। এর অর্থ এই যে এই আধ্যাত্মিক হৃদয় ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখে, কাজ করে এবং শেয়ার করে, যাতে এটি তাদের কথাবার্তা এবং কাজ এবং অন্যদের কথাবার্তা এবং কর্মে লক্ষ্য করা যায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সকলেই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। অতএব, পূর্বে নির্দেশিত হিসাবে, একটি আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মূল হল ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

" *অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন... এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে যা বিদীর্ণ হয় এবং পানি বের হয়...*"

এই ধরণের আধ্যাত্মিক হৃদয় আগেরটির মতোই, তবে পার্থক্য হল যে এটি প্রথম ধরণের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মতো অন্যদের উপকার করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করতে পারে কিন্তু তারা অন্যদের সক্রিয়ভাবে শেখাতে পারে না। এবং এই আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য কম চেষ্টা করে কিন্তু তারা যত কম জানে

এবং শেখে, তারা আন্তরিকভাবে এটিকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, যা তাদের প্রচেষ্টা অনুসারে তাদের এবং অন্যদের উপকার করে। যদি কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে আশা করা যায় তারা শেষ পর্যন্ত প্রথম ধরণের আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করবে, যেটি ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার, কাজ করা এবং ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে নিমগ্ন, যাতে তারা তাদের কাছে থাকা সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে। অন্যদের একই কাজ করতে উত্সাহিত করুন। এটাই একমাত্র পথ যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

" *অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন… এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায়..."*

চূড়ান্ত প্রকারের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের ধারক অগত্যা ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য প্রচেষ্টা করে না তবে তারা ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে এবং ইসলামের প্রধান নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে চেষ্টা করে। এটি মেনে চলা

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ন্যূনতম মান, কারণ যে এটি করতে ব্যর্থ হয় সে মহান আল্লাহকে মোটেই ভয় করে না। ৭৪ নং আয়াতে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ন্যূনতম মান মেনে চলে না সে হল সেই ব্যক্তি যে তাদের কথায় বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু কাজের মাধ্যমে তা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। আশংকা করা হয় যে, যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে হয়তো তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি ঘটতে পারে কারণ বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মতো যা অবশ্যই বাধ্যতামূলক কাজের দ্বারা পুষ্ট করা উচিত, ন্যূনতম কর্মের মধ্যে রয়েছে বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানো। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, তবে এটি ভালভাবে মারা যেতে পারে, যেমন একটি উদ্ভিদ মারা যায় যখন এটি সূর্যালোক এবং জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়। তাই একজনকে অবশ্যই সর্বদা ন্যূনতম মান মেনে চলতে হবে কিন্তু ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধ করতে পারে, এতে আলোচনা করা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করে এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলে। এই ধীরে ধীরে অগ্রগতি নিশ্চিত করবে যে তারা শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রকারের আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

"অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মতো বা তার চেয়েও কঠিন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু পাথর আছে যেগুলো থেকে নদীগুলো বের হয়, আর তাদের মধ্যে কিছু পাথর আছে যেগুলো ফেটে যায় এবং পানি বের হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায়..."

সঠিকভাবে পরিচালিত আধ্যাত্মিক হৃদয়গুলি মহান আল্লাহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই, কোন মুসলমানের কাছে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা এড়াতে কোন অজুহাত নেই।

যেহেতু একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লুকিয়ে থাকে, যেমন একজনের উদ্দেশ্য, মহান আল্লাহ, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আয়াতটি শেষ করেন যে তিনি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের লুকানো দিকগুলি যেমন তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রকাশ্য দিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যেমন একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বাহ্যিক প্রভাব তাদের কথা এবং কর্মের উপর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

তাই তাদের লুকানো অভিপ্রায় সংশোধন করে একটি পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় লাভের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এর একটি চিহ্ন হল তারা অন্যদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা দাবি করে না বা আশা করে না। ভালো কথা বলে বা নীরব থাকার মাধ্যমে তাদের কথা শুদ্ধ করতে হবে । এবং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মকে শুদ্ধ করতে হবে যে আশীর্বাদগুলি তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর মূল হল ঐশ্বরিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করা যাতে তারা এতে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে যেমন ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন অহংকার এবং হিংসা পরিহার করে। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হওয়ার একটি কারণ। এটি তখন স্পষ্ট করে যে অজ্ঞতা একটি কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অন্যতম মূল এবং তাই অবশ্যই পরিহার করা এই ডিজিটাল যুগে যেখানে ইসলামী জ্ঞান সহজলভ্য,

সেখানে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার জন্য তাদের সম্পদকে কাজে লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 75-77

۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

“তোমরা কি আশা কর যে, তারা [কিতাবধারীরা] তোমাদের জন্য ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল [তাদের আলেমগণ] আল্লাহর বাণী শুনত এবং তারপর তা [তাওরাত] বিকৃত করত। তারা জেনেও বুঝেছিলেন?

আর যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন তারা একে অপরের সাথে একাকী থাকে, তখন তারা বলে, "তোমরা কি তাদের সাথে সে বিষয়ে কথা বলছ যা আল্লাহ তোমাদের কাছে নাযিল করেছেন, যাতে তারা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তার সামনে বিতর্ক করতে পারে? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

কিন্তু তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন?

মক্কার অমুসলিমদের প্রচণ্ড অত্যাচার ও বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবীগণ অনায়াসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, কারণ তারা এমন একটি জাতি যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও আইন মেনে চলছিল। মদীনায় হিজরত করার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি শক্তিশালী কারণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব দেখায় যে, তারা অন্যদের প্রতি কতটা আন্তরিকতার অধিকারী ছিল, কারণ তারা সর্বদা নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য কামনা করতেন। তারা যেমন ইসলাম দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া পছন্দ করত, তেমনি তারা অন্যদের জন্যও এটি কামনা করেছিল। মুসলিমদের জন্য এই মনোভাব অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সহীহ মুসলিম, 196 নম্বর হাদিস অনুসারে অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। . অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 75:

“তোমরা কি আশা কর যে, তারা [কিতাবধারীরা] তোমাদের জন্য ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল [তাদের আলেমগণ] আল্লাহর বাণী শুনত এবং তারপর তা [তাওরাত] বিকৃত করত। তারা যখন জানত তখন বুঝতে পেরেছিল?

ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে তারা যা অর্জন করেছিল, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য ভালবাসার কারণে, বইয়ের অধিকাংশ লোক ইসলামকে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল। তাদের জীবনধারা তাদের ধার্মিকতার চেহারা বজায় রেখে তাদের সমস্ত জাগতিক ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়। কিন্তু ইসলাম যেহেতু তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিল, তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআন তাদের আলোচনায় এসেছে। ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ, যা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল এবং জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

আয়াত 75 এটাও স্পষ্ট করে যে কিতাবের লোকেরা তাদের বিশ্বাসের দাবি সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসী বলে বিবেচিত হননি। এটি ইসলামী শিক্ষার মূলে থাকা কর্মের সাথে একজনের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। কাজ ছাড়া মৌখিক দাবির ইসলামে খুব কম মূল্য রয়েছে। যে ব্যক্তি ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে সে সেই ছাত্রের মতোই মূর্খ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞানটি তাদের মনে রয়েছে এবং তাই তাদের উত্তর দিয়ে জ্ঞানটি লেখার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার প্রশ্ন। এই ছাত্রটি যেভাবে ব্যর্থ হবে সেভাবে যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে ইসলামে বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার দাবি করে তবুও

কর্মের মাধ্যমে এই দাবিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হবে। যদিও মহান আল্লাহ, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয়ে কি আছে তা জানেন, তিনি কম নয়, তিনি ঈমানকে বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে যারা বিশ্বাস করে এবং কর্মের সাথে সমর্থন করে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 32:

“যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যুবরণ করে, [হয়ে] উত্তম ও পবিত্র; [ফেরেশতারা] বলবে, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি যা করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 75:

“তোমরা কি আশা কর যে, তারা [কিতাবধারীরা] তোমাদের জন্য ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল [তাদের আলেমগণ] আল্লাহর বাণী শুনত এবং তারপর তা [তাওরাত] বিকৃত করত। তারা যখন জানত তখন বুঝতে পেরেছিল?

বেশীরভাগ কিতাবের এই আচরণ সত্ত্বেও, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাদের সবাই এই আচরণ করেনি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 75:

“তোমরা কি আশা কর যে, তারা [কিতাবধারীরা] তোমাদের জন্য ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল [তাদের আলেমগণ] আল্লাহর বাণী শুনত এবং তারপর তা [তাওরাত] বিকৃত করত। তারা যখন জানত তখন বুঝতে পেরেছিল?

যে কয়েকজন এই পদ্ধতিতে আচরণ করেননি, যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারা ইসলামকে উপস্থাপিত করার সময় সহজেই গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তারা ইসলামের আগমনের প্রচারকারী তাওরাতের শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে মেনে চলেছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি কয়েকজনের কাজের উপর ভিত্তি করে একদল লোককে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। দুঃখজনকভাবে, এই মনোভাবটি প্রায়শই মুসলিমদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় যারা একটি নির্দিষ্ট দেশের লোকদের মতো একটি সম্পূর্ণ দলকে একটি বালতিতে ফেলে দেয়, শুধুমাত্র তাদের একটি দল খারাপ আচরণ করার কারণে। এটি আশ্চর্যজনক কারণ মুসলিমদের সাথে মিডিয়া সবসময় এইভাবে আচরণ করে, কারণ সমগ্র মুসলিম জাতি সংখ্যালঘু বিপথগামী মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয় যারা নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করে। যেহেতু মুসলিমরা এই মনোভাবের নেতিবাচক পরিণতিগুলি অনুভব করেছে, তাই অন্যদের সাথে এইভাবে আচরণ করা এড়াতে তাদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 75:

“তোমরা কি আশা কর যে, তারা [কিতাবধারীরা] তোমাদের জন্য ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল [তাদের আলেমগণ] আল্লাহর বাণী শুনত এবং তারপর তা [তাওরাত] বিকৃত করত। তারা যখন জানত তখন বুঝতে পেরেছিল?

এই আয়াতটি মুসলিমদেরকে ইসলামিক জ্ঞানের প্রতি এমন আচরণ না করার জন্যও সতর্ক করে। তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে শিখতে হবে না এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভুল ব্যাখ্যা করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নামের সাথে দেখানোর মতো ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণকারীদের সতর্ক করেছেন। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তার উপর কাজ করে এবং সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিস লাভের জন্য এই জ্ঞানের অপব্যবহার এড়ায়। আয়াত 76 এটাও স্পষ্ট করে যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে ভুল উত্তর পাওয়া পাপ বলে বিবেচিত হয় না যদিও একজন ব্যক্তির এটি এড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

মহান আল্লাহ, অতঃপর কিতাবধারীদের মধ্য থেকে মুনাফিকদের দ্বিমুখী মনোভাব তুলে ধরেন এবং কীভাবে তারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাদের শিক্ষা ভাগ করে নেবেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, তাদের বোঝানোর জন্য যে তারা সকলেই এই বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল। একই দিকে অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 76:

“আর যখন তারা [আহলে কিতাবের মুনাফিক] ঈমানদারদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা একে অপরের সাথে একাকী থাকে, তখন তারা বলে, "তোমরা কি তাদের সাথে সে বিষয়ে কথা বলছ যা আল্লাহ তোমাদের

কাছে নাযিল করেছেন, যাতে তারা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তার সামনে বিতর্ক করতে পারে? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

একটি দ্বিমুখী মনোভাব সর্বদা এড়ানো উচিত কারণ একজন ব্যক্তি সীমিত সময়ের জন্য তাদের মনোভাবের দ্বারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করতে পারে তবে এই সময়টি শেষ হয়ে গেলে তারা উভয় জগতেই প্রকাশ্যে অপমানিত হবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 64:

" মুনাফিকরা আশঙ্কা করে যে, তাদের সম্পর্কে কোন সূরা নাযিল হয়, যা তাদের অন্তরে যা আছে তা জানিয়ে দেয়। বলো, উপহাস কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন যা তোমরা ভয় কর।

সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বিমুখী মনোভাব অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার দুটি জিভ হবে আগুনের। তাই এই মনোভাব যে কোন মূল্যে পরিহার করতে হবে। একজন মুসলিমকে সর্বদা সত্য মেনে চলতে হবে, তা নির্বিশেষে তারা যার সাথে আচরণ করছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 76:

“আর যখন তারা [আহলে কিতাবের মুনাফিক] ঈমানদারদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা একে অপরের সাথে একাকী থাকে, তখন তারা বলে, "তোমরা কি তাদের সাথে সে বিষয়ে কথা বলছ যা আল্লাহ তোমাদের কাছে নাযিল করেছেন, যাতে তারা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তার সামনে বিতর্ক করতে পারে? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

এই আয়াতটি খারাপ সাহচর্যের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে কারণ কিতাবের মুনাফিকরা একে অপরকে ভালোর প্রতি আন্তরিকভাবে উপদেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তা স্পষ্টভাবে বা সূক্ষ্মভাবে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে হোক না কেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ভাল সঙ্গী গ্রহণ করবে যারা সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি তাদের পরামর্শ দেয় এবং উত্সাহিত করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি ভালো সঙ্গী অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়, সে দুনিয়াতে কেবল নিজের জন্য চাপ ও কষ্টের কারণ হবে এবং তাদের খারাপ সঙ্গী আখিরাতেও তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 76:

“আর যখন তারা [আহলে কিতাবের মুনাফিক] ঈমানদারদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা একে অপরের সাথে একাকী থাকে, তখন তারা বলে, "তোমরা কি তাদের সাথে সে বিষয়ে কথা বলছ যা আল্লাহ তোমাদের কাছে নাযিল করেছেন, যাতে তারা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তার সামনে বিতর্ক করতে পারে? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

এই মুনাফিকরা মূর্খতার সাথে একে অপরকে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার মধ্যে পাওয়া জ্ঞান সাহাবীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে এটি বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে উঠবে, কারণ তারা নিজেরাই এই শিক্ষাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন ছিল না কারণ তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং আচরণই এই সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে তারা তাদের খোদায়ী শিক্ষাগুলো মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করেছে যাতে তারা তাদের পার্থিব বাসনা অর্জন ও পূরণ করতে পারে। এবং তাদের খারাপ উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং আচরণ সবই মহান আল্লাহ তায়ালা জানেন, যদিও তারা সেগুলি মানুষের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 77:

"কিন্তু তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন?"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই মুনাফিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরিবর্তে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এর একটি লক্ষণ এই যে, তারা জনগণের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান কামনা করে না বা আশাও করে না। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ভাল বক্তৃতা গ্রহণ করে, যার মধ্যে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই আয়াতগুলিতে উল্লিখিত ভণ্ডদের দ্বিমুখী মনোভাব এড়াবে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে ভাল আচরণ গ্রহণ করে যাতে তারা এতে আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্য যেমন আন্তরিকতা, উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন ভন্ডামি, লোভ এবং অহংকার এড়িয়ে চলতে পারে। এই সবগুলি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে মুনাফিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন্দ নিয়ত, কথা ও কাজ অবলম্বন করে, যেহেতু তারা কেবল তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে চায়, সে উভয় জগতেই চাপ ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 78

وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

"এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

এই শ্লোকটি সেই সমস্ত লোকদের সমালোচনা করে যারা মৌখিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু এর শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই অন্ধভাবে তাদের ঐশ্বরিক কিতাবগুলো আবৃত্তি করতেন যা তারা শিখিয়েছেন এবং কী সমর্থন করেছেন, আজকের মুসলমানদের মতো যারা পবিত্র কুরআনের অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করেন। ফলে কিতাবধারী এই অশিক্ষিত লোকেরা তখন তাদের আসমানী কিতাবের শিক্ষা না বুঝে তাদের বুজুর্গ ও আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করেছিল কারণ তাদের অনেক বুজুর্গ এবং পণ্ডিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী কিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের অধিকাংশই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের অজ্ঞ অনুসারীদেরকে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছিল যদিও তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ঐশী কিতাবে আলোচিত হওয়ার কারণে এর সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 78:

" *এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না...*"

এই আয়াতটি তাই ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে অজ্ঞতা অবলম্বন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের অন্ধ অনুকরণের দিকে নিয়ে যায়, যা প্রায়শই বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 116:

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না এবং তারা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ হওয়ার অন্যতম কারণ।

একজন মুসলিম ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত জটিল এবং বিশদ দিক যেমন ইসলামী আইনশাস্ত্রের জটিল দিকগুলি বুঝতে পারে বলে আশা করা যায় না। কিন্তু তারা পবিত্র কুরআনে আলোচিত ঈমানের মৌলিক উপাদান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তারা নিয়মিতভাবে তাদের পথনির্দেশের এই দুটি উৎসের উপর অধ্যয়ন, শিখতে এবং কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জীবন এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ তাদের সমস্ত ধর্মীয় বিষয়ে অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না যার ফলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞতা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকেও বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করতে পারে যখন তারা জানে না? এই অজ্ঞ লোকেরা তখন তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যখন তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত বলে ধরে নেবে, কারণ তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে। এই মনোভাব শুধুমাত্র তাদেরকে ধর্মীয় অনুশীলন এবং বিশ্বাস বলে ধরে নিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। এটি কেবলমাত্র আরও বিভ্রান্তির দিকে

নিয়ে যাবে, কারণ এই অভ্যাসগুলির অনেকগুলি শিরক এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে নিহিত। অজ্ঞ মুসলমানদের দেখলেই তা স্পষ্ট হয়।

কিতাবধারীদের মধ্যে থেকে অজ্ঞরা ধরে নিয়েছিল যে ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তার পরিবর্তে তাদের ধর্ম থেকে কিছু অনুশীলন শেখাই পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। তারা তাদের বিশ্বাসকে কয়েকটি খালি অনুশীলনে পরিণত করেছে এবং বুঝতে পারেনি যে তাদের বিশ্বাস তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, শব্দ এবং কর্মকে প্রভাবিত করার জন্য। এই উপলব্ধি তখনই ঘটে যখন কেউ ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে এবং তার উপর কাজ করে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু শারীরিক ইবাদতের উপর নির্ভর করে অনুমান করে যে এটি সাফল্যের পথ। যখন কেউ তাদের বিশ্বাসকে কিছু অভ্যাস এবং আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত করে যা তারা বোঝে না এমন ভাষায় সম্পাদিত হয়, তখন তাদের বিশ্বাস আর জীবনের উপায় হয়ে ওঠে না। পরবর্তী প্রজন্ম যখন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তখন তারা এই কয়েকটি অভ্যাস ত্যাগ করার আগে শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এই ভেবে যে তারা তাদের বিশ্বাসের জীবনযাত্রার একটি উপায় বোঝার পরিবর্তে তারা তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিমা দেশগুলিতে অভিবাসিত প্রবীণরা পোশাকের প্রতি তাদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম যারা পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন তারা পোশাকের এই পদ্ধতিটি ত্যাগ করেছেন এই ভেবে যে এটি কেবল একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং জীবনধারা নয়। সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের সমস্যা হল যে তারা সবসময় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তিত হয় এবং যদি বিশ্বাসকে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসাবে দেখা হয় তবে এটিও সময়ের সাথে সাথে পরিত্যক্ত হবে। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যেও কিতাবধারীদের সাথে এমনটি ঘটেছে। এক সময় তাদের গির্জা এবং উপাসনালয়গুলি একনিষ্ঠ উপাসক এবং জ্ঞানের সন্ধানকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু লোকেরা যখন জ্ঞান ত্যাগ করেছিল এবং শুধুমাত্র কয়েকটি অনুশীলনের উপর নির্ভর করেছিল, তখন পরবর্তী প্রজন্ম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং এমনকি এই কয়েকটি অভ্যাস ত্যাগ করেছিল এবং ফলস্বরূপ তাদের উপাসনালয়গুলি। এবং গীর্জা খালি হয়ে গেল।

উপরন্তু, যারা পুরানো প্রজন্মের মধ্যে এই মানসিকতা গ্রহণ করেছিল তারা তাদের শেখা কয়েকটি অনুশীলনের উপর ধারণ করেছিল কিন্তু সমাজের সাধারণ মানসিকতার পরিবর্তনের কারণে, পরবর্তী প্রজন্ম আর সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলিকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করতে চায় না এবং এমনকি প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কেন তাদের বিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত? এবং এই অনুশীলনের উপর কাজ করুন। বয়স্ক প্রজন্ম যদি জানে না কেন তারা মুসলমান, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে তারা কীভাবে বোঝাবে? অজ্ঞতা শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের প্রবীণদের দ্বারা শেখানো কিছু অভ্যাস ত্যাগ করতে এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে জীবনযাপন করতে উত্সাহিত করবে।

মুসলিমরা যদি ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়ন ও আমল করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অনুরূপ করতে উত্সাহিত করে, তবে তারাও এই আয়াতে বর্ণিত কিতাবের লোকদের ভাগ্য ভাগ করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

এটি ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার বিপজ্জনক পরিণতির বিষয়েও সতর্ক করে। যে এই মনোভাব অবলম্বন করে সে অনিবার্যভাবে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করবে যা কেবল সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর কিছু স্বর্গীয় গুণাবলী শিখতে পারে, যেমন তিনি সমস্ত ক্ষমাশীল এবং করুণাময় এবং ফলস্বরূপ তারা তাঁর করুণা ও ক্ষমার আশার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইচ্ছাপূরণের চিন্তায় লিপ্ত হবেন। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকবে, এবং বিশ্বাস করবে যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। যদিও, মহান আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমা করেন, কম নয়, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তিনি অন্যায়কারী এবং সৎকর্মকারীর সাথে এই দুনিয়া বা পরকালে সমান আচরণ করবেন না, কারণ এটি তাঁর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

" নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

এই ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে তারা মহান আল্লাহকে সম্মান দেখাচ্ছেন, যদিও তারা আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করেন না কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে তিনি ভাল কাজকারীর সাথে অন্যায়কারীর সমান আচরণ করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে বাঁধা। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তাকে প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং তারা যে পাপগুলো করে থাকে তার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় সে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করার যোগ্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

আর একটি বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস যারা ইসলামি শিক্ষাগুলো শিখতে ও আমল করতে ব্যর্থ হয় তারা কিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তিকে ছোট করে। তারা ধরে নেয় যে তারা মুসলমান হওয়ায় তারা মুসলমান হয়েই মারা যাবে, যার অর্থ তারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হলেও। প্রথমত, ঈমানের সাথে এই পৃথিবী ত্যাগের নিশ্চয়তা নেই এবং যারা তাদের অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে কারণ তারা আনুগত্যের সাথে তাদের ঈমানকে লালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈমান হল একটি উদ্ভিদের মত যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে এবং যেভাবে একটি গাছ মারা যায় যখন এটি পুষ্টি পায় না, যেমন পানি, তেমনি একজন মুসলিমের ঈমানও ভালো হতে পারে যারা কর্মের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, কিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তি এক মুহুর্তের জন্যও অসহনীয় , বহু বছর চলে গেলেও। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে তাকে এক মুহুর্তের জন্য জাহান্নামে নিমজ্জিত করে ফিরিয়ে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তিনি তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল কিছু অনুভব করেছেন কিনা যার জন্য তিনি নেতিবাচক উত্তর দেবেন, কারণ জাহান্নাম এমন ভয়ানক যা একজন ব্যক্তির কখনও অনুভব করা যেকোনো উপভোগের স্মৃতি এবং অনুভূতিকে ধ্বংস করে দেয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4321 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে

সতর্ক করা হয়েছে। এটা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট যে জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয় তাই এটাকে পার্থিব কারাগারের মতো অবজ্ঞা করা উচিত নয়। উপরন্তু, এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব একই কিতাবের লোকেরা গ্রহণ করেছিল যারা জাহান্নামকেও হেয় করেছিল এবং ফলস্বরূপ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের সমালোচনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" এবং তারা বলে, "আগুন কখনই আমাদের স্পর্শ করবে না, [কয়েকটি] গণনা দিন ছাড়া।" বল, "তুমি কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞ মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত আরেকটি ধ্রুপদী বিভ্রান্তিকর ধারণা হল যে, তারা ধরে নেয় যে, তারা বিচারের দিনে একজন পবিত্র ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকের মধ্যস্থতার দ্বারা রক্ষা পাবে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদিও তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল ছিল। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি বাস্তবতাও কম নয়,

তবুও অনেক মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আগেই বলা হয়েছে, জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয়। উপরন্তু, এই অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করবেন, সেভাবে তিনি তাদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেবেন যারা পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও আমল পরিত্যাগ করেছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 30:

"আর রসূল বলেছেন, "হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

কেউ কিছু গ্রহণ ও গ্রহণ করার পরেই তা পরিত্যাগ করতে পারে। অতএব, এটি স্পষ্টতই মুসলমানদেরকে বোঝায় কারণ তারাই পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার দিবসে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন তার কী ঘটবে তা নির্ধারণ করতে একজন আলেম লাগে না।

এই অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, তাদের কর্ম নির্বিশেষে তাদের ক্ষমা করা হবে। এই একই বিভ্রান্তিকর মনোভাব ছিল আহলে কিতাবদের দ্বারা গৃহীত যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সমালোচনা করেছেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে ইসলামী জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় সে ধরে নেবে যে, মহান আল্লাহর ঐতিহ্য তাদের জন্য পরিবর্তিত হবে। অর্থ, যদিও তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শাস্তি দেবেন যারা ক্রমাগত তাঁর অবাধ্য ছিল, অজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে এই ঐতিহ্য তাদের জন্য পরিবর্তিত হবে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহর ঐতিহ্য কারো বা কোনো জাতির জন্য পরিবর্তিত হয় না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী জাতির পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে? কিন্তু আপনি আল্লাহর পথে [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর পথে কোনো পরিবর্তনও পাবেন না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞ মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত আরেকটি ক্লাসিক বিভ্রান্তিকর অনুমান হল যে তারা ধরে নেয় যে তারা বিচারের দিনে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে কারণ তারা দাবি করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তারা তার ঐতিহ্য শেখার এবং অভিনয়ের মাধ্যমে এই ভালবাসা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এমনকি পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী-রাসূলকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, তবুও তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ বিচারের দিন তারা তাদের সাথে থাকবে না। একই পরিণতি সেই মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটবে যারা কার্যত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দান করা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। এটি অনেক আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং নেককার। আর সঙ্গী হিসেবে তারা উত্তম।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই পরিণতি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কার্যত আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করে, তাদের জন্য নয় যারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে ভালবাসার দাবি করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

উপসংহারে বলা যায়, অন্যের দ্বারা বিপথগামী হওয়া এবং আল্লাহ, মহান, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরকাল সম্পর্কে ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস অবলম্বন করা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল শিক্ষা ও আমল। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্যের উপর। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

কিন্তু যে ব্যক্তি এই আচরণে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে অজ্ঞতা অবলম্বন করে, সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে দুনিয়াতে মানসিক চাপ ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং তারপর তারা পরকালে এমন অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে কখনো উপলব্ধি বা আশা করেনি। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 47:

"এবং যারা অন্যায় করেছে তাদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং এর সাথে তার অনুরূপ সবকিছুই থাকত, তবে তারা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ শাস্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কিছু উপস্থিত হবে যা তারা আমলে নেয়নি।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 79-82

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا
قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ
ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।

আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?"

হ্যাঁ, [বিপরীত] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে- তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

মহান আল্লাহ সেই কিতাবের লোকদের সমালোচনা করেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক কিতাবগুলোকে পরিবর্তন ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ ও নেতৃত্ব লাভের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, তারা ঐশ্বরিক আইন পরিবর্তন করার জন্য ধনীদের কাছ থেকে ঘুষ নেবে যাতে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে পাপ করার জন্য ছাড় দেওয়া হয়। এমনকি তারা তাদের অন্ধ অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বর্ণনা এবং তাদের আসমানী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের বর্ণনাও পরিবর্তন করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 79:

“ সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে “কিতাব” লেখে, তারপর বলে, “এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে”, যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে…

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেন যে, তারা যে পার্থিব জিনিসই অর্জন করুক না কেন তারা তাদের আসমানী কিতাবগুলোকে কঠোরভাবে মেনে নিলে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চললে তারা যা অর্জন করত তার তুলনায় তারা ছোট হবে। উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য যারা সঠিকভাবে আচরণ করে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে যে ফোঁটা পাওয়া যায় তার তুলনায় একটি সমুদ্রের মতো। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, এইভাবে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায় তা তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের বহনকারীর উপর পার্থিব আশীর্বাদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস। এই কারণেই প্রায়শই পার্থিব বিলাসিতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরা অন্য কারো চেয়ে বেশি মানসিক সমস্যা যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় ভোগেন। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মনের শান্তি ছাড়া সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ এবং বিলাসিতা তুচ্ছ, ঠিক যেমন 79 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে খোদায়ী শিক্ষার সাথে আপস করে তাদের জন্য এই পার্থিব ও আখেরাতের শাস্তি নিজেদের এবং অন্যদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ছাড় দেয়।

"... তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

একটি অভিশাপ একজনকে মহান আল্লাহর রহমত থেকে সরিয়ে দেয়, যা তাদের এই দুনিয়া বা পরের উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে বাধা দেয়, তা নির্বিশেষে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস পেতে পারে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, জাগতিক জিনিসের জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা, যেমন অন্যদের দেখানো জাহান্নামে প্রবেশ করুন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 79:

" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

এই মনোভাবের একটি শাখা হল যখন তথাকথিত ইসলামিক পণ্ডিতরা এমন কর্মের সমর্থন করেন যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে নেই, একটি অনুসরণ সংগ্রহ করার জন্য, যখন দাবি করে যে তারা কি উকিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলস্বরূপ, তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা এই প্রথাগুলিকে আঁকড়ে ধরে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং এই আলেমদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করে যাদের আনুগত্য সকল পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক। মুসলমানদের অবশ্যই এই ধরনের লোকদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং আমল করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে হয়, একজন অন্য জিনিসের উপর যত কম কাজ করবে তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

79 শ্লোকে বর্ণিত মনোভাবটি কন শিল্পীদের দ্বারাও গৃহীত হয় যারা একটি পারিশ্রমিকের জন্য ধর্মীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে। তারা আধ্যাত্মিক ব্যায়াম করে দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, যদিও তিনি বা তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নির্দেশ দেননি। এইসব লোকদেরকে যেকোন মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তারা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারাতে উৎসাহিত করে এবং যেহেতু তারা মুসলমানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। , যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 79:

" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

মহান আল্লাহ যে কারণে এই মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন তার অন্যতম কারণ এটি অন্য লোকদের বিপথগামী হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। বিভ্রান্তিকর মনোভাব অবলম্বন করা যথেষ্ট খারাপ কিন্তু মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তা আরও খারাপ হয়ে যায়, যখন একজনের কাজ অন্যের পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে অন্যকে পথভ্রষ্ট করে, সে তাদের প্রত্যেক বিভ্রান্ত অনুসারীর সমান পাপ ভোগ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শিখবে, কাজ করবে এবং অন্যদেরকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেবে। , সব সময়ে

মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন গ্রন্থের লোকদের মধ্যে থেকে অনেক আলেম ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আসমানী কিতাবগুলিকে সম্পাদনা ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" *আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।"*

তারা তাদের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতারিত করেছিল যখন তারা ধরে নিয়েছিল যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, এবং ফলস্বরূপ তিনি তাদের পাপের জন্য সরাসরি ক্ষমা করবেন বা তাদের খুব হালকা শাস্তি দেবেন। এই ফলাফলগুলি তাই সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসগুলি অর্জনের জন্য তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থগুলিকে সম্পাদনা এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছে, ঠিক যেমন একজন চোর যে মূল্যবান কিছু চুরি করার পরিকল্পনা করে যে ঝুঁকিটি মূল্যবান বলে বিশ্বাস করে, এমনকি যদি তারা ধরা পড়ে এবং কারাগারে পাঠানো হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে ইচ্ছাপূরণের কোনো মূল্য নেই এবং যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে সে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করবে। উপরন্তু, তাদের মনোভাব মহান আল্লাহকে অসম্মান করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি বিচারের দিন ভাল এবং অন্যায়কারীর সাথে সমান আচরণ করবেন। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

" নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

বইয়ের লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি অন্যদের তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন কিন্তু তাদের রেহাই দেবেন। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর প্রতি অন্যায়কে দায়ী করে, যা নিজেই একটি গুরুতর পাপ। এটি 80 নং আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "আমাদেরকে আগুন কখনো স্পর্শ করবে না, [কয়েকটি] দিন ছাড়া।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করার মনোভাব পরিহার করতে হবে, পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ ও নেতৃত্ব লাভের জন্য। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান এই দাবি করে কিতাবের লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার জন্য ক্ষমা বা মৃদু শাস্তির শিকার হবে বলে বিশ্বাস করে কিতাবধারীদের মতোই ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাধারা গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার হয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ একটি সত্য, তবুও অনেক মুসলিম জাহান্নামে যাবে। হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে বিচার দিবসে তাঁর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায় । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে একজন যারা তাদের পার্থিব জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে নিমজ্জিত করা হবে এবং ফিরিয়ে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তিনি তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল কিছু অনুভব করেছেন কিনা যার জন্য তিনি নেতিবাচক উত্তর দেবেন, কারণ জাহান্নাম এমন ভয়ানক যা একজন ব্যক্তির কখনও অনুভব করা যেকোনো উপভোগের স্মৃতি এবং অনুভূতিকে ধ্বংস করে দেয়। সুনানে ইবনে মাজাহ 4321 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জাহান্নামে একটি মুহূর্তও অসহনীয় তাই জাহান্নামে তাদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হালকা হবে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যকে সকল জাতির কাছে স্পষ্ট করে দেন, যা অনেকেরই গৃহীত ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে পরিষ্কারভাবে দূর করে দেয়।

কোন ব্যক্তি বা জাতির জন্য এই ঐতিহ্য পরিবর্তন করা হবে না, কারণ এটি মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 81-82:

" হ্যাঁ, [বিপরীত] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে - তারাই জাহান্নামের সাথী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

একজন তাদের পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া তখন ঘটে যখন কেউ তার থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা না করে তাদের পাপপূর্ণ আচরণে অবিরত থাকে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, আল্লাহ, মহান বা অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি পরিস্থিতি আরও খারাপ না করে, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনও অধিকার আদায় করা। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙঘন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করে তাদের পাপগুলোকে বেষ্টন করা হবে না, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যারা সাহসের সাথে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে।

মহান আল্লাহ এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে বাস্তবায়িত না করে দুনিয়া বা পরকালের সফলতা সম্ভব নয়, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করা ইহকাল বা পরকালে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে না। প্রকৃতপক্ষে, যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে

চলে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি ঘটতে পারে কারণ একজনের বিশ্বাস একটি গাছের মতো যা অবশ্যই ভাল কাজের দ্বারা পুষ্ট করা উচিত। একইভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যায় যখন এটি জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল হতে পারে যে ভাল কাজের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 82:

“কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে- তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা এড়াতে হবে। কোন ঐশ্বরিক আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উপেক্ষা করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা তাদের বেছে নেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করার একটি রূপ। তাদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে চলতে হবে এই ধারণা করে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করাকে উপেক্ষা করতে পারে, তবুও উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। এই মনোভাব মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম], “তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল। আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং অস্বীকার করছিলে।"

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের এবং মুসলিম জাতিকে সম্প্রসারণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কিছু প্রধান বাস্তব উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা পূরণ করা প্রয়োজন, কারণ বাস্তব কর্মই এর প্রমাণ। মহান আল্লাহর প্রতি একজনের বিশ্বাস, এবং সেগুলি একজনের বিশ্বাস বজায় রাখার এবং শক্তিশালী করার একটি মাধ্যম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

" *আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে]...*"

বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মতো যাকে অবশ্যই আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। একটি উদ্ভিদ যেমন জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও ভাল হতে পারে যে কর্ম দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

" *আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম] যে, "আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না...*"

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করা বলতে বোঝায় যে আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করাকে বোঝায় যেগুলো ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে। এর মধ্যে একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে একজন শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখে এবং সেইজন্য মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান চায় না। এর মধ্যে যা ভাল তা বলা বা চুপ থাকাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টির ঊর্ধ্বে তাদের কামনা-বাসনা বা কামনা-বাসনা ও সন্তুষ্টিকে কখনোই মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা উচিত নয়। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

" আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার [নিজের] ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

এই যুগে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা সম্ভব নয় যদি না কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলে। অতএব, একজনকে অন্য উত্স থেকে নেওয়া অন্য সমস্ত কাজগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে মনে হয়, কারণ এই উত্সগুলির উপর যত বেশি কাজ করা হবে তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় বা কাজ যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মূলে নেই। মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ এই নয় যে একজনকে অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হবে। মানুষ ভুলের প্রবণতা, তাই নিখুঁত হওয়া মহান আল্লাহর দাবি ছিল না। মানুষ আশা করা হয় যে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে এবং যখনই তারা পাপ করবে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে। সি অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 6:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনও অধিকার আদায় করা। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ঈমানের মূল নীতি, মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য নিয়ে আলোচনা করার পর আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও যত্নের সাথে আচরণ করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না; এবং পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করুন..."*

তাদের পিতামাতার সাথে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আচরণ করার গুরুত্ব যে কেউ বুঝতে পারে কারণ এটিকে মহান আল্লাহর ইবাদতের পরে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআন জুড়ে বহুবার ঘটে। তাই একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের পিতামাতার সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সম্মান এবং ভাল আচরণ করবে। এটি প্রযোজ্য এমনকি যদি একজনের পিতামাতা একজন অমুসলিম হয়। সহীহ মুসলিম, 2325 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, 83 নম্বর আয়াতটিও এই বিষয়টি তুলে ধরে কারণ এটি কাউকে তাদের মুসলিম পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দেয় না। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের পিতামাতার সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা তাদের নিজের সন্তানদের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন একজনের পিতামাতার সম্পূর্ণ আনুগত্যের আদেশ দেয় না, কারণ তারা তাদের সন্তানকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার আদেশ দিতে পারে। সম্পূর্ণ আনুগত্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য, কারণ পরবর্তীটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেবে। অতএব, পিতামাতার উচিত ইসলামের শিক্ষার অপব্যাখ্যা এই দাবি করে করা উচিত নয় যে তাদের সন্তানদের অবশ্যই তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করতে হবে। দুঃখজনকভাবে, মুসলিম পিতামাতার মধ্যে এই মনোভাবটি বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে কারণ তারা অন্যান্য ধর্মের সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি গ্রহণ করেছে যা পিতামাতার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যকে তাদের ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সমান করে। বাচ্চাদের তাদের পিতামাতার সাথে মতবিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এমনকি ইসলামে বৈধ বিষয়গুলিতেও, তবে তাদের অবশ্যই তাদের বাবা-মায়ের প্রতি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে শ্রদ্ধা বজায় রাখতে হবে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী ভালো সন্তান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন বা সমাজের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড নয়। মানুষের মান, বিশেষ করে যখন একটি ভাল সন্তানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন প্রায়ই ভুল হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে লোকেদের দ্বারা নির্ধারিত মান নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় এবং যারা তাদের একটি খারাপ সন্তানের তকমা দেয় তাদের প্রতি তাদের নজর দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের পিতামাতার সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং তাদের আচরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে পুরষ্কার চাইতে হবে, এমনকি তাদের পিতামাতা বা অন্যান্য লোকেরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর বৈধতা ও অনুমোদন চাইতে হবে, তাদের পিতামাতার মতো লোকেদের অনুমোদনের বৈধতা নয়। ভুল দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং এমনকি তাদের পিতা-মাতার অনুমোদন ও বৈধতা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে অমান্য করতে উত্সাহিত করতে পারে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 8:

" আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শরীক করার চেষ্টা করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না..."

মহান আল্লাহ তখন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করতে উৎসাহিত করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং আত্মীয়দের সাথে ...*"

মহান আল্লাহ সর্বদা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বব্যাপী উপদেশ প্রদান করেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে একজনের আত্মীয়দের প্রতি সদয় আচরণের আহ্বান জানান কারণ শুধুমাত্র এই একক উপদেশের উপর কাজ করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সদয় আচরণ করে তাহলে বাইরের কোনো উৎস থেকে অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ করা হবে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দেরকে ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোন বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং দোষারোপ করার যোগ্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয়, আজকে অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসটি তাদের সাহায্য করছে তা ভাল বা খারাপ তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই 43 নম্বর আয়াতের ক্রম মেনে চলতে হবে এবং শুধুমাত্র তাদের আত্মীয়দেরকে

সাহায্য করতে হবে যেগুলো সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে যুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, 83:

"... *আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং আত্মীয়দের সাথে...*"

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। আবার, মানুষের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি ভাল আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞার প্রতি খুব বেশি খেয়াল করা উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানকে বিরোধী করে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আত্মীয়দের অধিকার পূরণ করতে হবে, তারা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ভাল আত্মীয় হিসাবে বিবেচিত হোক বা না হোক। পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কখনই পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পার্থিব কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। উপরন্তু, যদিও একজন মুসলমান ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবে কোন অংশে কম নয়, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ভাল জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করা এবং খারাপ বিষয়ে সতর্ক করা। তাদের আত্মীয়কে তাদের বিপথগামী থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ কর এবং আত্মীয়স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে...*"

এতিমদের প্রায়ই ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা প্রায়শই তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের সাহায্য করবে। এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই দিন এবং যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে সেট আপ করতে পারে। এবং স্পনসরশিপের পরিমাণ প্রায়ই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম হয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য পাবে। সহীহ বুখারী, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, যেমন একজন বিধবার যত্ন নেয়, তাকে সারা রাত নামাজ পড়া এবং প্রতিদিন রোজা রাখার সমান সওয়াব দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী 6006 নং হাদিসে এটির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাতের নামায ও স্বেচ্ছায় রোযার মতো স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করা কঠিন মনে করে, তাকে এই সওয়াব অর্জনের জন্য এই হাদীসের উপর আমল করা উচিত। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাদের কাছে যা কিছু আছে যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল মনোভাব অবলম্বন করে তাদের পুরস্কার নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা একজন ব্যক্তির যে কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা রয়েছে। অতএব, কোন মুসলমান, যতই স্বল্প সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, এই আয়াতের উপর আমল করা থেকে নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারে না।

শ্লোক 83 এর পরবর্তী অংশে একজনের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে যাতে তারা কেবল ভাল এবং উপকারী কথা বলতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *এবং লোকদের সাথে ভাল কথা বলুন...*"

একজনকে মনে রাখতে হবে যে বক্তৃতা তিন প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম প্রকারটি হল মন্দ কথাবার্তা যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ বিচারের দিন জাহান্নামে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য একটি একটি মন্দ শব্দই যথেষ্ট। জামে আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারটি হল অনর্থক এবং অকেজো কথাবার্তা। যদিও এই ধরণের পাপ বা ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবে কম নয়, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মন্দ কথার প্রথম পদক্ষেপটি প্রায়শই নিরর্থক কথাবার্তা। উদাহরণস্বরূপ, অসার কথাবার্তা প্রায়ই গীবত এবং অপবাদের দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জন্য অযথা বক্তৃতা একটি বড় অনুশোচনা হবে কারণ এটি একটি মহান সময় অপচয়, বিশেষ করে যখন তারা পুরষ্কার পালন করে যারা অনর্থক কথা এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে ভাল কথা বলে। পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে উত্তম কথা বলাই শেষ প্রকার। প্রথম দুই ধরনের বক্তৃতা এড়াতে পারে শুধু ভালো কথা বলে বা চুপ করে থাকার মাধ্যমে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের নীরবতার জন্যও পুরস্কৃত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একজনকে অবশ্যই ভাল নির্দেশ দিতে হবে এবং অন্যকে মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে হবে এবং ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে আন্তরিকভাবে উপদেশ দিতে হবে। বক্তৃতায় ভদ্রতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন অন্যের কাছে সঠিক কথা বলতে পারে কিন্তু তারা কঠোরভাবে তা করে বলে তারা প্রায়শই তাদের সঠিক পথ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। পরিশেষে, কেউ অন্যদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলার মাধ্যমে এই আয়াতটি পূরণ করতে পারে যে তারা তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তাদের সম্পর্কে কথা বলতে চায়।

মহান আল্লাহ অতঃপর ফরজ নামাজ কায়েম করার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *এবং নামায কায়েম কর...*"

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

" তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহ তখন ফরজ দানের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *এবং যাকাত দাও..."*

বাধ্যতামূলক দাতব্য হল একজনের সামগ্রিক আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার একটি উদ্দেশ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, এবং তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে, একজনের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতই কেবল একটি ঋণ যা তার সঠিক মালিক মহান আল্লাহকে পরিশোধ করতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছিল, যেমন তাদের সম্পদ, সেগুলি তাদেরই এবং তাই বাধ্যতামূলক দান করা থেকে বিরত থাকে , তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব ঋণ একটি জরিমানা সম্মুখীন. উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দান না করে, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তা থেকে বিরত রাখে তারা যেন কখনই মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, তারা যে সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

83 নম্বর আয়াতটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলিমদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য উল্লেখ করার পর আয়াতের শেষ দিকে ফরজ নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়গুলো মানুষ কিভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

" আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম], "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল। আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" ..."

অনেক মুসলিম মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, যেমন বাধ্যতামূলক নামায, তবুও প্রায়শই সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে এবং বিশ্বাস করে যে এই মনোভাব মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভের জন্য যথেষ্ট। সত্য হলো, সৃষ্টির হক আদায় করা মহান আল্লাহর হক আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অর্থ, মানুষ মহান আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ না তারা মানুষের হক আদায় করে। যে ব্যক্তি মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে তাদের প্রতি অন্যায় করে সে বিচারের দিন বিচারের সম্মুখীন হবে। তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের এবং মুসলিম জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আলোচনার মূল আয়াতটি শেষ করেছেন যে তাদের অবশ্যই ইসরায়েলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্তানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যারা আল্লাহর অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, মহান, এবং সৃষ্টির অধিকার. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং অস্বীকার করছ।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমস্ত লোককে একই বালতিতে নিক্ষেপ করবেন না। মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে ইসরায়েলের সকল সন্তান তাঁর অবাধ্য হয়নি। একজনকে অবশ্যই এই নেতিবাচক আচরণকে এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি বর্ণবাদ, অপবাদ এবং অন্যদের অবজ্ঞা করার মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেননি যে, বনী ইসরাঈলরা তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করেছে। তারা শুধুমাত্র 83 নং আয়াতে উল্লিখিত কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে কার্যত প্রমাণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি আরও নির্দেশ করে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করার গুরুত্ব, কারণ কাজ ছাড়া শব্দের ব্যবহার খুবই কম। ইসলামে মূল্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"...অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তোমরা অস্বীকার করছ।"

মহান আল্লাহ মদিনায় বসবাসরত কিতাবধারীদের সতর্ক করেছেন যেন তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে এবং ইসলামকে গ্রহণ না করে কারণ এর সত্যতা তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল, যেমন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র

কুরআন। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু কিতাবের অধিকাংশ লোক তখনও সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং কর্মের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসের দাবি প্রমাণ করে, কারণ ইসলাম গ্রহণের অর্থ হবে তাদের পার্থিব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ। এই জীবনযাত্রা তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম], "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল। আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং অস্বীকার করছিলে।"

এই আয়াতটি বোঝার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং এর সাথে সম্পর্কিত মূল কাজগুলি কালের সূচনাকাল থেকে সর্বদা একই ছিল। অর্থ, ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়, এটি একই ধর্ম যা প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষের কাছে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা আনা হয়েছে এবং চূড়ান্ত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনা বাণী দ্বারা চূড়ান্ত হয়েছে। তার উপর মদিনায় বসবাসকারী কিতাবধারীদের তাই অবিলম্বে ইসলামের প্রতি সাড়া

দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এটি একটি নতুন ধর্ম নয় বরং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসের চূড়ান্ত এবং অসম্পাদিত সংস্করণ ছিল। কিন্তু তাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আপোষ করে পার্থিব জিনিস লাভের প্রতি ভালোবাসার কারণে কিতাবীদের অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"...অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তোমরা অস্বীকার করছ।"

যেহেতু মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে যুক্ত মূল ক্রিয়াকলাপগুলি সর্বদা একই ছিল, তাই মুসলমানদের উচিত আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঘোষণা প্রমাণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা উচিত, কারণ তাদের কিছু করার আদেশ দেওয়া হয়নি। তাদের পূর্ববর্তী প্রতিটি প্রজন্মের থেকে আলাদা।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের অবশ্যই ইসরায়েলের সন্তানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করার সময় আন্তরিকভাবে এবং বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

" আর [স্মরণ করুন] যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, [তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম], "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল। শব্দসমূহ] এবং সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"..."

এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কার্যত সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, কর্মের মাধ্যমে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 83:

"... *অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং অস্বীকার করছ।"*

ফলস্বরূপ, তাদের যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং উদ্বেগের উত্স হয়ে উঠবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফলাফলের মধ্যে পার্থক্যটি বেশ স্পষ্ট হয় যদি কেউ এই জগতের লোকদের প্রতি চিন্তাভাবনা করে যারা তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 84-86

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِمْ تَظَـٰهَرُونَ
عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ
إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের [ইসরাঈলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "তোমাদের [অর্থাৎ, একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" অতঃপর আপনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করলেন।

অতঃপর, তোমরাই সেই [একই ব্যক্তি যারা] একে অপরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের একটি দলকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করছ। এবং যদি তারা আপনার কাছে বন্দী হয়ে আসে, তবে আপনি তাদের মুক্তিপণ দিয়ে থাকেন, যদিও তাদের উচ্ছেদ আপনার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করেন এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করেন? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে

তাদের জন্য পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী আছে? এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।

এরাই তারা যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, কাজেই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।"

মহান আল্লাহ, কিতাবের লোকদেরকে , এবং মুসলিম জাতিকে সম্প্রসারিত করে, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা তাদের পূর্বপুরুষ, ইসরায়েলের সন্তানদের মতোই তাদের কর্তব্য পালন করতে বাধ্য ছিল। পূরণ করতে অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 84:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের [ইসরাঈলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "তোমাদের [অর্থাৎ, একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" অতঃপর আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় [এটি] স্বীকার করেছেন।"

এই আয়াতটি এমনভাবে বলা হয়েছে যার অর্থ আত্মহত্যা করা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তিকে অন্যের জীবনকে সম্মান করতে হবে ঠিক যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের জীবনকে সম্মান করতে চায়, একজনকে এমন আচরণ করতে হবে যেন অন্যের ক্ষতি করা নিজের ক্ষতি করার মতো। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়। সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিমদের প্রতি এই মনোভাব অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে একজন প্রকৃত মুসলিম ও বিশ্বাসীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার মতো গণ্য করা হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32:

“... আমরা বনী ইসরাঈলের উপর আদেশ দিয়েছিলাম যে যে ব্যক্তি একটি আত্মাকে হত্যা করে ব্যতীত একটি আত্মার জন্য বা দেশে [সম্পাদিত] ফাসাদ ব্যতীত, সে যেন মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছে। এবং যে কেউ একজনকে বাঁচায় - সে যেন মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করল..."

অন্যের ক্ষতি করা একজন মুসলমানের আচরণের পরিপন্থী বলে কেউ ভাবতে পারেন যে, তারা যদি আইনগত অধিকার ছাড়া অন্যকে হত্যা করে তবে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থেকে কতটা দূরে থাকতে হবে?

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 84:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের [ইসরাঈলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "তোমাদের [অর্থাৎ, একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" অতঃপর আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় [এটি] স্বীকার করেছেন।”

এই আয়াতের সমাপ্তি এটাও স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো নয় যতক্ষণ না কেউ আনুগত্যের কর্মের মাধ্যমে একে সমর্থন করে। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন জলের মতো পুষ্টি না পেলে মারা যাবে, তেমনি

একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও ভাল হতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, আনুগত্যের কাজগুলি হল প্রমাণ যা মহান আল্লাহ তাদের কাছ থেকে দাবি করেন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে। তাই ইসলামে কাজ ছাড়া কথার ওজন কম। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী ইসরাঈল ও তাদের বংশধররা এই আদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তারা বারবার তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের লোকদের হত্যা করত এবং তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিত। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 84-85:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের [ইসরাঈলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "তোমাদের [অর্থাৎ, একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" অতঃপর আপনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করলেন। অতঃপর, তোমরাই সেই [একই ব্যক্তি যারা] একে অপরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের একটি দলকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করছ, তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করছ..."

মুসলমানদের অবশ্যই এই ধরনের আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে অন্যদের সাথে যা ভাল তাতে সহযোগিতা করতে হবে এবং খারাপ জিনিস থেকে সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

একজন মুসলিমকে কখনই লক্ষ্য করা উচিত নয় যে কে কিছু করছে বরং তাদের সাহায্য করার আগে তারা কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে অন্যদের সাহায্য করে এমনকি যদি এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে মহান আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে তারা যে লোকদের খুশি করার লক্ষ্য রাখে, তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে উঠবে, কারণ আত্মীয়-স্বজনদের মতো পার্থিব জিনিসগুলি উৎস হয়ে উঠবে কিনা তা একমাত্র আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন। একজন ব্যক্তির জন্য শান্তি বা চাপের উত্স। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

তখন কিতাবের লোকদের অদ্ভুত মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 85:

“ *অতঃপর, তোমরাই সেই [একই যারা] একে অপরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের একটি দলকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করছ । এবং যদি তারা আপনার কাছে বন্দী হয়ে আসে, তবে আপনি তাদের মুক্তিপণ দিয়ে থাকেন, যদিও তাদের উচ্ছেদ আপনার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করেন এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করেন?*

সীমালঙ্ঘন এবং তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরে, তারা যুদ্ধবন্দী হওয়ার পরে তাদের স্বাধীনতা ক্রয় করবে। তারা দাবি করেছিল যে তাওরাতের শিক্ষা অনুসারে তাদের স্বাধীনতা ক্রয় করা তাদের উপর একটি কর্তব্য ছিল , যদিও একই তাওরাত তাদের প্রথম স্থানে একে অপরের সাথে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছে। চেরি বাছাইয়ের তাদের মনোভাব সম্পর্কে ভীতিকর বিষয় কোনটি অনুসরণ করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে তাওরাতের কিছু অংশে বিশ্বাস করা এবং অন্য অংশগুলিতে অবিশ্বাস করা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ, মহান আল্লাহ বলেননি যে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের উপর আমল করেছে এবং অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করেছে যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, তিনি তাদের মনোভাবকে কুফরী বর্ণনা করেছেন। দুঃখজনকভাবে, এই মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে যারা পবিত্র কোরআনের কোন অংশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি বেছে নিতে চান এবং কোনটি উপেক্ষা করবেন যাতে তারা স্বাধীনভাবে পূরণ করতে পারে। তাদের পার্থিব ইচ্ছা। আয়াত 85 অনুযায়ী, এই মনোভাব শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে অবিশ্বাসের সাথে যুক্ত নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 85:

"... *তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করেন এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করেন?..."*

মহান আল্লাহ তখন কিতাবের লোকদের এবং মুসলিম জাতিকে সম্প্রসারণ করে সতর্ক করেন যে, যে কেউ ঐশ্বরিক শিক্ষার প্রতি চেরি বাছাই করার মনোভাব অবলম্বন করবে সে দেখতে পাবে যে এই মনোভাবের মাধ্যমে তারা প্রাপ্ত সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ যেমন সম্পদের উৎস হয়ে উঠবে। উভয় জগতে তাদের জন্য দুঃখ, চাপ এবং উদ্বেগ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 85:

"...তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা এটা করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী আছে? এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে..."

এর কারণ হল তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যকে ভুলে গিয়েছিল এবং উপেক্ষা করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজনকে কখনই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে শুধুমাত্র তাদের শাস্তি না হওয়ার কারণে বা স্পষ্টভাবে, যখন তারা ঐশ্বরিক শিক্ষার প্রতি চেরি বাছাই করার মনোভাব গ্রহণ করে, যে তারা পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তারা যা কিছু করে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা নিঃসন্দেহে উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এবং যারা এ ধরনের আচরণ করেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই তারা যে অপমানজনক পরিণতি ভোগ করেছে তা লক্ষ্য করলে এটি খুবই স্পষ্ট হয়। এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর শাস্তি প্রায়শই সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট নয়, যেমন পার্থিব জিনিস যা একজন ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে অর্জন করেছে, তাদের জন্য চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 85:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, যে ব্যক্তি বেছে নেয় কোন ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে, সে শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে আচরণ করে যাতে তারা তাদের পার্থিব ইচ্ছাগুলোকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পূর্ণ করতে পারে যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা এবং

প্রাপ্তি। পার্থিব জিনিস যা তারা কামনা করে, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব। এই মনোভাবের ফলস্বরূপ, এই চেরি বাছাইকারী, তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং পার্থিব লাভকে প্রাধান্য দিয়েছে মনের শান্তির উপর, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে উভয় জগতেই পাওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে আনন্দদায়ক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। তাঁর কাছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 86:

"এরাই তারা যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন কিনেছে..."

এটি একটি মূর্খ লেনদেন, কারণ তারা অস্থায়ী, দূষিত এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জিনিসকে প্রাধান্য দিয়েছে স্থায়ী এবং দূষিত মনের শান্তির চেয়ে যখন তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে উভয় জগতেই অর্জন করে। এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

তাদের দুর্বল পছন্দের ফলস্বরূপ, তাদের চেরি বাছাই করার মনোভাবের মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করেছে তা তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার উত্স হয়ে উঠবে। সময়ের সাথে সাথে, এই শাস্তি কেবল বাড়বে তবুও তারা জানবে

না কেন তারা দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী যদিও তাদের হাতে পৃথিবী রয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের আশেপাশের লোক এবং জিনিসগুলিকে দোষারোপ করবে, যার ফলে তারা তাদের জীবনের কিছু শালীন লোকের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এতে তাদের মানসিক সমস্যা বাড়বে। কোন পরামর্শদাতা, জাগতিক বন্ধু বা জিনিস তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তারা যদি তাওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরকালে তারা কী ভয়াবহতার সম্মুখীন হবে তা বর্ণনা করার মতো নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 86:

"... সুতরাং তাদের জন্য শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

তাই একজনকে অবশ্যই ঐশ্বরিক শিক্ষা থেকে চেরি বাছাই এড়িয়ে এই ফলাফল এড়াতে হবে এবং এর পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করতে হবে, এমনকি যদি তারা এই শিক্ষাগুলির কিছু পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। একজনকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার কাছে যেতে হবে এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হবে যেভাবে তারা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে যখন তারা তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে দেয়। যেভাবে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে যদিও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ করে, একজনকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। বিশ্ব এবং পরবর্তী। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে , যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 87

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ
وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ
وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

"এবং অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব [তওরাত] দিয়েছিলাম এবং রসূলদের সাথে তার অনুসরণ করেছিলাম। আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা [ফেরেশতা জিব্রাইল] দ্বারা সমর্থন করেছি। কিন্তু এটা কি [তা নয়] যে, [হে বনী ইসরাঈল] যখনই তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, তখনই তোমরা অহংকার করেছিলে? আর একটি দল [রসূলদের] তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে তোমরা হত্যা করেছিলে।

মহান আল্লাহ সর্বদা পবিত্র নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদের উপর স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সহকারে যাতে তারা মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে পরিচালিত করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই আনুগত্যের মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক আচরণবিধি পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে এমন একটি আচরণবিধি তৈরি করে এবং অনুসরণ করে যা তার ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং তাই তাকে দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তবে তাদের এবং একটি প্রাণীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা পশুদের চেয়েও খারাপ, কারণ প্রাণীদের ঐশ্বরিক আচরণবিধি অনুসরণ করার মতো উচ্চ স্তরের বুদ্ধি নেই যা মানবজাতিকে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 179:

"... তারা পশুর মত; বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট। তারাই গাফেল।"

ঐশ্বরিক আচরণবিধি মানুষকে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবন দেয়। এই আচরণবিধি ব্যতীত একজন ব্যক্তি অর্থহীন উপায়ে তাদের জীবন এবং তাদের দেওয়া সম্পদ নষ্ট করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

" এবং অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব [অর্থাৎ তাওরাত] দিয়েছিলাম এবং তার পিছনে রসূল দিয়েছিলাম। আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা [ফেরেশতা জিব্রাইল] দিয়ে সমর্থন করেছি..."

মহান আল্লাহ, প্রত্যেক নবী (সাঃ) কে, তাদেরকে স্বর্গীয় জ্ঞান এবং অলৌকিকতার আকারে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছেন যা তাদের লোকদের উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে সমর্থন করেছিল। এ যুগে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অলৌকিক নিদর্শন হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য যাতে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার জন্য, তাদের অবশ্যই এই স্পষ্ট প্রমাণগুলি অধ্যয়ন করতে হবে এবং আমল করতে হবে। কিন্তু যে মুসলমান তা করতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা কঠিন হবে, কারণ তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা দুর্বল।

অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আনীত ঐশ্বরিক আচরণবিধিকে বাস্তবিকভাবে অনুসরণ করতে অস্বীকার করার এবং ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

"... কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমার কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], তোমার আত্মা যা কামনা করেনি, তুমি অহংকার করেছিলে?

অস্বীকার করা এবং ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হল যে এটি প্রায়শই মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বিরোধিতা করে। ইস্রায়েলের সন্তানরা বহু প্রজন্মের থেকে অন্য একটি দল ছিল যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল কারণ তারা তাদের পার্থিব ইচ্ছাকে সংযত করার জন্য ঐশী নির্দেশনাকে মেনে নিতে পারেনি। বরং তারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা মুক্ত করতে চেয়েছিল। একজনের জীবনধারাকে ধরে রাখার ইচ্ছা যা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পূর্ণ করতে দেয় তা এতই শক্তিশালী হতে পারে যে এটি একজনকে স্পষ্ট সত্যের প্রতি অহংকারপূর্ণ আচরণ করতে উত্সাহিত করে। অহংকার তাই যখন কেউ সত্যকে অস্বীকার করে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। একজন মুসলমানকে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যায় না। একজনের জীবনধারাকে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা, যার মূলে রয়েছে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, এমনকি একজনকে অন্যের উপর অত্যাচার ও ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

"...কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমার কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], তোমার আত্মা যা কামনা করেনি, তুমি অহংকার করেছিলে? আর একটি দলকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছিলে।"

মক্কার অমুসলিম এবং মদিনায় বসবাসকারী গ্রন্থের লোকেরা উভয়েই ইসলামের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু তারা এটিকে অস্বীকার করেছিল কারণ এটি তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত ঘোষণার ৪০ বছর আগে থেকে জানত এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে তিনি বিশ্বস্ত ও সৎ ছাড়া আর কিছুই নন। তারা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং পবিত্র কুরআন কোন প্রাণীর কাছ থেকে আসেনি তা ভালোভাবে জানতেন। এবং কিতাবের লোকেরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পেরেছিল, যেমন তারা উভয়ই তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মক্কার অমুসলিম এবং আহলে কিতাব উভয়েই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে ক্রমাগত ক্ষতিসাধন ও বিরোধিতা

করার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। কারণ তারা তাদের বানোয়াট জীবনধারা এবং আচরণবিধি পরিত্যাগ করতে চায়নি যা তাদেরকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

“...কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমার কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], তোমার আত্মা যা কামনা করেনি, তুমি অহংকার করেছিলে? আর একটি দলকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছিলে।"

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, মহানবী (সা.)-কে অস্বীকার করা ও নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই পৃথিবী একটি পরীক্ষা এবং পরীক্ষার জায়গা তাই, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একে একে পরীক্ষা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করবে, তত বেশি তাদের পরীক্ষা করা হবে, যেমন তাদের চারপাশের লোকদের সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহানবী (সাঃ) এর মনোভাব শিখতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে, যারা সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল ছিলেন, তারা বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং উভয় জগতে তাদের চূড়ান্ত বিজয় কীভাবে অর্জিত হয়েছিল, এমনকি যদি তারা নিহত হয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 169-170:

“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত, রিযিক প্রাপ্ত। আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে আনন্দিত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

“...কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমার কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], তোমার আত্মা যা কামনা করেনি, তুমি অহংকার করেছিলে? আর একটি দলকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছিলে।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই অনুরূপ আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যা ঘটতে পারে যখন তারা পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর কাজ করে, যা তাদের ইচ্ছার সাথে খাপ খায় এবং সেই অংশগুলিকে উপেক্ষা করে যা তাদের ইচ্ছার বিরোধী। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে নিজেকে এবং অন্যদেরকে বিশ্বাস করতে বোকা বানিয়ে ফেলতে পারে যে তারা আন্তরিক মুসলিম অথচ তারা নিজেদের ইচ্ছার পূজারী ছাড়া আর কিছুই নয়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে কঠোরভাবে ঐশ্বরিক আচরণবিধি অনুসরণ করা তাদের জন্য সর্বাবস্থায় সর্বোত্তম কারণ এটি সরাসরি তাদের সৃষ্টিকর্তার

কাছ থেকে আসে। উপরন্তু, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন তাদের চিকিত্সকের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কারণ তারা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জানে, যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঐশ্বরিক নির্দেশনা গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা। এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদত্ত আচরণবিধি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। কিন্তু একইভাবে একজন রোগী যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শকে উপেক্ষা করে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, সে মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভুগবে, একইভাবে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করবে এবং আমল করতে ব্যর্থ হবে, সেও শান্তি পাবে। এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তও পায়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এর কারণ এই যে, একমাত্র আল্লাহই মহান, যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন যে পার্থিব জিনিসের অধিকারী তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের উৎস বা শান্তির উৎস হয়ে ওঠে। আল্লাহই মহান, একমাত্র যিনি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস। অতএব, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে আর কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

ইতিহাস, সমাজ ও ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ দ্বারা দুটি বিকল্প পরিষ্কার করা হয়েছে। যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তারা পাবে। যে পার্থিব জিনিসগুলি তাদের কাছে রয়েছে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং হতাশার উত্স হয়ে উঠবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পক্ষান্তরে যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যখন কেউ ইতিহাসের পাতা উল্টায়, তাদের সমাজে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন তারা ঐশ্বরিক শিক্ষা অধ্যয়ন করে তখন এই দুটি জীবনধারা এবং প্রতিটির ফলাফল বেশ স্পষ্ট হয়। অতএব, একজন ব্যক্তিকে তার নিজের স্বার্থে সঠিক পথ বেছে নিতে হবে।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 88

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"এবং তারা [কিতাবের লোকেরা] বলেছিল, "আমাদের হৃদয় আবৃত।" কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে], আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা খুব কমই বিশ্বাস করে।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী গ্রন্থের অধিকাংশ আলেমগণ অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এর মধ্যে অনেক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে। যদিও তারা ইসলামের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, যেহেতু পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অন্যদেরকে এটি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিল। যেহেতু তারা বা তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা, নেতৃত্ব এবং এই জিনিসগুলির সাথে যে সম্পদ এসেছিল তা হারাবে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

সমাজের বিপথগামী আলেম ও অভিজাতরা সর্বদাই সর্বপ্রথম খোদায়ী নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতা করে কারণ এটি তাদের জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে তারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদকে অপব্যবহার করেছে। তাই এই মনোভাব অবশ্যই মুসলিমদের এড়িয়ে চলতে হবে যারা চেরি বাছাই করে একইভাবে কাজ করতে পারে কোন ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে এবং কোনটি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী উপেক্ষা করতে হবে। ইতিহাস দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে, এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, কারণ যে ব্যক্তি এই আচরণ গ্রহণ করে সে মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যদিও তারা নিজেকে একজন আন্তরিক মুসলিম বলে দাবি করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার একটি কৌশল আলোচনার মূল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

" *এবং তারা [কিতাবের লোকেরা] বলেছিল, "আমাদের হৃদয় আবৃত।"*

কিতাবের লোকদের পণ্ডিতরা তাদের নিজস্ব ঐশী কিতাবের বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে তারা সমর্থন করতেন যে এটি কতটা স্বাভাবিকভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত এবং উপযুক্ত। কিন্তু তারা দাবি করেছিল যে তাদের ঐশী গ্রন্থের বিপরীতে পবিত্র কুরআন মানুষের উপর এই প্রভাব ফেলেনি, তাই তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে পবিত্র কুরআনের উত্স তাদের ঐশী গ্রন্থের উত্সের মতো নয়, অর্থ, আল্লাহ, মহান, অন্যথায় পবিত্র। কুরআন তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একই গভীর প্রভাব ফেলত যা তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থগুলি অনুমিতভাবে করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি একজন নির্দিষ্ট লেখকের সাথে পরিচিত তারা সহজেই তাদের কাজ চিনতে পারেন, এমনকি যদি তারা এমন একটি প্যাসেজ পড়ছেন যেখানে লেখকের নাম তাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে। একইভাবে, তারা দাবি করেছিল যে পবিত্র কুরআন তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের মতো একই গভীর প্রভাব ফেলেনি, এর অর্থ অবশ্যই উভয়ের লেখকই আলাদা ছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

" *এবং তারা [কিতাবের লোকেরা] বলেছিল, "আমাদের হৃদয় আবৃত।"*

যেহেতু তাদের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অজ্ঞ ছিল, তারা ধরে নিয়েছিল যে তাদের পণ্ডিতরাই ঐশী কিতাবকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম লোক এবং তাই তারা পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করার জন্য অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করেছিল।

মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ

করার নির্দেশ দেয় যাতে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ না করে নিজের জন্য ইসলামের মৌলিক সত্যগুলিকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারে এবং কাজ করতে পারে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

" *বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে, আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."*

এই পদ্ধতিতে আচরণ করা নিশ্চিত করবে যে কেউ অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে না যাদের একমাত্র নেতৃত্ব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং এর সাথে আসা জাগতিক জিনিসগুলি, ঠিক যেমন কতজন আলেম কিতাবের আচরণ করেছিলেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

" *এবং তারা [কিতাবের লোকেরা] বলেছিল, "আমাদের হৃদয় আবৃত।"*

একজন মুসলিমকে অবশ্যই কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, যার ফলে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়গুলি সেই শিক্ষাগুলি থেকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে যাতে তারা সেগুলি বুঝতে বা আমল করতে পারে না।

এই আচরণ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

"... কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে], আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা খুব কমই বিশ্বাস করে।"

মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সফলতা পাওয়া সম্ভব নয় যখন কেউ মহান আল্লাহর রহমত হারায়, যা অভিশপ্ত হওয়ার সরাসরি ফলাফল। উপরন্তু, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করা একটি কুফরী কাজ, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অবাধ্যতা নয়। এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে , একজন মুসলিমকে তাই ঐশ্বরিক শিক্ষা থেকে চেরি বাছাই করার মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি তাদের অধিকারী সামান্য এবং দুর্বল বিশ্বাসের মৃত্যু হতে পারে। বিশ্বাস হল একটি উদ্ভিদের মতো যাকে সঠিকভাবে পুষ্ট করতে হবে এবং ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে রক্ষা করতে হবে। ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শে আসলে একটি উদ্ভিদ যেমন মারা যেতে পারে তেমনি একজন মুসলমানের বিশ্বাসও মারা যেতে পারে যদি তারা ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, যেমন চেরি পিকিং কোন ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে এবং কোনটি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী উপেক্ষা করতে হবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় ও পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ, শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যাতে তাদের বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হয় এবং

ফলস্বরূপ তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য প্রদান করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

" *এবং তারা [কিতাবের লোকেরা] বলেছিল, "আমাদের হৃদয় আবৃত।"*

এর অর্থ এইও হতে পারে যে, কিতাবের পণ্ডিতরা দাবি করেছিলেন যে তাদের আসমানী কিতাব তাদেরকে এমন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক হৃদয় দান করেছে যে তারা অন্যান্য সমস্ত জিনিস থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে উঠেছে। অর্থ, তাদের পবিত্র কুরআনের প্রয়োজন ছিল না কারণ তারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব ঐশী কিতাবের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব মুসলমানদের দ্বারাও গ্রহণ করা যেতে পারে যারা বিশ্বাস করে যে তারা কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে তারা আর পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করতে বাধ্য থাকে না, যেমন তারা ইতিমধ্যেই করেছে। আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। ঠিক যেমন একজন শিক্ষার্থী যে কোর্স থেকে স্নাতক হয় তাদের আর তাদের শিক্ষকের সাথে পাঠে অংশ

নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, এই লোকেরা মনে করে যে তাদের আর ইসলামী শিক্ষার নির্দেশনার প্রয়োজন নেই কারণ তারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। এটি একটি অত্যন্ত অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব কারণ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কখনই ইসলামের শিক্ষার উপর আমল পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর দৃঢ় থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

" আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

তাই একজনকে অবশ্যই এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব পরিহার করতে হবে অন্যথায় তারা মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এমনকি তাদের সামান্য বিশ্বাস থেকেও বঞ্চিত হতে পারে, যা চূড়ান্ত ক্ষতি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 88:

"... কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে], আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা খুব কমই বিশ্বাস করে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 89-91

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٩

بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ فَبَآءُو
بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٩٠

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤۡمِنُ بِمَآ أُنزِلَ
عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَهُمۡۗ
قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبۡلُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٩١

“আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব [পবিত্র কুরআন] এসেছিল যা তাদের কাছে ছিল [তওরাতের] সত্যায়ন করে - যদিও এর আগে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রার্থনা করত - কিন্তু [তারপর] যখন তাদের কাছে এলো যাকে তারা চিনতে পেরেছে, তারা অবিশ্বাস করেছে। সুতরাং কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

কতই না নিকৃষ্ট বিষয় যার জন্য তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে- যে তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অবিশ্বাস করবে [তাদের] ক্ষোভের কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করবেন। তাই তারা

ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

আর যখন তাদেরকে [আহলে কিতাব] বলা হয়, "আল্লাহ যা [পবিত্র কুরআন] নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে, আমরা [শুধুমাত্র] আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি।" এবং তারা এর পরে যা এসেছে তাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটি তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়ন করে [তওরাত ও বাইবেল] বল, "তাহলে কেন তোমরা পূর্বে আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো?"

পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব, তাওরাত এবং বাইবেলের সঠিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করেছে এবং মানুষের দ্বারা তাদের মধ্যে যে ত্রুটিগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল তা সংশোধন করেছে। যারা তাওরাতকে কঠোরভাবে মেনে চলেন, যেমন আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইসলাম আসার আগে, তারা পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাদের উভয়েরই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

উপরন্তু, সমস্ত আসমানী কিতাবের রচয়িতা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন, তাই যারা তাওরাতকে সঠিকভাবে মেনে চলেন তারা পবিত্র কুরআনকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 82-83:

“আপনি অবশ্যই ইহুদীদের এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের প্রতি ঈমানদারদের প্রতি সবচেয়ে তীব্র শত্রুতা দেখতে পাবেন; এবং আপনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের পাবেন মুমিনদের স্নেহে যারা বলে, আমরা খ্রিস্টান। কারণ তাদের মধ্যে পুরোহিত ও সন্ন্যাসী রয়েছে এবং তারা অহংকারী নয়। আর যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শোনে, তখন আপনি দেখতে পান তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে কারণ তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদেরকে সাক্ষীদের মধ্যে নিবন্ধন করুন।

এটি বোঝা সহজ, কারণ যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লেখকের সাথে পরিচিত হন তিনি সহজেই তাদের কাজ চিনতে পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 89:

" *এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব [পবিত্র কুরআন] এসেছিল যা তাদের কাছে ছিল [তওরাতের] সত্যায়ন করে।*

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, কিতাবের লোকেরা কীভাবে চূড়ান্ত ঐশী ওহী এবং মহানবী (সাঃ) এর নামে তাদের যুদ্ধ ও বিবাদে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে মিনতি করবে। তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৩ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 89:

" এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব [পবিত্র কুরআন] এসেছিল যা তাদের কাছে ছিল [তওরাতের] সত্যায়ন করে - যদিও এর আগে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রার্থনা করত..."

প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাবই মদিনায় বসবাসকারী মূর্তিপূজারীদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল কারণ তারা ক্রমাগত শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন এবং চূড়ান্ত আসমানী প্রত্যাদেশের বইয়ের লোকেরা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। কিভাবে তাদের উভয়ের মাধ্যমে কিতাবরা অন্য সকল জাতিকে জয় করবে। উদাহরণস্বরূপ, মদিনায় বসবাসকারী ইহুদি পণ্ডিত ইউশা প্রায়ই ঘোষণা করতেন যে শেষ নবী (সা.)-কে আরবের মানুষের কাছে পাঠানোর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি জনগণকে এই চূড়ান্ত মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাবেন, যদি তারা তাঁর সময়ে বেঁচে থাকেন এবং তাঁর দাওয়াত প্রত্যক্ষ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন সেই লোকেরাই ইউশা (আঃ) এই চূড়ান্ত নবীকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু ইউশা স্বয়ং নবী মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক এবং ইসলাম হিংসা ও মন্দ থেকে। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 212-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 89:

"... *কিন্তু [অতঃপর] যখন তাদের কাছে এমন কিছু এল যা তারা চিনতে পেরেছিল, তারা তাতে অবিশ্বাস করেছিল..."*

আগেই বলা হয়েছে, বইটির লোকেরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তবুও তারা শিক্ষার সাথে আপস

করে তৈরি করা আচরণবিধি অনুসরণ করার জন্য ভালবাসার কারণে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের, যাতে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে এবং পার্থিব জিনিস যেমন সামাজিক মর্যাদা, নেতৃত্ব এবং সম্পদ অর্জন করতে পারে। তাদের প্রকাশ্য কুফরী কাজের ফলে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 89:

"...কিন্তু [অতঃপর] যখন তাদের কাছে এমন কিছু এল যা তারা চিনতে পেরেছিল, তখন তারা অবিশ্বাস করেছিল; সুতরাং কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।"

মহান আল্লাহর অভিশাপ তাঁর রহমতকে সরিয়ে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে কেবল উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, একজনকে যে পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা দুঃখ, চাপ এবং হতাশার উত্স হয়ে উঠবে। এটা খুবই প্রতীয়মান হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে।

মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও তারা মৌখিকভাবে তাদের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা বা উপেক্ষা করে কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে তাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং সম্পদ ও নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস লাভ করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। 89 নম্বর আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, এইভাবে আচরণ করা অবিশ্বাসের কাজ। অতএব, যে ব্যক্তি এই আচরণ

করবে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করা উচিত। এটি ঘটতে পারে কারণ বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মতো যা পুষ্টি পাওয়ার মাধ্যমে এবং ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে সুরক্ষিত থাকার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শে এলে যেমন একটি উদ্ভিদ মারা যেতে পারে , তেমনি পার্থিব লাভের জন্য ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যাখ্যা করার মতো ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আসলে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের মৃত্যু হতে পারে।

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের ক্ষণস্থায়ী ও দূষিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য বিক্রি করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 90:

" *কত নিকৃষ্ট সেটা যার জন্য তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে..."*

প্রতিটি ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে নিজেকে সামান্য টাকার বিনিময়ে বস্তুজগতের কাছে বিক্রি করবে নাকি উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের বিনিময়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 111:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন যার বিনিময়ে তারা জান্নাত পাবে..."

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের কাছে যা কিছু পার্থিব নিয়ামত রয়েছে তা মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। এই বাস্তবতা বোঝা একজনকে সঠিক পছন্দ করতে সাহায্য করবে।

মহান আল্লাহ তারপর আরেকটি কারণ তুলে ধরেছেন যে কারণে কিতাবের অনেক লোক ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 90:

"... তারা [তাদের] ক্রোধের মাধ্যমে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে তারা অবিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ নাজিল করবেন..."

কিতাবের লোকেরা ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ) এর ভাই হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর। তাদের উপর হতে যেহেতু কিতাবের লোকেরা, বিশেষ করে ইহুদিরা বংশের প্রেমে নিমগ্ন ছিল, যা তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় দিক, তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারেনি, যেমন তিনি ছিলেন। একটি ভিন্ন বংশ। তারা এমন একজনকে মেনে নিতে এবং

অনুসরণ করতে দেখেছিল যে তাদের বংশের ছিল না কারণ এটি বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বকে মুছে ফেলবে, যা তারা বানোয়াট করেছিল।

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই বর্ণবাদী মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ এটি ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মহান আল্লাহ তায়ালা এটা স্পষ্ট করে দেন যে, কেউ যত আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মান্য করে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষা দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, তারা তত বেশি উন্নত হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনের উদ্দেশ্য এবং তাদের অনেক কাজ লুকিয়ে আছে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন কে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে। অতএব, কাউকে কখনোই মনে করা উচিত নয় যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, এমনকি যদি তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। দুঃখের বিষয় যে, অনেক মুসলিম এমন আচরণ করে বইয়ের লোকদের পথ অনুসরণ করেছে যেন ইসলাম তাদের জাতি ও জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। তারা বিভিন্ন জাতি এবং পটভূমির অন্যান্য মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের থেকে নিকৃষ্ট। ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব কারণ কোন জাগতিক জিনিস যা মানুষকে একে অপরের থেকে আলাদা করে না, যেমন জাতি, লিঙ্গ বা বর্ণ, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

উপরন্তু, কিতাবের লোকেরা তাদের বংশের নয় এমন কাউকে অনুসরণ করাকে মেনে নিতে পারে না, এটি তাদের মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হিংসা পোষণ করে। হিংসা একটি বড় পাপ যাকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ হিংসাকারী সরাসরি আল্লাহর পছন্দ ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যিনি মহান আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ামত বরাদ্দ করেছেন, এক্ষেত্রে নবুওয়াত। যে ব্যক্তি এইভাবে মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সমালোচনা করে, সে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধ তাদের নিজের উপরই টেনে আনবে, কারণ তারা এমন আচরণ করে যেন তারা তার চেয়ে ভাল জানে যে তার আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 90:

"... *যে তারা [তাদের] ক্ষোভের মাধ্যমে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অবিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহ নাযিল করবেন। তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।*"

তাদের হিংসা তাদের কাছে স্পষ্ট সত্যকে গ্রহণ ও সমর্থন করতে বাধা দেয়। হিংসা মানুষের বোঝাপড়ার প্রতিকার করে কারণ এটি তাদের এমনভাবে আচরণ করতে উত্সাহিত করে যা তাদের মনের শান্তি এবং সাফল্য পেতে বাধা দেয়, যেমন অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া আশীর্বাদ অপসারণের চেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে, কিতাবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ ও সমর্থন করার মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের অংশ হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু তাদের হিংসা তাদের এই উচ্চ মর্যাদা পেতে বাধা দেয়, এমন একটি পদ যা তারা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থ।

একজন মুসলিমকে কখনই বিশ্বাস করতে ভুল করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যদের ভাল কাজে সমর্থন করে তবে তাদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে। ইতিহাস এমন লোকেদের উদাহরণে পূর্ণ যারা মহান আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যখন তারা অন্যদেরকে ভাল কাজে সমর্থন করেছেন, এমনকি এর অর্থ অন্য লোকেরা লাইমলাইট অর্জন করলেও। উদাহরণ স্বরূপ, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই ইসলামের প্রথম খলিফা হতে পারতেন তবুও তিনি আবু বক্কর সিদ্দিক রা.-কে মনোনীত করে সঠিক কাজটি করেছিলেন। সহীহ বুখারি 3667 এবং 3668 নম্বরে পাওয়া হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক হিসাবে ইতিহাসে নেমে গেছেন এবং সর্বদা একজন নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মানবজাতি অর্থ, তার পদমর্যাদা তখনই উপরে উঠেছিল যখন সে অন্যদেরকে সঠিক বিষয়ে সমর্থন করেছিল, তা কমেনি। এই সত্য কিতাবধারীরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরন্তু, তাদের উপর মহান আল্লাহর ক্রোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, তারা ইসলামের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেও ইসলামের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের আলোচনা করা হয়েছিল। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে। উপরন্তু, যখন কিতাবের অনেক আলেম ইসলামে অবিশ্বাস করেছিল তখন তারা তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের মতো অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের হিংসা এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণে তারা অসংখ্য মানুষকে বিপথগামী করেছিল। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে তাই মহান আল্লাহর গজব অর্জন করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 90:

“... *যে তারা [তাদের] ক্ষোভের মাধ্যমে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অবিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহ নাযিল করবেন। তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি একজন ব্যক্তি যে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে তাও নির্দেশ করে, যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব। পবিত্র কুরআনে এবং তাঁর রেওয়ায়েতে অনেক সময়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর নবুওয়াতের কথা উল্লেখ করার আগেও মহান আল্লাহর বান্দা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করে, তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহর একজন সত্যিকারের বান্দা সর্বদা মহান আল্লাহর ইচ্ছাকে তাদের আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে রাখেন এবং এই সত্যকে গ্রহণ করেন যে তাদের নিজের জীবন সহ যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহরই অধিকারী, এবং তাই হতে হবে। তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বান্দা নিজের সন্তুষ্টির জন্য অনুসন্ধান বা আকাঙ্ক্ষা করে না। তারা কেবল তাদের প্রভু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 90:

“... *যে তারা [তাদের] ক্ষোভের মাধ্যমে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অবিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহ নাযিল করবেন।*

তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

মহান আল্লাহ তখন সেই কিতাবের লোকদের মনোভাবের সমালোচনা করেন যারা পবিত্র কুরআনের সত্যতা স্বীকার করেও প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দাবি করেছিল যে তারা কেবল তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাওরাত এবং বাইবেলে বিশ্বাস করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 91:

" *আর যখন তাদের [আহলে কিতাব] বলা হয়, "আল্লাহ যা [পবিত্র কুরআন] নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে, "আমরা [শুধুমাত্র] আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি।" এবং তারা এর পরে যা এসেছে তাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটি তাদের কাছে যা আছে তার সত্যতা প্রমাণ করে..."*

তবুও শুধুমাত্র তাদের ঐশী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখার দাবিটিও মিথ্যা ছিল, কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ ও নেতৃত্বের মতো পার্থিব লাভের জন্য সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করেছে। এমনকি যখন মহান আল্লাহ তাদের আসমানী কিতাবের মধ্যে যে ভুলগুলো প্রবর্তন করেছিলেন তা সংশোধন করার জন্য তাদের কাছে নবী করীম (সাঃ) প্রেরণ করেছিলেন, তখন তারা তাদের কিছুকে অস্বীকার করেছিল এবং অন্যদের হত্যা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

“... কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], যা নিয়ে তোমাদের আত্মা চায়নি, তোমরা অহংকার করেছিলে? আর একটি দলকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছিলে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 91:

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে, “আমরা [কেবল] আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি। এবং তারা এর পরে যা এসেছে তাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটি তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়ন করে। বল, "তাহলে কেন তোমরা পূর্বে আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো?"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী গ্রন্থের লোকেরা শুধুমাত্র তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কখনও একজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করেনি, কিন্তু তারা প্রকাশ্যে তাদের কর্মকে সমর্থন করেছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করেছিল, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করেছেন।

এটি অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে কারণ একজন যাদের মনোভাব এবং আচরণ তাদের সমর্থন এবং অনুকরণ করে তাদের হিসাবে

গণ্য করা হবে। সুনানে আবু দাউদ 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, মুসলিমরা যদি ঐশী শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ কিতাবের লোকদের মনোভাব অবলম্বন করে, তাহলে পরকালে তারা তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হতে পারে।

অবশেষে, 91 শ্লোকের সমাপ্তিও ধার্মিক কর্মের সাথে একজনের বিশ্বাসের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। কিতাবের লোকেরা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে দাবি করেছে কিন্তু তাদের দাবিকে আনুগত্যের সাথে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্যই এই আচরণ পরিহার করতে হবে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায়, যেভাবে ঈমানের অধিকারী গ্রন্থের লোকদের দাবী মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন, একইভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবিকারী মুসলমানদের মৌখিক দাবী যদি তারা তাদের দাবী সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তবে তিনি তাদের মৌখিক দাবীগুলোকে খারিজ করে দেবেন। আনুগত্যের কাজ

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 92-93

۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

"আর অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।

আর [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের [ইসরাঈলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তোমাদের উপর পর্বতকে উত্থিত করলাম, [বললাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং শোন।" তারা বললো, "আমরা শুনেছি এবং অমান্য করেছি।" এবং তাদের অন্তর তাদের অবিশ্বাসের কারণে বাছুরের [প্রেম] শুষে নিল। বল, 'তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট, যদি তোমরা ঈমানদার হও'।

মহান আল্লাহ, তারপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেন এবং মুসলিম জাতিকে ইসরায়েলের সন্তানদের অবাধ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন যখন তারা একটি ইবাদত করত। স্বর্ণের মর্যাদা সত্ত্বেও তারা শারীরিকভাবে হযরত মুসা (আঃ)-কে প্রদত্ত অনেক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন তাঁর লাঠিকে সাপে পরিণত করা এবং অলৌকিক ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনীর ধ্বংস। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 92:

"আর অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর তোমরা এর পরে বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।"

এই সময়ের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও কালজয়ী প্রমাণ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য একজনকে অবশ্যই তাদের শিখতে হবে এবং তাদের উপর কাজ করতে হবে, যা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে অমান্য করা থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু যদি কোন মুসলমান অজ্ঞতা অবলম্বন করে, তাহলে তারা ইসরাঈলের সন্তানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা পূরণকে বেছে নিয়েছে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 92:

"আর অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর তোমরা এর পরে বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, অথচ তোমরা ছিলে জালেম।"

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল যে সোনার বাছুরটি এমন একটি জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে তারা তাদের সমস্ত জাগতিক ইচ্ছা পূরণ করতে স্বাধীন ছিল, কারণ সোনার বাছুর তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করার জন্য একটি আচরণবিধি দিতে সক্ষম ছিল না। অথচ, হযরত মুসা (আঃ) কর্তৃক আনীত শিক্ষা তাদেরকে মেনে চলার জন্য একটি উচ্চতর আচরণবিধি প্রদান করেছিল যা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আচরণকে সংযত করেছিল। মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলিকে উপেক্ষা করে এই আচরণ পরিহার করতে হবে যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সেই শিক্ষাগুলি অনুসরণ করে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য উপযুক্ত। এই চেরি বাছাই করার মনোভাব ইজরায়েলের সন্তানরা গ্রহণ করেছে এবং এটি উভয় জগতে তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যায় কারণ যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যদিও এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে কারণ এই শিক্ষাগুলি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাদের পিছনের জ্ঞান বুঝতে ব্যর্থ হয়। তাদের অবশ্যই এই শিক্ষাগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে ঠিক যেমন তারা গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে, এমনকি যখন তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

" *এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা আপনার [ইসরায়েলের সন্তানদের] প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং আপনার উপরে পর্বতকে উত্থিত করেছিলাম ..."*

উল্লেখ্য যে, তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করার জন্য তাদের উপর পাহাড় উঠানো হয়নি, যেমন তারা পূর্ব থেকেই ঈমান গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাস কখনই কারো উপর জোর করা যায় না কারণ এটি আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বিষয়। একজন ব্যক্তির শরীরকে কিছু করতে বাধ্য করা যেতে পারে কিন্তু কারো আধ্যাত্মিক হৃদয়কে জোর করে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

" ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

তাদের কার্যত বিশ্বাসের মৌখিক দাবিকে কার্যত সমর্থন করার গুরুতরতার একটি অনুস্মারক ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর পর্বতকে উত্থিত করেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর সংকল্পের সাথে..."

দৃঢ়সংকল্পের সাথে গ্রহণ করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর আমল করার প্রচেষ্টার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটা করা সম্ভব নয় যখন কেউ ঐশ্বরিক শিক্ষা ত্যাগ করে বা সেগুলি বোঝে না এমন ভাষায় আবৃত্তি করে। সংকল্প মানে পরিপূর্ণতা নয় কারণ মহান আল্লাহ কখনো মানুষের কাছে পরিপূর্ণতা চাননি। তিনি তাদেরকে ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলো শেখার এবং কাজ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আদেশ দেন যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং যখনই কেউ পাপ করে, তখনই তা থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়াকে সংকল্প অন্তর্ভুক্ত করে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনও অধিকার আদায় করা। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। সি অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 6:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর পর্বতকে উত্থিত করেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর সংকল্পের সাথে..."

দৃঢ়সংকল্পের মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর অটল থাকা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত উত্স এড়িয়ে যাওয়া এমনকি যদি তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে। তাই একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলি এড়িয়ে চলতে হবে, যেহেতু কেউ অন্য বিষয়ে যত বেশি কাজ করবে তত কম তারা এই দুটির উপর আমল করবে। পথনির্দেশের উৎস, যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

" এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং পর্বতকে তোমাদের উপরে তুলেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ় সংকল্পের সাথে গ্রহণ কর এবং শোন..."

শ্রবণ সেই ব্যক্তির মতো আচরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে এক কান দিয়ে কিছু শোনে কিন্তু শব্দগুলি অন্য কান দিয়ে চলে যায় এবং তাদের আচরণকে কোনোভাবেই প্রভাবিত না করে। শ্রবণ করা শ্রবণের চেয়ে উচ্চতর, কারণ শোনার মধ্যে যা বলা হয়েছে তা মনোযোগ সহকারে শোনা, শোনা শব্দগুলির প্রতি প্রতিফলন করা এবং সেই শিক্ষাগুলিকে একজনের চরিত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা জড়িত। এই প্রতিফলন বা প্রয়োগ ব্যতীত কেবল কথা শোনার ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই খুব কম মূল্য রয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এমন আচরণ করা এড়িয়ে চলতে

হবে যেন একটি ইসলামী বক্তৃতা শোনা যথেষ্ট ভালো। পরিবর্তে তাদের অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করতে হবে, যা আলোচনা করা হয়েছে তার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ ও আচরণে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যা ইসরায়েলের সন্তানরা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু করতে পারেনি কারণ এটি তাদের ইচ্ছাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর পর্বতকে উত্থাপন করেছিলাম, [বলেছিলাম], "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং শোন।" তারা বলল [পরিবর্তে], "আমরা শুনি এবং অমান্য করি।"..."

এটা অসম্ভাব্য যে ইস্রায়েলের সন্তানরা আসলে এই শব্দগুলি বলেছিল এবং আয়াতটি তাদের জিহ্বার পরিবর্তে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং কর্মের কণ্ঠস্বর বর্ণনা করছে। অর্থ, তারা মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার দাবি করেছিল, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে তারা ঐশী শিক্ষা শুনে ও শেখা সত্ত্বেও তারা তাঁর অবাধ্য ছিল। তাই মুসলমানদের উচিত হবে মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করার এই মনোভাব এড়িয়ে চলার পাশাপাশি তাদের ঘোষণাকে কাজ দিয়ে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মতো যা আনুগত্যের ব্যবহারিক ক্রিয়া দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন পানির মতো পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হলে মরে যাবে, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও মারা যেতে পারে যদি তারা তাদের আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক দাবিকে লালন করতে ব্যর্থ হয়। যে এরূপ আচরণ করে সে কেবল বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

"... তারা [পরিবর্তে] বলেছিল, "আমরা শুনেছি এবং অমান্য করেছি।"..."

উপরন্তু, বাস্তবিক আনুগত্যই একজন ব্যক্তির প্রমাণ যা ইহকালে মানসিক শান্তি এবং পরকালে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন। আনুগত্যের অর্থ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু ইসরায়েলের সন্তানরা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করে এমন একটি ঐশ্বরিক আচরণের দ্বারা জীবনযাপনকে মেনে নিতে পারেনি, তাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কঠোর হয়ে ওঠে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

"... এবং তাদের অন্তর তাদের অবিশ্বাসের কারণে বাছুরের [পূজা] শুষে নিল..."

মহান আল্লাহ, তারপর এই মনোভাবের সমালোচনা করেন, যেখানে কেউ মৌখিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার দাবি করে, কিন্তু আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা এটি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

"... বলুন, "তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয় তা কতই না নিকৃষ্ট, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

মদিনায় বসবাসকারী কিতাবধারীদের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জিহ্বায় এই চূড়ান্ত মন্তব্যটি দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষ, বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তারা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করেছিল, কিন্তু তাদের সত্যতা স্বীকার করেও যখন তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখনও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তারা উভয়েই আলোচনা করা হয়েছিল। ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তাই মুসলমানদের অবশ্যই আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়ে কিতাব ও ইসরায়েলের সন্তানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অন্যথায় তারা ইস্রায়েলের সন্তানদের এবং কিতাবের লোকেরা একই সমালোচনা পাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 93:

"... বলুন, "তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয় তা কতই না নিকৃষ্ট, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

যে ব্যক্তি এই সমালোচনা গ্রহণ করে এবং অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় সে উভয় জগতে মানসিক শান্তি ও সাফল্য পাবে না তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 94-96

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"বলুন, যদি আখেরাতের গৃহ আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য হয় এবং [অন্যান্য] লোকদের নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

কিন্তু তাদের হাত যা দিয়েছে তার জন্য তারা কখনই এটি কামনা করবে না। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।

এবং আপনি অবশ্যই তাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে লোভী দেখতে পাবেন - [এমনকি] যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে একজন চায় যে তাকে এক হাজার বছর জীবন দেওয়া হোক, কিন্তু এটি তাকে [আসন্ন] শাস্তি থেকে ন্যূনতম মুছে ফেলবে না যে তাকে জীবন দেওয়া উচিত। আর তারা যা করে আল্লাহ তা দেখেন।"

কিতাবের লোকেরা দাবি করবে যে, তারা যেহেতু মহান আল্লাহর প্রিয়, তাই তাদের আচার-আচরণ ও কাজ নির্বিশেষে পরকালে তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা ছিল। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ..."

তাদের বিপথগামী মনোভাবের কারণে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইচ্ছুক চিন্তাধারা গ্রহণ করে। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা সর্বদা অবিরামভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করার সাথে জড়িত, যখন মহান আল্লাহর রহমতের সত্যিকারের আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে, যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। , যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। তাই একজনকে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই এবং এটি কেবল গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি কিতাবধারীদের মত মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে, সে কেবল মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক মনোভাব অবলম্বন করবে। শুধুমাত্র তাদের বংশের কারণে তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করার অর্থ হল যে ঐশ্বরিক করুণা বর্ণবাদের উপর ভিত্তি করে। এর অর্থ দাঁড়াবে যে, মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলের সাথে অন্যায়কারীর সমান আচরণ করবেন, যা সত্য ও তাঁর ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

দুঃখের বিষয়, এই ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাভাবনা অনেক মুসলিমদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে যারা বইটির লোকেরা যেভাবে একই দাবি করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতির অন্তর্ভুক্ত তাই তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত মূর্খতাপূর্ণ এবং অসম্মানজনক মনোভাব গ্রহণ করা কারণ এটি স্পষ্টভাবে ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। মহান আল্লাহর রহমতের উপর সত্যিকারের আশা রাখতে হবে, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করার মাধ্যমে, তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক এবং যখনই তারা পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনও অধিকার আদায় করা। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা রাখার যোগ্য।

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা কেবলমাত্র তারা কতটা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তার সাথে সম্পর্কিত। এটি কোনো জাগতিক কারণের সাথে যুক্ত নয়, যেমন একজনের লিঙ্গ, জাতি, বংশ বা সম্পদ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

অন্যথায় বিশ্বাস করা শুধুমাত্র একই ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাধারা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করবে বইয়ের লোকেরা গৃহীত।

মহান আল্লাহ তখন কিতাবধারীদের এবং তাদের বিপথগামী মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা 94:

"বলুন, যদি আখেরাতের গৃহ আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, অন্য লোকদের জন্য নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এই চ্যালেঞ্জটি সেই ব্যক্তি সহজেই গ্রহণ করবে যারা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের আচরণ এবং কর্ম নির্বিশেষে পরকালে পরিত্রাণের গ্যারান্টিযুক্ত। মৃত্যু কামনা করে বা আত্মহত্যা করে জান্নাত লাভ করতে পারলে কেন কষ্ট, পরীক্ষা, অসুস্থতা ও মানসিক চাপে ভরা এই পৃথিবীতে থাকতে চাইবে? এমনকি যদি আত্মহত্যা করাকে তাদের বিশ্বাসে পাপ বলে মনে করা হয় তবে এটি তাদের জান্নাত থেকে বিরত রাখবে না কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা ইতিমধ্যেই পরিত্রাণের

নিশ্চয়তা পেয়েছে। তবুও, সত্যটি হল তারা সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন যদিও তারা মৌখিকভাবে মিথ্যা দাবি করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 95:

" *কিন্তু তারা কখনই এটি কামনা করবে না, তাদের হাত যা দিয়েছে তার কারণে। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।"*

তারা পুরোপুরি জানে যে তারা পরকালে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারবে না এবং তাই তারা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না। কিন্তু তারা যতই এই পৃথিবীতে থাকতে চায় না কেন, তারা সর্বদা সেখানে কিছু পরিণতির সম্মুখীন হবে, যদিও এই পরিণতিগুলি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নাও হয়, যেমন মহান আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, একটি উৎস হয়ে ওঠে। তাদের দুর্দশা এবং মানসিক চাপ। এবং পরকালে যা হবে তা আরও খারাপ হবে যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তারা তাদের কর্মের পরিণতির সম্মুখীন হতে পারে না যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয় কারণ কোন কিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞান থেকে এড়াতে পারে না এবং কোন কিছুই তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এড়াতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 95:

" *... আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।*"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 94-95:

"বলুন, যদি আখেরাতের গৃহ আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য হয় এবং [অন্যান্য] লোকদের নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" কিন্তু তাদের হাত যা দিয়েছে তার জন্য তারা কখনই এটি কামনা করবে না। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।"

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে কিতাবের লোকেরা কেন সাহাবায়ে কেরামের কাছে মৃত্যু কামনা করেনি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক পথে ছিল। প্রথমত, একজন মুসলমান জানে না যে তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে কি না। যেহেতু বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যুর বিপদ বিদ্যমান, একজন মুসলমানের মৃত্যু চাওয়া উচিত নয় এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর ঐতিহ্য, এবং তারপর আশা করি যে তারা যখন শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে, মহান আল্লাহ তাদের ঈমান রক্ষা করবেন। যাতে তারা পরকালে নাজাত পায়। দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিম তাদের বিশ্বাসের সাথে মারা গেলেও তাদের পাপের শাস্তি হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার আগে তারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও অসহনীয় তাই একজন মুসলমানের মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়, কারণ তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেনি, যা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্য দিকে বইয়ের লোকেরা এই দুটি পয়েন্ট দ্বারা বাধা ছিল না কারণ তারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের বংশের কারণে পরকালে মুক্তির গ্যারান্টিযুক্ত ছিল। আর যারা দাবি করেছিল যে তারা জাহান্নামে মাত্র কয়েক দিনের জন্য প্রবেশ করবে তারা জাহান্নামের ভয়ের অধিকারী নয় ইসলাম মুসলমানদের অধিকার করতে শেখায়। মুসলমানদের শেখানো হয়েছে যে ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করা অসহনীয়, যেখানে বইয়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে তাদের জন্য জাহান্নাম কেবল একটি ছোট উপদ্রব হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

"এবং তারা বলে, " [কয়েকটি] গণনা ব্যতীত আগুন আমাদের কখনই স্পর্শ করবে না।"...

অতএব, যদি তারা সত্য কথা বলত তবে তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত এবং মৌখিকভাবে মৃত্যু কামনা করত কিন্তু তারা তা না করে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 95:

" *... আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।"*

অতঃপর মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনের প্রতি কিতাবধারী মানুষের চরম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 96:

" *এবং আপনি অবশ্যই তাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে লোভী দেখতে পাবেন - [এমনকি] যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে একজন চায় যে তাকে হাজার বছর জীবন দেওয়া হোক..."*

এই যুগে এই মনোভাব আরও স্পষ্ট কারণ বইয়ের লোকেরা যে জিনিসটি চায় এবং আকাঙ্ক্ষা করে তা হল আরও পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ, চাকরি, বিয়ে এবং ক্যারিয়ার। যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে পরিত্রাণ তাদের জন্য ইতিমধ্যেই নিশ্চিত, তাই তারা কেবল পার্থিব জিনিস অর্জন এবং উপভোগ করার দিকে মনোনিবেশ করে। যদিও ইসলাম পরিমিতভাবে হালাল পার্থিব জিনিস অর্জন ও উপভোগ করতে নিষেধ করে না, তবুও এটি মানবজাতিকে কম শিক্ষা দেয় যে তাদের উদ্দেশ্য পার্থিব জিনিস উপভোগ করা নয়, বরং বিচারের দিনে, মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য কার্যত প্রস্তুত করা। যার উপর তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা নেই। এই ব্যবহারিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে পার্থিব আশীর্বাদগুলো তারা প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই কিতাবধারীদের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব জিনিস অর্জন ও ভোগ করা। যেহেতু পৃথিবী অস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ, সে যাই হোক না কেন কেউ এটি অর্জন এবং উপভোগ করুক না কেন তা কেবল তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চাপ এবং অসুবিধার কারণ হবে, কারণ তাদের মনোভাব কেবল তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য করবে। মঞ্জুর অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এই বাস্তবতা তখন মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 96:

" এবং আপনি অবশ্যই তাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে লোভী দেখতে পাবেন - [এমনকি] যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে একজন চায় যে তাকে এক হাজার বছর জীবন দেওয়া হোক, কিন্তু এটি তাকে [আসন্ন] শাস্তি থেকে ন্যূনতমভাবে সরিয়ে দেবে না যে তাকে জীবন দেওয়া উচিত..."

একজন ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে যত বছরই দেওয়া হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত হিসাবের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। যেহেতু এই চূড়ান্ত যাত্রা এবং জবাবদিহিতা অবশ্যম্ভাবী তাই কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হওয়া অর্থপূর্ণ, কারণ তাদের দীর্ঘ জীবন বা এই পৃথিবীতে তারা যে বিলাসিতা উপভোগ করে তা বিচার দিবসে তাদের অনিবার্য জবাবদিহিতাকে সরিয়ে দেবে না। এই ব্যবহারিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। একজন বুদ্ধিমান ছাত্র যেভাবে তাদের অনিবার্য পরীক্ষার জন্য কার্যত প্রস্তুত করে, তেমনি জ্ঞানী মুসলমানও তাদের অনিবার্য হিসাব-নিকাশের জন্য প্রস্তুত করবে, যদিও তাদের এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন দেওয়া হয়। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবন বা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যা তারা উপভোগ করে তা যদি তারা জাহান্নামে শেষ হয় তবে তাদের ভাল বোধ করবে না, কারণ জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কোনও ব্যক্তির ভাল স্মৃতিগুলিকে এমনভাবে সরিয়ে দেয় যা তাদের অনুভব করে যে তারা কখনই নয়। তাদের সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে ভাল কিছু অভিজ্ঞতা. সুনানে ইবনে মাজাহ, আয়াত 4321 এ পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

তদ্ব্যতীত, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই পৃথিবীতে যত বছরই দেওয়া হোক না কেন, তার জীবন এক ঝলকানি দিয়ে চলে যাবে। এটি এমন একটি সত্য যা

কোন ব্যক্তি, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে অস্বীকার করতে পারে না। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা এমন হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ব্যতীত [জগতে] অবস্থান করেনি..."

অতএব, এই দুনিয়ায় আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করার কোন মানে হয় না যদি তা দীর্ঘমেয়াদী অসুবিধা এবং পরকালে শাস্তির দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 96:

" *এবং আপনি অবশ্যই তাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে লোভী দেখতে পাবেন - [এমনকি] যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে একজন চায় যে তাকে এক হাজার বছর জীবন দেওয়া হোক, কিন্তু এটি তাকে [আসন্ন] শাস্তি থেকে ন্যূনতমভাবে সরিয়ে দেবে না যে তাকে জীবন দেওয়া উচিত..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা রাখার সমালোচনা করে। দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে ভাল কাজগুলি করতে বিলম্ব করতে উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার

উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে ভাল কাজ করার জন্য প্রচুর সময় রয়েছে। দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশাও একজনকে নিজের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণের উন্নতি করতে দেরী করতে উত্সাহিত করবে, কারণ তারা বিশ্বাস করে তাদের আচরণ ও কর্ম পরিবর্তন করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় রয়েছে। পরিশেষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকার জন্য আরামদায়ক করার জন্য জাগতিক জিনিসপত্র জমা করতে এবং উপভোগ করতে উত্সাহিত করবে। অন্যদিকে, একজনের জীবন ক্ষণিকের মধ্যে কেটে যাবে বলে বিশ্বাস করা তাদের সৎ কাজ করতে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করতে উত্সাহিত করবে এবং এটি তাদের তাদের মৌলিক কাজগুলি করতে উত্সাহিত করবে। এই পৃথিবীতে প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজন। এটি পরকালে তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করবে যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই পার্থিব জীবনের প্রতি লোভ ও ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে যে, পরকালের জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবনের তুলনা সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী, ছোট এবং অপূর্ণ হবে। অথচ পরকালের সুখ চিরন্তন, অকল্পনীয়ভাবে বিশাল এবং সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত। অতএব, তাদের অবশ্যই তাদের দেওয়া পার্থিব নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা পরকালের চিরন্তন এবং নিখুঁত

সুখ লাভ করতে পারে, এমন একটি সুখ যা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরকালের জন্য যতটা সম্ভব ভাল পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে, যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে অর্জন করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের পার্থিব জীবনের দিকে মনোনিবেশ না করে পরকালের জন্য যে ভালো কিছু পাঠিয়েছে তা পূরণের দিকে মনোনিবেশ করবে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 18:

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন আগামীকালের জন্য কী রেখে গেছে তা দেখুক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

কিন্তু যদি কেউ কিতাবধারীদের মনোভাব অবলম্বন করে তবে তারা ভাল কিছু পাঠাবে না এবং তাই কেবল তাদের পার্থিব জীবনের দিকে মনোনিবেশ করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালা দুটি পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইহলোকে মানসিক শান্তি এবং পরকালের মুক্তি যে বোঝার পথ তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় ইচ্ছাকৃত চিন্তার মাধ্যমে নয়। এবং ভ্রান্তির পথ যেখানে কেউ বিশ্বাস করে যে তারা তাদের ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারে এবং এখনও উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে। এটা এখন

মানুষের উপর নির্ভর করে যে তারা কোন পথ বেছে নেবে, কারণ মহান আল্লাহ দেখছেন এবং নিঃসন্দেহে তাদের পছন্দ ও কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 96:

"... আর তারা যা করে আল্লাহ তা দেখেন।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 97-99

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾

"বলুন, যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু, সে [কেউ নয়] যিনি এটি [পবিত্র কুরআন] আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আল্লাহর অনুমতিক্রমে, সত্যায়নকারী যা আগে ছিল [তওরাত ও বাইবেল] এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের এবং তাঁর রসূলগণ এবং জিব্রাইল ও মিকায়েলের শত্রু হয় - তবে অবশ্যই আল্লাহ কাফেরদের শত্রু।

এবং আমি অবশ্যই আপনার প্রতি আয়াতসমূহ [যা] স্পষ্ট প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেছি এবং অবাধ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করবে না।"

মক্কার অমুসলিমদের মতোই বইয়ের লোকেরা তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যানকে জায়েজ করার জন্য খোঁড়া অজুহাত নিয়ে আসবে। এসব খোঁড়া অজুহাতের একটির কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 97:

"বলুন, যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু, সে [কেউ নয়] যিনি এটি [পবিত্র কুরআন] আপনার হৃদয়ে নাযিল করেছেন , [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আল্লাহর অনুমতিক্রমে, সত্যায়নকারী। যা আগে ছিল [তওরাত ও বাইবেল]..."

পবিত্র কুরআন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা, কেবল তাদের মানসিকতা সংশোধন করা নয়। কেউ তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে তখনই পরিশুদ্ধ করতে পারে যখন তারা পবিত্র কুরআনের মধ্যে উল্লিখিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা এবং এতে বর্ণিত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন হিংসা, লোভ এবং অধৈর্যতা পরিহার করে। যিনি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 97:

"বলুন, যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু, সে [কেউ নয়] যিনি এটি [পবিত্র কুরআন] আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আল্লাহর অনুমতিক্রমে, সত্যায়নকারী যা আগে ছিল [তওরাত ও বাইবেল]..."

পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সঠিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করেছে এবং মানুষের দ্বারা তাদের মধ্যে যে ত্রুটিগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল তা সংশোধন করেছে। সমস্ত আসমানী কিতাবের রচয়িতা যেহেতু মহান আল্লাহ, তাই কিতাবের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনের উত্সকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেমন একজন ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট লেখক সম্পর্কে সচেতন তাদের কাজকে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনের উৎসকে চিনতে পারলে তা থেকে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 97:

"...এর আগে যা ছিল তা নিশ্চিত করা [তওরাত ও বাইবেল] এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।"

যারা পবিত্র কুরআনে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে তারাই এর থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে, কারণ তারা একাই আন্তরিকভাবে এটি শিখবে এবং আমল করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি কর্মের সাথে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, কারণ কর্ম ছাড়া শব্দগুলি সঠিক নির্দেশনার দিকে পরিচালিত করে না। একটি নিরাপদ গন্তব্যে একটি মানচিত্র তখনই কার্যকর যখন কেউ এটি ব্যবহার করে। কেবলমাত্র মানচিত্র ধারণ করা কাউকে তাদের নিরাপদ গন্তব্যে নিয়ে যায় না। একইভাবে, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করা এবং নিজের ঘরে এর একটি অনুলিপি রাখা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক দিকনির্দেশনা নিয়ে যায় না, কেবল এটি শেখা এবং তার উপর আমল করে। যখন কেউ পবিত্র কুরআন শিখে এবং তার উপর আমল করে তখন এটি তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে পথ দেখায় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, এটি তাদের শেখাবে কীভাবে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। কঠিন সময়ে, পবিত্র কুরআন তাদের দেখাবে কীভাবে ধৈর্য ধরে রাখতে হয়, যার মধ্যে মৌখিক বা ব্যবহারিকভাবে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, যখন বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল

তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসটি বেছে নেন। সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশিত হিসাবে, এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে পুরস্কার এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 97:

" *বলুন, যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু - তিনিই [কেউ নয়] যিনি এটি [পবিত্র কুরআন] আপনার হৃদয়ে নাযিল করেছেন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আল্লাহর অনুমতিক্রমে..."* "

কিতাবের লোকেরা দাবি করেছিল যে প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) যেমন পবিত্র কুরআন নাযিল করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে, তারা তা গ্রহণ করবে না, যেহেতু তারা দাবি করেছিল যে এটি জিব্রাইল, শান্তি। তাঁর উপর, যিনি তাদের পূর্বপুরুষ, বনী ইসরাঈলের উপর মহান আল্লাহর শাস্তি নিয়ে অবতীর্ণ হবেন। তারা দাবি করেছিল যদি প্রধান দূত মিকায়েল (আঃ) পবিত্র কুরআন নাযিল করেন তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাফসীর ইবনে কাসীর, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 304-305 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনকে ফেরেশতা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটি একটি মূর্খ কারণ ছিল, তারা সকলেই কেবল ঠিক তাই করে যা মহান আল্লাহ তাদের আদেশ করেন। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"... ফেরেশতা, কঠোর এবং কঠোর; তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না বরং তারা যা আদেশ করে তাই করে।"

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যারা প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সমালোচনা করছিলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা করছিলেন, যেভাবে তিনিই ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কোন একনিষ্ঠ ও আনুগত্যশীল বান্দার সমালোচনা করে, তা সে ফেরেশতাই হোক বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এরই হোক, সে মহান আল্লাহর সমালোচনা করছে। এ কারণেই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর খাঁটি বান্দাদের সমালোচনা করে তিনি তার শত্রু। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 98:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ এবং তাঁর রসূলগণ এবং জিব্রাইল ও মিকায়েলের শত্রু হয় - তবে অবশ্যই আল্লাহ কাফেরদের শত্রু।"

উপরন্তু, এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং শত্রুতা পোষণ করা, যেমন ফেরেশতা বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের জন্য প্রত্যাখ্যান করা এবং শত্রুতা পোষণ করার সমান। এটি কিতাবের লোকদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম খনন ছিল যারা কিছু পবিত্র নবীকে বিশ্বাস করার দাবি করেছিল, কিন্তু অন্যদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই মনোভাব স্পষ্ট কুফরী।

এই আয়াতটি আরও সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের সমালোচনা করা একটি কুফরী কাজ এবং তাই সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি প্রায়শই ঘটতে পারে যখন কেউ পবিত্র কুরআন বা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সমালোচনা করে, কারণ তারা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। এই সমালোচনা অগত্যা মৌখিক হতে হবে না. ইসলামের শিক্ষাগুলোকে অবহিত করার পর সেগুলোকে উপেক্ষা করে কেউ ব্যবহারিকভাবে সমালোচনা করতে পারে।

বইটির সমালোচনার লোকেরা যেহেতু গঠনমূলক ছিল না, তাই মহান আল্লাহ তায়ালা তা বাতিল করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি পার্থিব ও ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাকে উপেক্ষা করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তিকে কখনই ব্যক্তিগতভাবে অগঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে তাদের পথে চলতে হবে। ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত একজন মুসলিমকে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই যেকোন গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করতে হবে , কারণ আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি একজনের আচরণ উন্নত করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মানুষের সমালোচনাকে ইসলামের শিক্ষার সাথে তুলনা করতে হবে এবং যদি তা ইসলামের শিক্ষার সাথে মিলে যায় তবে তা গ্রহণ করতে হবে বা তা না হলে উপেক্ষা করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে কিতাবধারীরা পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমনটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 99:

" *এবং আমরা অবশ্যই আপনার প্রতি আয়াতগুলি [যা] স্পষ্ট প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি এবং অবাধ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করবে না।"*

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, শুধুমাত্র যখন কেউ পবিত্র কুরআনের কাছে খোলা মনের সাথে যোগাযোগ করবে তখনই তারা এর অতুলনীয় প্রকৃতিকে চিনতে পারবে এর সর্বব্যাপী উপদেশ, দিকনির্দেশনা, কালজয়ী প্রকৃতি এবং যে কোনো পটভূমি ও প্রজন্মের যে কেউ তার উপর আমল করার ক্ষমতার ব্যাপারে। তাদের জ্ঞানের স্তর নির্বিশেষে। পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর

অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

কিন্তু যখন আহলে কিতাবরা যে মনোভাব গ্রহণ করে, তখন তারা পবিত্র কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য খোঁড়া অজুহাত পেশ করবে। তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে কারণ পবিত্র কুরআন তাদের একটি উচ্চতর আচরণবিধি প্রদান করে যা তাদের আচরণকে সংযত করে। কিন্তু তারা তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের কামনা-বাসনাকে উন্মোচন করতে চায়, তারা পবিত্র কুরআনকে খোঁড়া অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 99:

" *এবং আমরা অবশ্যই আপনার প্রতি আয়াতগুলি [যা] স্পষ্ট প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি এবং অবাধ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করবে না।"*

একজন মুসলমানকে তাই ব্যবহারিকভাবে এই ধরনের আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যদিও তারা মৌখিকভাবে পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করার দাবি করে। একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং আমল করতে হবে যাতে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। . এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি কেউ পবিত্র কুরআনকে কার্যত প্রত্যাখ্যান করে কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যার ফলে উভয় জগতেই অসুবিধা হবে, যদিও তাদের আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তও ঘটে। . অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 100

أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠

“এটা কি [সত্য] নয় যে যখনই তারা [কিতাবের লোকেরা] একটি চুক্তি নিয়েছিল তাদের একটি দল তা ফেলে দিয়েছে? কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে] তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।"

মহান আল্লাহ, কিতাবের লোকদের সমালোচনা করেছেন, যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসী বলে দাবি করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 100:

"এটা কি [সত্য] নয় যে যখনই তারা [কিতাবের লোকেরা] প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তাদের একটি দল তা ফেলে দিয়েছে?..."

কিতাবের অনেক লোক, যেমন তাদের পূর্বপুরুষ, ইসরায়েলের সন্তান, মৌখিকভাবে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার দাবিতে পারদর্শী ছিল, কিন্তু কাজ দিয়ে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করবে যাতে তারা তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করতে পারে এবং ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ ও নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস লাভ করতে পারে। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 34:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই অনেক আলেম ও ভিক্ষু অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং [তাদেরকে] আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে..."

তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যদিও তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল, যেহেতু পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআন তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 155-157:

“আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আমাদের নিয়োগের জন্য মনোনীত করেছিলেন সত্তর জন। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, তখন সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি আগে তাদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন? এটা আপনার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম ফয়সালা করুন [যা] ভাল এবং [ও] পরকালে, আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি। [আল্লাহ] বললেন, "আমার শাস্তি - আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দেই, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে।" সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য [বিশেষ করে] নির্ধারণ করব যারা আমাকে ভয় করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে। যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে], যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য যা হালাল করেন। ভাল এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয় যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সমর্থন করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করেছে, তারাই সফলকাম হবে।”

এবং অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 100:

“এটা কি [সত্য] নয় যে যখনই তারা [কিতাবের লোকেরা] একটি চুক্তি নিয়েছিল তাদের একটি দল তা ফেলে দিয়েছে? ..."

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, সমস্ত কিতাব বা বনী ইসরাঈল এমন আচরণ করেনি। তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে মঞ্জুর করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে কিতাবের লোকদের অনুকরণ করা এড়াতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি একটি লোককে অনুকরণ করে তাদের থেকে বিবেচনা করা হয়। সুনান আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা এবং চেরি বাছাই করা এড়িয়ে চলতে হবে কোন ইসলামী শিক্ষাগুলি অনুসরণ করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে কারণ এটি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে, যার ফলে উভয় জগতে সমস্যা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার দাবি করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

প্রকৃতপক্ষে আলোচনার মূল আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য তাদের ঈমান হারানোর ঝুঁকি নিয়ে চলে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 100:

“এটা কি [সত্য] নয় যে যখনই তারা [কিতাবের লোকেরা] একটি চুক্তি নিয়েছিল তাদের একটি দল তা ফেলে দিয়েছে? কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে] তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।"

এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি গাছের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট হতে হবে। একইভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যাবে যদি এটি পানির মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন মুসলমানের বিশ্বাস মরে যেতে পারে যদি তারা আনুগত্যের সাথে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। কাজেই, তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার তাদের মৌখিক ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 100:

“এটা কি [সত্য] নয় যে যখনই তারা [কিতাবের লোকেরা] একটি চুক্তি নিয়েছিল তাদের একটি দল তা ফেলে দিয়েছে? কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে] তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।"

এই আয়াতটি আরো ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা। যখন আল্লাহর প্রতি কারোর বিশ্বাস এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা দুর্বল হয়ে যায়, তখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যার ফলে তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দুর্বলতা এড়াতে হবে। এটি দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করবে, যা ফলস্বরূপ একজনকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করে। এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 101-103

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

“এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল এসেছিলেন যা তাদের কাছে ছিল তার সত্যায়ন করে, তখন কিতাব প্রাপ্তদের একটি দল আল্লাহর কিতাব [তাওরাত] তাদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছিল যেন তারা জানে না [এতে কী রয়েছে]। .

এবং তারা [বনি ইসরাইল] [তাদের আসমানী কিতাবের পরিবর্তে] অনুসরণ করত যা শয়তানরা সোলায়মানের শাসনামলে আবৃত্তি করেছিল। সোলায়মান কাফের ছিলেন না, কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [দুই

ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি কুফরী করবেন না।" এবং [তবুও] তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখে যা দ্বারা তারা একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা এর মাধ্যমে কারো ক্ষতি করে না। এবং তারা [লোকেরা] শিখে কি তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের উপকার করে না। কিন্তু তারা [বনি ইসরাঈল] অবশ্যই জানত যে, যে এটা [জাদু] ক্রয় করবে পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর নিকৃষ্ট বিষয় যার জন্য তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, যদি তারা জানত।

আর যদি তারা (আহলে কিতাব) ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারটি আরও ভালো হত, যদি তারা জানত।"

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব, তাওরাত ও বাইবেলের সঠিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করেছে এবং দুর্নীতিবাজদের দ্বারা তাদের মধ্যে যে ত্রুটিগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল তা সংশোধন করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 101:

"আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল তাদের কাছে এসেছিলেন যা তাদের কাছে ছিল তার সত্যায়নকারী..."

সমস্ত আসমানী কিতাবের রচয়িতা যেহেতু মহান আল্লাহ, তাই কিতাবের আলেমগণ পবিত্র কুরআনের উৎপত্তিকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। একটি নির্দিষ্ট লেখকের সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি সহজেই তাদের কাজ চিনতে পারেন। উপরন্তু, তারা স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের[নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

সত্যের স্বীকৃতি ও উপলব্ধি সত্ত্বেও, কিতাবের পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে অনেকেই তাদের নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে এবং এর সাথে যা কিছু এসেছে যেমন সম্পদ হারানোর ভয়ে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করার ভয়ে ছিল। আচরণবিধি যার দ্বারা তাদের পার্থিব কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 101:

"আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল এসেছিলেন যা তাদের কাছে রয়েছে তার সত্যায়ন করে, তখন কিতাব প্রাপ্তদের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে (অর্থাৎ, তাওরাত) তাদের পিঠের আড়ালে নিক্ষেপ করল যেন তারা জানে না। অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। এটা ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। একইভাবে একজন কর্মচারী, যেমন একজন সার্জন, তাদের কাছে থাকা জ্ঞান বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বেতন পাবেন না, এবং একজন মুসলমানও তাদের কাছে থাকা ইসলামী জ্ঞান থেকে উপকৃত হবেন না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে এর উপর কাজ করে। জ্ঞান নিজেই পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে না ঠিক যেমন একটি মানচিত্র নিজেই একজন ব্যক্তিকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যায় না যতক্ষণ না এটি কার্যকর করা হয়।

উপরন্তু, আয়াত 101 এটাও স্পষ্ট করে যে সমস্ত কিতাব বা ইস্রায়েলের সন্তানরা এই পদ্ধতিতে আচরণ করেনি। তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে মঞ্জুর করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে , কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 101:

"আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল এসেছিলেন যা তাদের কাছে রয়েছে তার সত্যায়ন করে, তখন কিতাব প্রাপ্তদের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে (অর্থাৎ, তাওরাত) তাদের পিঠের আড়ালে নিক্ষেপ করল যেন তারা জানে না। অন্তর্ভুক্ত।"

মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই ধরনের আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে। এটি সহজেই ঘটতে পারে যখন একজন চেরি বেছে নেয় কোন ইসলামিক শিক্ষা অনুসরণ করবে এবং কোনটি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী উপেক্ষা করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তাকে এই ভেবে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, যখন প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজের ইচ্ছার পূজা করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

ইসলাম এমন কোনো জামার মতো নয় যা কেউ তার মিষ্টি ইচ্ছা অনুযায়ী পরতে পারে এবং খুলে ফেলতে পারে। বরং, এটি এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজনের মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং প্রতিটি আশীর্বাদ একজনকে দেওয়া হয়েছে, এমনকি এটি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলেও। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শে গ্রহণ করে এবং কাজ করে যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। একইভাবে একজন রোগী যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে তার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে, একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যেখানে একজন রোগী যেভাবে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে সে ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, একইভাবে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, তাদের প্রদত্ত

নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করবে। , যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এমনকি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলেও। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও কিতাবের লোকেরা তাওরাতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল, তবুও তারা এর শিক্ষাগুলিকে উপেক্ষা করবে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী এবং পরিবর্তে কালো জাদুর মত বিকল্প মন্দ এবং বিভ্রান্তিকর জ্ঞান অনুসরণ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"এবং তারা [পরিবর্তে] শয়তানরা সোলায়মানের রাজত্বকালে যা আবৃত্তি করেছিল তা অনুসরণ করেছিল..."

তাই মুসলমানদের অবশ্যই অন্য সব ধরনের তথাকথিত ধর্মীয় জ্ঞান এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস দ্বারা সুপারিশকৃত কর্মগুলো ভালো হলেও। কাজ এটা সত্য যে, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর কাজ করে, যদিও তা ভাল কাজের দিকে

পরিচালিত করে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তার উপর বর্ষিত হউক, যা পরিবর্তিতভাবে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যে কোন বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উত্সের মধ্যে নিহিত নয় তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিজেদের পাপকে জায়েজ করার জন্য, কিতাবের অনেক পন্ডিত পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে ভুল প্রবর্তন করেছেন যেগুলো অসত্য ও অসম্মানজনকভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিত্রিত করেছে। এই ত্রুটিগুলি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...এটি সোলায়মান ছিলেন না যিনি অবিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল..."

মুসলমানদের অবশ্যই অনুরূপ মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যার মাধ্যমে কেউ তাদের নিজেদের খারাপ কাজ এবং কথাবার্তাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। এই মনোভাব কাউকে ভালো বোধ করতে পারে কিন্তু এটা তাদের এই দুনিয়াতে বা পরকালে সাহায্য করবে না। সহজ কথায়, যদি কোন পার্থিব বিচারক কোন অপরাধীকে ক্ষমা না করেন কেননা তারা এই পৃথিবীতে তাদের চেয়েও খারাপ অপরাধী, মহান আল্লাহও কোন অন্যায়কারীকে ক্ষমা করবেন না, যদিও তারা

তাদের চেয়েও খারাপ অন্যায়কারী হয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি একক মানদণ্ডে অধিষ্ঠিত করা হবে, ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত মান যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই এই নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করতে হবে, যা অলসতাকে প্ররোচিত করে এবং পরিবর্তে তাদের কী ইতিবাচক চরিত্র পরিবর্তন করতে হবে তা মূল্যায়ন করার জন্য নিজেদেরকে ইসলামের মানদণ্ডের সাথে তুলনা করতে হবে।

মহান আল্লাহ তারপর উল্লেখ করেছেন যে কতজন ইসরাঈল সন্তান তাদের আসমানী কিতাব ত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে জ্ঞানের অনুসরণ করেছিল যা তারা পার্থিব লাভের জন্য অপব্যবহার করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না।" এবং [তবুও] তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখে যা দ্বারা তারা একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়..."

যেহেতু দুই ফেরেশতাকে দেওয়া জ্ঞান এবং শয়তানদের শেখানো কালো জাদু আলাদা করা হয়েছে, এটা স্পষ্ট যে দুই ফেরেশতা মানুষকে কালো জাদু শেখাতে আসেননি। পরিবর্তে তাদের এমন জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল যা হয় কালো জাদু বা অন্য কোন ধরণের ঐশ্বরিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে ফেরেশতারা মানুষকে খারাপ কিছু শেখাবে। আয়াতের গঠন থেকে বোঝা যায় যে

শয়তানরা তাদের কাছে থাকা জ্ঞান থেকে মানুষকে কালো জাদু শিখিয়েছিল এবং কালো জাদু ব্যবহার করে মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করার জন্য দুটি ফেরেশতাকে দেওয়া জ্ঞানের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অপব্যাখ্যা করা হল যা দুটি ফেরেশতা 102 আয়াতে লোকেদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল। এটি বোঝা সহজ, কারণ একটি ভাল উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা জ্ঞান যদি ভুল ব্যক্তির কাছে থাকে তবে তার অপব্যবহার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান মানবজাতির কাছে তাদের উপকার করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন রোগ নিরাময়কারী ওষুধ আবিষ্কার এবং উত্পাদন। কিন্তু ভুল হাতে সেই একই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অস্ত্র তৈরির মতো মন্দ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐশ্বরিক জ্ঞান একই। ডান হাতে এটি উভয় জগতের মানুষের উপকারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু ভুল হাতে এটি খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি নিম্নোক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পবিত্র কুরআন উভয় জগতের কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় যখন বোঝার এবং সঠিকভাবে আমল করা হয়। যদিও, পার্থিব লাভের জন্য কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করলে উভয় জগতেই ক্ষতি হতে পারে।

এই আলোচনা আরও সমর্থন করে যে এই দিন এবং যুগেও অনেক লোক এই পদ্ধতিতে আচরণ করে। তাদের ব্ল্যাক ম্যাজিক প্রায়ই ভালো ঐশ্বরিক জ্ঞান নিয়ে থাকে যা প্রেক্ষাপটের বাইরে পাকানো হয় এবং শয়তানী জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়। দ্বিতীয়ত, দুই ফেরেশতা কেবলমাত্র মানুষের সাথে কালো জাদুর ধারণা নিয়ে

আলোচনা করতে পারতেন যাতে তাদের এবং নবীদের অলৌকিকতার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারে, যেমন হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা। তার উপর, যখন তাকে অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে তারা কালো জাদু শিখিয়েছিল তবে কেবল তা নির্দেশ করেছিল যা এর ফলে লোকেদেরকে এটি এড়াতে সতর্ক করে কারণ এটি অবিশ্বাস ছিল। এটি সর্বদা শিক্ষার একটি গ্রহণযোগ্য রূপ হয়েছে। এই দুটি বিষয়ই আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা সমর্থিত কারণ এতে বলা হয়নি যে দুটি ফেরেশতা মানুষকে কালো জাদু শিখিয়েছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না।" এবং [তবুও] তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখে যা দ্বারা তারা একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা এর মাধ্যমে কারো ক্ষতি করে না..."

এই উদ্‌ধৃত আয়াতের শেষ একটি শক্তিশালী বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই মহাবিশ্বের কোন কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটে না, তা সে বড় জিনিসই হোক না কেন, যেমন সূর্যের উদয় হোক বা ছোট কিছু হোক, যেমন বাতাসে পাতার ওড়না। যে ব্যক্তি এই সত্যে বিশ্বাস করে সে বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের কিছু দিতে পারে না এবং মহান আল্লাহ অনুমতি না দিলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারে না। জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

" আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন - কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এই সত্যটি উপলব্ধি করা এবং মেনে নেওয়া একজনকে সৃষ্টির ভয় থেকে এবং পৃথিবীর মধ্যে পাওয়া মন্দ যেমন কালো জাদু থেকে বিরত রাখবে। যদি কোন ক্ষতি তাদের প্রভাবিত করে, তারা বুঝবে যে, মহান আল্লাহ তা ঘটতে দিয়েছেন এমন প্রজ্ঞার কারণে যা তাদের কাছে দৃশ্যমান নাও হতে পারে, যেমন ধৈর্য সহকারে অসুবিধা মোকাবেলা করে তারা অগণিত পুরস্কার লাভ করে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। যদি তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়, তবে তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আসে এবং তাই তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কৃতজ্ঞতা নিশ্চিত করা জড়িত যে একজনের উদ্দেশ্য সর্বদা মহান আল্লাহকে খুশি করা। এর একটি লক্ষণ এই যে তারা মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশা করে না। কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা চুপ থাকাও জড়িত। পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা বলতে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে , যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে কখনই সম্ভাব্য মন্দের জন্য পাগল হয়ে উঠবে না যা তাদের প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে তাদের এমন শিল্পীদের থেকে রক্ষা করবে যারা পারিশ্রমিকের জন্য মানুষের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার দাবি করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না।" এবং [তবুও] তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখে যা দ্বারা তারা একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা এর মাধ্যমে কারো ক্ষতি করে না। এবং তারা [অর্থাৎ, লোকেরা] শিখেছে যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের উপকার করে না। কিন্তু তারা [অর্থাৎ বনী ইসরাঈল] নিশ্চিতভাবেই জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করবে [অর্থাৎ জাদু] তার আখেরাতে কোনো অংশ থাকবে না। আর নিকৃষ্ট জিনিস যার জন্য তারা নিজেদের বিক্রি করে, যদি তারা জানত।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে কালো জাদুর সাথে জড়িত কিছু অনুশীলন করা কুফরী। এটা শুধু বড় পাপই নয়। বিশ্বাস হল একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বাধ্যতামূলক কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে এবং বিষাক্ত বৈশিষ্ট্য ও কর্ম থেকে রক্ষা করতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যেতে পারে যদি এটি জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে সুরক্ষিত না হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস মারা যেতে পারে যখন তারা আনুগত্যের কাজগুলি করতে ব্যর্থ হয় এবং যদি তারা কিছু পাপের উপর অবিচল থাকে, যেমন কালো জাদু অনুশীলন হিসাবে. যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল উভয় জগতের কষ্ট এবং শাস্তির জন্য তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্য বিক্রি করে। যে ব্যক্তি কালো জাদুর সাথে যুক্ত হয় সে উভয় জগতেই হেরে যাবে, এমনকি যদি এই

পৃথিবীতে তাদের ক্ষতি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ পার্থিব শাস্তি প্রায়শই সূক্ষ্ম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"... *এবং নিকৃষ্ট জিনিস যার জন্য তারা নিজেদের বিক্রি করে, যদি তারা জানত।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কালো জাদু অনুশীলনকে ধ্বংসাত্মক পাপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। অর্থ, যদি কেউ আন্তরিকভাবে তাওবা না করে তবে তা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। এস আহীহ বুখারী, ২৭৬৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কালো জাদু অনুশীলন করাও একটি মারাত্মক বড় পাপ কারণ যে এটি অনুশীলন করে সে বিশ্বাস করে যে এটি মহান আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করতে পারে। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর অসীম শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যা স্পষ্ট অবিশ্বাস। তাই মুসলমানদেরকে যে কোনো মূল্যে এই মারাত্মক বড় পাপ থেকে বাঁচতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না।" এবং [তবুও] তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখে যা দ্বারা তারা একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা এর মাধ্যমে কারো ক্ষতি করে না। এবং তারা [অর্থাৎ, লোকেরা] শিখেছে যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের উপকার করে না। কিন্তু তারা [অর্থাৎ বনী ইসরাঈল] নিশ্চিতভাবেই জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করবে [অর্থাৎ জাদু] তার আখেরাতে কোনো অংশ থাকবে না। আর নিকৃষ্ট জিনিস যার জন্য তারা নিজেদের বিক্রি করে, যদি তারা জানত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে যে ব্যক্তি পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা করে সে উভয় জগতে কষ্ট এবং চাপ ছাড়া কিছুই পাবে না। এই মনোভাবের মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করবে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ ও দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে গেছে। এবং পরকালে যা আসে তা আরও খারাপ, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এটা খুবই প্রতীয়মান হয় যখন কেউ তাদের লক্ষ্য করে যারা পার্থিব লাভের জন্য ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করে।

আয়াত 102 এর শেষ অংশ স্পষ্ট করে যে অজ্ঞতা হল বড় পাপ করার মূল কারণ, যা উভয় জগতেই একজনের কষ্ট ও দুঃখের কারণ হতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...এবং নিকৃষ্ট জিনিস যার জন্য তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত।"

তাই একজনকে অবশ্যই অজ্ঞতা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিস অনুযায়ী ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। একজনকে অবশ্যই ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যাতে তারা সহজেই পাপ এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনতে পারে এবং তাই সেগুলিকে এড়িয়ে চলে। . যে ব্যক্তি অজ্ঞতাকে তাদের পথ হিসাবে গ্রহণ করে সে সহজেই পাপ করবে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করবে, কারণ তারা তাদের এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলেন যে, পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অপব্যাখ্যা করা এড়িয়ে চলা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করে। এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, তাদের অবশ্যই তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা, যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 103:

"এবং যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারটি আরও ভাল হত, যদি তারা জানত।"

একজনকে অবশ্যই এই সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে হবে যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, কারণ এটি উভয় জগতে তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান যা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। শুধুমাত্র এই ইতিবাচক মনোভাবের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 103:

"এবং যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারটি আরও ভাল হত, যদি তারা জানত।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 104

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

“হে ঈমানদারগণ, [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে] “রায়না” বলো না, বরং “অনুর্না” বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্য একটি ঘোষণা দেন তখন তিনি এটিকে ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে যুক্ত করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

" *হে ঈমানদারগণ, বলো না...*"

এটি কাজের সাথে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই ক্রিয়াগুলি হল প্রমাণ যা একজনের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পেতে প্রয়োজন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হওয়া একজন ছাত্রের মতই অর্থহীন যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফেরত দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞানটি তাদের মনের মধ্যে থাকায় তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কর্মের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান দেখানোর প্রয়োজন নেই। একইভাবে এই ছাত্রকে তাদের শিক্ষকের দ্বারা ব্যর্থ করা হবে, একইভাবে মুসলমানরাও ব্যর্থ হবে যারা তাদের মৌখিক বিশ্বাসের দাবিকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে ব্যর্থ হবে। যদিও মহান আল্লাহ একজনের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তবুও তিনি মানুষকে

তাদের মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণাকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উপরন্তু, যে তাদের বিশ্বাস বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় তাকে এটি হারানোর ভয় করা উচিত। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একইভাবে একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, যেমন জল, মরে যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও হতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

কিতাবধারীদের অনেকেই পরিণতির ভয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে অপমান ও ক্ষতি করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, তারা গোপনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপমান ও ক্ষতিসাধনের জন্য বিভ্রান্তিকর পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা একটি দ্বিমুখী চরিত্র গ্রহণ করেছিল যার মাধ্যমে তারা মৌখিকভাবে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে যে শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল তা মেনে চলার দাবি করবে, তবুও তারা ইসলামের শত্রুদেরকে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিল। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। আরেকটি বিভ্রান্তিকর পরিকল্পনা, যা আলোচনার মূল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল কিভাবে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু শব্দের ভুল উচ্চারণ করবে যা পরবর্তীতে তাদের অপমানে পরিণত করবে যখন তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

" *হে ঈমানদারগণ, [হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে] "রায়না" বলো না, বরং বল, "অনুর্না"..."*

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, মহান আল্লাহ, সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, এমন শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করার নির্দেশ দেন যা তাদের ভুল উচ্চারণ করে অপমানে পরিণত হতে পারে, যার একটি উদাহরণ 104 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই সেই সকল কিতাবের মনোভাব অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করেছেন। পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই অন্য সকল লোকের প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, কারণ এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সহীহ মুসলিম, 196 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেভাবে অন্যরা তাদের সাথে ব্যবহার করতে চায়।

মহান আল্লাহ, সাহাবায়ে কেরামকেও নির্দেশ দেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা মনোযোগ সহকারে শুনতে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা [আল্লাহর রসূলকে] "রায়না" বলো না, বরং বল, "অনুর্না" এবং শুনো..."

বইয়ের লোকেরা যে শব্দটি ভুল উচ্চারণ করবে তা সাহাবীগণ ব্যবহার করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, একইভাবে একজন ছাত্র তাদের শিক্ষককে ধীরগতি করতে এবং তারা যা শিখিয়েছে তা পুনরাবৃত্তি করতে বলে। এটি ভুল উচ্চারণ করা হলে এটি একটি অপমান হয়ে ওঠে। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন যা ভুল উচ্চারণ করা যাবে না এবং মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য যাতে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ করতে না পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেকোন ভালো জ্ঞানকে সবসময় মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। শোনার মধ্যে যা বলা হয়েছে তা শ্রবণ করা, কীভাবে এটিকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার প্রতিফলন করে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা করে একজনের মনে তথ্য প্রক্রিয়া করা জড়িত। দুঃখের বিষয়, অনেকেই বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শ্রবণই সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। শ্রবণ করা শিক্ষা গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে না যেখানে একজন শুনেছেন শিক্ষা গ্রহণ করে। ইসলাম একজনকে শোনার নির্দেশ দেয়, শুধু ইসলামী জ্ঞান শুনতে নয়। সঠিকভাবে শোনার ব্যর্থতা হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া এবং শোনা সত্ত্বেও।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা [আল্লাহর রসূলকে] "রায়না" বলো না, বরং বল, "অনুর্না" এবং শুনো..."

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে স্পষ্ট ও ন্যায়পরায়ণভাবে কথা বলতে শেখায়। অর্থ, একজনকে অস্পষ্ট উপায়ে কথা বলা এড়ানো উচিত যা অন্যরা ভুল পথে নিতে পারে। এটি প্রায়ই ফাটল এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে। একজন মুসলিমকে সর্বদা সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে কথা বলতে হবে অথবা নীরব থাকতে হবে। সহীহ মুসলিম, 176 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়ের কথা বল।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা [আল্লাহর রসূলকে] "রায়না" বলো না, বরং "অনুর্না" বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের আচরণ অনুকরণ না করার জন্যও সতর্ক করে। অর্থ, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং এই দুটি পথনির্দেশের উৎসে নিহিত নয় এমন বিষয়ের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্য কোন উৎসের উপর যত বেশি কাজ করে, এমনকি যদি তারা জায়েয কাজের দিকে পরিচালিত করে, তত কম

তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 104:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা [আল্লাহর রসূলকে] "রায়না" বলো না, বরং "অনুর্না" বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আয়াত 104 দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এটি একটি অবিশ্বাসের কাজ. এটি ঘটতে পারে যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তার আদেশ এবং উপদেশ উপেক্ষা করে কারণ তারা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই সর্বান্তকরণে আল্লাহ, মহান ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হবে, কারণ এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 65:

" কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা [সত্যিকার] বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে বিতর্ক করবে তার বিচার করবে এবং তারপরে আপনি যে বিচার করেছেন তাতে নিজেদের মধ্যে কোন অস্বস্তি পাবেন না এবং [সম্পূর্ণ, স্বেচ্ছায়] বশ্যতা স্বীকার করবেন না।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যে তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তাদের তেতো ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া সত্ত্বেও কাজ করে, কারণ তারা জানে যে এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম। কিন্তু কেউ যদি একজন মূর্খ রোগীর মতো আচরণ করে যারা তাদের ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শ উপেক্ষা করে তবে তারা দুর্বল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ছাড়া কিছুই পাবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 104:

"... আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 105

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ
خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

“আহলে কিতাব [ইহুদি ও খ্রিস্টান] এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারাও চায় না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"

ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ঈর্ষান্বিত স্বভাবকে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

“ *আহলে কিতাব [ইহুদী ও খ্রিস্টান] এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারাও চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ নাযিল হোক...”*

কিতাবের পণ্ডিতগণ ইসলামের সত্যতাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিসাবে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন এবং পবিত্র কুরআন তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিতাবের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাই হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর না হয়ে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। , তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তারা যেমন ছিল। যেহেতু তাদের পুরো ধর্মটি বংশের গুরুত্বের চারপাশে অভিযোজিত হয়েছিল, যা তাদের মতে তাদের অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে, তাই তারা ভিন্ন বংশের একজন মহানবী (সাঃ) কে মেনে নিতে এবং অনুসরণ করতে পারেনি। . এটি শুধুমাত্র তাদের বানোয়াট তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কমপ্লেক্স ধ্বংস করবে।

যেহেতু মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল তাই তারা জানত পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয়। এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ায় নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

মক্কার অমুসলিমদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে বেঁচে থাকতে পারেনি, যিনি একজন দরিদ্র এতিম ছিলেন, যদিও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেহেতু তারা নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ কামনা করেছিল, তখন তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত ঘোষণা করেছিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

“ *আহলে কিতাব [ইহুদী ও খ্রিস্টান] এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারাও চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ নাযিল হোক...”*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিংসা একটি মারাত্মক বড় পাপ কারণ এটি সহজেই একজনকে ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় বিষয়ে সত্য এবং সঠিক পথ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে ব্যক্তি সত্য ও সঠিক পথকে প্রত্যাখ্যান করে সে কখনই ইহকাল বা পরকালে প্রকৃত সফলতা পাবে না। উপরন্তু, এটি একটি বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন যে কাকে পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হবে তারা হিংসা করে। তাই ঈর্ষাকারী এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ নিয়ামত দিয়ে ভুল করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

"... *কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রহমতের জন্য বেছে নেন..."*

একজন মুসলিমকে সর্বদা এই সত্যটি মনে রাখতে হবে এবং তাই হিংসা পরিহার করতে হবে। মন্দ ধরনের হিংসা হল যখন কেউ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে

আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছা করে এবং এই ফলাফলের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে। বৈধ ঈর্ষা হল যখন কেউ অন্য কাউকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অনুরূপ আশীর্বাদ কামনা করে বা ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে তার কাছে থাকা আশীর্বাদ হারানোর জন্য চেষ্টা না করে। যদিও এই প্রকারটি হালাল, তবুও পার্থিব বিষয়ের উপর এই প্রকারের অধিকারী হওয়া দোষের যোগ্য এবং ধর্মীয় বিষয়ে এর অধিকারী হওয়া গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া গ্রহণযোগ্য ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বৈধ সম্পদ অর্জন করেন এবং ব্যবহার করেন। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। অন্য ব্যক্তি যাকে আইনত ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন এবং মানুষকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহারে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে, কারণ এটি একাই মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্য এবং আরও আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

" এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

আলোচ্য মূল আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

"... আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"

অথচ বেআইনি হিংসা অবলম্বন করা ব্যক্তিকে মানসিক প্রশান্তি লাভে বাধা দেবে এবং তা তাদের নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এতে উভয় জগতেরই কল্যাণের ক্ষতি হবে।

যে মুসলমান পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে যা অন্যদের দ্বারা ঈর্ষা করা যায় তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলি ব্যবহারে অবিচল থাকতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে এবং নেতিবাচক থেকে রক্ষা পাবে। তাদের হিংসুকের ক্ষতি, এমনকি যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

এবং অধ্যায় 113 আল ফালাক, আয়াত 1 এবং 5:

" বলুন, আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই.. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে [আশ্রয়] যখন সে হিংসা করে।"

উপরন্তু, তারা সর্বদা তাদের প্রাপ্ত যে কোন পার্থিব আশীর্বাদের উপর অহংকার এড়াতে হবে কারণ এটি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রদান করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

" ... *কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের জন্য বেছে নেন ..."*

অতএব, এমন একটি আশীর্বাদের উপর অহংকার করা যা প্রকৃতপক্ষে অন্য কারোর জন্য নিছক বোকামি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 105:

“ আহলে কিতাব [ইহুদী ও খ্রিস্টান] এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারাও চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ নাযিল হোক...”

নাযিলকৃত কল্যাণ বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনকে নির্দেশ করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই এই পৃথিবীতে এবং পরকালে কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এর শিক্ষাগুলি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করবে। একজনকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা বোঝে না এমন ভাষায় কেবল এটি পাঠ করা উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন হেদায়েতের কিতাব, তেলাওয়াতের কিতাব নয়। গাইডেন্স তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ শিখে এবং তার উপর কাজ করে, ঠিক যেমন একটি মানচিত্র তাকে তার কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে যখন তারা এটিতে কাজ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মূল আয়াতে উল্লিখিত ভালো বলতে যেকোনো পার্থিব আশীর্বাদকে বোঝায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পার্থিব আশীর্বাদ শুধুমাত্র উভয় জগতের একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে উঠবে যখন তারা এটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ পার্থিব নিয়ামতকে অপব্যবহার করলে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপ, দুর্দশা ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা নিয়ামতের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 106-107

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

"আমরা কোন আয়াতকে রদ করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা তার অনুরূপ [একটি] বের করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান?

তুমি কি জানো না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই?

রহিতকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আদেশ বা নিষেধ অন্যটির সাথে প্রতিস্থাপন করা জড়িত। এই প্রক্রিয়াটি অনেক পার্থিব পরিস্থিতিতেও নিযুক্ত করা হয়, যেমন একজন ডাক্তার যখন ওষুধ লিখে দেন। একজন ডাক্তার প্রায়শই প্রাথমিকভাবে একটি ওষুধের সম্পূর্ণ ডোজ নির্ধারণ করেন না কারণ তারা জানেন যে তাদের রোগী এটি সহ্য করতে সক্ষম হবে না। তাই তারা প্রাথমিকভাবে কম ডোজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণের পরামর্শ দেয় এবং সময়ের সাথে সাথে ডোজ এবং বা ব্যবহারের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায়। এই ধীরে ধীরে বিল্ড আপ মানবদেহকে ন্যূনতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহ নির্ধারিত ওষুধ থেকে উপকৃত হতে দেয়। সময়ের সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য মহান আল্লাহ এই কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কুরআন একযোগে নাযিল না হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 32:

"আর যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা বলে, "কেন তার প্রতি একযোগে কোরআন অবতীর্ণ হয়নি?" এমনিভাবে আমরা এর দ্বারা তোমার হৃদয়কে শক্তিশালী করতে পারি। এবং আমরা এটি স্পষ্টভাবে ব্যবধান করেছি।"

অ্যালকোহলের নিষেধাজ্ঞায় বাতিলকরণ কৌশল প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেখা যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।"..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 43:

"হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তুমি বুঝতে পারো তুমি কি বলছ..."

এবং পরিশেষে অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। একযোগে এটি নিষিদ্ধ করা হলে যারা এতে আসক্ত ছিল তাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো, যার মধ্যে বেশিরভাগ আরব ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 106:

"আমরা কোন আয়াত রহিত করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ একটি [একটি] বের করি..."

অতএব, রহিতকরণ প্রক্রিয়ার সমালোচনা করা এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা নিছক মূর্খতা, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে কীভাবে শিক্ষিত করতে হয় তা ভাল জানেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 106:

"... তুমি কি জানো না যে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান?"

এমনকি যদি কেউ এই প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে মহান আল্লাহ যেভাবে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেন সে সম্পর্কে তাদের কোন বক্তব্য নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 107:

" *তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই.."*

অতএব, একজনকে অবশ্যই বিশ্বজগতের মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তিহীন ও নগণ্য বান্দা হিসাবে তাদের অবস্থানকে চিনতে হবে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে দেখতে পাবে যে, তার অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করবে তা উভয় জগতেই তাদের মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে উঠবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজনকে কখনই এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে পারে এবং কোন না কোনভাবে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য লাভ করতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ, মহাবিশ্ব এবং একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 107:

"...এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই?"

রহিতকরণের এই প্রক্রিয়াটি কিতাবের লোকদের দাবিকেও খণ্ডন করে যে, তাদের আসমানী কিতাব ও আইন পবিত্র কুরআন দ্বারা রহিত হয়নি। মহান আল্লাহ, প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন নাজিল করেছেন এবং তারপর তাঁর চূড়ান্ত কালজয়ী আইন দিয়ে অতীতের সমস্ত আইন বাতিল করেছেন, যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি কিতাবের লোকদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল কারণ চূড়ান্ত আসমানী প্রত্যাদেশ, পবিত্র কুরআন এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 106-107:

“আমরা কোন আয়াতকে রদ করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা তার অনুরূপ [একটি] বের করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান? তুমি কি জান না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই?

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামিক অধ্যয়নে রহিতকরণ শব্দটি প্রায়শই স্পষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যদিও তারা দুটি পৃথক ধারণা। রহিতকরণের অর্থ হল একটি আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাকে অন্য একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা, যেখানে স্পষ্টীকরণ হল যখন একটি নির্দিষ্ট রায়কে আরও স্পষ্ট বা আরও নির্দিষ্ট করা হয়। যখন কেউ

দুটি সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য বুঝবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে শুধুমাত্র খুব কম, সম্ভবত শুধুমাত্র একটি, আয়াতের সেট পবিত্র কুরআনে রহিত করা হয়েছে এবং বাকিগুলি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত বা ঐতিহ্য দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুঃখজনকভাবে, এই দুটি অর্থের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হওয়া বিপথগামী ব্যক্তিদের দাবি করতে উত্সাহিত করেছে যে ক্ষমতা ও সম্পদের মতো পার্থিব লাভের জন্য পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রহিত করা হয়েছে। 107 নং আয়াতের শেষ অংশে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে এই মনোভাব এড়িয়ে চলার জন্য কারণ তাদের কোন সুরক্ষা বা সাহায্যকারী থাকবে না আল্লাহর শাস্তি থেকে, যা তাদেরকে উভয় জগতেই ঘিরে রাখবে, যদিও তাদের কাছে পার্থিব জিনিস থাকতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 107:

"... *এবং [তাই] আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই?"*

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 106:

"আমরা কোন আয়াত রহিত করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ একটি [একটি] বের করি..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে পবিত্র কুরআন মানুষের জীবনকে কঠিন করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এটি জীবনকে সহজ

করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে একজন মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য খুঁজে পায়। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 57:

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।"

উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহলের অনেক নেতিবাচক প্রভাব মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল না যখন এটি পবিত্র কুরআন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল, যেমন মানবদেহের অগণিত অঙ্গগুলিতে এর বিরূপ প্রভাব। এটি শুধুমাত্র এই নেতিবাচক প্রভাবগুলির কারণে এটি নিষিদ্ধ ছিল। অর্থ, মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানুষের উপকারী জিনিসের আদেশ ও নিষেধ করেন। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শে গ্রহণ করে এবং কাজ করে, যদিও তারা তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে দেয়, কারণ তারা জানে পরামর্শ তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় বা তাদের উপদেশের উপকারিতা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 106:

"আমরা কোন আয়াত রহিত করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ একটি [একটি] বের করি..."

সময়ের সাথে সাথে একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করার এই প্রক্রিয়াটি বোঝার গুরুত্বও নির্দেশ করে যে ইসলাম মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা চায় না এবং রাতারাতি সাধু হওয়ার দাবি করে না। একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে শেখার এবং আমল করার জন্য নিয়মিত সময় দেবেন এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা করবেন বলে আশা করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, তাদেরকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে। এই প্রক্রিয়া তাদের বিশ্বাসের শক্তিতে ধীরে ধীরে কিন্তু অবিরাম বৃদ্ধি ঘটাবে। যার ঈমান যত মজবুত হবে, সে তত বেশি মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 106:

"আমরা কোন আয়াত রহিত করি না বা বিস্মৃত করি না, তবে আমরা এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ একটি [একটি] বের করি..."

এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে যখনই কেউ নতুন কিছু শিখে তখনই তার আচরণকে ক্রমাগত ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। শুধুমাত্র একজন অজ্ঞ ও একগুঁয়ে ব্যক্তি যখন নতুন ইসলামী জ্ঞান শিখে তখন পরিবর্তন হয় না। একজন মুসলিমকে অবশ্যই একটি নমনীয় মনোভাব অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে তারা সর্বদা তাদের বক্তৃতা ও কর্মকে তাদের অর্জিত নতুন ইসলামিক জ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ করে। যেখানে, তারা সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো অন্য কোনও মান অনুযায়ী তাদের আচরণ পরিবর্তন করবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রহিতকরণের প্রক্রিয়া হল একটি পরীক্ষা যা স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য যে তারা নতুন ইসলামী জ্ঞান শিখলে কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ পরিবর্তন করে এবং যারা একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তারা ইতিমধ্যেই তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 108

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ
بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

"অথবা আপনি কি আপনার রসূলকে জিজ্ঞাসা করতে চান যেমনটি আগে মুসাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর করে, সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তারা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে যাতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়, ঠিক যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতি, ইসরাঈল সন্তানদের দ্বারা কষ্ট পেয়েছিলেন। . অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 67-71:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বলল, আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে এটি কী। [মূসা] বললেন, "[আল্লাহ] বলেন, 'এটি এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধও নয়, কুমারীও নয়, বরং এর মধ্যবর্তী', সুতরাং তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করো।" তারা বলল, আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন যেন আমাদের দেখান তার রং কেমন। তিনি বললেন, তিনি বলেন, 'এটি একটি হলুদ গাভী, বর্ণে উজ্জ্বল - দর্শকদের কাছে আনন্দদায়ক।'" তারা বলল, "আপনার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে, সব গরু দেখতে একই রকম। এবং অবশ্যই আমরা, যদি আল্লাহ চান, হেদায়েত হবে।" তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন, 'এটি একটি গাভী যা মাটিতে লাঙ্গল বা ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত নয়, তার গায়ে কোন দাগ নেই।'" তারা বলল, "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" তাই তারা তাকে জবাই করেছিল, কিন্তু তারা খুব কমই করতে পারে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 108:

"অথবা আপনি কি আপনার রসূলকে জিজ্ঞাসা করতে চান যেভাবে মুসাকে আগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? ..."

পবিত্র নবী মুসা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা আয়াতে যেমন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মানুষকে কেবল তাদের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যার ফলে তাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। বিচার দিবসে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে সেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানে একজন মুসলিমকে মনোযোগ দিতে হবে। অন্য যেকোন কিছু অবশ্যই বাদ দিতে হবে কারণ এটি তাদের যে জিনিসগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে তা থেকে তাদের বিভ্রান্ত করবে। সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে , মুসলমানদের অবশ্যই অর্থহীন প্রশ্ন করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে তাদের যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা পূরণ করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম, এমনকি পন্ডিতরাও এমন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না। তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এই মনোভাব শুধুমাত্র ইসলামী জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই মনোভাবের উপর অবিচল থাকা কেবলমাত্র একজনকে ত্রাণ বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যায়, যা সর্বদা প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং বিষয়গুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, অবিশ্বাসের দিকে, যা সর্বদা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এবং সমস্যার সাথে সংযুক্ত ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 108:

“অথবা আপনি কি আপনার রসূলকে জিজ্ঞাসা করতে চান যেমনটি আগে মুসাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর করবে সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর করে, সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।”

এই আয়াতটি কিতাবের লোকদের এবং মক্কার অমুসলিমদেরকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্য এবং অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য অর্থহীন প্রশ্ন করা থেকে সতর্ক করতে পারে। বইয়ের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষ, ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছ থেকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এড়ানোর গুরুত্ব শেখা উচিত ছিল। যেহেতু তাদের পন্ডিতদের কাছে আসমানী কিতাব রয়েছে যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেছে, সেহেতু ইসলামের সত্যতা তাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল বলে তাদের এই আচরণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুওয়াত ঘোষণার চল্লিশ বছর আগে বসবাস করত এবং তাই জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল, তারা জানত পবিত্র কোরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয় অন্যথায় তারা তাদের জ্ঞানের স্তর, তাদের সামাজিক অবস্থান, সময় নির্বিশেষে মানুষকে গাইড করার ক্ষমতার সাথে সহজেই মিলত। তারা বসবাস করে এবং একটি ব্যক্তি বা জাতি কখনও সম্মুখীন হতে পারে এমন প্রতিটি সামাজিক, ব্যক্তিগত, আর্থিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা রাখে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের (অর্থাৎ সমর্থকদের) ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

যারা বইয়ের লোক এবং মক্কার অমুসলিমদের কাছ থেকে ইসলাম থেকে অন্যদের বিপথগামী করার জন্য অর্থহীন বিষয়গুলি অনুসরণ করেছিল তারা কেবল সেই

বিশ্বাসের বিনিময় করেছিল যা তাদের অবিশ্বাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 108:

"...আর যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর করে, সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের এই পৃথিবীতে অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই হবে না এবং তাদের পথ পরকালে জান্নাতে শেষ হবে না, কারণ তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ভুলে গেছে, যার মধ্যে নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 109-110

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ
بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই চান যে, আপনি ঈমান আনার পর, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও নিজেদের প্রতি ঈর্ষার কারণে তারা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তার আদেশ প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আর নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু তোমরা নিজেদের জন্য সামনে রাখবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

বরাবরের মতো, মহান আল্লাহ যখনই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমালোচনা করেন তিনি সর্বদা স্পষ্ট করে দেন যে সেই দলের সকল সদস্য একইভাবে কাজ করেননি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

"কিতাবের অনেক লোক..."

এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই মনোভাবের উপর অটল থাকা প্রায়শই বৈষম্যের দিকে নিয়ে যায়, যেমন বর্ণবাদ, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ, তারপর মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বইয়ের লোকদের অনেকের হিংসা তুলে ধরেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

" *কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই চান যে, আপনি ঈমান আনার পর, নিজেদের প্রতি ঈর্ষার কারণে তারা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে..."*

এই পদ্ধতিতে আচরণ করা অন্যদের সাথে আন্তরিকতার সাথে আচরণ করা সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে, যা সহীহ মুসলিম, 196 নম্বর হাদিস অনুসারে ইসলামের

একটি অপরিহার্য দিক। একজনকে অবশ্যই এই আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে সত্যিকারের বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা যা একজন ব্যক্তি যা চান। নিজেদের সহীহ বুখারী, ১৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিতাবের লোকেরা ঈর্ষা করত যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন না, বরং তাদের বংশ থেকে ছিলেন, বরং তাঁর ভাইয়ের বংশধর। হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম উনাদের উপর। যেহেতু তাদের পুরো বিশ্বাস তাদের বংশের চারপাশে কেন্দ্রীভূত ছিল, যেহেতু তারা দাবি করেছিল যে এটি তাদের বংশ ছিল যা তাদের বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে, তারা ভিন্ন বংশের কাউকে গ্রহণ করতে বা অনুসরণ করতে পারে না কারণ এটি তাদের উচ্চতর হওয়ার মিথ্যা দাবি করবে। কারণ তাদের রক্ত সকলের জন্য পরিষ্কার। উপরন্তু, তারা মুসলমানদেরকে ঈর্ষা করত কারণ তারাও ঐশ্বরিক প্রকাশের বাহক হয়ে উঠেছিল, যা বইয়ের লোকেরা খুব গর্বিত ছিল। তারা অন্য জাতির সাথে স্পটলাইট ভাগ করে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ, তারা কামনা করেছিল যে মুসলিমরা ঐশ্বরিক প্রকাশের উপর ভিত্তি করে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করবে এবং মূর্তি পূজায় ফিরে আসবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

" *কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই চান যে, আপনি ঈমান আনার পর, নিজেদের প্রতি ঈর্ষার কারণে তারা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে...*"

হিংসা একটি বড় পাপ যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি বড় পাপ কারণ হিংসাকারী সরাসরি মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ নিয়ামত দান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে মৌখিক এবং শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয় যার বিরুদ্ধে তারা হিংসা করে সে কেবল তাদের নিজের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ ঈর্ষা হল যখন কেউ অন্য কারো প্রতি অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যা তাকে দেওয়া হয়েছে তা না হারিয়ে। যদিও এই প্রকারটি বৈধ, তথাপি তা কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে দোষারোপযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ এবং প্রশংসনীয় ঈর্ষার উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায় তাকে হিংসা করতে পারে। অন্য ব্যক্তি হিংসা করতে পারে সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে।

একজনকে অবশ্যই হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে যে এটি একটি বড় পাপ যা মহান আল্লাহর বন্টন পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এটি আরও আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করা কেবলমাত্র একজন মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যাওয়ার কারণ হবে, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

" *কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই চান যে, আপনি ঈমান আনার পর, নিজেদের প্রতি ঈর্ষার কারণে তারা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি বোঝার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যে, যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যার মূলে রয়েছে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তখন তারা সর্বদা অন্যদের দ্বারা সমালোচনার শিকার হবে। দুঃখজনকভাবে, এই সমালোচনা প্রায়ই তাদের নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে। এটি ঘটে যখন লোকেরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যার সমালোচনা করে সে তাদের পথ ছাড়া অন্য পথ বেছে নিচ্ছে এর অর্থ হল তাদের পথটি একটি মন্দ। কিন্তু সত্য হল ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না এবং শুধুমাত্র একটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে চায় কারণ এটি তাদের জন্য ভাল। কখনও কখনও, তাদের সমালোচনার মূল হিংসা হয় কারণ তারা হিংসা করে যে তাদের আত্মীয় ইসলামী জ্ঞান অনুসরণ করছে এবং অন্যরা তাদের চেয়ে ভাল হিসাবে দেখবে। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কেউ নির্ণয় করতে পারে কে তাদের প্রতি সত্যিকারের আন্তরিক, কারণ যারা তাদের প্রতি আন্তরিক তারা তাদের পথ ধরে চলতে উৎসাহিত করবে, এমনকি তারা তাদের

মনোভাবের পরিবর্তন বুঝতে না পারলেও, কারণ তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে এটি ব্যক্তিকে খুশি করে। এবং যেহেতু তারা কোন অন্যায় করছে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের নতুন উচ্চতর পথের উপর অটল থাকতে হবে এবং তারা যে সমালোচনার সম্মুখীন হয় তার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। এর পরিবর্তে তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ চালিয়ে যেতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পারে। শুধুমাত্র এই পথের মাধ্যমে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের ঐশী কিতাবে আলোচিত হওয়ার পরও, মহান আল্লাহ, কিতাবের লোকদের ইসলামের সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের হিংসা ও প্রত্যাখ্যানের জন্য তাদের সমালোচনা করেছিলেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 109:

" কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই চান যে, আপনি ঈমান আনার পর, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের প্রতি হিংসার কারণে তারা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে।"

মহান আল্লাহ, তারপর ঈর্ষান্বিত মুসলমানদেরকে তাদের ঈর্ষাকারীদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করতে শেখান, কারণ কিতাবধারীরা, মহান আল্লাহ তাদের হিংসার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন এবং ঈর্ষাকারীদের শাস্তি দেবেন যদি তারা ব্যর্থ হয়। আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

"... সুতরাং ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে তাই তাদের হিংসাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং ইসলামের সীমারেখার মধ্যেই নিজেদের রক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা জড়িত, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এভাবেই কেউ তাদের হিংসা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অধ্যায় 113 আল ফালাক, আয়াত 1 এবং 5:

"বলুন, আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই.. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

মহান আল্লাহ তখন তাদেরকে তাদের ঈর্ষার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয় , যেমন মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন এবং মানুষের খুব সীমিত চিন্তাধারা অনুযায়ী নয়। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 109:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

অতঃপর মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার দিকগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 110:

"আর নামায কায়েম কর..."

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

" তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহ প্রায়শই নামায কায়েম করাকে ফরয দান করার সাথে সংযুক্ত করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 110:

"... আর যাকাত দাও..."

বাধ্যতামূলক দাতব্য হল একজনের সামগ্রিক আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার একটি উদ্দেশ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, এবং তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে, একজনের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতই কেবল একটি ঋণ যা তার সঠিক মালিক মহান আল্লাহকে পরিশোধ করতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছিল, যেমন তাদের সম্পদ, সেগুলি তাদেরই এবং তাই বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির মুখোমুখি হবে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব ঋণ একটি জরিমানা সম্মুখীন. উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দান না করে, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, তারা যে সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ, তারপর তাঁর আনুগত্যের মধ্যে দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহারের গুরুত্ব সংক্ষিপ্ত করেন, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 110:

"...এবং তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু ভালো রাখবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে..."

এটি একজন মুসলমানকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা কেবল তখনই নিজেদের উপকার করছে যখন তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। তারা

আল্লাহ, মহান বা অন্য লোকদের প্রতি কোন উপকার করে না, কারণ তারা ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহকে মান্য করে সরাসরি উপকৃত হয়। সত্য, যা প্রায়শই অনেকের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তা হল যে কেউ যখন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, তখন এটি নিশ্চিত করে যে তারা এই পৃথিবীতে, তাদের কবরে এবং বিচারের দিনে এটি থেকে উপকৃত হয়, অর্থ, এটি তাদের দখলে থাকে এবং এই পর্যায়ে জুড়ে তাদের সমর্থন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তারা এই দুনিয়ায়, তাদের কবরে এবং বিচার দিবসে তাদের জন্য চাপ এবং অসুবিধার উত্স হয়ে উঠবে যদিও জিনিসটি শেষ পর্যন্ত তাদের আঙ্গুল থেকে পিছলে যাবে তাদের জীবন বা তাদের মৃত্যুর পরে। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া পার্থিব নিয়ামতগুলোকে ধরে রাখতে চায় এবং উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে উঠতে চায়, তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 110:

"...এবং তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু ভালো রাখবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে..."

কিন্তু কেউ যদি তাদের সাথে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে পরবর্তী জগতে নিয়ে যেতে এবং উভয় জগতে তাদের জন্য শান্তির উত্স হয়ে উঠতে বেছে নেয়, সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, বা না হোক, যেভাবেই হোক তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে। পছন্দ, যেহেতু কিছুই ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 110:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ, তোমরা যা কর, তা দেখছেন।"

যদি তারা সঠিক পছন্দ করে তবে তারা উভয় জগতেই অনুগ্রহ ও পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বেছে নেয়, তাহলে তারা উভয় জগতেই তাদের মানসিক চাপ ও দুঃখের উৎস হয়ে উঠবে, কারণ তারা সেই আশীর্বাদকে ভুলে গেছে যিনি তাদের দান করেছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 111-112

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"আর তারা [কিতাবধারীরা] বলে, "ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এটা তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।

হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে], যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে ইসলামে নিজের মুখমন্ডলকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

যদিও কিতাবধারী আলেমগণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে তাদের ঐশী শিক্ষাগুলি বিপথগামী লোকদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়েছে এবং তারা স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতাকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর উপর, তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল, তারা তখনও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দাবি করেছিল যে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত ছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু যে বিষয়টি মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করেছিল, তা হল যে তারা তাদের অজ্ঞ অনুসারীদেরকেও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিভ্রান্ত করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 111:

"এবং তারা [কিতাবধারীরা] বলে, "ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

কিন্তু তাদের দাবী ইচ্ছাকৃত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য ছিল না। ইচ্ছাকৃত চিন্তা সর্বদা মহান আল্লাহকে অমান্য করার সাথে জড়িত, একজনকে দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অথচ মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের প্রকৃত আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ। এই পার্থক্যটি জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিতাবের লোকেরা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকার কারণে ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিল। তারা এমন বিশ্বাসও গ্রহণ করেছিল যা সরাসরি মহান আল্লাহর ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের বংশের কারণে মহান আল্লাহর প্রিয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এটি একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক মনোভাব ছিল কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বর্ণবাদ এবং অবিচারকে দায়ী করে, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্যে থেকে মন্দ কাজের লোকের সাথে সমানভাবে আচরণ করবেন যা তাদের থেকে নয়। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

তাই তাদের দাবী মিথ্যা ছিল কারণ তাদের ঐশী কিতাবগুলো সম্পাদিত হয়েছে এবং ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যখনই তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল ছিল, তখনই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এটি সর্বদাই মহান আল্লাহর ঐতিহ্য, যা কোন জাতির জন্য কখনই পরিবর্তন হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 111:

"আর তারা [কিতাবধারীরা] বলে, "ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এটা তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।

দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের ইচ্ছাপূরণের চিন্তাধারা অনেক মুসলিমদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে যারা দাবি করে যে তারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতি থেকে, তাদের কর্ম নির্বিশেষে তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা রয়েছে। তারা ইতিহাসের পাতা উল্টাতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মহান আল্লাহর ঐতিহ্য, যার মধ্যে যারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে তাদের শাস্তি প্রদান করে, তারা যেই হোক না কেন, কখনও পরিবর্তন হয়নি। তাই এই মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং এটি অবশ্যই পরিহার করা উচিত কারণ এটি আন্তরিকভাবে

মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করার দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ একটি সত্য, যা অনেক হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, কোনটিই কম নয়, কিছু মুসলিম এখনও থাকবে। জাহান্নামে প্রবেশ করুন। জাহান্নামে একটি মুহূর্তও অসহনীয়। উপরন্তু, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করে এবং তাই মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যুর আগে তাদের ঈমান হারানোর ঝুঁকি রয়েছে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একইভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যাবে যদি এটি জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও ভাল হতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অতএব, একজনের জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় যে ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা পরিহার করা এবং তার পরিবর্তে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করা, যা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 111:

"আর তারা [কিতাবধারীরা] বলে, "ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এটা তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে ভিত্তি করার গুরুত্বও নির্দেশ করে। তাই মানুষকে অন্ধভাবে তাদের বিশ্বাস ও কর্ম, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যদের অনুসরণ করে গবাদি পশুর মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। একজনকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে শক্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে, কারণ অজ্ঞ মুসলিমরা সহজেই মহান আল্লাহকে অমান্য করে, যখন তাদের ইচ্ছা বিরোধী হয়। উপরন্তু, অজ্ঞতা বা অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে এমন বিশ্বাস এবং কাজগুলি সর্বদা বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়, যেমন ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা এবং বিশ্বাসের মধ্যে নতুনত্বের প্রবর্তন। এ দুটিই একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে।

মহান আল্লাহ, তারপর কর্মের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে বাস্তবায়িত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 112:

" *হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে], যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে...*"

এই আয়াতটি, অগণিত অন্যদের মত, এটা স্পষ্ট করে যে শুধুমাত্র জিহ্বা দিয়ে বিশ্বাসের দাবি করা সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। একজনকে অবশ্যই ভাল কাজের সাথে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের দাবিকে সমর্থন করতে হবে। যদিও মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তবুও তিনি আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস প্রদর্শনের জন্য আদেশ দিয়েছেন। কাজ ছাড়া কথার মূল্য ইসলামে খুব কম। তাই পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"*যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।*"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 112:

" *হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে], যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে..."*

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্য অনুসারে হয়। তাই জ্ঞানের অন্য সব উৎসকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলো ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু কেউ জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় তা আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। , মহিমান্বিত।

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 112:

" *হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে], যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে..."*

এই আয়াতের গঠনটি একজনের বিশ্বাসকে বিভক্ত না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যেখানে তারা শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করে যখন এটি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়। ইসলাম এমন কোন জামার মত নয় যেটা পরা ও খুলে ফেলা যায়

নিজের ইচ্ছানুযায়ী। ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে প্রতিটি আশীর্বাদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। যারা এইভাবে আচরণ করে তারা সত্যই মহান আল্লাহর কাছে ইসলামে তাদের মুখ পেশ করেছে। মহান আল্লাহ তখন তাদের ভয় ও শোকের মতো চরম আবেগ থেকে রক্ষা করবেন, যা খারাপ মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 112:

"...এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

যদিও একজন মুসলিম যে সঠিকভাবে আচরণ করে, তবুও এই পৃথিবীতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, কারণ এই পৃথিবী পরীক্ষা এবং পরীক্ষার আবাস, কোন অংশে কম নয়, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তারা চরম আবেগ থেকে রক্ষা পাবে যা উত্সাহিত করতে পারে। মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য হওয়া। পরিবর্তে, তারা চাপ এবং দুঃখের সম্মুখীন হবে কিন্তু তারা এই আবেগগুলিকে কাটিয়ে উঠবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। ফলস্বরূপ, তারা নিরাপদে পরকালে পৌঁছানো পর্যন্ত মানসিক প্রশান্তি নিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে হবে, এমনকি তাদের ইচ্ছার বিরোধী হলেও, কারণ এটি উভয় জগতে তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই সেই বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনেও, যদিও এই পরামর্শটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, সে দেখতে পাবে যে তারা নিয়মিত বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট চরম আবেগের দ্বারা পরাস্ত হয়, এমনকি যদি তাদের মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তও হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এটি অগণিত মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে, যেমন বিষণ্নতা, চরম মেজাজের পরিবর্তন এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য যা হবে তা আরও খারাপ হবে, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ্] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 113

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

"ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর কিছু নেই [সত্য]," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদিদের দাঁড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা জানে না তারা তাদের কথার মতো কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।"

আল্লাহ, মহান, কিতাবের লোকদের, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সমালোচনা করেন, যারা দাবি করে যে অন্যের বিশ্বাস কোন শক্ত প্রমাণ বা প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

" ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর কিছু নেই [সত্য]," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদীদের দাড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে..."

বাস্তবে, তাদের কোন বিশ্বাসই দৃঢ় ঐশ্বরিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ছিল না কারণ তাদের উভয় ধর্মগ্রন্থই বিপথগামী লোকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যা কোন দলই অস্বীকার করেনি। তাদের পণ্ডিতরা, যারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে পারদর্শী ছিলেন, তারা পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিক উত্সকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর লেখকের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এই সত্যটি যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ই ছিলেন। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে অবশ্যই তাদের আচরণ গ্রহণ করা উচিত নয় যার মধ্যে অন্যের মনোভাবের সমালোচনা করা এবং নিজের বিপথগামী মনোভাবের প্রতি উদাসীন থাকা। একজন ব্যক্তির এমন মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং কাজ করতে হবে, যাতে অন্যদের বিশ্বাস এবং মনোভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আগে তাদের বিশ্বাস এবং কাজগুলি শক্ত প্রমাণ এবং সঠিক নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

" ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর কিছু নেই [সত্য]," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদীদের দাড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে..."

উপরন্তু, এই আয়াতে এমন জ্ঞানের সমালোচনা করা হয়েছে যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত নয়। আহলে কিতাব উভয় আলেম তাদের কিতাবে শিক্ষা লাভ করেও তাদের উপর আমল করতে ব্যর্থ হন। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলামে কর্ম ছাড়া জ্ঞানের মূল্য খুব কম। জ্ঞান যেমন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না যতক্ষণ না তারা জ্ঞানের উপর কাজ করে, তেমনি ইসলামী জ্ঞানও একজন মুসলমানকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে না যতক্ষণ না তারা তার উপর কাজ করে। বর্ধিতভাবে, তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের অর্থ না বুঝে

অন্ধভাবে তেলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি তাদের এটির উপর কাজ করতেও বাধা দেবে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কিতাব নয়, এটি একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। সঠিক জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমেই পথনির্দেশ পাওয়া যায়, শুধুমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে নয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

" *ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর কিছু নেই [সত্য]," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদীদের দাড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে..."*

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে তাদের বিশ্বাস শক্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ছিল না বরং অন্যদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তাদের নিজের পক্ষে অন্ধ আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। মানুষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য কারণ এটি সর্বদা বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, গ্যাংগুলির সম্পূর্ণ ধারণাটি একে অপরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে। অন্ধ আনুগত্য একজনকে সত্যকে সমর্থন করা থেকে বাধা দেবে যদি এর অর্থ যারা তাদের পক্ষে নেই তাদের সমর্থন করা এবং এটি তাদের নিজের এবং জনগণের সাথে সংযুক্ত থাকলে ভুলের বিরুদ্ধে সতর্ক করা থেকে বাধা দেয়। দুঃখজনকভাবে, এই অত্যন্ত অপছন্দের মনোভাব এমন কি অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যেও পাওয়া যায় যাদের তাদের শিক্ষক এবং চিন্তাধারার প্রতি অন্ধ আনুগত্য তাদের বিভিন্ন চিন্তাধারার অন্যান্য পণ্ডিতদের দ্বারা প্রদত্ত ইসলামী ব্যাখ্যা সমর্থন করতে বাধা দেয় যদিও তারা গোপনে তাদের সাথে একমত হয়। পরিবর্তে, তাদের অন্ধ আনুগত্য তাদের অন্যান্য চিন্তাধারার সমালোচনা করতে উত্সাহিত করে, ঠিক যেমন খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা একে অপরের সমালোচনা করেছিল।

একজন পণ্ডিত যার কাজ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখানো, নিরপেক্ষ উপায়ে তারপরে তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাদের চিন্তাধারার আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দেন। কিছু ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারার মতাদর্শের সাথে দ্বিমত অর্জন করেছে। একজন মুসলমানের জন্য তাদের শিক্ষকদের সম্মান করা অত্যাবশ্যক কিন্তু তাদের কখনোই তাদের বা অন্যদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অবলম্বন করা উচিত নয়। তাদের অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে। এই কারণেই তারা একে অপরের সাথে সম্মানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে লজ্জা পেত না, কারণ তারা একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেনি। এর একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 7284 এবং 7285 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে উমর ইবনে খাত্তাব সম্মানের সাথে তার নেতা, খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিকের মতামতকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবে সে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করবে এবং তাই সাহাবায়ে কেরামের মতোই সঠিকভাবে তাদের উপর আমল করবে। .

আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে। যে মুসলমান কোনো বিশেষ পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই যারা তাদের পণ্ডিতের মতের বিরোধিতা করে তাদের সমালোচনা ও ঘৃণা করা। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মতের একটি বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী একজন মুসলমানের এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তাদের চিন্তাধারার বিশ্বাস এবং সমর্থনকারীর থেকে ভিন্ন।

আহলে কিতাব আলেমদের উপর মহান আল্লাহর ক্রোধের একটি কারণ এই যে, তারা তাদের অজ্ঞ অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল যখন তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও অস্বীকার করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

" ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর মতো [সত্য] কিছুই নেই," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদিদের দাঁড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা জানে না তারা তাদের কথার মতো কথা বলে..."

একজন মুসলমানের জন্য কেবলমাত্র পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই যা সঠিক ও ভালো তা সমর্থন করা অপরিহার্য, কারণ যে ব্যক্তি মানুষকে বিপথগামী করে তার বিরুদ্ধে তাদের অনুসারীরা তাদের খারাপ উপদেশ ও নির্দেশনার ভিত্তিতে যে পাপ করে থাকে তার বিরুদ্ধে একই পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই সত্য শিখতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে কাজ করতে হবে এবং অন্যদের কাছে এটির পরামর্শ দিতে হবে যাতে তারা তাদের অনুসারীরা তাদের ভাল কাজ করার সময় যে পুরস্কার অর্জন করে তা অর্জন করে। পরামর্শ

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

" ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর মতো [সত্য] কিছুই নেই," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদিদের দাঁড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা জানে না তারা তাদের কথার মতো কথা বলে..."

উপরন্তু, এই আয়াতে অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করার সমালোচনা করা হয়েছে কারণ এটি বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান উৎস। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে গবাদি পশুর মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরিবর্তে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দরকারী জ্ঞান শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে, যাতে তারা তাদের সমস্ত বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা অর্জন করতে পারে। ইসলাম গবাদি পশুর মতো আচরণের সমালোচনা করে এবং সর্বদা মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং কাজ করতে উত্সাহিত করে, যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে অন্তর্দৃষ্টি এবং বোঝার সাথে জীবনযাপন করে। ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্যের একটি কারণ। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 9:

"...বলুন, "যারা জানে তারা কি সমান যারা জানে না?" কেবল তারাই মনে রাখবে [যারা] বুদ্ধিমান লোক।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 113:

" ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর মতো [সত্য] কিছুই নেই," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদিদের দাঁড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা জানে না তারা তাদের কথার মতো কথা বলে..."

যারা ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখতে এবং আমল করতে ব্যর্থ হয় যাতে তাদের আচরণ ও কাজগুলো দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে হয়, যারা তাদের খারাপ উপদেশের মাধ্যমে অন্যদের বিপথগামী করে এবং যারা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করে তারা উভয় জগতে তাদের মনোভাবের পরিণতি ভোগ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 113:

"ইহুদীরা বলে, "খ্রিস্টানদের দাড়ানোর কিছু নেই [সত্য]," এবং খ্রিস্টানরা বলে, "ইহুদিদের দাঁড়ানোর কিছু নেই," যদিও তারা [উভয়] কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা জানে না তারা তাদের কথার মতো কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কোন পথ বেছে নিন না কেন, যা অন্যদের পথ থেকে আলাদা, তারা তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হবে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে যাতে বিচার দিবসে তাদের চূড়ান্ত রায় তাদের পক্ষে হয়। এই সঠিক পথের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে সঠিক পছন্দ করবে তাকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য দেওয়া হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের চূড়ান্ত বিচারকে উপেক্ষা করবে সে নিঃসন্দেহে ভুল পথ বেছে নেবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা। ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার মুখোমুখি হবে, কারণ তারা তাদের স্রষ্টা ও মালিকের আনুগত্য করতে ভুলে গেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

"এবং তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যারা আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের ধ্বংসের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ভয় ছাড়া তাদের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের জন্য নয়। তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের সমালোচনা করেন, যারা আল্লাহর ঘর, কাবা ঘরের রক্ষক হওয়ার কারণে খুব গর্বিত ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 114:

"আর যারা আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা [অর্থাৎ, প্রশংসা] হতে বাধা দেয় তাদের চেয়ে বড় জালেম কে..."

যেহেতু তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামকে সেখানে আল্লাহর উপাসনা করতে বাধা দেবে, যদিও এটি তাদের নিজস্ব দীর্ঘস্থায়ী নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, যা কাউকে অনুমতি দেয় কিনা। শত্রুর বন্ধু, মক্কার পবিত্র মসজিদে অবাধে ইবাদত করা। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অমুসলিম চাচা আবু জাহল একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি যদি পবিত্র মক্কার পবিত্র মসজিদে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবলোকন করেন, কাবা শরীফকে সেজদা অবস্থায় ঘাড় মাড়িয়ে যেতেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, তখন আবু জাহেল তার মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার কাছে এলো কিন্তু সে দ্রুত তাড়াহুড়ো করে বন্য শিকারী থেকে গাধার মত পালিয়ে গেল। তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি আগুনের একটি খাদ দেখেছেন, ত্রাস এবং ডানা পূর্ণ, যা তার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরে মন্তব্য করেছিলেন যে আবু জাহেল যদি তার পরিকল্পনায় অটল থাকে তবে ফেরেশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সহীহ মুসলিমের ৭০৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালার গৃহে ইবাদত করতে বাধা দিয়ে মক্কার অমুসলিমরা বাস্তবে তা ও এর পবিত্রতা বিনষ্ট করছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 114:

" এবং তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যারা আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের ধ্বংসের জন্য প্রচেষ্টা চালায়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মসজিদের উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর ইবাদত করা এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন, শেখা এবং শেখানো এবং তাই প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হতে হবে। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান জাগতিক কথোপকথনের জন্য মসজিদকে সামাজিক ক্লাবে পরিণত করেছে, মহান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে মহিমান্বিত করার স্থান এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন জ্ঞান শেখানোর জন্য। এইভাবে আচরণ করা শুধুমাত্র তাদের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এই আয়াতের সমালোচনা তাদের জন্যও প্রযোজ্য। একটি মসজিদ নির্মাণ যথেষ্ট নয়, মুসলমানদের অবশ্যই এর উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

"...এবং আমরা ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, [বলেছি], "আমার ঘরকে পবিত্র কর তাদের জন্য যারা তাওয়াফ [প্রদক্ষিণ] করে এবং যারা ইবাদতের জন্য [সেখানে] অবস্থান করে এবং যারা রুকু ও সেজদা করে।"

এইভাবে আচরণ করা মহান আল্লাহকে ভয় করার একটি অংশ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 114:

"... ভয় ছাড়া তাদের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের জন্য নয়..."

যার মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে, সে নিশ্চিত করবে যে তারা মসজিদের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, ঠিক মক্কার অমুসলিমদের মতোই, এটিকে পার্থিব বিষয়ে সামাজিকতার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করে, আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে মানুষকে মহিমান্বিত করে এবং পবিত্র কুরআন ব্যতীত ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়। এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহ উভয় জগতে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না কারণ তারা মহান আল্লাহর মেহমান হিসাবে আচরণ করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 114:

"... তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 115

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝١١٥

"আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যেদিকেই তুমি [হবে] ফিরি, সেখানেই আল্লাহর মুখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।"

এই আয়াতটি নামাজের সময় মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত ছিল, যা জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার মসজিদ আল হারামে পরিবর্তিত হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"আমরা অবশ্যই আপনার মুখমন্ডল, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আকাশের দিকে ফিরে যেতে দেখেছি এবং আমরা অবশ্যই আপনাকে এমন একটি কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি খুশি হবেন। সুতরাং তোমার মুখ [অর্থাৎ নিজেকে] আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে ঘুরিয়ে দাও..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 115:

"আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই..."

যেহেতু মহান আল্লাহ এই জগতের সকল বিষয়ের মালিক, একজন ব্যক্তির কাছে তাঁর আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। যে ব্যক্তি একটি সম্প্রদায় বা দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আইন অপছন্দ করেন সে এমন একটি দেশে স্থানান্তর করতে স্বাধীন যে আইনটি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহ তায়ালার, তার আইন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ হিজরত করতে পারে এমন কোথাও নেই। তাই তাদের নিজেদের স্বার্থে তা মানতে হবে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহর আইন তাদের উপকার

করে, এমনকি যদি তারা তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

“যারা রসূল, নিরক্ষর নবীকে অনুসরণ করে, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে] দেখে, যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য হালাল করেন। যা ভালো এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয়..."

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর আইন মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে, তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনেও, যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে। যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এইভাবে আচরণ করলে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যথায়, একজন রোগী যেভাবে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নিতে এবং কাজ করতে অস্বীকার করে সে মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে, তেমনি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর বিধান মেনে নিতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হবে সেও মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কেন্দ্রবিন্দু হল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার একটি দিকনির্দেশনা এবং তাই মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি কোনো এক দিকে নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 115:

" *আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যেদিকেই তুমি [হতে পারে] মুখ ফিরাবে, সেখানেই আল্লাহর মুখ আছে..."*

এই বাস্তবতা মনে রাখা একজন মুসলিমকে সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে সাহায্য করবে, এটা জেনে যে তিনি তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সব সময়

পর্যবেক্ষণ করছেন, শুধুমাত্র যখন তারা নামায পড়েন তখন নয়। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতার উপর তাদের শক্তি নিবদ্ধ করে সে অবশেষে ঈমানের উৎকর্ষ লাভ করবে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর উপাসনা করার মতো কাজ করে, যেন তারা আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 115:

"... *নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।*"

অথচ যে ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে ভুলে যায়, সে তখনই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, যখন তারা নামায আদায় করবে এবং তাদের দানকৃত নেয়ামতের অপব্যবহার করে তাদের বাইরে তাঁর অবাধ্য হবে। এভাবে নিজের বিশ্বাসকে বিভক্ত করা কেবলমাত্র যখনই তার ইচ্ছার বিরোধিতা হয় তখনই মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে। নিজের বিশ্বাসকে বিভক্ত করা একজনকে বুঝতে বাধা দেয় যে ইসলাম হল একটি জীবন ব্যবস্থা যা একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে তারা তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদকে ব্যবহার করে। পরিবর্তে, তারা তাদের বিশ্বাসকে কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করবে যা তাদের জীবনের অন্যান্য দিকের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। এর ফলে উভয় জগতে বিভ্রান্তি ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 116-117

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ١١٦

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত।

নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

আল্লাহ, মহান, তারপর খ্রিস্টান এবং কিছু ইহুদিদের ধর্মের সমালোচনা করেন যারা দাবি করেছিল যে আল্লাহ, মহান, তার একটি জৈবিক পুত্র ছিল বা একজন মানুষকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 116:

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান!..."

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 30:

"ইহুদীরা বলে, "এজরা আল্লাহর পুত্র"; আর খৃষ্টানরা বলে, "মসীহ আল্লাহর পুত্র।" এটা তাদের মুখের বক্তব্য; তারা তাদের পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কথাই অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন; তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়?"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, তাদের পুরো বিশ্বাস তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন মানুষকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যারা একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, কারণ এটি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বিপথগামী হয়। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে, দরকারী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে এটি কাজ করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের প্রবীণদের আচরণ এবং মনোভাবের বিপরীত হয়। ইসলাম স্পষ্ট করে বলেছে যে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। এটি ইসলাম এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম এবং জীবন পদ্ধতির মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য। ইসলাম মানুষকে তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে এবং অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ

না করে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

" বলুন, "আমি তোমাকে শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - যে তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও, জোড়ায় জোড়ায় [সত্যের সন্ধান করো] এবং তারপর চিন্তা করো।"...

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিস্তারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তিনি যে সমস্ত অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর স্বর্গে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 47:

"তিনি [মারিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, "হে আমার প্রভু, আমার সন্তান হবে কিভাবে যখন কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি?" [ফেরেশতা] বললেন, "তিনিই

আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তিনি হযরত আদম (আঃ) -কে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার মানে এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 59:

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাকে বললেন, "হও" এবং সে হল।

এটা আশ্চর্যের বিষয় যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে মহানবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করার অধিকার বেশি, তবুও তারা এ দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ) এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করলেও হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেন না তা অদ্ভুত।

মহানবী ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক ঘটনা পবিত্র কুরআন দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট করে যে, মহানবী ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি ও আদেশে এই সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)

যদি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তাঁর মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হতো না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 49:

“এবং [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] বনী ইসরাঈলের জন্য একজন রসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। যা] পাখির মত, তারপর আমি তাতে শ্বাস নিই এবং আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধকে [জন্ম থেকে] এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি - আল্লাহর হুকুমে। এবং আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনি কী খান এবং আপনি আপনার বাড়িতে কী সংরক্ষণ করেন…”

জীবিত অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে আরোহণ আরও ইঙ্গিত করে যে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাকে, যেভাবে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি ঐশ্বরিক হতেন তবে তিনি নিজের সহজাত শক্তি দিয়ে এ যাত্রা করতে পারতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 55:

"[উল্লেখ করুন] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠাব এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে মুক্ত করব..."

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে হযরত ঈসা (আঃ) কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশের উপর যাঁর ছবি দেখা গিয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) নন, বরং তাঁকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। মহান

আল্লাহ এই সময়ের মধ্যেই হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানের দিকে উঠিয়েছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 156-158:

“এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যের জন্য একটি বড় অপবাদ। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।" এবং তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশে চড়াওনি; কিন্তু [অন্যকে] তাদের সাথে তার সাদৃশ্য করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া অর্থ, নিহত হওয়া, নিজের মধ্যেই অদ্ভুত কারণ একজন সত্যিকারের ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে। যদি একটি সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। সুতরাং বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবগতভাবে একটি ঐশ্বরিক সত্তা হল এমন কিছু যা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ, তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন নেই। যদি একটি সত্তা অন্যের দ্বারা টিকিয়ে রাখে তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। মহানবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়েই স্বর্গীয় জীব ছিলেন না কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাত্ তারা স্বনির্ভর সত্তা ছিলেন না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 75:

“মসীহ, মরিয়ম পুত্র, একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; [অন্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর তার মা ছিলেন সত্যের সমর্থক। তারা দুজনেই

খাবার খেতেন। দেখো, আমি তাদের কাছে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তারপর দেখুন তারা কিভাবে প্রতারিত হয়।"

উপরন্তু, কেউ দাবি করতে পারে না যে ফেরেশতারা খায় না বলে তারা ঈশ্বর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাস্তবে, তারাও মহান আল্লাহ তায়ালা ভিন্নভাবে টিকিয়ে রেখেছেন তাই তারাও স্বাবলম্বী নয়। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাকি সৃষ্টির মতোই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করবে, এটাই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একটি জৈবিক শিশু সবসময় তাদের পিতামাতার সাথে কিছু বৈশিষ্ট্য শেয়ার করবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণের ভাগী নন। আসলে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করা হয়। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও পানি দ্বারা টিকিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি মারা যাবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন, অন্য সব মানুষের মতোই। দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য তার বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা পবিত্র নবী ঈসা (আঃ)-এর ধারণার প্রবর্তন করেছিল, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে ঐশ্বরিক হওয়ার ধারণা, যা তারা তাদের পূর্বের বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা থেকে বহন করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপুষ্ট মহানবী (সা.)-কে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো কল্পকাহিনী ও মিথ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র একটি সামান্য বিট সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন যে একটি সত্তা যা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং মরতে পারে সে কখনই ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই জিনিসগুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণের বিরোধিতা করে।

আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, মহান আল্লাহ, সন্তান গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি একাই সমগ্র সৃষ্টির মালিক, এমন কিছু যা অন্যের উপর হস্তান্তর করা হবে না। একটি সৃষ্ট সত্তা একটি সন্তানের কামনা করে যাতে তারা তাদের সাহায্য ও সমর্থন করে, বিশেষ করে দুর্বলতার সময়, এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা মারা যায় তখন তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। সন্তান গ্রহণের জন্য এই বা অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলির কোনটিই মহান আল্লাহর কাছে প্রযোজ্য নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 116-117:

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"

যে ব্যক্তি আসমান ও যমীন এবং তাদের নির্মাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে সে মহান আল্লাহর একত্বকে স্পষ্টভাবে চিনবে। যদি একজন নির্মাতা ছাড়া একটি সাধারণ বিল্ডিং সঠিকভাবে তৈরি করা যায় না, তাহলে কীভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত সিস্টেমগুলি যেমন জলচক্র, মহাসাগর এবং সমুদ্রের নিখুঁত ঘনত্ব, পৃথিবীর নিখুঁত ঘনত্ব, নিখুঁত দূরত্ব কীভাবে তৈরি করা যায়? সূর্য পৃথিবী থেকে এবং ভূমির নিখুঁত উচ্চতায় কোন স্রষ্টা ছাড়া নির্মিত হবে? উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত তবে তা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে, কারণ প্রতিটি ঈশ্বর ভিন্ন কিছু চান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অতএব, আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে সামান্য প্রতিফলনই মহান আল্লাহ ব্যতীত সকলের দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ একাই মহানবী ঈসা (আঃ) সহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের কর্মের বিচার করার জন্য তাদের পুনরুত্থিত করবেন, সমস্ত একটি একক আদেশের মাধ্যমে। , হতে এবং এটা হয়.

উপসংহারে, প্রধান আয়াতগুলি প্রদর্শন করে যে কীভাবে এবং কেন পরিপূর্ণতার গুণাবলী একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। প্রথমত, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই একমাত্র মহান আল্লাহর। দ্বিতীয়ত, সবকিছুই তাঁর অধীনস্থ, অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায়, অর্থ, কোনো কিছুই তাঁর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। চতুর্থত, তাঁর সৃষ্টি শক্তি এতই প্রবল যে, তাঁর কোনো যন্ত্র বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তিনি কেবল একটি জিনিস আদেশ করেন এবং তা ঘটে। এই চারটি গুণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। যদি তাঁর সন্তান থাকে তবে তারা অন্তত এই গুণগুলির মধ্যে একটি তাঁর সাথে ভাগ করে নিত কিন্তু কোন প্রাণীই তাদের কোনটির অধিকারী হতে পারে না বা কখনও পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি যারা তাঁর প্রতি সন্তানের পরিচয় দিয়েছে তারাও এই সত্যে বিশ্বাস করেছিল। অতএব, তাদের নিজস্ব বিশ্বাস তাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে তাদের দাবির বিরোধিতা করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 116-117:

“…বরং, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতগুলো মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ যেহেতু একাই সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, যেহেতু কেউ তার আদেশ থেকে এড়াতে পারে না এবং তাই তারা তাদের পছন্দ করুক বা না করুক, তাই তাকেই মানতে হবে। . মনের শান্তির আবাস, আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছুর প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহকে অমান্য করে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করা বোকামি। যদি কেউ এই বাস্তবতাকে বাস্তবায়িত করে তবে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হবে সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্য হবে। এটি উভয় জগতে চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি একজন সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 118-119

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ لَوۡلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوۡ تَأۡتِينَآ ءَايَةٞۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن
قَبۡلِهِم مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘ تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ١١٨

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩

“যারা জানে না তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না বা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের কথার মতই বলেছিল। তাদের অন্তর একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি সুস্পষ্টভাবে নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দিয়েছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা আপনাকে সত্য সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

মহান আল্লাহ এই আয়াতগুলো শুরু করেছেন অজ্ঞতা ও তার লোকদের সমালোচনা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

"যারা জানেন না তারা বলেন..."

জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা একটি অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য কারণ এটি কেবলমাত্র বিপথগামী হতে পারে। যে সঠিক কি তা জানে না সে জীবনে সবসময় ভুল পছন্দ করবে। ধর্মীয় বিষয়ে, অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করে থাকে কারণ তারা পাপ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে অবগত থাকে না। ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্যের একটি কারণ। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা দাবি করা মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের হিসাবে গ্রহণ করে। বিশ্বাস, তার সাথে আসা কর্তব্য এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। লাইসেন্সধারী চালককে যেমন অজ্ঞতা দাবি করার জন্য ক্ষমা করা হবে না, যেমন তারা গাড়ি চালানোর নিয়ম জানার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তেমনি একজন মুসলমানও যদি অজ্ঞতা দাবি করে তবে বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে না। তাই একজনকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা শিখতে পারে কিভাবে তারা যে কোন পরিস্থিতির সাথে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারে এবং যাতে তারা প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, যাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়। উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভের এটাই একমাত্র উপায়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, অজ্ঞতা কেবল তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে, যার ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

" যারা জানে না তারা বলে, "আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না..."

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞ কথা বলবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের সাথে পরোক্ষভাবে কথা বলেছেন। তাঁর সাথে সরাসরি কথোপকথন অদৃশ্যের একটি উপাদান যা বিচার দিবস পর্যন্ত থাকতে হবে। জাহান্নাম ও জান্নাতের মতো অদৃশ্য বিষয়গুলো যদি এই পৃথিবীতে প্রকাশ পায় তাহলে সেগুলোতে বিশ্বাস করা কঠিন হবে না এবং তাই ঈমানকে অর্থহীন করে দেবে, যেমন অমুসলিমদের কিয়ামতের দিন ঈমান গ্রহণ করা অর্থহীন হবে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই আল্লাহর বাণী, মহান, অর্থ, পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন এবং আমল করার মাধ্যমে এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে ব্যবহার করতে হবে যখন তারা অদৃশ্য বিষয়গুলি তাদের কাছে প্রকাশ পাবে এবং তাদের কাজগুলি, যেমন আন্তরিক তওবা, তাদের আর উপকার হবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

"যারা জানে না তারা বলে, "আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না বা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না?"...

অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য, মক্কার অমুসলিমদের নেতারা, এমনকি মদিনার কিতাবধারী আলেমরাও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অলৌকিকতা দাবি করবেন। মহান আল্লাহর ঐতিহ্য কখনো পরিবর্তন হয়নি। যখন একটি জাতি তাদের অনুরোধ করা অলৌকিক ঘটনাগুলিতে অবিশ্বাস করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ, তাদের নিজেদের স্বার্থে তাদের অনুরোধ পূরণ করা এড়িয়ে গেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে তারা বিশ্বাস গ্রহণ করবে না এবং কেবল দাবি করবে যে তাদের চোখ জাদু করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মক্কার অমুসলিমরা একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মক্কার একটি পর্বত, সাফা পর্বতকে তাদের জন্য সোনায় পরিণত করতে এবং পাহাড়গুলিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিল যাতে তারা ফসল ফলাতে পারে। মহান আল্লাহ তাকে বলেছিলেন যে অবকাশ দেওয়া এবং তাদের মূর্খতাপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করা বা তিনি যদি চান তবে মহান আল্লাহ তাদের অনুরোধ পূরণ করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর পরে যদি তারা ইসলামে অবিশ্বাস করে তবে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবকাশ দিতে এবং তাদের মূর্খতার অনুরোধ উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তারা এরপরও অবিশ্বাস করবে। মহান আল্লাহ অতঃপর পবিত্র কুরআনের 17 অধ্যায় আল ইসরা, আয়াত 59 অবতীর্ণ করেন:

"এবং আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণে [অর্থাৎ, অলৌকিকতা] প্রেরণ করতে বাধা দেয়নি শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অস্বীকার করেছিল। আর আমি সামুদকে একটি দৃশ্যমান উটনী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আর আমরা সতর্কবাণী ব্যতীত নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি না।"

ইমাম আল ওয়াহিদীর আসবাব আল নুযুল, ১৭:৫৯, পৃষ্ঠা ১০৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এক সময়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঘোষণাকে নিশ্চিত করার জন্য পবিত্র কুরআন ব্যতীত তাদের একটি অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদের চাঁদের দ্বিখণ্ডন দেখালেন। এমনকি এই সুস্পষ্ট চিহ্নের পরেও তারা কেবল দাবি করেছিল যে সে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়েছে। এই সময়ে অধ্যায় 54 আল কামার, আয়াত 1-3, অবতীর্ণ হয়:

“কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে, আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর যদি তারা কোন নিদর্শন [অর্থাৎ, অলৌকিক] দেখে, তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "যাদু অতিক্রম করা।" আর তারা অস্বীকার করেছিল এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের জন্যই রয়েছে নিষ্পত্তির সময়।

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 77-78-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 3637 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসও এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

“যারা জানে না তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না বা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের কথার মতই বলেছিল। তাদের হৃদয় একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ..."

মহান আল্লাহ তখন বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তুলে ধরেন। যখন একজন ব্যক্তি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট ধারণা বা ধারণা গ্রহণ করবে না তখন তারা সর্বদা ধারণা বা ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য দুর্বল অজুহাত নিয়ে আসে। এটি সর্বদা তাদের মনোভাব ছিল যারা ইতিমধ্যে তাদের মন তৈরি করার পরে পরিস্থিতির কাছে যায়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং তার পরিবর্তে তাদের সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারণ না করেই খোলা মন নিয়ে প্রতিটি পার্থিব ও ধর্মীয় পরিস্থিতির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে । এই পদ্ধতিতে আচরণ তাদের ইচ্ছার পরিবর্তে স্পষ্ট প্রমাণ, যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সঠিক পছন্দ, একটি পছন্দ করার অনুমতি দেবে।

উপরন্তু, একটি সমাজের বিপথগামী নেতারা, যারা নতুন ধারণা এবং ধারণার আগমনে তাদের অবস্থান এবং প্রভাব হারানোর ভয় পায়, তারা সর্বদা নির্বোধ প্রশ্ন নিয়ে এসে অন্যদের নতুন ধারণা ও ধারণার সত্যতা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মক্কার অমুসলিমদের নেতারাও একই আচরণ করেছিল। তারা ভয় করত যে ইসলাম তাদের সম্মান ও সামাজিক প্রভাব কেড়ে নেবে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করবে এবং ফলস্বরূপ তারা মূর্খ কারণ নিয়ে এসেছিল কেন সাধারণ জনগণ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে। একজন মুসলিমকে এইভাবে অন্যদের বিপথগামী করা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ তারা তাদের অনুসারীদের মতো পাপ অর্জন করবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই

অন্যের পরামর্শ ও মতামতকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই প্রতিটি নতুন ধারণা বা ধারণাকে সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি এবং প্রমাণের সাথে মূল্যায়ন করতে হবে যাতে এটি গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করতে। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

“...এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের কথা মত বলেছিল। তাদের হৃদয় একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ..."

এই আয়াতটি লোকেদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মনোভাব ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে, এমনকি যারা তাদের সময়কালে বসবাস করে। অন্যের মনোভাব এবং পছন্দ এবং তাদের পছন্দের ফলে তারা যে পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করে একজন সহজেই জীবনের সঠিক পথটি শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি শিখতে একটি প্রতিভা লাগে না যে মনের শান্তি জাগতিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং খ্যাতির সাথে মিথ্যে নয়, কারণ যারা এই জিনিসগুলির অধিকারী তারা ক্রমাগত মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন উদ্বেগ, চাপ, হতাশা, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যদের পছন্দ এবং কাজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখতে হবে যাতে তারা জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক পথ চিনতে এবং অনুসরণ করতে পারে।

মহান আল্লাহ তারপর ব্যাখ্যা করেন যে যারা ইসলামের শিক্ষার কাছে যায় তারা একটি স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ মন অলৌকিক ঘটনাকে কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা হিসাবে দেখার প্রয়োজন ছাড়াই এর সত্যতা স্বীকার করবে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, শান্তি এবং তার উপর রহমত বর্ষিত হোক, যথেষ্ট প্রমাণ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

"...আমরা নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি এমন সম্প্রদায়কে যারা [বিশ্বাসে] বিশ্বাসী।"

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত ঘোষণার আগে মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে চল্লিশ বছর জীবন কাটিয়েছিলেন যাতে তারা ভালভাবে জানে যে তিনি মিথ্যাবাদী বা পাগল নন। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রকাশ্যে তাকে সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলত। যেহেতু তারা আরবি ভাষার প্রভু ছিলেন, তাই তারা সম্পূর্ণরূপে জানতেন যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয় অন্যথায় তারা মহান আল্লাহ তায়ালার চ্যালেঞ্জ পূরণ করতেন, যা পবিত্র কুরআনের সাথে সুন্দরভাবে মিলে যায়। , উপযোগিতা, এটির জ্ঞান, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, জাতিগততা এবং তারা যে সময়ে বাস করে তা নির্বিশেষে যে কেউ সহজেই অনুশীলন করার ক্ষমতা এবং প্রতিটি ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাজ কখনোই সম্মুখীন হতে পারে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 38:

"নাকি তারা বলে, "তিনি (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি উদ্ভাবন করেছেন?" বল, "তাহলে এর মত একটি সূরা বের কর এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে সম্ভব ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

তারা যে পারেনি বা অন্য কেউ পারবে না, তা পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিক উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 119:

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

"...আমরা নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি এমন সম্প্রদায়কে যারা [বিশ্বাসে] বিশ্বাসী।"

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টির মধ্যে যে নিদর্শন রয়েছে সেগুলোর উপর কেবল চিন্তা করেই ইসলামের সত্যতা স্বীকার করা যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 119:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যে ব্যক্তি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে খোলা মনে চিন্তা করে সে নিঃসন্দেহে এক আল্লাহ, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং বিচার দিবসের আগমনের সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। যদি একজন নির্মাতা ছাড়া একটি একক বিল্ডিং সঠিকভাবে তৈরি করা যায় না, তাহলে কীভাবে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত সিস্টেম তৈরি করা যাবে? যেমন সূর্য থেকে পৃথিবীর নিখুঁত দূরত্ব, মহাসাগরগুলির নিখুঁত ঘনত্ব, যা সমুদ্রের জীবনকে তাদের মধ্যে উন্নতি করতে দেয় যখন বিশাল জাহাজগুলি তাদের উপরে যাত্রা করে, পৃথিবীর নিখুঁত গঠন, যা দুর্বল গাছপালাকে বেড়ে উঠতে দেয়। এটি থেকে যখন বিশাল বিল্ডিং তৈরি করা যেতে পারে এবং জল চক্রের নিখুঁত ব্যবস্থা যা সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার জল সরবরাহ করে। এলোমেলো কিছু কখনও এত নিখুঁত সিস্টেমের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। যদি তারা একাধিক ঈশ্বর হয়, তাহলে প্রতিটি ঈশ্বর ভিন্ন কিছু কামনা করতেন, যা সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। যেহেতু এটি স্পষ্টতই নয়, এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে তারা কেবল এক ঈশ্বর, আল্লাহ, মহান হতে পারে। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে পাওয়া নিখুঁত ব্যবস্থা, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সবই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি তাদের থেকে উপকৃত হয়। সৃষ্টির মধ্যে এ পর্যন্ত যে প্রধান জিনিসটি ভারসাম্যহীন থেকে গেছে তা হল মানুষের কর্ম। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারী তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না। এটা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক যে, যিনি মহাবিশ্বের মধ্যে অগণিত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের কর্মকে ভারসাম্যহীন রেখে দেবেন। অতএব, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন মানবজাতির কর্মগুলি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, যথা, বিচারের দিন। উপরন্তু, সত্য হল বিচার দিবস ব্যতীত, এই পৃথিবীতে জীবন অর্থহীন কারণ এর সবকিছুই অসম্পূর্ণ এবং কেউ যা কিছু অর্জন করুক না কেন তারা শেষ পর্যন্ত

সময়ের সাথে সাথে বা মৃত্যুর মাধ্যমে এটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। বিচার দিবস এবং পরকাল ছাড়া এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব অর্থহীন এবং অর্থহীন হবে, কারণ একজনের উচ্চতর, নিখুঁত এবং স্থায়ী লক্ষ্য থাকবে না।

118 নং আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি উন্মুক্ত মন নিয়ে মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের কাছে যাবে সে ঈমানের নিশ্চয়তা লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 118:

"...আমরা নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি এমন সম্প্রদায়কে যারা [বিশ্বাসে] বিশ্বাসী।"

বিশ্বাসের নিশ্চিততা নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, সে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে সহজেই তাঁর অবাধ্য হবে, যখনই তার ইচ্ছা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 119:

"নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছি..."

যে ব্যক্তি সত্য, অর্থ, পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উপেক্ষা করে, সে অনিবার্যভাবে মিথ্যার সাথে রয়ে যাবে। মিথ্যা যেহেতু চঞ্চল এবং অসিদ্ধ, সেহেতু কেউ এর মাধ্যমে ইহকাল বা পরকালে মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 32:

"কারণ এটাই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সত্য। আর সত্যের বাইরে ভুল ছাড়া আর কি হতে পারে? তাহলে আপনি কিভাবে এড়িয়ে গেলেন?"

অতএব, যদি কেউ মনের শান্তি এবং সাফল্য কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই সত্যকে মেনে চলতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই নির্দেশনার এই দুটি উৎসকে মেনে চলতে হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্য সব উৎসকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলো ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর কাজ করবে, তত কম তারা মহান আল্লাহ প্রেরিত সত্যের উপর আমল করবে, যা ফলত বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করার একটি কারণ

এই যে , যে কোনো বিষয় যা নির্দেশনার দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 119:

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি সতর্কতা বা সুসংবাদ থেকে উপকৃত হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের উপর কাজ করে। একজন চালক যেমন রাস্তায় বিপদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করলে উপকৃত হবে না, তেমনি ইসলামি শিক্ষায় আলোচিত সতর্কবাণী ও সুসংবাদ উপেক্ষাকারী মুসলিমও লাভবান হবে না। তাই একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় বিশ্বে ইসলামিক শিক্ষা দ্বারা প্রদত্ত সতর্কতা এবং সুসংবাদ থেকে উপকৃত হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যদি তারা এই সতর্কবাণী এবং সুসংবাদগুলিকে উপেক্ষা করে তবে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে তারা তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অনুভব করবে এবং যে বিষয়ে তাদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা তারা হারিয়ে ফেলবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 119:

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি..."

এটিও ইঙ্গিত করে যে ইসলাম একটি ভারসাম্যের ধর্ম। এ ক্ষেত্রে উভয় জগতে শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। এই দুটি চরমের মধ্যে ভারসাম্য অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভয় মানুষকে পাপ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আশা মানুষকে ভাল কাজের দিকে চালিত করে। অথচ একের উপর অন্যকে অবলম্বন করা গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ভয়ের অধিকারী, সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিতে পারে, কারণ তারা পরিত্রাণের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছে। আর যে শুধু আশা পোষণ করে, সে ইচ্ছাপূরণের চিন্তা-ভাবনা অবলম্বন করতে পারে, যার ইসলামে কোনো মূল্য নেই। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকবে, এবং বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা করা হবে, কারণ মহান আল্লাহর রহমত অসীম। আশা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে, যার মধ্যে রয়েছে পাপ পরিহার করা এবং ভাল কাজ করার চেষ্টা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে আশা ও ইচ্ছাপূরণের এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার এবং মানবতাকে অনুকরণ করার জন্য নিখুঁত রোল মডেল দেওয়ার জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই যারা তাকে পাঠানো বার্তা উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছে তাদের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 119:

"... এবং জাহান্নামের সঙ্গীদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মীয় বা পার্থিব বিষয়ে তাদের উপর জোর করে সঠিক দিকনির্দেশনা চাপিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচরণ করা উচিত নয়।

পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে অন্যদের কাছে সত্য উপস্থাপন করতে হবে এবং অন্যদেরকে উদাহরণ দিয়ে পরিচালিত করার জন্য নিজেরাই এর উপর কাজ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে মানুষকে তাদের নিজের পছন্দের উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারা সঠিক বা ভুল পছন্দ করুক। .

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 120

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَئِنِ
ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনাকে অনুমোদন করবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েতই [একমাত্র] হেদায়েত। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না।"

এই আয়াতে মহান আল্লাহ একটি সার্বজনীন বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 120:

"এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনাকে অনুমোদন করবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন ..."

যখনই একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে ভিন্ন বৈধ পথ বেছে নেয়, তা পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়েই হোক না কেন, তারা সর্বদা অন্যদের দ্বারা, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা সমালোচিত হবে, যারা তাদের যাত্রায় তাদের প্রথম সমর্থন করবে। এই আয়াতের ব্যাপারে, কিতাবের আলেমদেরই প্রথম ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল যারা মুসলমানদের সমর্থন করতেন কারণ তারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, যেমন পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাকে, তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে.."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

লোকেরা তাদের সমালোচনা করে যারা তাদের পথ ছাড়া অন্য পথ নেয় কারণ এটি তাদের মনে করে যে তাদের নিজস্ব পথ খারাপ। কিন্তু এটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি ভুল অনুভূতি, কারণ ব্যক্তি শুধুমাত্র অন্য পথ বেছে নেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য একটি ভাল বিকল্প হবে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদি তাদের আত্মীয়রা তাদের মনোভাব ভাগ না করে তবে তারা তাদের পথে না থাকার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। এটি ছিল একটি কারণ যার কারণে প্রত্যেক নবী (সা.) তাদের সমাজের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল, কারণ তারা মানুষের কাছে একটি নতুন এবং উচ্চতর পথ প্রবর্তন করেছিলেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পছন্দের উপর অটল থাকতে হবে, যতক্ষণ না এটি একটি বৈধ হয় এবং অন্যের গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটি করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের অগঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা ইসলামী শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা থেকে কাউকে কখনই বিরত করা উচিত নয়, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আলোচ্য মূল আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 120:

" এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনাকে অনুমোদন করবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। বল, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েতই একমাত্র হেদায়েত।"..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য অন্য লোকেদের খুশি করা নয়। তাদের উদ্দেশ্য হল তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু মহান আল্লাহকে খুশি করা। তারা যদি মানুষকে খুশি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তবে তারা কখনই তা অর্জন করতে পারবে না কারণ তাদের চঞ্চল প্রকৃতির কারণে মানুষ খুশি করা অত্যন্ত কঠিন এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে, যার ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি শান্তি ও বরকত বর্ষণ করেন। তার উপর, মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য মঞ্জুর করা হবে, এমনকি যদি মানুষ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 120:

" এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনাকে অনুমোদন করবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। বল, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েতই একমাত্র হেদায়েত।"..."

মহান আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দেশিকা শুধুমাত্র তখনই উপকৃত হবে যখন তারা এটির উপর কাজ করে। কেবল একটি পথ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজনকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর কারণ হবে না। তাদের গন্তব্যে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই জ্ঞানের উপর কাজ করতে হবে। একইভাবে সঠিক দিকনির্দেশনা অর্জনের জন্য ইসলামী শিক্ষাগুলোকে শিখতে হবে এবং তার ওপর আমল করতে হবে। শুধু আমল ছাড়া ইসলামী জ্ঞান ধারণ করলে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যায় না এবং না বুঝে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। উপরন্তু, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, সঠিক পথনির্দেশ শুধুমাত্র হেদায়েতের দুটি উৎসের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তাই, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্য সব উৎসকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও তা ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু কেউ অন্য উৎসের ওপর যত বেশি আমল করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের ওপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে কোনো বিষয় যে দুটি হেদায়েতের উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 120:

" ... বলুন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েতই হল হেদায়েত।"..."

এটি এও ইঙ্গিত করে যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই সঠিক দিকনির্দেশনা, তা অসুবিধার সময় হোক বা স্বাচ্ছন্দ্য, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শিক্ষা ও আমল ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া একটি প্রধান কারণ যার মধ্যে অনেক মুসলিম, যারা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে, তারা এখনও তাদের বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, তারা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি সফলভাবে অতিক্রম করতে পারে না, যার ফলে মানসিক শান্তি নষ্ট হয়।

মহান আল্লাহ অতঃপর স্পষ্ট করে বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত ব্যতীত প্রতিটি পথই কেবল মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ প্রতিফলিত হয় যে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসের দাবিকারী লোকেরা তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে এবং কিছু জাগতিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদেরকে ধার্মিকতার পোশাকে পরিধান করে যা তারা কীভাবে আশীর্বাদ ব্যবহার করে তার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। তারা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম জুড়ে দেওয়া হয়েছে. এমনকি যারা একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করে না, তারা কেবল সেই জিনিসগুলিকে অনুসরণ করে যা তাদের ইচ্ছা পূরণ করে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 120:

"এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনাকে অনুমোদন করবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন... আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না।"

অতএব, এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব দুটি পথ নিয়ে গঠিত। উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের পথ, যার মধ্যে আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তাকে যেহেতু মহান আল্লাহ একাই সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মনের শান্তির আবাস, আধ্যাত্মিক হৃদয়, তাই তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

জীবনের অন্যান্য সমস্ত পথ শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। এটি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার কারণ হবে, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই সমস্যা এবং অসুবিধা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 120:

"...যদি তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 121

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এর যথার্থ তেলাওয়াত করে। তারাই [যারা] এতে বিশ্বাস করে। আর যারা এতে অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতেও উল্লেখ করা হয়েছে, এই আয়াতটিও তাদের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ, যথারীতি, স্পষ্ট করে দেন যে, আহলে কিতাবের সকল সদস্য , যাদের তিনি সমালোচনা করেছেন, তারা একই আচরণ করেননি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 121:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এর সঠিক আবৃত্তি করে..."

এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর সমালোচনা এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। এইভাবে আচরণ সহজেই বৈষম্যের দিকে নিয়ে যায়, যেমন বর্ণবাদ। পরিবর্তে, প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব কর্মের উপর ভিত্তি করে বিচার করতে হবে। একটি সম্পূর্ণ সংস্থা বা গোষ্ঠীকে কেবলমাত্র সমালোচনা করা যেতে পারে যদি স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে তারা সবাই একইভাবে আচরণ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 121:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এর যথার্থ তেলাওয়াত করে। তারাই [যারা] এতে বিশ্বাস করে..."

এই আয়াতটি কিতাব ও তাওরাত বা মুসলমানদের এবং পবিত্র কুরআনের কিছু সদস্যকে নির্দেশ করে না কেন, যেভাবেই হোক একটি ঐশী কিতাবকে সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা নিছক পাঠের বাইরে চলে যায়। আবৃত্তির আরবি শব্দের অর্থ আসলে অনুসরণ করা, অর্থ, কার্যত অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার অর্থ হল এর শিক্ষাগুলি বোঝা এবং তার উপর কাজ করা। না বুঝে বা কাজ না করে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন পড়ার বিষয়টি কেবল তাদের কাজের মাধ্যমে তারা যা তেলাওয়াত করছে তার বিরোধিতা করে। এটাকে মোটেও পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এই আয়াতের অর্থ হল তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে তাদের জীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে। অর্থ, তারা তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণের ন্যায্যতার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকে। দুঃখজনকভাবে, এর একটি রূপ এমন পণ্ডিতদের মধ্যেও ঘটতে পারে যাদের তাদের চিন্তাধারার প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং শিক্ষকরা তাদের নিরপেক্ষ ও খোলা মনের সাথে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাদের চিন্তাধারার সাথে মানানসই করার জন্য পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে উত্সাহিত করে। একজন মুসলমানের জন্য তাদের শিক্ষক ও সমবয়সীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ তবে তাদের আনুগত্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি হতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করবে, ঠিক যেমন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

যারা পবিত্র কুরআনকে বোঝা ও আমল করা এড়িয়ে যায় বা যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে তাই এটাকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে না। যেন তারা পবিত্র কুরআনকে তাদের জিহ্বা দ্বারা বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের কর্মের মাধ্যমে নয়। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরোধিতা করবে যখন তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 121:

"... আর যারা এতে অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ করতে হবে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী আমল করতে হবে, যাতে উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করা যায়, যদিও এর শিক্ষা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাদের অবশ্যই এটি গ্রহণ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শে গ্রহণ করে এবং কাজ করে যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 122-123

يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোনো প্রাণই অন্য কোনো প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না এবং তার কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।"

মহান আল্লাহ, অতঃপর কিতাবধারীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান, তিনি তাদের প্রতি যে অগণিত অনুগ্রহ দান করেছেন, যেমন তাওরাত, বাইবেল এবং অনেক পবিত্র নবী, শান্তি তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 122:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর পরিবর্তে, এই ক্ষেত্রে ইসলামকে গ্রহণ করা হত কারণ তারা পবিত্র কুরআন হিসাবে এর সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল। , তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এখনও ইসলাম প্রত্যাখ্যান. অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তারা জানত যে ইসলাম তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে এবং এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, বইয়ের অধিকাংশ লোক ইসলামের সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণকেও মেনে নিতে পারেনি, যিনি তাদের বংশের নয়, বনী ইসরাঈল। যেহেতু তারা দাবি করেছিল যে মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র তাদের বংশের উপর ভিত্তি করে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের স্পষ্ট বিরোধী হবে। এর সাথে তারা বাঁচতে পারেনি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 122:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়ে কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। কৃতজ্ঞতা মানে একজনের সমস্ত কাজের মধ্যে একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এর একটি লক্ষণ এই

যে, তারা জনগণের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা প্রতিদান আশা করে না বা আশাও করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। একজনের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতা হল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 122:

"হে বনী ইসরাঈল, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ, ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে বাকি মানবজাতির উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলিকে তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং বাকি মানবজাতির জন্য নিখুঁত রোল মডেল হিসাবে আচরণ করা। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের কাছ থেকে তাদের ভূমিকা নিয়ে মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

কিন্তু এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানরা তখনই মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে, যখন তারা ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখবে এবং তার ওপর কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অনুকরণ করার জন্য বাকি মানবতার জন্য নিখুঁত রোল মডেল হিসাবে আচরণ করবে। পরবর্তী আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, বিচার দিবসে এই দায়িত্বে ব্যর্থতার পরিণতির সম্মুখীন হওয়া থেকে কোনো মুসলমান রেহাই পাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 123:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য আত্মার জন্য যথেষ্ট হবে না..."

একজন রাজা যেমন তাদের রাজ্যের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের রাষ্ট্রদূতকে বরখাস্ত করবেন, তেমনি প্রতিটি মুসলমান যদি মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তবে তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে।

মহান আল্লাহ অতঃপর কিতাবধারীদেরকে এবং মুসলমানদেরকে সম্প্রসারিত করে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিচার দিবসের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না যদি তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 123:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, এবং তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, এর ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাকে দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যদি সে তাওবা করতে ব্যর্থ হয়। . তাদেরকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, যেমন তাদের সম্পদ এবং পরিবার, তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশার উৎস হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি একটি মানসিক সমস্যা থেকে পরবর্তীতে চলে যাবে এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। তারা বিনোদন এবং মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করতে পারে তবে তারা দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং সামগ্রিকভাবে তারা চাপে পূর্ণ জীবনযাপন করবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কিন্তু যেহেতু এই পার্থিব শাস্তি প্রায়শই সূক্ষ্ম, মানুষ তাদের কষ্টের উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর অবাধ্যতাকে চিনতে ব্যর্থ হয়। অথচ শেষ বিচারের দিন তাদের শাস্তির কারণ তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 123:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, এবং তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

কিতাবের লোকেরা, সেইসাথে আজ অনেক মুসলমান বিচার দিবসের বিষয়ে একটি বিকৃত বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্বাস করে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, তারা কোন না কোনভাবে তাদের অবিরাম অবাধ্যতার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি

করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এরূপ বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে তিনি বিচারের দিনে মানুষের সাথে সমান আচরণ করবেন না। এই মূর্খ বিশ্বাস মহান আল্লাহর ন্যায় ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

বিচার দিবস সম্পর্কে তাদের বিকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে এই বিশ্বাস করা যে তারা শাস্তি থেকে বাঁচতে তাদের বিভ্রান্তির জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এমনকি শয়তানকে দোষারোপ করাও গৃহীত হবে না, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের পছন্দ ও কর্মের জন্য দায়ী এবং তাই তাদের পরিণতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 123:

" এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোনো আত্মা অন্য আত্মার জন্য যথেষ্ট হবে না..."

বিচার দিবসের আরেকটি বিকৃত বিশ্বাস হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অবাধ্যতার জন্য কোনো না কোনোভাবে প্রতিশোধ নেবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে দাবি করে যে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যা মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন না , কারণ তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করতে হবে এই পৃথিবীতে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

" সুতরাং সেদিন তাদের অজুহাত অন্যায়কারীদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 123:

" এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য আত্মার জন্য যথেষ্ট হবে না এবং তার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না..."

বিচার দিবসের আরেকটি বিকৃত বিশ্বাস হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য কেউ সুপারিশের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করবে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, কোনটিই কম নয়, এমনকি তাঁর কিছু সুপারিশের মাধ্যমেও মুসলিমরা এখনও জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামের একটি মুহূর্ত সত্যিই অসহনীয়। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং বিচার দিবসে সুপারিশের আশা করে, তার ভয় করা উচিত যে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তাদের ঈমান হারাবে। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন জলের মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও ভাল হতে পারে যদি তারা আনুগত্যের কাজ দিয়ে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 123:

"...না কোন সুপারিশ এর উপকারে আসবে, না তাদের সাহায্য করা হবে।"

কিয়ামত ও জাহান্নামের ভয়াবহতা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হওয়ার একটি বড় কারণ হল,

তাদের ব্যাপারে মানুষ যে বিকৃত আকীদা গ্রহণ করেছে তা দূর করা। বিচার দিবসের ব্যাপারে যখন কেউ বিকৃত বিশ্বাসের অধিকারী হয় তখন তা কেবলমাত্র সেই ইচ্ছাপূরণের চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে যা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকার সাথে জড়িত। যেখানে বিচার দিবসের প্রকৃত প্রকৃতি বোঝা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে উৎসাহিত করবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 123:

"এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন আত্মা অন্য কোন প্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে না, এবং তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 124

۞ وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا
يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤

“এবং যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা শব্দ [আদেশ] দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা পূরণ করেছিলেন। [আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।" [ইবরাহীম] বললেন, "আর আমার বংশধরদের?" [আল্লাহ] বললেন, আমার অঙ্গীকার যালিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পবিত্র কুরআনে পবিত্র নবী ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রায়শই উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তিনি মক্কার মূর্তিপূজারী এবং কিতাবের লোক উভয়ের পূর্বপুরুষ, যারা মূলত মদিনায় বসবাস করছিলেন। মহান আল্লাহ বারংবার তুলে ধরেছেন যে কিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলেন, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। ঐশ্বরিক শিক্ষায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

" *এবং যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা শব্দ [আদেশ] দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা পূরণ করেছিলেন ...*"

এটি মক্কার মূর্তিপূজারী এবং কিতাবের লোকদের সরাসরি সমালোচনা, যারা এই সত্য নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত যে তারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর, যদিও তারা তাঁর মতো আচরণ করেনি এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল। প্রকৃতপক্ষে, উভয় দলই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখার দাবিও করেছিল, যদিও তারা উভয়েই স্পষ্টভাবে অসম্মান করছিল। তাদের অবাধ্যতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও অস্বীকার করেছিল। মক্কার মূর্তিপূজারীরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 40 বছর অতিবাহিত করেছিল, তিনি নবুওয়াত ঘোষণা করার আগে এবং তাই তিনি জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। আর তারা যেহেতু আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল তাই তারা জানত পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয়। কিতাবধারী আলেমগণ পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কারণ তারা এর রচয়িতা, মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং তারা ইসলামের সত্যতাকে পবিত্র কুরআন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা. তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মুসলমানদের এই দুই দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী হওয়ার জন্য গর্ব করার দাবি করে, যদিও বাস্তবিকভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই সকল নবী (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

" *এবং যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা শব্দ [আদেশ] দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা পূরণ করেছিলেন ..."*

উপরন্তু, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষা ও পরীক্ষার স্থান, সেহেতু কেউই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পালায় না, এমনকি নবী (সা.)ও নয়। এই সত্যটি মনে রাখা একজনকে পরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে থাকতে সাহায্য করবে। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। কেউ ধৈর্য ধরে থাকতে পারে যখন তারা বুঝতে পারে, জ্ঞান এবং নিশ্চিততার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে চিনতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন একজন ব্যক্তি তাদের ধৈর্যের সাথে বিশ্বাসের নিশ্চিততা যোগ করে, তখন তাকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেওয়া হবে, যেমনটি হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মঞ্জুর করেছিলেন। অধ্যায় 32 সাজদাহ, আয়াত 24:

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে আমাদের নির্দেশে পথপ্রদর্শনকারী নেতা তৈরি করেছিলাম, যখন তারা ধৈর্যশীল ছিল এবং [যখন] তারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 124:

"আর যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা পূরণ করেছিলেন। [আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।"

বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জিত হয় যখন কেউ ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখে এবং তার উপর কাজ করে। এটি অন্যদের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। বিশ্বাসের যত বেশি দৃঢ়তা থাকবে, তারা সহজে এবং অসুবিধা উভয় সময়েই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে তত বেশি মেনে চলবে। এই আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত যে আশীর্বাদগুলি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ অতঃপর মহানবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর বংশধরদের জন্য যে মহান আন্তরিকতার অধিকারী ছিলেন তা উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং অন্যদেরকে আল্লাহর

প্রতিনিধি হয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করে। পৃথিবীতে অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

" আর যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা পূরণ করেছিলেন। [আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।" [ইব্রাহিম] বললেন, "এবং আমার বংশধরদের?"...

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যদের জন্য এই ধরনের আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং প্রথমত ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে যাতে তারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) করেছিলেন, এবং তারপর পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং আমল করার গুরুত্ব শেখান যাতে তারাও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করে। উচুঁ, পৃথিবীতে। শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমে একজন মহান আল্লাহর প্রতি এবং তরুণ প্রজন্মের মতো অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় এবং তার অবাধ্যতার পরিবর্তে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে মানসিক শান্তি ও সফলতা পাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

" ... *[আল্লাহ] বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।" [ইবরাহীম] বললেন, "আর আমার বংশধরদের?" [আল্লাহ] বলেছেন, "আমার অঙ্গীকার যালিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"*

এবং c hapter 20 Taha, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

"... [আল্লাহ] বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।" [ইবরাহীম] বললেন, "আর আমার বংশধরদের?" [আল্লাহ] বলেছেন, "আমার অঙ্গীকার যালিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

মহান আল্লাহ তায়ালা মক্কার মূর্তিপূজক এবং কিতাবের লোকদেরকেও সতর্ক করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উভয় জগতেই সাফল্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ উভয় দলই দাবি করেছিল যে তারা যেমন ছিল। তার বংশধররা তাদের কর্ম নির্বিশেষে উভয় জগতেই সফলতা লাভ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বংশ কারো উপকারে আসবে না যতক্ষণ না তারা কার্যত মহান আল্লাহকে মান্য করবে, যেমনটি তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ করেছিলেন। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তির বংশ পরকালে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে না যদি তার মধ্যে ভালো কাজের অভাব থাকে। জামি আত তিরমিযী, 2945 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। উপরন্তু, বিশ্বাস করা যে কারো বংশ তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে, মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, কারণ এটি তাঁর ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 125

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ
وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥

“আর [উল্লেখ করুন] যখন আমরা ঘর [কাবা] কে মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং [নিরাপত্তার স্থান] করেছিলাম। এবং [হে ঈমানদারগণ] ইব্রাহীমের দাঁড়ানো স্থান থেকে নামাজের স্থান গ্রহণ কর। আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, "আমার ঘরকে পবিত্র কর তাদের জন্য যারা প্রদক্ষিণ করে এবং যারা ইবাদতের জন্য [সেখানে] অবস্থান করে এবং যারা রুকু ও সেজদা করে।"

মহান আল্লাহ, তারপর মক্কার অমুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা তাঁর ঘর কাবার কারণে আরব উপদ্বীপে আভিজাত্য, মর্যাদা, বিধান এবং নিরাপত্তা দিয়ে ধন্য হয়েছে। শুধুমাত্র এই অনুগ্রহই তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল। যার সত্যতা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, যেহেতু তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে 40 বছর অতিবাহিত করেছিল এবং তাই জানত যে তিনি কোন মিথ্যাবাদী নন এবং সত্য যে তারা আরবি ভাষা এবং ওস্তাদ ছিলেন। তাই জানতাম পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার বাণী নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

" *আর [উল্লেখ করুন] যখন আমরা ঘর [কাবা]কে মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং [নিরাপত্তার] স্থান করেছিলাম..."*

প্রত্যাবর্তনের স্থানটি পবিত্র তীর্থযাত্রাকে নির্দেশ করে যা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে অব্যাহত ছিল, যদিও এর সঠিক অনুশীলনগুলি বিপথগামী লোকেরা পরিবর্তন করেছিল। উপরন্তু, মুসলমানরা যেভাবে তাদের নামাজের সময় কাবার দিকে মুখ করে থাকে, তাদেরও অবশ্যই তাদের বিচার এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রতিটি পরিস্থিতিতে কাবার মালিক, মহান আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অর্থ, তাদের অবশ্যই প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিটি দোয়া ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যাবর্তনের স্থানও মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। মুসলিম জাতির মধ্যে জাতীয়তা, ভাষা এবং জাতিগত মতভেদ যাই থাকুক না কেন, তাদের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা অবশ্যই একটি অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে, মহান আল্লাহর আনুগত্য, যা তাঁর ঘর, কাবা এবং প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রার্থনার দিক। প্রত্যাবর্তনের স্থান এও ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলমান পার্থিব ব্যস্ততায় যতই বিভ্রান্ত হোক না কেন, তাদের সারাদিন সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে,

যেভাবে তারা তাদের দেহকে আল্লাহর ঘরের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। নামাযের সময় কাবা পবিত্র। প্রত্যাবর্তনের একটি স্থান মুসলমানদেরকেও স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন হবে মহান আল্লাহর কাছে, ঠিক যেমন তারা তাঁর সামনে দাঁড়ায় যখনই তারা তাঁর ঘর কাবার দিকে তাদের প্রার্থনা করে। যে ব্যক্তি সর্বদা এটি মনে রাখে সে কার্যত মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হবে, যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

" *আর [উল্লেখ করুন] যখন আমরা ঘর [কাবা]কে মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং [নিরাপত্তার] স্থান করেছিলাম..."*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মক্কাকে এর জনগণের জন্য নিরাপদ স্থান বানিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 126:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন..."

কারণে, শহর এবং এর বাসিন্দারা এর বাইরে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নিয়মিত সহিংসতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। বাসিন্দারা এতটাই নিরাপদ ছিল যে মক্কা থেকে যাত্রা করা তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলিকে চোরদের দ্বারা আক্রমণ ও লুটপাট করা হবে না কারণ তারা আল্লাহর ঘর, কাবার রক্ষক হিসাবে বিবেচিত হত। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 67:

"তারা কি দেখেনি যে, আমরা [মক্কাকে] নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছি, অথচ তাদের চারপাশ থেকে লোকেদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তাহলে কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে?

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ এবং মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা করার ফলে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সরাসরি চ্যালেঞ্জ হয়ে যেত এবং আরব উপদ্বীপে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়ে ফেলত, মক্কার অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা সহিংসভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছিল।

যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার সারা জীবন এবং বিশেষ করে যখন তিনি আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা, আল্লাহ, মহিমান্বিত, আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রচেষ্টার স্মৃতি রেখেছিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

"...এবং, [হে ঈমানদারগণ], ইব্রাহিমের দাঁড়ানো স্থান থেকে প্রার্থনার স্থান গ্রহণ কর..."

মহানবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলেন আল্লাহর ঘর, কাবা, তা শেষ সময় পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্য প্রার্থনার স্থান। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের ভাল উদ্দেশ্য এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা শুধুমাত্র উভয় জগতেই তাদের উপকারে আসবে না বরং তাদের প্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, কোনো না কোনো আকারে বা ফ্যাশনে। অথচ, বস্তুজগতের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির প্রতি ব্যক্তির প্রচেষ্টা সময়ের সাথে সাথে তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে বিলীন হয়ে যাবে। এটি একটি অনিবার্য ভাগ্য যা কেউ অস্বীকার করে না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমাদের যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। আর যারা ধৈর্য্য ধারণ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের পুরষ্কার দেবো যা তারা করত তার সর্বোত্তম অনুরূপ।"

অতএব, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে একজনকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে, যদিও এটি তাদের ইচ্ছা বা মানুষ, সমাজ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতামতের বিরোধিতা করে, কারণ এর সুফল উভয় জগতেই স্থায়ী হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে এই আয়াতটি পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের আন্তরিক কর্মের আশীর্বাদ উভয় জগতে স্থায়ী হবে এবং এর ইতিবাচক প্রভাব অন্যদের জন্য

উপকৃত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে রয়ে যাবে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা পৃথিবীতে রয়ে গেছে, হাজার হাজার মানুষ। তার মৃত্যুর বছর পরে।

মহান আল্লাহ তারপর শুধু মসজিদ নির্মাণের গুরুত্বই নয় বরং তাদের উদ্দেশ্য পূরণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন, যা মুসলমানদেরকে তাদের মধ্যে এবং ইসলামী জ্ঞানের প্রসারের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার অনুমতি দেয়। মক্কার অমুসলিমরা এই উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছিল যদিও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘর, মহান, কাবার রক্ষক এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিল। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

"...এবং আমরা ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, [বলেছি], "আমার ঘরকে পবিত্র কর তাদের জন্য যারা তা প্রদক্ষিণ করে এবং যারা উপাসনার জন্য [সেখানে] অবস্থান করে এবং যারা রুকু ও সেজদা করে।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর মসজিদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়ে মক্কার অমুসলিমদের নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। সমস্ত মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মসজিদগুলি শারীরিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে পরিষ্কার রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত হতে হবে। তাদের অবসরে কথোপকথনের জন্য সামাজিক ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদেরকে অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য নিরাপদ ও নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা আদর্শ মুসলিম হয়ে উঠতে পারে। পবিত্র কুরআন থেকে সরাসরি প্রাপ্ত সঠিক ইসলামী জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অবশ্যই তাদের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও তা ভাল

কাজের দিকে পরিচালিত করে। সরল সত্য হল যে, অন্য উৎস থেকে নেওয়া ধর্মীয় জ্ঞানের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলমূল দিয়ে রিজিক করুন - তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে।" [আল্লাহ] বলেন, "আর যে কুফরী করবে, আমি তাকে অল্পের জন্য ভোগবিলাস দেব, তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করব, আর তার গন্তব্য খুবই খারাপ।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তারা কেবলমাত্র তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার কারণে আরব উপদ্বীপে নিরাপত্তা, বিধান এবং সম্মান লাভ করেছে, এবং তারা নিজেরাই ন্যায়পরায়ণতার কারণে নয়। নির্দেশিত অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 126:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলমূল দিয়ে দিন..."

সেই সময়, মক্কার আশেপাশের উপজাতিরা ক্রমাগত একে অপরকে আক্রমণ করত এবং তাদের ভূমির নিকট দিয়ে যাওয়া বাণিজ্য কাফেলা লুট করত কিন্তু মহান আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, যা ছিল মহানবী ইব্রাহিমের শান্তি প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ। তারা মক্কার অমুসলিমদের কোনো ক্ষতি করবে না। অধ্যায় 106 কুরাইশ, আয়াত 1-4:

“কুরায়শদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। শীত ও গ্রীষ্মের কাফেলায় তাদের অভ্যস্ত নিরাপত্তা। তারা যেন এই ঘরের পালনকর্তার ইবাদত করে। যিনি তাদের আহার করেছেন, [তাদেরকে] ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন এবং ভয় থেকে [তাদেরকে] নিরাপদ করেছেন।”

শুধুমাত্র এই পয়েন্টটিই মক্কার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল, বিশেষ করে যখন তারা স্পষ্টভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। নবুওয়াত

ঘোষণার পূর্বে তারা 40 বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কাটিয়েছিলেন এবং তাই তারা জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার মাস্টার ছিলেন, তারা জানত যে পবিত্র কোরআন শরীফের শব্দ নয়। একটি সৃষ্ট সত্তা। এত কিছুর পরেও, মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ তারা জানত যে এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

মহান আল্লাহ তখন মক্কার অমুসলিমদের বিভ্রান্তিকর মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেন যারা দাবি করেছিল যে তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী, যদিও তিনি তাদের মনোভাব ও জীবনযাপন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 126:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিল, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-ফলাদি প্রদান করুন - তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে।"

তিনি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকতার সাথে এইভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ বা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না সে কেবল অন্যদেরকে বিপথগামী করবে এবং পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেবে। এটি একটি স্পষ্ট সত্য যা অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বা তাদের মৌখিক বিশ্বাসের দাবিকে কাজ দিয়ে সমর্থন করে না এবং যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না বা এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, সে অনিবার্যভাবে তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। মঞ্জুর করা হয়েছে। এই মনোভাব

অন্যদের বিপথগামী হওয়ার কারণ হবে, যেমন লোকেরা অন্ধভাবে সেলিব্রিটিদের অনুকরণ করে। যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন তাদের শারীরিক বা রাজনৈতিক শক্তি, সে অনিবার্য অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে। এবং যে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতাকে বিশ্বাস করে না বা ভয় পায় না সে সহজেই অন্যদের উপর অন্যায় করবে, বিশেষ করে যখন তারা বিশ্বাস করে যে কেউ তাদের জবাবদিহি করবে না, যেমন পুলিশ। অথচ, যে ব্যক্তি কার্যত আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করে, সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করবে, তারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির অধিকার পূরণ করবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ তারা এর পরিণতিকে ভয় পায়, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা পার্থিব কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে। যেমন পুলিশ। এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাব সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেবে। ইসলামিক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এটি ঘটেছিল তা লক্ষ্য করার জন্য শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যখন জনগণ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেছিল, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই ভয়ই মূল আয়াতের বাকি অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 126:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিল, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-ফলাদি প্রদান করুন - তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে।" [আল্লাহ] বলেন, "আর যে অবিশ্বাস করে, আমি তাকে অল্পের জন্য ভোগবিলাস দেব, তারপর আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করব, এবং তার গন্তব্য খুবই খারাপ।"

এছাড়াও, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'আটি মুসলমানদেরকে অন্য সকলের উপরে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও আনুগত্য রাখার গুরুত্বও শেখায়, কারণ তাঁর প্রার্থনায় তাঁর নিজের বংশধরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পূর্বের একটি আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 124:

"... [আল্লাহ] বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জনগণের নেতা করব।" [ইবরাহীম] বললেন, "আর আমার বংশধরদের?" [আল্লাহ] বলেছেন, "আমার অঙ্গীকার যালিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে একজনের আনুগত্য অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি হতে হবে। মানুষের আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া অন্য লোকেদের সন্তুষ্ট ও সমর্থন করার জন্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কারণ হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অনৈক্যের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অনুগত থাকা অনিবার্যভাবে অন্য ব্যক্তিকে বিরক্ত করবে। অন্যদিকে, মুসলিমরা যদি সর্বোত্তম আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে একত্রিত হবে, কারণ তারা একটি সাধারণ লক্ষ্য ভাগ করে নেয়, যা হল মহান আল্লাহর আনুগত্য। সময়ের সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই বিষয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 126:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিল, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-ফলাদি প্রদান করুন - তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে।" [আল্লাহ] বলেন, "আর যে অবিশ্বাস করে, আমি তাকে অল্পের জন্য ভোগবিলাস দেব, তারপর আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করব, এবং তার গন্তব্য খুবই খারাপ।"

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর সঠিক পথনির্দেশ বাধ্যতামূলক করেন না, কারণ এটি এই দুনিয়ার উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করবে। এই পৃথিবী হল পরীক্ষার আবাস এবং তাই প্রত্যেককে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে, বা না। . তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে, এমনকি যদি ইসলাম তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সেভাবে কাজ করতে হবে যেভাবে একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শে গ্রহণ করে এবং কাজ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনেও, তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, একজন ব্যক্তিকে কখনই এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা জাগতিক জিনিসগুলির কারণে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে, কারণ আল্লাহ, মহান, তার সমস্ত সৃষ্টির জন্য, তাদের বিশ্বাস বা কর্ম নির্বিশেষে প্রদান করেন। সঠিক দিকনির্দেশনা কেবলমাত্র তার উপর ভিত্তি করে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে কিনা। উপরন্তু, প্রধান আয়াতে নির্দেশিত হিসাবে, মহান আল্লাহ, মানুষকে তাদের অবাধ্যতার জন্য অবিলম্বে শাস্তি দেন না। পরিবর্তে তিনি মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলিকে স্বীকৃতি, গ্রহণ এবং আমল করার অগণিত সুযোগ দেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অগণিত সুযোগের দ্বারা প্রতারিত না হয়, কারণ এই সুযোগগুলি শেষ পর্যন্ত একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি তাদের ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের কাছে এমন কোন অজুহাত থাকবে না যা তাকে উভয় জগতের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

একজন ব্যক্তি যে পথ বেছে নিন না কেন, তারা নিঃসন্দেহে উভয় জগতেই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হবে। এই পৃথিবীতে, পরিণতিগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হয় যার ফলে একজনকে দেওয়া জাগতিক জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপ, অসুবিধা এবং দুঃখের উৎস হয়ে ওঠে, যেমন তাদের সম্পদ, পরিবার এবং কর্মজীবন। অথচ আখেরাতের পরিণতি তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তাদের আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্ত থাকলেও, তারা উভয় জগতে তাদের দুর্দশার ভাগ্য থেকে রেহাই পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস। এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন তারা যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যেমন এই বিশ্বের সেলিব্রিটিদেরকে লক্ষ্য করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 126:

"... *ইব্রাহীম বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, এটিকে একটি নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-ফলাদি প্রদান করুন - তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে।" [আল্লাহ] বলেন, "আর যে কুফরী করবে, আমি তাকে অল্পের জন্য ভোগবিলাস দেব, তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করব, আর তার গন্তব্য খুবই খারাপ।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই মক্কার অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিলেন, যদিও তাদের কাজগুলি তাঁর পথের বিরোধিতা করেছিল। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ভয় করতে হবে যে, তারা যদি পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে কার্যত আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যেটি ইসলামের পথ, তারা এই আয়াতে উল্লিখিতদের ভাগ্য ভাগ করে নিতে পারে। এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি গাছের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন জলের মতো পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও মরতে পারে যদি তারা আনুগত্যের কাজ দিয়ে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 127-129

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٩

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

হে আমাদের রব, এবং আমাদেরকে আপনার [আনুগত্য করে] মুসলিম করুন এবং আমাদের বংশধরদের থেকে আপনার [আনুগত্যশীল] একটি মুসলিম জাতি করুন। এবং আমাদের [ইবাদতের] আচার-অনুষ্ঠান দেখাও এবং [রহমতের সাথে] আমাদের দিকে ফিরে আস। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

হে আমাদের পালনকর্তা, তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মহান আল্লাহ মক্কার অমুসলিমদের এবং তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পবিত্র ও আন্তরিক নিয়তের গ্রন্থ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যখন তারা নির্মাণ করছিলেন। আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা, মক্কায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

" *এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন..."*

মহান আল্লাহর ঘর, কাবা নির্মাণে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে এটি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করা ছিল মক্কার অমুসলিমদের সরাসরি সমালোচনা, যারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিল, যদিও তারা তাঁর শিক্ষা ও পথের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য পরিত্যাগ করেছিল এবং তার পরিবর্তে তাঁর সাথে শিরক করেছে যাতে তারা নিজেদের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী একটি জীবনধারা তৈরি করতে পারে। মুসলমানদের অবশ্যই মক্কার অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্তরাধিকার বহন করতে হবে, সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাদের নিয়ামত ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে। মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করা, যদিও তাঁর উত্তরাধিকারকে ব্যবহারিকভাবে সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হওয়া কোনো মুসলমানের জন্য

এই দুনিয়া বা পরকালের কোনো উপকারে আসবে না, ঠিক যেমন মক্কার অমুসলিমরা কোনো সুবিধা পায়নি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী হওয়ার তাদের মৌখিক দাবির জন্য , যদিও তারা কার্যত তাঁকে অনুসরণ করেনি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

" *এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মহান আল্লাহকে খুশি করে এমন বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন মুসলমানের উচিত নয় কে কিছু করছে তা পর্যবেক্ষণ করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে যে তাদের সমর্থন করবে কি না। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে কেউ কী করছে এবং যদি এটি ভাল হয়, তবে তাদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা উচিত। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এই মনোভাব নিশ্চিত করবে যে কেউ খারাপ জিনিসগুলিতে অন্ধ আনুগত্য থেকে অন্যদের সাহায্য করবে না। তারা বরং মানুষের প্রতি তাদের আনুগত্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

" *এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন..."*

এই আয়াতটি মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্বের সাথে যুক্ত বিষয়গুলি যেমন একটি সম্পত্তি সাম্রাজ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে খুশি করে এমন জিনিসগুলিতে তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার গুরুত্ব। সত্য হল যে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের ভাল কাজগুলিকে তাদের কবরে নিয়ে যাবে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস যেমন একটি সম্পত্তি সাম্রাজ্য, অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হবে, তবে মৃত ব্যক্তি তা অর্জনের জন্য দায়ী থাকবে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে ভাল কাজগুলিকে এগিয়ে পাঠাতে হবে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রেওয়ায়েতগুলি এবং পিছনে রেখে গেছে। একটি আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার যা তাদের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে, যার অর্থ একটি চলমান দাতব্য, যেমন একটি মসজিদ

নির্মাণ। যে ব্যক্তি এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত থাকবে সে উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

" এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন..."

এই আয়াতটিও ভালো নিয়তের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না, কারণ তিনি কেবলমাত্র তাদেরই পুরস্কৃত করেন যারা শুধুমাত্র তাঁর জন্য কাজ করে। আনন্দ জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ মানুষের গোপন অভিপ্রায় জানেন এবং তাদের কথা ও কাজ জানেন ও শোনেন। অতএব, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের উদ্দেশ্য সর্বদা সঠিক এবং ভাল বক্তৃতা দিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে, যাতে তারা ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে এবং ভাল কাজের সাথে তাদের উদ্দেশ্য অনুসরণ করে। অর্থ, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

যদি কেউ ভাল উদ্দেশ্যের অধিকারী হতে ব্যর্থ হয় এবং ভাল কথাবার্তা ও কর্মের সাথে তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা দুনিয়া বা পরকাল উভয়েই তাদের প্রচেষ্টা থেকে ভাল কিছুই পাবে না। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে [তাদের] কৃতকর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

মহান আল্লাহ তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উনাদের সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার আগ্রহকে তুলে ধরেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"আমাদের পালনকর্তা, এবং আমাদেরকে আপনার [আনুগত্য করে] মুসলিম করুন..."

এই আত্মসমর্পণের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সমর্থন করা জড়িত। অর্থ, তাদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ বাহ্যিক কর্ম ছাড়া আধ্যাত্মিক অন্তরে বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। এই বাহ্যিক প্রকাশের সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা একজন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট করে যে, ইসলাম পালন না করে এমন মুসলিম হওয়ার মতো কোনো বিষয় নেই, যেহেতু মুসলিম শব্দের অর্থ হল কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। উপরন্তু, এটি নির্দেশ করে যে একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেমন তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের আকাঙ্ক্ষা এবং ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মিডিয়া অনুসরণ করা। যদি কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের উপর এসব বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, তবে তারা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মহান আল্লাহর কাছে নয়। তাই একজনকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে না, কারণ নিজের জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ দাবি করা এবং নিজের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ইসলামে কোন মূল্য নেই।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"আমাদের পালনকর্তা, এবং আমাদেরকে আপনার [আনুগত্য করে] মুসলিম করুন..."

মহানবী ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তারা এই দোয়া করার সময় আগেই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং এটি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে। কাজেই সফলতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র ইসলামে বিশ্বাসের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। একজনকে সর্বদা সর্বাবস্থায়, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য মেনে চলার মাধ্যমে তাদের ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং যখনই তারা পাপ করে, তখনই ভবিষ্যতে আবার পাপের পুনরাবৃত্তি এড়াতে তাদের আচরণ সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এটি অনেক ইসলামী শিক্ষায় নির্দেশিত হয়েছে, যেমন জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া হাদিস। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 6:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

মহান আল্লাহ, তারপর তাঁর আনুগত্যের দিকে একজনের বংশধরদেরকে নির্দেশিত করার গুরুত্বও তুলে ধরেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"...এবং আমাদের বংশধর থেকে একটি মুসলিম জাতি আপনার কাছে [আনুগত্য করে]..."

এটা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা তাদের সন্তানদেরকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার গুরুত্ব শিখিয়েছেন। অর্থ, তারা স্বয়ং খোদায়ী শিক্ষাগুলি শিখে এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে এবং তারপর তাদের সন্তানদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 132-133:

"এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" অথবা তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা বলল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর। এবং আমরা তাঁরই [আনুগত] মুসলিম।"

পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য শেখাতে ব্যর্থ হয়। তার উপর হতে

128 নং আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা নির্দেশিত, উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মকে মহান আল্লাহকে মান্য করার গুরুত্ব শেখানো জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"...এবং আমাদের [পূজার] আচার দেখাও..."

সুতরাং এটি ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে গৃহীত ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে কেউ আল্লাহকে মান্য করতে পারে না বা অন্যকে কীভাবে তাঁর আনুগত্য করতে হয় তা শেখাতে পারে না। তার উপর অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"...শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

তাই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞতা কেবল একজনকে খারাপ উদ্দেশ্য, খারাপ কথাবার্তা এবং খারাপ কাজ অবলম্বন করে এবং তাই সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"...এবং আমাদের [জীবনের] আচার দেখাও..."

এই শ্লোকটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য যে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে তারও উল্লেখ হতে পারে। এটি ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা এই যুগে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত উত্স এড়িয়ে চলা, এমনকি যদি তারা ভাল দিকে নিয়ে যায়। কাজ আসল বিষয়টি এই যে, কেউ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ। উপরন্তু, মহান আল্লাহ, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি একাই সর্বোত্তম আচরণবিধি জানেন যা তাদের জন্য উপযুক্ত এবং যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই একজনকে অবশ্যই এই আচরণবিধি মেনে চলতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কারণ এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই ইসলামিক আচরণবিধি মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী গ্রহণ করে এবং তাদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা রয়েছে।

128 নং আয়াতের পরবর্তী অংশটি নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে তাঁর করুণার মাধ্যমে, কারণ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা, সুযোগ এবং ভাল কাজের গ্রহণযোগ্যতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 128:

"...এবং [রহমতে] আমাদের দিকে ফিরে যাও..."

আমাদের দিকে ফেরার জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দের অর্থ আমাদের তওবা কবুল করাও হতে পারে। উভয় ব্যাখ্যাই নম্রতা অবলম্বন করার গুরুত্ব তুলে ধরে। একজন নম্র ব্যক্তি জানবে যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং নম্র ব্যক্তি সর্বদা তাদের ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি স্বীকার করবে এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের উপেক্ষা ও ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করবে। এই নম্রতা আয়াত 128 এর শেষ অংশে নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 128:

"...নিশ্চয়ই, আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই সত্যের সদ্ব্যবহার করতে হবে যে, মহান আল্লাহ ক্রমাগত তাদের মৃত্যুর পূর্বে মানুষের প্রতি করুণা ও ক্ষমার সাথে ফিরে আসেন। মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থেকে এবং ধরে নিতে হবে

যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। পরিবর্তে, একজনকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করার মাধ্যমে তাঁর রহমতের প্রকৃত আশা গ্রহণ করতে হবে, যে আশীর্বাদগুলি তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে , শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর, এবং তারপর বিশ্বাস করুন তিনি তাদের প্রতি করুণা ও ক্ষমার সাথে ফিরে আসবেন। ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা এবং প্রকৃত আশার মধ্যে এই পার্থক্যটি জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তখন কিতাবধারী এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের কাছেই স্পষ্ট করে দেন, যারা উভয়েই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিলেন, যে সত্য তাঁর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যারা তাঁকে অনুসরণ করেন। এই সত্যটি মহানবী ইব্রাহিম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 129:

"হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান..."

প্রথম লক্ষ্য করার বিষয় হল যে তাদের প্রার্থনা হাজার বছর পরে পূর্ণ হয়েছিল। এটি একজনের বৈধ পার্থিব বাসনা অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাথে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ, পরম উদার এবং শুধুমাত্র অবিলম্বে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকেন যার ফলে তাঁর নিজস্ব সময়সূচী অনুযায়ী

কাজ করা হয় কারণ এটি জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম। অনেক ইসলামি শিক্ষায় এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 89:

" *[আল্লাহ] বললেন, "তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। সুতরাং তুমি সঠিক পথে থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না।"*

তাই একজন মুসলমানকে আল্লাহকে জেনে ভাল ও বৈধ প্রার্থনার উপর অবিচল থাকতে হবে, সর্বোত্তম সময়ে, সর্বোত্তম উপায়ে সাড়া দেবেন এবং এমনভাবে সাড়া দেবেন যা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 129:

"হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান..."

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব থেকে এসে তার নবুওয়াতের দাবিকে আরও সমর্থন করেছিলেন, কারণ তিনি মক্কার অমুসলিমদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের মধ্যে নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে

তার জীবনের 40 বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাই তারা তার আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

বইয়ের লোকেরা যেহেতু তাদের বিশ্বাসের মধ্যে বংশের গুরুত্বকে প্রবর্তন করেছে, এই সত্য যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত ইব্রাহীম (সা.)-এর সরাসরি বংশধর ছিলেন, ঠিক তাদের মতোই, তাকে গ্রহণ করতে এবং অনুসরণ করতে তাদের উত্সাহিত করা উচিত ছিল, বিশেষ করে যখন তারা তাকে এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল, যেহেতু তারা উভয়ই তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মক্কার অমুসলিমদের নেতা এবং কিতাবধারী উভয়েই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে সমস্ত মুসলমানরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মেনে নিয়েছেন, তাদের অবশ্যই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজের মাধ্যমে তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করতে হবে, ইসলামে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। কর্ম ছাড়া বিশ্বাসের মৌখিক দাবি হিসাবে শিক্ষার ইসলামে তেমন মূল্য নেই কারণ এটি কারও উদ্দেশ্য, বক্তৃতা বা কর্মের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে না। এটি 129 নং আয়াতের পরবর্তী অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 129:

" হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন..."

বইটি পবিত্র কুরআনে আলোচিত আইন ও আচরণবিধি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে বোঝায়, যা মানবজাতিকে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু জ্ঞান মানুষের দ্বারা অপব্যবহার করা যেতে পারে, একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। যখন কেউ ইসলামী জ্ঞানকে প্রজ্ঞার সাথে একত্রিত করে,

তখন এটি তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 129:

" হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন..."

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, পবিত্র কুরআনের অন্ধ তেলাওয়াতই সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয় যদি কেউ এটি বুঝতে এবং আমল করতে ব্যর্থ হয়। শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞানের উপর আমল করার মাধ্যমেই তাদের নিয়ত, কথা ও কাজ পরিশুদ্ধ হবে । এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

কিন্তু কোনো মুসলমান যদি মক্কার অমুসলিম ও কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, দাবি করে যে তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদের উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী, শান্তি ও বরকত

বর্ষিত হোক। তার উপর, ইসলামী শিক্ষাগুলো শেখার ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করে। এর ফলে উভয় জগতেই স্ট্রেস, অসুবিধা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি কেউ ইসলামে বিশ্বাস রাখে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজন ব্যক্তি যে পথই বেছে নিন না কেন, তারা নিঃসন্দেহে উভয় জগতেই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা থেকে এড়াতে পারে না এবং তাঁর দ্বারা কোনভাবেই তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না, কারণ তিনি সর্বদা প্রজ্ঞার সাথে কাজ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 129:

"... প্রকৃতপক্ষে, আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনিই জানেন কে নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্য। এটি মক্কার অমুসলিমদের এবং কিতাবের লোকদেরও সরাসরি সমালোচনা, যারা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে প্রশ্ন করেছিল যে কেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চূড়ান্ত পবিত্র নবী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। তাদের উপর হতে অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 31-32:

"আর তারা বললো, "কেন এই কুরআন দুটি শহরের একজন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?" তারা কি তোমার প্রভুর রহমত বন্টন করে?..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিংসা একটি বড় পাপ যা সর্বদা এড়ানো উচিত। এটি একটি বড় পাপ কারণ হিংসাকারী সরাসরি মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ নিয়ামত দান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে মৌখিক এবং শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয় যার বিরুদ্ধে তারা হিংসা করে সে কেবল তাদের নিজের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ ঈর্ষা হল যখন কেউ অন্য কারো প্রতি অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যা তাকে দেওয়া হয়েছে তা না হারিয়ে। যদিও এই প্রকারটি বৈধ, তথাপি তা কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে দোষারোপযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ এবং প্রশংসনীয় ঈর্ষার উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায় তাকে হিংসা করতে পারে। অন্য ব্যক্তি হিংসা করতে পারে সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে।

একজনকে অবশ্যই হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে যে এটি একটি বড় পাপ যা মহান আল্লাহর বন্টন পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এটি আরও আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করা কেবলমাত্র একজন মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যাওয়ার কারণ হবে, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যে মুসলমান ঈর্ষান্বিত হয় তাকে অবশ্যই তাদের হিংসাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র ইসলামের সীমার মধ্যে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা জড়িত, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এভাবেই কেউ তাদের হিংসা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অধ্যায় 113 আল ফালাক, আয়াত 1 এবং 5:

"বলুন, আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই... এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

মহান আল্লাহ তখন তাদেরকে তাদের ঈর্ষার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, যেমন মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন এবং মানুষের খুব সীমিত চিন্তাধারা অনুযায়ী নয়। .

উপসংহারে বলা যায়, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করতে হবে, এর শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং তার ওপর কাজ করতে হবে, এমনকি তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলেও। তাদের অবশ্যই এর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের চিকিত্সকের পরামর্শে গ্রহণ করে এবং কাজ করে যে তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া সত্ত্বেও এটি তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। যদি তারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পছন্দ করে তবে এটি কেবলমাত্র খারাপ মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় সে উভয় জগতেই অসুবিধা, চাপ এবং সমস্যায় পড়বে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 130-134

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

“আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আর আমরা তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছিলাম এবং অবশ্যই সে পরকালে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করেছি।"

আর ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

অথবা তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত] মুসলিম।"

এটি একটি জাতি ছিল যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের এবং কিতাবের লোকদের মনোভাবের সমালোচনা করেন , যারা উভয়েই হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিলেন, যদিও তারা উভয়েই তাঁর নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। উপায়, যার ফলে নিজেদের থেকে বোকা বানানো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

" *আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে..."*

তারা তাঁর পথের বিরোধিতা করেছিল কারণ তাঁর পথের সাথে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য জড়িত ছিল, তাঁকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল তা তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। কিতাবের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিমরা তাঁর পথের বিরোধিতা করেছিল কারণ এটি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

" *আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিম এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলতে পারে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পথের সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিশ্বাস করে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকতে পারে, যখন বিশ্বাস করে অন্য কেউ বিচারের দিন তাদের রক্ষা করবে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যস্থতা একটি সত্য এবং অনেক ইসলামী শিক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নং হাদিস পাওয়া যায়, তবুও কিছু মুসলিম এখনও যাবেন না। জাহান্নাম। যেহেতু জাহান্নামের একটি মুহূর্ত অসহনীয়, একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা কেবল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশকে উপহাস করছে। একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থেকে নিজেকে বোকা বানাতে পারে, যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা, যেমনটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা এবং তারপর এই আশা করা যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন। অবাধ্যতা সবসময় ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার সাথে যুক্ত এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আশার মধ্যে এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকে নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে মনের শান্তি বিশ্বাস করে এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণের মধ্যেই নিহিত থাকে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তাঁকে খুশি করার উপায়ে দৈব শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে মানসিক চাপ, দুর্দশা এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, এমনকি যদি তার কাছে সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যরা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে বলে বিশ্বাস করে নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্য করা তখনই কারো উপকারে আসবে যখন তা দুনিয়াতে করা হবে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"সুতরাং সেদিন তাদের অজুহাত অন্যায়কারীদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

কেউ কেউ নিজেদেরকে মূর্খ মনে করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যদিও তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করে। . তাই একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলি এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি এটি ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে কারণ জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে যত বেশি কাজ করা হয়, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবীর ঐতিহ্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় তা আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। , মহিমান্বিত।

তাই একজনকে অবশ্যই সব ধরনের বিভ্রান্তিকর মনোভাব এবং বাঁকানো বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে যা তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানোর কারণ করে। পরিবর্তে,

সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, একজন ব্যক্তি তখনই তাঁর বিশেষ রহমত লাভ করবে, যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, যখন তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে মেনে চলে এবং তাঁর অনুসরণ করে । পথ , যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকার। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

"... *এবং আমরা তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, এবং অবশ্যই তিনি পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।*"

এই বক্তব্যটি এটা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট যে, একমাত্র জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয় তা হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অন্য সকল মান, যেমন লিঙ্গ, জাতি, বংশ এবং সামাজিক মর্যাদা, একজনের পদমর্যাদা নির্ধারণের সময় মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন প্রভাব রাখে না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটি ছিল বইয়ের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের জন্য আরেকটি সমালোচনা যারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের বংশই তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

"... *এবং আমরা তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, এবং অবশ্যই তিনি পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"*

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কেউ যদি পরকালে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে মিলিত হতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে, যা সৎ পথ। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি এই পৃথিবীতে ধার্মিকদের সঙ্গীও অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ এটি তাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ একজনকে ধার্মিকতা গ্রহণে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি একদল লোকের কর্মকে অবলম্বন করে তাকে তাদের থেকে বিবেচনা করা হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি খারাপ সঙ্গীকে অবলম্বন করবে সে নিঃসন্দেহে তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ

করবে এবং তাই তাদের থেকে বিবেচনা করা হবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সহীহ বুখারি নং 3688- এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি আখেরাতে যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথে থাকবে। এটা স্পষ্ট যে সত্যিকারের ভালবাসা কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা কার্যত ধার্মিক পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে। অন্যথায় প্রেমের মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট হলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, অন্যান্য জাতি যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, আখেরাতে তাদের সাথেই শেষ হবে। স্পষ্টতই এটি এমন নয়, কারণ তারা তাদের নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা মৌখিকভাবে তাদের ভালবাসার দাবি করে।

মহান আল্লাহ অতঃপর স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131:

" *যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করেছি।"*

এটি আরও বইয়ের লোকদের এবং মক্কার অমুসলিমদের সমালোচনা করে, এবং বর্ধিতভাবে, মুসলমানদের সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহ পার্থিব কারণের উপর ভিত্তি করে লোকেদের প্রতি তাঁর রহমত প্রদান করেন না, যেমন বংশ। তাঁর করুণা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ কার্যত তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যখন মহান আল্লাহকে মান্য করার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সমাজ, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা তাদের নিজস্ব ইচ্ছাকে অনুসরণ ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ঘোষণা করলেও কার্যত এসবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। . এইভাবে কিতাবের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিমদের আচরণ ছিল এবং তারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিল। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই কিছু বা কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। এই জমাটি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, অন্য মানুষ, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা ঈশ্বরের কাছে হোক না কেন। অতএব, কেউ যদি তাদের নিয়ত, কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে অন্য কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বজগতের মহান প্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা পরিপূর্ণতার সাথে জড়িত নয়। এটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া জড়িত। এবং যখনই তারা কোন পাপ করে

তখনই মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি আচরণ করুন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131:

" *যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করেছি।"*

বিশ্বজগতের প্রভুর উল্লেখ করা হয়েছিল সম্ভবত এই সত্যটি তুলে ধরার জন্য যে কেউ যদি মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে কারণ তিনি একাই সমগ্র মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, সে উভয় জগতে চাপ, দুশ্চিন্তা ও ঝামেলা ছাড়া কিছুই পাবে না, যদিও তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়। বিশ্বজগতের প্রভু, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ সমগ্র মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ তারপর এই সত্যটি তুলে ধরেন যে, মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই ছিল মহানবী ইব্রাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকার, যা তাঁর সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ, তাঁর নাতি, নবী ইয়াকুব সহ তাঁর বংশধরগণ। , তাঁর উপর সালাম, অনুরূপ করেছেন. অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131-132:

" যখন তার রব তাকে বললেন, "আবেদন কর," সে বলল, "আমি [ইসলামে] আনুগত্য করেছি। বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে।" এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার

ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, তাই মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি মুসলমান।"

মহানবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তিনি কিতাবের লোকদের পূর্বপুরুষ ছিলেন যারা ইসরাইল সন্তান হিসেবেও পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান। এটি কিতাবের লোক এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের জন্যই আরেকটি সমালোচনা ছিল যে তারা কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করছে: মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার উত্তরাধিকার। এই বিরোধিতা চরমে পৌঁছেছিল যখন তারা উভয়েই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও উভয় দলই ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল।

মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে ৪০ বছর অতিবাহিত করেছিল এবং সেজন্য তিনি জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল, তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয়। কিন্তু ইসলাম তাদের আকাঙ্ক্ষার

পরিপন্থী হওয়ায়, মক্কার অমুসলিমদের অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাই তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলার উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করেছিল।

কিতাবের লোকদের জন্য, তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল যেহেতু তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, মহানের সাথে পরিচিত ছিল এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই চিনতে পেরেছিল, যেমন তাদের উভয়ই ছিল। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু ইসলাম তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হওয়ায়, বইয়ের অধিকাংশ লোক ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাই তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করার উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করেছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

মুসলমানদের অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মকে মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) এর মতো উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে উত্সাহিত করতে হবে। উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখা এবং কাজ করা জড়িত যাতে অন্যরা তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করে। অতঃপর মুসলমানদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখানোর জন্য সময় উৎসর্গ করতে হবে, যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সারা জীবন ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে। এটা লক্ষ্য করা দুঃখজনক যে কিভাবে অধিকাংশ মুসলিম পিতামাতা পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান শেখানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী যা পার্থিব সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় তবুও তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা অন্যদের হাতে তুলে দেয়, যদিও তাদের সন্তানদের শেখানো তাদের কর্তব্য। ইসলামের ভিত্তি সরাসরি। যদিও পরবর্তী

প্রজন্মকে জাগতিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা প্রশংসনীয়, তবুও মা-বাবাকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বাচ্চাদের মসজিদে পাঠানো শেখার জন্য কিভাবে পবিত্র কুরআন না বুঝে তেলাওয়াত করা যায় তা যথেষ্ট নয়। একজন কিশোরকে প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, অন্ধ অনুকরণ নয়, অন্যথায় তারা কেবল সময়ের সাথে সাথে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তারা ইসলামকে সংস্কৃতির একটি অংশ হিসাবে পালন করবে যা সময়ের সাথে সাথে বাতিল করা যেতে পারে। যখন কেউ প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং প্রয়োগ করা উচিত যখন তারা প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং আব্রাহাম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে বেছে নিয়েছেন..."

মহান আল্লাহ ইসলামকে মানবজাতির জন্য ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছেন কারণ এটি তাদের প্রকৃতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন কোন আচরণবিধি তাদের প্রকৃতি ও ক্ষমতার সাথে খাপ খায়। যখন কেউ এই ঐশ্বরিক আচরণবিধি পরিত্যাগ করে এবং পরিবর্তে মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে তখন এটি কেবলমাত্র একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি মানুষের প্রকৃতির জন্য পুরোপুরি

ডিজাইন করা হয়নি। মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যতই অগ্রগতি করুক না কেন, তারা কখনই নিখুঁত আচরণবিধি তৈরি করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে যার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যহীন সে কখনই মানসিক শান্তি পাবে না। তাই একজনকে ইসলামের শিক্ষাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, যদিও তাদের তেতো ওষুধ দেওয়া হয়। একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে আজকে মুসলমান হওয়া মানে আগামীকাল একজন মুসলমান মারা যাবে না। এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি গাছের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন পানির মতো পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হলে মরে যায়, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও ভালো হতে পারে যদি তারা আনুগত্যের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে যাতে তারা মুসলিম হিসেবে

মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিম, ৭২৩২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং যদি সে একজন দৃঢ় মুসলিম হিসেবে মারা যায়। , অতঃপর তাদেরকে দৃঢ় মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এবং একজনের মৃত্যুর অবস্থা তাদের জীবনযাত্রার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এটি এই সত্যটিকেও তুলে ধরে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, কারণ একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে তার বংশ বা সংযোগ তাদের রক্ষা করবে না যদি তারা মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্ব আরও তুলে ধরেছেন এবং অতীতের নবীগণ, যেমন কিতাবের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই মনোভাবের উপর অটল ছিলেন। এবং সর্বদা পরবর্তী প্রজন্মকে একই কাজ করতে উত্সাহিত করে। আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য

করা, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই পৃথিবীতে তাদের শেষ মুহূর্তেও তারা এটি নিয়ে আলোচনা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

"অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?"...

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর শেষ মুহুর্তে যখন তিনি মানুষকে ফরজ নামাজ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ তারা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। সুনানে ইবনে মাজা, 2698 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এটি ছিল সেই বইয়ের লোকদের আরেকটি সমালোচনা যারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তবুও মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার এবং অন্যদেরকে অনুরোধ করার জন্য তাঁর মনোভাব অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একই কাজ করুন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

"অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?"...

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পরে কার ইবাদত করবে তা জিজ্ঞাসা করেননি বরং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর পরে কার ইবাদত করবে। তিনি তার সন্তানদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে মানুষ যেভাবে জীবিত সত্ত্বার উপাসনা করতে পারে, ঠিক সেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং নিজের ইচ্ছার মতো প্রাণহীন জিনিসের পূজা করা যায়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা অন্য সব কিছুর চেয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আনুগত্য করা এবং অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করাকে অগ্রাধিকার দেয় সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং দুর্দশা দেখা দেবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের আন্তরিকতাকে তুলে ধরেন, যা তাদের বংশধরদের তথা কিতাবের লোকদের মধ্যে থাকা অকৃত্রিমতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

" *না কি তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত্য] মুসলিম।"*

তারা তাদের দাদা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করার পূর্বে তাদের মহান চাচা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করার বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে, কিতাবের লোকদের বিপরীতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানরা। , হযরত ইসমাঈল (আঃ) বা তাঁর বংশের প্রতি কোন ঈর্ষা পোষণ করেননি, যার মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবর্তে, তারা ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার যারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

বিপথগামী লোকদের দ্বারা প্রবর্তিত তাদের আসমানী কিতাবের পরিবর্তনের কারণে, কিতাবেরা তাদের পুরো বিশ্বাস তাদের বংশের উপর ভিত্তি করে। তারা দাবি করেছিল যে এটি তাদের বংশ যা তাদের বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে এবং তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করার একটি কারণ ছিল কারণ তিনি ভিন্ন বংশের ছিলেন। তাকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে ধ্বংস করবে এবং এটি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির সরাসরি বিরোধিতা করবে। এটা তারা

মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের পুরো মনোভাব তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের পথের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

" *না কি তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত্য] মুসলিম।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি মুসলিমদের তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পার্থিব বিষয়ের উপর বিশ্বাসের সাথে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। দুঃখজনকভাবে, আজকের বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে বিপরীতটি সত্য যারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে বেশি চিন্তিত। যদিও জাগতিক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া ইসলামে গ্রহণযোগ্য তবুও এটিকে নিজের বা তাদের নির্ভরশীলদের সম্মানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। পার্থিব বিষয়গুলি কেবল একজনের ধর্মীয় বিষয়ের সেবা করার একটি উপায় যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি অর্জিত হয় যখন তারা তাদের পার্থিব সম্পদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্য।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, যদি তারা নিজেরাই মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় তবে তার বংশ তাদের দুনিয়াতে বা পরকালে কোনো সাহায্য করবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

" এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

এটি কিতাবের লোকেরা, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা গৃহীত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয় এবং এমনকি আজকে কিছু মুসলমানের দ্বারা, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের বংশ এবং ধার্মিক লোকেদের সাথে সম্পর্ক, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট। উভয় জগতে তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দিতে। এটি বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, কারণ এটি পরামর্শ দেয় যে তিনি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন এবং এমনকি বর্ণবাদী আচরণ করেন যখন তিনি না করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই মনোভাবের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, তিনি স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিলেন যে একজন ব্যক্তির বংশধর যদি তাদের ভাল কাজের অভাব থাকে তবে বিচারের দিন তাদের অগ্রসর হবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

এবং অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

" হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকারে আসবে না এবং কোন পুত্র তার পিতার কোন উপকারে আসবে না..."

তাই একজন মুসলমানকে কার্যত তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যাতে তারা পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি তারা অবাধ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে বিচারের দিন তাদের সাথে একত্রিত হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"*

খারাপ আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য অন্যদের কাজের সাথে তাদের নিজের কাজের তুলনা করার মানসিকতা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ

ক্রমাগত তাদের আচরণের সাথে অন্যদের আচরণের তুলনা করে যারা তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান যে নামাজ পড়ে না সে নিজেকে একজন খুনীর সাথে তুলনা করবে যার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব জায়েজ হবে। আয়াত 134 এর শেষের দ্বারা নির্দেশিত, এই মনোভাব একজন মূর্খ ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি পরকালে তাদের সাহায্য করবে না, কারণ একজন ব্যক্তিকে অন্যের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং তাদের সাথে তুলনা করা হবে না। অন্যদের আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে যে একক মানদণ্ডের তুলনা করা হবে তা হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এই যুগে, এটি বোঝায় যে একজন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে কতটা শিখে এবং আমল করে।

একইভাবে, একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অভাবের জন্য অজুহাত তৈরি করা উচিত নয়, এই দাবি করে যে অন্যরা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তার এই দাবি করে নিজেকে আরও ভালো বোধ করা উচিত নয় যে অন্য কারো পক্ষে ইসলামিক জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তাদের শক্তি এবং সময় উৎসর্গ করা সহজ কারণ তারা শুধুমাত্র খণ্ডকালীন কাজ করে। একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল অলসতাকে বাড়িয়ে তুলবে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যদিও এর অর্থ তারা অন্যদের তুলনায় কম ভাল কাজ করে, কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণ নয় গুণমান দেখেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।*"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের নিজস্ব আচরণে মনোনিবেশ করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ বিচারের দিনে এই বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে না, যেমন পূর্ববর্তী প্রজন্মের আচার-আচরণ, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা শুধুমাত্র একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদেশ দেওয়ার একটি কারণ যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানকে উত্তম করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা উদ্বেগহীন বিষয়গুলো পরিহার করে। তাদের তাই একজনের ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হওয়া অবশ্যই একজনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 135-138

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾

"তারা বলে, "ইহুদী বা খ্রিস্টান হও [তাহ] তোমরা হেদায়েত পাবে।" বলুন, বরং [আমরা] ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ করি, সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

বলুন, [হে ঈমানদারগণ], "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং [তাঁর] বংশধরদের প্রতি এবং যা মূসাকে দেওয়া হয়েছিল। এবং ঈসা

(আঃ) এবং নবীদেরকে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে, আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

সুতরাং যদি তারা [কিতাবধারীরা] বিশ্বাস করে যেমন আপনি বিশ্বাস করেন, তবে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা কেবল মতভেদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

[এবং বল, আমাদের] আল্লাহর রঙ [ধর্ম]। আর দ্বীনের [নির্ধারণ] ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।"

মদীনায় বসবাসরত কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের পন্ডিতগণ অন্যদেরকে অনুরোধ করতেন, যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তারা উভয়েই ইসলামের সত্যতা স্বীকার করলেও তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 135:

"তারা বলে, "ইহুদী বা খ্রিস্টান হও [তাই] তোমরা হেদায়েত পাবে।"..."

কিতাবধারী আলেমগণ পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিলেন। এবং তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছিল কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল, কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল যে সাধারণ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা তাদের সমাজে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব হারাবে। তাই একজনকে অবশ্যই পার্থিব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা এড়িয়ে চলতে হবে, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা, কারণ এটি তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য দু'জন ক্ষুধার্ত ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। নেকড়ে যা ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পার্থিব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাকে বুঝতে হবে যে এটি কেবলমাত্র উভয় জগতেই তাদের উপকারে আসবে যদি তারা সেগুলিকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। তার উপর হতে সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া জিনিসগুলির অপব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, অসুবিধা এবং দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি তারা আনন্দ ও বিনোদনের

মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, যেমন আল্লাহ, মহান, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করে, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 135:

"তারা বলে, "ইহুদী বা খ্রিস্টান হও [তাই] তোমরা হেদায়েত পাবে।"..."

এই আয়াতটি অন্যদের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে, কারণ এটি প্রায়শই বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যকে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান ও গ্রহণ করার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য ধর্ম ও জীবন পদ্ধতির বিপরীতে, ইসলাম সর্বদা মানুষকে তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে এবং অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম এবং অন্যান্য সত্য বিষয়গুলি গ্রহণ করতে উত্সাহিত করেছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা অন্যদেরকে শুধুমাত্র একটি ভাল পথে পরিচালিত করবে কারণ যে ব্যক্তি অন্যদেরকে বিপথগামী করার পরামর্শ দেয়, যেমন পাপ করা, সে প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ বহন করবে যাকে তারা বিপথগামী করে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে একে অপরকে পরামর্শ দিতে হবে যাতে তারা ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়ে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেয়।

মহান আল্লাহ অতঃপর কিতাবের লোকদের মনোভাবের সমালোচনা করেন, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার দাবি করে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল, কারণ তারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত

রেখেছিল, যদিও তারা ছিল। তাঁর পথের বিরোধী, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের পথ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 135:

"তারা বলে, "ইহুদী বা খ্রিস্টান হও [তাই] তোমরা হেদায়েত পাবে।" বলুন, "বরং সত্যের দিকে ঝুঁকে থাকা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ করি এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার অর্থ এই হতে পারে যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) যখনই কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন বা তাকে প্রদত্ত কোন নেয়ামতের সাথে যোগাযোগ করেছেন, তখনই তাঁর উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করে যে তিনি মহান আল্লাহর সাথে শরীক করেননি, তার ইচ্ছার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কাজ করে, তার কথাবার্তার মাধ্যমে, এমনভাবে কথা বলে যা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এবং এর মাধ্যমে। তার কর্ম, তাকে দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। এটাই মহান আল্লাহর কাছে প্রকৃত আত্মসমর্পণ, সকল নবী-রাসূলগণের পথ এবং ইসলামের পথ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 135:

"... *বলুন, "বরং [আমরা] ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করি, সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"*

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এটা স্পষ্ট করেন যে, কিতাব বা মক্কার অমুসলিমরা কেউই তাঁর প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করেনি, যদিও তারা উভয়েই অন্যথা দাবি করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 136:

"বলুন, [হে ঈমানদারগণ], "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং বংশধরদের [আল-আসবাতে] এবং যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল। এবং নবীদেরকে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে, আমরা তাদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত"।

মক্কার অমুসলিম এবং খ্রিস্টানরা মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার করেছিল, যখন ইহুদীরা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল, কারণ তারা বেছে নিয়েছিল কোন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোনটি গ্রহণ করবেন এবং কোনটি প্রত্যাখ্যান করবেন এবং কোন ঐশী বাণী গ্রহণ করবেন এবং যা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস অসম্পূর্ণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ নবী (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস না করা। তিনি এটাও স্পষ্ট করেন যে, তাঁর ধর্ম যুগে যুগে একই ছিল, ইসলাম ধর্ম, অর্থ, একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের ধর্ম। এর মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা ঈশ্বরের শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে আল্লাহ, মহান, মহানবী (সা.)-এর ওপর বা তাদের দেওয়া ঐশী বাণীতে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে না, এমনকি তারা অমুসলিমদের মতো মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করলেও। মক্কার এবং কিতাবের লোকেরা করেছিল। সুতরাং এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে নিজের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, কারণ ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে মৌখিকভাবে

ঈমানের ঘোষণা করা যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে, 136 নং আয়াতের শেষের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, ঈমানের সাথে কর্মের সংমিশ্রণই হল একজন মুসলিমের সংজ্ঞা। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 136:

"...এবং আমরা তাঁর প্রতি [আনুগত্যশীল] মুসলিম।"

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই বইয়ের লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা চেরি বেছে নিয়েছিলেন কোন্ নবী (সাঃ) এবং কোনটি গ্রহণ করতে হবে এবং কোনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে, চেরি বাছাই করে কোন ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং কোন ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করে এবং তাদের উপেক্ষা করা উচিত, কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কারণ এটিই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের সংজ্ঞা, যা সকল নবীদের উত্তরাধিকার। . চেরি বাছাইকারী শুধুমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষার আনুগত্য করে এবং উপাসনা করে, মহান আল্লাহকে নয়, এমনকি যদি তারা অন্যথায় দাবি করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রকৃত বিশ্বাস হল সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যা ফলস্বরূপ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 137:

"সুতরাং তারা যদি বিশ্বাস করে যেভাবে আপনি বিশ্বাস করেন, তবে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়েছে..."

এই আয়াতের অর্থ এই অর্থে করা যেতে পারে যে, তারা, আহলে কিতাবরা যদি সাহাবায়ে কেরামের মতো মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, তাহলে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবেন। এটি ইঙ্গিত করবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আশা করেন না যে, লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ স্তরের বিশ্বাসের সাথে মিলিত হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যেমন তিনি বলেননি যে সাহাবায়ে কেরামের মতোই মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য করেছেন, কারণ এটি অর্জন করা কার্যত অসম্ভব হবে। তাই একজনকে অবশ্যই দুর্বল অজুহাত ত্যাগ করতে হবে যা তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করতে বাধা দেয়। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

উপরন্তু, এই আয়াতটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে

এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করা এড়িয়ে চলার গুরুত্বও নির্দেশ করে, যদিও সেগুলো ভালোর দিকে নিয়ে যায়। কাজ, কারণ এটি সঠিক পথের সাথে সাংঘর্ষিক। সরল সত্য হল যে, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর কাজ করবে, তারা তত কম হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর কাজ করবে, যার ফলে বিপথগামী হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে কোনো বিষয় যে দুটি হেদায়েতের উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। . এই সতর্কতাটি 137 নং আয়াতেও দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 137:

"সুতরাং তারা যদি বিশ্বাস করে যেভাবে আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা কেবল মতবিরোধে রয়েছে।

হেদায়েতের দুটি উৎস থেকে বিচ্যুত হওয়া কেবল অনৈক্যের দিকে নিয়ে যাবে। এটা খুব স্পষ্ট হয় যখন কেউ আজ মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে এবং কিভাবে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কারণ তারা প্রত্যেকে ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উত্স মেনে চলে এবং এমন আচরণ করে যেন ইসলামের নীতিগুলি অন্যান্য উত্স থেকে নেওয়া এই জ্ঞানের চারপাশে ঘোরাফেরা করে যদিও এটি তা নয়। . মুসলমানদের অবশ্যই এই মনোভাব অবলম্বন করা এড়িয়ে চলতে হবে, যা অতীতের জাতিদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল যারা নেতৃত্ব কামনা করেছিল এবং তাই তাদের ঐশী কিতাবে বর্ণিত বিশ্বাসের মৌলিক নীতিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। পরিবর্তে, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের দিকে পরিচালিত করবে যেমনটি সাহাবায়ে কেরামের সাথে হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে

আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। যে ব্যক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অটল থাকবে, সে সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিচালিত হবেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 137:

"...এবং আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলামের শত্রুরা, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবেরা এবং মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যতক্ষণ তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন। এই সুরক্ষা যে কেউ তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদের জন্য প্রসারিত দ্বারা দেওয়া হয়। একজন মুসলিম জীবনে অসুবিধার সম্মুখীন হবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, ততক্ষণ তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত ও পরিচালিত হবে, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

এটা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর জন্য সহজ, কারণ তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ঘটে তা তিনি শোনেন এবং তারা যা করে তা জানেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 137:

"... আর তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

অতঃপর আল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলেন যে, তিনিই সর্বোত্তম আচরণবিধি জানেন, সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি যা মানুষের জন্য উপযুক্ত, যাতে তারা সর্বদা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করে, যার ফলে মানসিক শান্তি আসে। এবং উভয় জগতের শরীর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"[এবং বল, "আমাদের] আল্লাহর দ্বীন। আর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে?..."

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন, তাই তাদের স্বভাব, ক্ষমতা, মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে মানানসই আচরণবিধি প্রদানের জন্য একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন। মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে একটি সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন, তারা কখনই সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা যে আচরণবিধি তৈরি করে তা কখনই মানুষের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত হবে না। এটি একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, যা ফলস্বরূপ একজনকে মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেয়। 138 নং

আয়াতের শেষের দ্বারা নির্দেশিত, যে ব্যক্তি এই সাধারণ সত্যটি বোঝে সে তাই তাদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আচরণবিধি মেনে নেবে এবং কাজ করবে, জেনে রাখবে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। তারা একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করবে যারা তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"...এবং আমরা তাঁর উপাসক।"

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অতএব, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে আর কে পাবে না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, তাকে মানসিক প্রশান্তি দেওয়া হবে এবং উভয় জগতের শরীর, এমনকি যদি তারা সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একটি ভিন্ন আচরণবিধি অনুসরণ করে, যা কেবলমাত্র তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে, সে উভয় জগতে চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা ছাড়া কিছুই পাবে না, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং মুহূর্তগুলি অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"[এবং বল, "আমাদের] আল্লাহর রঙ [ধর্ম]। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? আর আমরা তাঁরই উপাসক।"

একটি রঙের রঞ্জক যেমন একটি পোশাককে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে এবং স্থায়ী হয়, তেমনি একজন মুসলমানের বিশ্বাস অবশ্যই তাদের জীবনের প্রতিটি দিক, যেমন তাদের ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবন এবং তাদের পুরো দিনকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলিকে তারা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদের সাথে যোগাযোগ করে, যেমন তাদের সময় এবং সম্পদ। তাই ইসলামের ধর্মীয় রঞ্জক অনুপ্রবেশ এবং তাদের উদ্দেশ্য আবৃত করতে হবে, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং অন্য কিছু বা অন্য কারো জন্য নয়। এটি তাদের বক্তৃতা অনুপ্রবেশ এবং আবৃত করা আবশ্যক, যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে কথা বলে, যার মধ্যে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং ইসলামের ধর্মীয় রঞ্জক অবশ্যই অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে আবৃত করতে হবে, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কাজ করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। এরূপ আচরণ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ইবাদত করা এবং সকল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"...এবং আমরা তাঁর উপাসক।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"[এবং বল, "আমাদের] আল্লাহর রঙ [ধর্ম]। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? আর আমরা তাঁরই উপাসক।"

যেহেতু আল্লাহর রং, মহান, অর্থ, ইসলাম, এক, এর অর্থ হল যে সমস্ত সামাজিক ও পার্থিব বাধা যা মানুষকে আলাদা করে যেমন লিঙ্গ, জাতি এবং বর্ণ, ইসলামে তার কোন মূল্য নেই, কারণ সমস্ত মুসলমান একক রঙে রঞ্জিত। ইসলামের রঙ। এটি ইসলামে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র অন্যদের থেকে উচ্চতর হয় তার উপর নির্ভর করে যে ইসলামের রঞ্জক তাদের জীবনে কতটা অনুপ্রবেশ করেছে, অর্থ, তারা কতটা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি ইসলামে বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষা যে ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে তত বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে যেহেতু মানুষের উদ্দেশ্য লুকানো এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই জ্ঞাত, তাই অন্য কেউ অন্যদের চেয়ে উত্তম কিনা তা বিচার করতে পারে না, কারণ তারা তাদের লুকানো উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নয়, এমনকি তাদের ভাল কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করলেও।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 138:

"[এবং বল, "আমাদের] আল্লাহর রঙ [ধর্ম]। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? আর আমরা তাঁরই উপাসক।"

মুসলমানরা যেহেতু ইসলামের রঙে রঞ্জিত, এটি ইঙ্গিত করে যে তারা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি, ঠিক যেমন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী একটি সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে যখন তারা সেই সংগঠনের ইউনিফর্ম পরিধান করে, যেমন পুলিশ বাহিনী। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, যে আশীর্বাদগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং সমস্ত মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এর ফলে অমুসলিমদের ইসলামের ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতি দেখাবে। অথচ, তারা যদি মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ, মহান বা মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হবে। এর ফলে তারা অমুসলিমদের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে, যার জন্য তাদের উভয় জগতেই জবাব দিতে হবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 139

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ

"বলুন, "তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ অথচ তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা? আমাদের জন্য আমাদের কাজ, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। এবং আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক।"

মহান আল্লাহ, তারপর মক্কার অমুসলিম এবং গ্রন্থের লোক উভয়কেই তাদের যুক্তিবাদী মানসিকতার জন্য সমালোচনা করেন যদিও তারা উভয়েই মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী বলে দাবি করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

"বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ অথচ তিনিই আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা?..."

তারা যদি মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করত তাহলে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মেনে নিত এবং অনুসরণ করত, কারণ এটাই ছিল মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ। নবুওয়াত ঘোষণার আগে মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ৪০ বছর অতিবাহিত করেছিল এবং তাই জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন এবং নবুওয়াত ঘোষণার আগে তিনি কোনো ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করেননি। . অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

যেহেতু তারা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল, তারা জানত পবিত্র কোরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয়। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হিসাবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য তাদের দাবিকে সমর্থন করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল।

কিতাবধারীদের জন্য, তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, যিনি তাদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তার সাথে পরিচিত ছিলেন। তারা ইসলামের সত্যতাকে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআন তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে বলেও স্বীকার করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হিসাবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য তাদের দাবিকে সমর্থন করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" *বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ অথচ তিনি আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা?..."*

এই আয়াতটি আরো ইঙ্গিত করে যে যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে, তখন এটি মানুষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক প্রতিরোধ করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। ঐক্যের জন্য, সাহাবায়ে কেরামের মত, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সকলেই মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন বলে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহর কাছে সঠিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যখন সমাজ, সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের মতো অন্যান্য বিষয়ের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের ঊর্ধ্বে রাখে, তখন তা কেবল তর্ক-বিতর্ক ও অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়। এই দিন এবং যুগে, এমনকি একটি একক মুসলিম পরিবারের মধ্যেও এটি বেশ স্পষ্ট।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" *বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ অথচ তিনি আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা?..."*

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রভু এবং মুসলিম জাতি একই সাথে এক, তাই, মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে যেভাবে আচরণ করেছেন তা মুসলিম জাতির জন্যও প্রযোজ্য হবে। অর্থ, মহান আল্লাহ যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সদস্যদের মনের শান্তি ও সাফল্য দান করেছেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিল, তাদেরকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করে ঈশ্বরের শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনিও পুরস্কৃত করবেন। মুসলিম যারা একই কাজ. বিপরীতভাবে, তিনি যেমন পূর্ববর্তী জাতির সদস্যদের শাস্তি দিয়েছিলেন যারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল ছিল, তারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী বলে দাবি করা সত্ত্বেও, তিনি একইভাবে আচরণকারী মুসলমানদেরকেও শাস্তি দেবেন। মহান আল্লাহর ঐতিহ্য কখনো পরিবর্তন হয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু তুমি কখনোই আল্লাহর পথে [প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর পথে কখনো কোনো পরিবর্তনও পাবে না।"

অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই কিতাবের লোকদের বিশ্বাসের মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা বিশেষ এবং তাই উভয় জগতেই পরিত্রাণের গ্যারান্টি দেয়, এমনকি যদি তারা অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে। এটি যেমন অতীতের জাতির জন্য সত্য ছিল না, মুসলিম জাতির জন্যও তা অবশ্যই সত্য নয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ..."

এরপর ইসলামের একটি মৌলিক নীতির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" *বলুন, "তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ অথচ তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা? আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ..."*

একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের বিশ্বাস, মতামত বা জীবনধারাকে অন্য লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয় কারণ এটি প্রায়শই তর্ক এবং বিতর্কের দিকে নিয়ে যায়। তাদের দায়িত্ব হল দৃঢ় প্রমাণ ব্যবহার করে লোকেদের কাছে সত্যটি স্পষ্ট করে দেওয়া এবং তারপরে অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া যা অনুসরণ করবে এবং কী প্রত্যাখ্যান করবে। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 29:

"এবং বল, "সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।"...

একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে তাদের শিক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যারা খোলা মন নিয়ে ইসলামের কাছে আসে এবং যারা শুধুমাত্র তর্ক ও বিতর্কে আগ্রহী তাদের উপেক্ষা করে, কারণ এটি সময় এবং শক্তির অপচয় করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" ... *আমাদের জন্য আমাদের কাজ, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ...*"

এটি অন্যের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার আগে প্রথমে নিজের কাজ সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করার জন্য ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখতে এবং তার উপর আমল করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাদের কথাবার্তাকে সংশোধন করতে হবে, ভালো কথা বলে বা নীরব থেকে তাদের কাজ সংশোধন করতে হবে। , পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে দান করা আশীর্বাদ ব্যবহার করে। তাকে এইভাবে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করার পর, একজন মুসলিম এমন অবস্থানে আছেন যে তিনি অন্যের কাজ নিয়ে নিজেকে চিন্তিত করতে পারেন। এই আলোচনাটি 139 এর শেষ অংশে নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 139:

"*...এবং আমরা তাঁর প্রতি [কাজ ও অভিপ্রায়ে] আন্তরিক।*"

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজনকে তাদের আচরণ সম্পর্কে অন্যদের পরামর্শ দেওয়ার আগে অবশ্যই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে, কারণ পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই আলোচনার অর্থ হল যে একজনকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং অন্যকেও একই কাজ করার পরামর্শ দিতে হবে, কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি কেবল অন্যকে বিভ্রান্ত করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" *... আমাদের জন্য আমাদের কাজ, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ..."*

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে অন্যের কর্মের প্রতি গাফিলতি থাকা উচিত এবং শুধুমাত্র নিজের বিশ্বাসের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত, কারণ অন্যদেরকে ভাল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং খারাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করা সমস্ত মুসলমানের জন্য তাদের শক্তি অনুযায়ী কর্তব্য। ইসলামের শিক্ষার প্রতি। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি। তুমি সৎ কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়কে নিষেধ কর..."

ন্যূনতম কর্তব্য হল একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পরিবারকে ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে হবে, এমনকি যদি বৃহত্তর সমাজ তার নিজস্ব উপায়ে এবং চিন্তাভাবনা থেকে হারিয়ে যায় বলে মনে হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি পচা আপেল শুধুমাত্র ভালো আপেলকেই দূষিত করবে। একইভাবে, মন্দ যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে তা শেষ পর্যন্ত সমাজের ভাল উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ভাল কি উপদেশ দিতে হবে এবং খারাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে হবে কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা এটি করার পরে, তাদের উচিত মানুষের সাথে তর্ক করা এড়িয়ে যাওয়া, কারণ তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

" *... আমাদের জন্য আমাদের কাজ, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে বিপথগামী মনোভাব এড়াতেও স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য লোকের ভাল কাজ এবং আচরণ বিচারের দিনে তাদের রক্ষা করবে যদিও তারা নিজেরাই আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে। যদিও বিচার দিবসে সুপারিশ একটি সত্য, তবুও কম নয়, এই মনোভাব গ্রহণ করা সুপারিশের ধারণাকে উপহাস করছে এবং যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে বিচারের দিন অন্যের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। মানবজাতির নেতৃবৃন্দ, সাহাবায়ে কেরামের আচার-আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে, যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে বর্ণিত হয়েছে। ঐশ্বরিক শিক্ষা, এবং শুধুমাত্র তখনই তাদের বিচার দিবসে অন্যদের কাছ থেকে সুপারিশের আশা করা উচিত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 139:

"...এবং আমরা তাঁর প্রতি [কাজ ও অভিপ্রায়ে] আন্তরিক।"

একজনের উদ্দেশ্য হল ইসলামের অন্তর্নিহিত ভিত্তি। কারও ভিত্তি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তবে তারা তার উপরে যা তৈরি করে তা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। অতএব, একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করবে, শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের জন্য কাজ করে বা তাঁর সাথে অন্যের জন্য কাজ করে, সে তার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি চিহ্ন হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 140-141

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

“অথবা আপনি বলবেন যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং জ্যাকব এবং তার বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন? বলুন, তোমরা কি অধিক জ্ঞানী নাকি আল্লাহ? আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে থাকা সাক্ষ্য গোপন করে? আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।

এটি একটি জাতি ছিল যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

মহান আল্লাহ তাদের অযৌক্তিক দাবীর জন্য কিতাবের লোকদের সমালোচনা করেন। তারা দাবি করেছিল তাদের পূর্বপুরুষগণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ছিলেন ইহুদী বা খ্রিস্টান, যদিও ইহুদী ধর্ম ও ত্রিত্বের ধারণা তাদের অনেক পরে প্রবর্তিত হয়েছিল, এমনকি হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনেক পরে। , শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে শেষ নবী। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

" *নাকি আপনি বলছেন যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং জ্যাকব এবং বংশধররা ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন? ..."*

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 65-67:

"হে কিতাবধারীগণ, তোমরা কেন ইব্রাহীমকে নিয়ে তর্ক করছ অথচ তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরে অবতীর্ণ হয়নি? তাহলে কি যুক্তি দেখাবে না? এই যে আপনি - যারা আপনার [কিছু] জ্ঞান আছে তা নিয়ে তর্ক করেছেন, কিন্তু আপনি যে বিষয়ে কিছু জানেন না তা নিয়ে তর্ক করছেন কেন? আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না। ইব্রাহীম ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া, একজন মুসলিম [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী]। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

মহান আল্লাহ, এই সত্যকে শক্তিশালী করেন যে তিনি একাই সব কিছু জানেন এবং তাই সত্য প্রকাশ করার সর্বোত্তম অবস্থানে আছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"... বলুন, "আপনি কি বেশি জানেন নাকি আল্লাহ?"..."

আহলে কিতাবের আলেমগণ যেহেতু পবিত্র কুরআনকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেমন তারা এর রচয়িতা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা উভয়ই তাদের ঐশ্বরিক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছিল, তারা, কিতাবের লোকেরা তাই জানত যে সত্যটি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"...আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে থাকা সাক্ষ্য গোপন করে?..."

তারা সত্যকে গোপন করেছিল কারণ ইসলাম সরাসরি তাদের পার্থিব বাসনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং কীভাবে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিল। যেহেতু তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে তারা ইসলাম এবং স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যা তারা সম্পূর্ণরূপে

সচেতন ছিল। ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের পূর্বপুরুষ, ইসরাঈলের সন্তানদের কাছ থেকে নেওয়া একটি চুক্তি এবং ইসলামের আগমন পর্যন্ত এটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চলে গেছে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 155-157:

“আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আমাদের নিয়োগের জন্য মনোনীত করেছিলেন সত্তর জন। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, তখন সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি আগে তাদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন? এটা আপনার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম ফয়সালা করুন [যা] ভাল এবং [ও] পরকালে, আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি। [আল্লাহ] বললেন, "আমার শাস্তি - আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দেই, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে।" সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য [বিশেষ করে] নির্ধারণ করব যারা আমাকে ভয় করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে। যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা লেখা আছে [অর্থাৎ বর্ণনা করা হয়েছে], যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য যা হালাল করেন। ভাল এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয় যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সমর্থন করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করেছে, তারাই সফলকাম হবে।”

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরাও মহান আল্লাহর সাথে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিল, যখন তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সর্বাবস্থায়, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। তাই মুসলমানদের অবশ্যই কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এটি কেবল উভয় জগতে দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে, যেমন পার্থিব আশীর্বাদগুলি তাদের ভঙ্গ করার মাধ্যমে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর সাথে চুক্তি, উভয় জগতেই তাদের সমস্যার উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলো অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেন, তিনি দেখতে পাবেন যে তিনি তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য দান করেন, যা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন মুসলিম যে পথই বেছে নেবে না কেন তারা উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে, যেমনটি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা করেছিল, কারণ কিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞান থেকে এড়ায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"... বলুন, "আপনি কি বেশি জানেন নাকি আল্লাহ?"..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং তাই তাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তা সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাদের জন্য সর্বোত্তম তা বোঝার জ্ঞান না থাকলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যে ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি বোঝে সে সমস্ত পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রেখে কারও কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়ানোর অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা। ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি বুঝতে ব্যর্থ হয় তারা যখনই তাদের ইচ্ছার বিপরীত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখনই দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়ে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকেও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অবকাশ দ্বারা একজন ব্যক্তিকে প্রতারিত করা উচিত নয়। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে তার পাপের জন্য অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হয় না তার মানে এই নয় যে তাকে মোটেও শাস্তি দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ মানুষকে সময় দেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ পায়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তাদের অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে তারা জবাবদিহিতা থেকে পালিয়ে গেছে, তাহলে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে কিছুই এড়ানো যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 140:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

মহান আল্লাহ অতঃপর পুনর্ব্যক্ত করেন যে, যদিও পূর্ববর্তী নবীগণ (সাঃ) তাদের উপর কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ধারণা প্রচার করেছেন, সর্বোত্তম, অর্থ, ইসলাম, কোনটিই কম নয়, প্রতিটি ব্যক্তি, অতীত বা বর্তমান, করবে। তাদের নিজস্ব পছন্দ এবং কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মের উপর ভিত্তি করে কাউকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে না, তারা যে কাজগুলোই করুক বা যারাই করুক না কেন। ছিল অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 141:

" এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

এটি কিতাবের লোকেরা, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা গৃহীত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয় এবং এমনকি আজকে কিছু মুসলমানের দ্বারা, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের বংশ এবং ধার্মিক লোকেদের সাথে সম্পর্ক, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট। উভয় জগতে তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দিতে। এটি বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, কারণ এটি পরামর্শ দেয় যে তিনি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন এবং এমনকি বর্ণবাদী আচরণ করেন যখন তিনি না করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই মনোভাবের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, তিনি স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিলেন যে একজন ব্যক্তির বংশধর যদি তাদের ভাল কাজের অভাব থাকে তবে বিচারের দিন তাদের অগ্রসর হবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

এবং অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

" হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকারে আসবে না এবং কোন পুত্র তার পিতার কোন উপকারে আসবে না..."

তাই একজন মুসলমানকে কার্যত তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যাতে তারা পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি তারা অবাধ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে বিচারের দিন তাদের সাথে একত্রিত হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে..."*

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কর্মের ফলাফলের সম্মুখীন হবে তাই আল্লাহর উপর বিশ্বাসের দাবি করা, মৌখিকভাবে, কর্মের মাধ্যমে তাঁর অবাধ্যতা মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে না। মনে রাখতে হবে বিশ্বাস হলো একটি গাছের মতো যাকে কর্মের মাধ্যমেই পুষ্ট করতে হবে। একটি উদ্ভিদ যেমন জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও মরে যেতে পারে যদি তারা আনুগত্যের সাথে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যেমন ঐশ্বরিক শিক্ষায়

বর্ণিত হয়েছে। সহজ কথায়, যদি একজন ব্যক্তির ভাল কাজের অভাব থাকে তবে তার মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"*

এই আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের নিজেদের অলসতা বা নিজেদের খারাপ আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য অন্যদের কাজের সাথে তাদের নিজের কাজের তুলনা করার মানসিকতা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ ক্রমাগত তাদের আচরণের সাথে অন্যদের আচরণের তুলনা করে যারা তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান যে নামাজ পড়ে না সে নিজেকে একজন খুনীর সাথে তুলনা করবে যার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব জায়েজ হবে। আয়াত 134 এর শেষের দ্বারা নির্দেশিত, এই মনোভাব একজন মূর্খ ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি পরকালে তাদের সাহায্য করবে না, কারণ একজন ব্যক্তিকে অন্যের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং তাদের সাথে তুলনা করা হবে না। অন্যদের আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে যে একক মানদণ্ডের তুলনা করা হবে তা হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এই যুগে, এটি বোঝায় যে একজন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে কতটা শিখে এবং আমল করে।

একইভাবে, একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অভাবের জন্য অজুহাত তৈরি করা উচিত নয়, এই দাবি করে যে অন্যরা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তার এই দাবি করে নিজেকে আরও ভালো বোধ করা উচিত নয় যে অন্য কারো পক্ষে ইসলামিক জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তাদের শক্তি এবং সময় উৎসর্গ করা সহজ কারণ তারা শুধুমাত্র খণ্ডকালীন কাজ করে। একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল অলসতাকে বাড়িয়ে তুলবে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যদিও এর অর্থ তারা অন্যদের তুলনায় কম ভাল কাজ করে, কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণ নয় গুণমান দেখেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।*"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের নিজস্ব আচরণে মনোনিবেশ করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ বিচারের দিনে এই বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে না, যেমন পূর্ববর্তী প্রজন্মের আচার-আচরণ, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা

করা শুধুমাত্র একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদেশ দেওয়ার একটি কারণ যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানকে উত্তম করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা উদ্বেগহীন বিষয়গুলো পরিহার করে। তাদের তাই একজনের ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হওয়া অবশ্যই একজনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 142-145

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ
وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٤٢

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ
شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ
عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ
بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣

قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ
ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ
لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٤٤

وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٖ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٖ قِبۡلَتَهُمۡۚ وَمَا
بَعۡضُهُم بِتَابِعٖ قِبۡلَةَ بَعۡضٖۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ
إِنَّكَ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٥

"মানুষের মধ্যে মূর্খরা বলবে, "কীসে তাদেরকে তাদের কেবলা [নামাজের দিক] থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যার মুখোমুখি তারা ছিল?" বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী [ভারসাম্যপূর্ণ] সম্প্রদায় বানিয়েছি যে, তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হবে এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন। আর আমরা কিবলা [নামাযের দিক] করিনি যেটি আপনি মুখ করতেন তবে আমরা স্পষ্ট করতে পারি যে কে রসূলের অনুসরণ করবে সেখান থেকে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ছাড়া এটি কঠিন। এবং আল্লাহ কখনই আপনাকে আপনার বিশ্বাস হারাতেন না [আপনার পূর্বের প্রার্থনা]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।

আমরা অবশ্যই আপনার [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে স্বর্গের দিকে মুখ ফেরানো দেখেছি এবং আমরা অবশ্যই আপনাকে এমন একটি কিবলার দিকে [প্রার্থনার দিক] ফিরিয়ে দেব যা আপনি খুশি হবেন। সুতরাং আপনি [নিজেকে] আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে মুখ করুন। আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাক না কেন, তার দিকে [নিজেদের] মুখ ফিরিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে [ইহুদি ও খ্রিস্টানরা] তারা ভালো করেই জানে যে, এটা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে আপনি যদি প্রতিটি নিদর্শন নিয়ে আসেন, তবে তারা আপনার কেবলা অনুসরণ করবে না। কিংবা আপনি তাদের কেবলার অনুসারী হবেন না। কিংবা একে অপরের কেবলার অনুসারীও হবে না। সুতরাং তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মূর্খরা বোকা কথা বলে কারণ তারা তাদের বক্তৃতার পরিণতির গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

"মানুষের মধ্যে মূর্খরা বলবে..."

ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে যাতে তারা তাদের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, কারণ এটি বিচারের দিনে জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ। জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বক্তব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণী হল পাপপূর্ণ কথাবার্তা, যেমন গীবত, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তৃতা হল পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা। বক্তৃতার চূড়ান্ত শ্রেণী হল অসার বক্তৃতা। যদিও এটিকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় না, তবুও কম নয়, এটি প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা প্রায়ই অন্যদের গীবত করার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জন্য নিরর্থক বক্তৃতা একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা সম্ভাব্য পুরষ্কার লক্ষ্য করে যদি তারা নিরর্থক বক্তৃতা পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে উপকারী কথা বলে তবে তারা প্রাপ্ত হতে পারত। তাই ভালো কথা বলা বা নীরব থাকার মাধ্যমে পাপ ও অসার কথা পরিহার করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের নীরবতার জন্যও পুরস্কৃত করা হবে, যেমনটি সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে।

আলোচনার অধীন প্রধান আয়াতগুলি কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে যেখানে সমস্ত মুসলমান তাদের নামাজ পড়ার সময় ফিরে আসে। মদিনায় হিজরত করার পূর্বে এবং হিজরতের পর দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ জেরুজালেমের মসজিদে আকসার দিকে মুখ করে থাকতেন। মক্কায় অবস্থানকালে, মহান আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে মুখ করার সময় এটি অর্জিত হয়েছিল, কিন্তু মদিনায় উভয় দিক মিলিত হতে পারেনি এবং তাই তারা মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে মসজিদ আকসার মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে মুখ করার জন্য আকুল হয়েছিলেন, মহান আল্লাহ স্থায়ীভাবে এর দিকে প্রার্থনার দিক পরিবর্তন করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 248-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু প্রাথমিক প্রার্থনার দিকটি ছিল জেরুজালেমের মসজিদ আকসা, এটি বইয়ের লোকদের খুশি করেছিল, কারণ এটি তাদের প্রার্থনার দিকও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করবে যে তারা সঠিক পথে ছিল কারণ তারা সেই দিকটির মুখোমুখি হয়েছিল যা মহান আল্লাহকে খুশি করেছিল। যখন মক্কায় প্রার্থনার দিক পরিবর্তন করা হয়েছিল তখন এটি তাদের দাবিকে মিথ্যা বলেছিল, যা আয়াত 142 এ নির্দেশিত। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 142:

"মানুষের মধ্যে মূর্খরা বলবে, "কীসে তাদেরকে তাদের কেবলা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যার মুখোমুখি তারা?"...

এই বিবৃতিটিও ছিল ইসলামের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার তাদের উপায়, কারণ তারা দাবি করেছিল যে এটি যদি সত্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হতো, তাহলে প্রথম দিন থেকেই মুসলিমরা সঠিক কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পরিচালিত হতো। অর্থ, ইসলাম যদি সত্য হতো, তাহলে বছরের পর বছর তাদের প্রার্থনার দিক পরিবর্তন করতে হতো না।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেন যে, সমগ্র সৃষ্টির মালিক যেহেতু তিনি একা, তিনিই সিদ্ধান্ত নেন মুসলমানরা তাদের নামাজের জন্য কখন এবং কোন দিকে মুখ করবে। তিনি যদি এই দিকটি প্রতিদিন পরিবর্তন করতে চান তবে অন্য কারও এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

"... বলুন, "আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম..."

উপরন্তু, কেন্দ্রবিন্দু প্রার্থনার জন্য একটি দিকনির্দেশের চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে এটি মুসলমানদের জন্য একটি অনুস্মারক যা তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজকে ক্রমাগত সেই দিকে ঘুরিয়ে দেয় যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, ঠিক যেমন তাদের দেহ প্রার্থনার জন্য মক্কার দিকে ফিরে যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারের অধীন, সেহেতু তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলা ছাড়া একজন ব্যক্তির আর কোনো বিকল্প নেই। একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে থাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে যেমন একজন ব্যক্তি সমস্যায় পড়বেন, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই সমস্যায় পড়বেন। . একজন ব্যক্তি একটি দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারে যদি তারা তার নিয়মে সন্তুষ্ট না হয় তবে তারা এমন জায়গায় পালাতে সক্ষম হবে না যেখানে মহান আল্লাহর বিধান এবং এখতিয়ার প্রযোজ্য নয়। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের স্বার্থে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে, সে

মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। আয়াত 142 এর শেষের দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে , এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

"...তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।"

অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

অথচ, যে ব্যক্তি মহাবিশ্বের মধ্যে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, সে একমাত্র তারই মালিক, সে উভয় জগতের শান্তি ও সাফল্যের পথ পাবে না। পরিবর্তে, তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

" *মানুষের মধ্যে মূর্খরা বলবে, "কীসে তাদেরকে তাদের কেবলা [নামাজের দিক] থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যে দিকে তারা মুখ করত?"..."*

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, প্রতিটি সমালোচনাই গ্রহণযোগ্য এবং তার উপর আমল করার যোগ্য নয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে গঠনমূলক

সমালোচনাকে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা উপেক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে যখন এটি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে, যখন এটি প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না এবং এমনকি যদি এটি একটি প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে। দুঃখজনকভাবে, অনেকে অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা আবেগগতভাবে এবং কার্যত প্রভাবিত হয়। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত সমালোচনা, পার্থিব প্রমাণ এবং যুক্তি মেনে নেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করার আগে তুলনা করে। যতক্ষণ কেউ এই মানসিকতা অবলম্বন করবে ততক্ষণ তারা গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করবে এবং তার উপর কাজ করবে যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণকে উন্নত করে এবং তাদের পার্থিব বিষয়গুলিকে উন্নত করে এবং তারা বুঝতে পারবে কখন এর দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়ে গঠনমূলক সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

" *মানুষের মধ্যে মূর্খরা বলবে, "কিসে তাদেরকে তাদের কেবলা [নামাজের দিক] থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যে দিকে তারা মুখ করে থাকত?" বল, "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই.."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখনই কেউ জীবনে এমন একটি পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যা তার চারপাশের পথ থেকে আলাদা, এটি প্রায়শই সমালোচনার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকেও। যখন কেউ একটি ভিন্ন পথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন অন্যরা বিরক্ত বোধ করবে কারণ এটি তাদের পথকে ভুল বলে মনে করে, এমনকি যদি নতুন পথ বেছে নেওয়া ব্যক্তি এইভাবে অনুভব না

করেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে হবে, এমনকি যদি এর ফলে তারা তাদের কাছ থেকে সমর্থন আশা করে, যেমন তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলে, তাকে তাদের সকল বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা, মানসিক শান্তি এবং তাদের সমালোচনাকারীদের থেকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, যদিও এতে কিছুটা সময় লাগে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 142:

"...তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।"

মহান আল্লাহর নির্দেশনা সকলের জন্য উপলব্ধ, পার্থিব বিষয় নির্বিশেষে যা মানুষকে অন্যদের থেকে পৃথক করে, যেমন সামাজিক শ্রেণী, লিঙ্গ এবং জাতিগততা। কিন্তু সঠিক পথনির্দেশ তারাই পাবে যারা তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এর সাথে ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও আমল করা জড়িত। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামে বিশ্বাসের দাবী করেও ইসলামিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে সঠিক পথনির্দেশ পাবে না, কারণ হেদায়েত পেতে হলে প্রকৃত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কর্মের প্রয়োজন হয়।

এরপর মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"এবং এইভাবে আমরা আপনাকে একটি মধ্যম সম্প্রদায় করেছি..."

ইসলাম সকল বিষয়ে ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। একটি ভারসাম্য যা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পর্যাপ্তভাবে আল্লাহর অধিকার, মানুষের অধিকার এবং তাদের নিজস্ব অধিকার পূরণ করবে, পাশাপাশি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে যাতে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার বিরাজ করে এবং যাতে তারা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির একটি উদাহরণ হল ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া ত্যাগ করতে শেখায় না এবং শুধুমাত্র পরকালে সাফল্য অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করে। বা এটা তাদের শিক্ষা দেয় না যে তারা পার্থিব সাফল্য অর্জনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে উপেক্ষা করবে। পরিবর্তে, এটি মুসলমানদেরকে তাদের দেওয়া বৈধ পার্থিব সম্পদ এবং সুযোগগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায়, অর্থাত্, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যদিও একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করা এমন কিছু যা সমস্ত মানুষের, তাদের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা নির্বিশেষে, এটি কখনই শুধুমাত্র মানুষের কাছে থাকা জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্জন করা যায় না। মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার অধ্যয়নে যতই অগ্রগতি অর্জন করা হোক না কেন, তারা কখনই এটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ একাই এই জ্ঞানের অধিকারী, কারণ তিনি একাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা, যা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"এবং এইভাবে আমরা আপনাকে একটি মধ্যম সম্প্রদায় করেছি..."

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম গঠনের জন্য পূর্ববর্তী জাতিদের দ্বারা গৃহীত চরম মনোভাব সংশোধন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ধর্ম একটি নিষ্ক্রিয় মানসিকতা গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা এমনকি নিজেদের রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা নিপীড়িত হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মগুলি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিল যা অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করেছিল। কিছু ধর্ম উত্তম নৈতিকতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে চরম হয়ে উঠেছে তবুও আইন পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্যান্য ধর্ম বিপরীত করেছে। কিছু ধর্ম সম্পূর্ণরূপে এই জগতের দিকে মনোনিবেশ করেছে, অন্যরা শুধুমাত্র পরকালের সাথে নিজেকে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। এই সব, এবং আরও, চরম মনোভাব যা সময়ের সাথে উদ্ভাবিত হয়েছিল ইসলাম দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে। এটি মানুষকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে শেখানোর মাধ্যমে এটি অর্জন করেছে যাতে তারা মন ও শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করতে পারে যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। যখনই কেউ এই পন্থা পরিত্যাগ করে তারা অবশেষে একটি চরম মনোভাব গ্রহণ করবে, যা মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যহীন অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ একজনকে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়।

মহান আল্লাহ তারপর মুসলিম সম্প্রদায়ের আরও একটি ভূমিকার রূপরেখা দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

" এবং এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম [ভারসাম্যপূর্ণ] সম্প্রদায় বানিয়েছি যাতে তোমরা জনগণের সাক্ষী হবে..."

মুসলিম জাতি তখনই বাকি মানবজাতির উপর সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর দূত হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

“ তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

এটি বাকি মানবজাতির জন্য একটি রোল মডেল হওয়া জড়িত যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে। একজন মুসলিম তখনই তা অর্জন করবে যখন তারা তাদের চরিত্র, কথা ও কাজকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী গঠন করবে। যে এটা করতে ব্যর্থ হবে সে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং এর ফলে তারা অমুসলিম ও অন্যান্য মুসলমানদের ইসলামকে অপছন্দ করবে। একজন মুসলমান ইসলামের দূত হিসাবে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করার মুহুর্তে তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং যদি তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের ব্যর্থতার জন্য দুনিয়া এবং পরকালে জবাব দেবে। আয়াত 143 এর পরবর্তী অংশে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 143:

"...যে তোমরা জনগণের উপর সাক্ষী হবে এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন..."

একইভাবে একজন রাজার দূতকে বরখাস্ত করা হবে যদি তারা রাজাকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মুসলিমরা যদি আল্লাহ, মহান এবং তাঁর ধর্মকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মহান আল্লাহ, তারপর জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার মসজিদ আল হারামে মুসলমানদের কেন্দ্রিক দিক পরিবর্তন করার একটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...আর আমরা কেবলা বানাইনি যে কেবলাকে তুমি মুখ করতে, তবে আমরা স্পষ্ট করতে পারি যে কে রাসুলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে..."

পরীক্ষাটি সহজ যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে যে দিকনির্দেশনা দেন তা অনুসরণ করবে কি না। এই পরীক্ষাটি ইসলামী শিক্ষায় প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাদের মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করে, তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে যাবে, এমনকি তা তাদের ইচ্ছা বা অন্য লোকের ইচ্ছার বিপরীত হলেও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজেদের প্রবৃত্তির ইবাদত করে সে

তখনই মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে যাবে যখন তা তাদের জন্য উপযুক্ত হবে। তাই, দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করার জন্য ইসলামী শিক্ষায় প্রদত্ত আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশের মাধ্যমে মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ যে সঠিক পথনির্দেশের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...আর আমরা কেবলা বানাইনি যে কেবলাকে তুমি মুখ করতে, তবে আমরা স্পষ্ট করতে পারি যে কে রাসুলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে..."

এই পরীক্ষার আরেকটি দিক হল আলোকিত করা যে, কে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, যখন কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনকে কিতাবের লোকেরা চ্যালেঞ্জ করেছিল। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন মিথ্যাভাবে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যে ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, কারণ y দাবি করেছিল যে ইসলাম সত্য হলে প্রথম দিন থেকেই সঠিক কেন্দ্রবিন্দুটি বেছে নেওয়া হত। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে কে মানবে আর কে অমান্য করবে তা দেখার জন্য কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন কেবল একটি পরীক্ষা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন..."

এর অর্থ এইও হতে পারে যে, কিতাবের লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বা যারা ইসলাম গ্রহণের কথা ভাবছিল তাদের জন্য এটি কঠিন ছিল কারণ তারা ইসলামের আগমনের আগে তাদের প্রার্থনার জন্য জেরুজালেমের মুখোমুখি হয়ে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তারা যদি সত্যের উপর অটল থাকে তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ দান করতেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

“...এবং আমরা কেবলা বানাইনি যে কেবলাকে তুমি মুখ করে থাকো ব্যতীত এই জন্য যে আমরা স্পষ্ট করে দিই যে কে রাসূলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন..."

এর অর্থ এইও হতে পারে যে, যখন মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় পরিবর্তিত হয়, তখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মদীনায় হিজরত করার পর মক্কার অমুসলিমদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া ও সংগ্রাম শেষ হয়নি। মহান আল্লাহ এমন কোন কেন্দ্রবিন্দু বেছে নেবেন না যা মূর্তিপূজারীদের হাতে থাকবে। এর অর্থ হল, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য মক্কার অমুসলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে তা সময়ের ব্যাপার মাত্র। মহান আল্লাহর ঘর, কাবা এবং মক্কাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর একত্বের আলোকবর্তিকা হিসাবে তৈরি করা। এই সংগ্রামকে মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে সাহাবাদের জন্য কঠিন ছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বিশেষ করে বহু বছর ধরে তারা মক্কার অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার পর। কিন্তু যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাদের ভূমিকাকে মেনে নিয়েছিল, তারা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যকে অটল রেখেছিল এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা অনুসরণ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই অবিচল মনোভাব অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে, পবিত্র কুরআনের পথ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অটল থাকে, এই পথ যেদিকেই নিয়ে যায় না কেন। তারা এবং যাই হোক না কেন তারা পথ বরাবর সম্মুখীন হতে হবে. কেবলমাত্র এই আচরণের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্য লাভ করবে, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

“...এবং আমরা কেবলা বানাইনি যে কেবলাকে তুমি মুখ করে থাকো এই জন্য যে আমরা স্পষ্ট করে দিই যে কে রাসুলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন..."

কেন্দ্রবিন্দুতে এই পরিবর্তনের একটি উদ্দেশ্য ছিল এটা স্পষ্ট করা যে কে অযৌক্তিক কুসংস্কার দ্বারা অন্ধ হয়ে গেছে এবং ভূমি ও রক্তের প্রতি নির্বোধ সংযুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং যারা এই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে এই নীচ মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম ছিল এবং এর পরিবর্তে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং সত্যকে মেনে চলুন, যে পথেই এটি তাদের নিয়ে যায়।

একদিকে আরবরা ছিল যারা তাদের জাতীয় ও জাতিগত অহংকারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের জন্য, জেরুজালেমকে তাদের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করা, যা ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাদের জাতীয় অহংকারকে সহজে গ্রহণ করা খুব কঠিন ছিল। অন্যদিকে, বইয়ের লোকেরা মূলত আলাদা ছিল না। তারাও জাতিগত অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যাতে তাদের জন্য অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কেন্দ্রবিন্দু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা কঠিন ছিল। যাদের অন্তর এমন মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তারা কিভাবে মহান আল্লাহর দাসত্বে সাড়া দিতে পারে? তাই, মহান আল্লাহ তায়ালা দেখেছিলেন যে, জেরুজালেমকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করে এই ধরনের মূর্তির পূজারীদেরকে তাঁর প্রকৃত উপাসকদের থেকে আলাদা করা হয়েছে। এটি তাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে বাধ্য ছিল যারা আরব এবং এর রীতিনীতির পূজা করত। পরবর্তীতে, মক্কার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের ফলে যারা

ইসরায়েলের মূর্তির পূজায় নিমগ্ন ছিল তাদের বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। এইভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কেবলমাত্র তারাই অবশিষ্ট ছিল যারা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত ও আনুগত্য করে না।

তাই, মুসলমানদেরকে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বাবস্থায়, জাতীয়তাবাদ, গোত্রীয় সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে। আত্মীয়তা

সালাতের দিক পরিবর্তন হলে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, অন্যান্য সাহাবীদের নামায কি আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা পরিবর্তনের আগে মারা গেছেন? প্রার্থনা দিক, কবুল হবে. মহান আল্লাহ, তারপর অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 143 নাজিল:

"...এবং আল্লাহ কখনোই আপনাকে আপনার ঈমান [অর্থাৎ আপনার পূর্বের নামাজ] হারাতে দেবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

সহীহ বুখারীর ৪০ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হল সাহাবায়ে কেরামের আন্তরিকতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, একে অপরের জন্য। তারা সবসময় একে অপরের সাফল্য নিয়ে

উদ্বিগ্ন ছিল। সহীহ মুসলিম, 196 নম্বর হাদিস অনুসারে এইভাবে অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য দিক। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে যেখানে তারা কেবল তাদের নিজের মঙ্গল বা তাদের প্রিয়জনের মঙ্গল সম্পর্কে চিন্তা করে। . একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাথে তাদের বন্ধন নির্বিশেষে আন্তরিকতা অবলম্বন করতে হবে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেভাবে সে নিজে অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 13 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রকৃত মুমিনের সংজ্ঞা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

“…এবং আল্লাহ কখনোই আপনাকে আপনার ঈমান [অর্থাৎ আপনার পূর্বের নামাজ] হারাতে দেবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ এই আয়াতে নামাজের জায়গায় ঈমান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ নামাজ কায়েম না করে কেউ প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হতে পারে না। এটি, আবারও, একজনের বিশ্বাসকে কর্মে বাস্তবায়িত করার গুরুত্ব তুলে ধরে। শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত একা বিশ্বাসের মূল্য নেই। মুসলিম শব্দের সংজ্ঞার অর্থ হল সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের জিহ্বা দিয়ে ঈমানের দাবি করার বিভ্রান্তিকর মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং তাদের কর্মে তা দেখাতে ব্যর্থ হবে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলো দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এই কর্মের

অন্তর্ভুক্ত। যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় তার উচিত এটি হারানোর ভয়। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। যেমন একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হয়, যেমন জল, মরে যায়, তেমনি একজন মুসলিমের ঈমানও ভালো হতে পারে যে আনুগত্যের সাথে তাদের ঈমানকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। আয়াত 143 এর চূড়ান্ত অংশ দ্বারা নির্দেশিত, উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্যের কাজগুলি প্রতিটি ব্যক্তির করার শক্তি এবং উপায়ের মধ্যেই রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ কখনো একজন আত্মাকে বোঝা করেন না। তারা সহ্য করতে পারে তার চেয়ে বেশি, এর মধ্যে আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, পরামর্শ বা পরীক্ষা জড়িত কিনা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 143:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

উপরন্তু, ভাল কাজ করার জন্য খুব শক্তি, সুযোগ, ক্ষমতা, জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণা মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। এটি মনে রাখা একজনকে তাদের আনুগত্যের কাজের উপর গর্ব করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এগুলো মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের সামান্য অংশ মাত্র। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

মহান আল্লাহ তারপর ব্যাখ্যা করেন যে উপায়ে মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার মসজিদ আল হারামে পরিবর্তন করা হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

" *আমরা অবশ্যই আপনার মুখ [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] স্বর্গের দিকে ফেরানো দেখেছি এবং আমরা অবশ্যই আপনাকে একটি কিবলার [প্রার্থনা দিক] দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি খুশি হবেন। সুতরাং আপনি আপনার মুখ আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে করুন..."*

এটি আরেকটি স্থান যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান মর্যাদাকে তুলে ধরে। তিনি মহানবী ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মহান আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্রবিন্দু হতে চেয়েছিলেন। এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই বিশাল মর্যাদা আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যার অর্থ, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যে দিকেই ফিরতে নির্দেশ দিতেন, সেদিকেই ফিরতেন। কোনো দ্বিধা বা অলসতার লক্ষণ না দেখিয়ে। তাঁর প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে। এই ক্ষেত্রে, তিনি তার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, কারণ তিনি মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তার মহৎ আচরণে তাকে

অনুসরণ করতে হবে, বিনা দ্বিধায় বা অলসতা ব্যতিরেকে তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজকে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে এবং তাদের অবশ্যই শিখতে হবে। আল্লাহর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া , তারা যা চায় তা তাকে বলার জন্য তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে , যেমন একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রায়শই সমস্যার দিকে নিয়ে যায় উভয় জগতে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায় ব্যবহার করে। , এবং বিশ্বাস করুন যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা পছন্দ করেন তা সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তার পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে পার্থিব জিনিস চাওয়া থেকে বিরত থাকা, কারণ একজন বিজ্ঞ মুসলিম জানে না যে তারা যা চায় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম কি না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিবর্তে, তাদের সাধারণ পার্থিব সুস্থতার জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, যিনি তাদের জন্য সর্বোত্তম জানেন। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শে বিশ্বাস করে, গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 201:

" কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

যে ব্যক্তি এই আচরণ করবে তাকে সর্বদা সেই পথের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যা তাদের সন্তুষ্ট করে, যদিও এই পথটি তাদের কাছে আগে থেকে অস্পষ্ট ছিল, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। নির্দেশনা যা তাকে খুশি করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"... *এবং আমরা অবশ্যই আপনাকে একটি কিবলার [প্রার্থনার দিক] দিকে ঘুরিয়ে দেব যা দিয়ে আপনি খুশি হবেন..."*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের এই মনোভাব তাঁর আচার-আচরণে ১৪৪ নং আয়াতের পরবর্তী অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"... *আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাকো না কেন, তার দিকে [নিজেদের] মুখ ফিরিয়ে নাও..."*

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থের লোকদের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের বিষয়ে তাদের সমালোচনার জন্য সমালোচনা করেন, যদিও তারা জানত যে চূড়ান্ত জাতির কেন্দ্রবিন্দু, মুসলিম জাতির, সর্বদা আল্লাহর ঘর বোঝানো হয়েছে, মহান, কাবা, মক্কায়, যেমনটি তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"... প্রকৃতপক্ষে, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে [ইহুদি ও খ্রিস্টানরা] তারা ভাল করেই জানে যে এটি তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

কিসের উপর কাজ করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষা থেকে চেরি বাছাই করার অভ্যাস ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 85:

"...তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করেন এবং অন্য অংশে অবিশ্বাস করেন? তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে তাদের শাস্তি বর্তমান জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি হতে পারে? এবং, বিচারের দিন, তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই ইসলামের সমস্ত শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অবকাশ দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয়, কারণ তিনি মানুষকে তাদের পাপের জন্য অবিলম্বে শাস্তি দেন না যাতে তাদের অনুতপ্ত হওয়ার এবং সংস্কার করার সুযোগ দেওয়া হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

"এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীই ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা যে অবকাশ দিয়েছেন তা সীমিত এবং কেউ যদি তাদের দেওয়া অবকাশ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"... এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

মহান আল্লাহ তখন কিতাবধারীদের একগুঁয়ে স্বভাব তুলে ধরেন, যারা পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল, যেমন তাদের উভয়েরই ছিল। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 145:

" *এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে আপনি যদি প্রতিটি নিদর্শন নিয়ে আসেন, তবে তারা আপনার কেবলা [প্রার্থনা নির্দেশনা] অনুসরণ করবে না। কিংবা আপনি তাদের কেবলার অনুসারী হবেন না। কিংবা তারা একে অপরের কেবলার অনুসারী হবে না...*"

তারা শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল যখন ইসলাম তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দিত এবং তারা ভয় করত যে ইসলাম তাদের সমাজে তাদের অর্জিত উচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 145:

" *এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে আপনি যদি প্রতিটি নিদর্শন নিয়ে আসেন, তবে তারা আপনার কেবলা [প্রার্থনা নির্দেশনা] অনুসরণ করবে না ...*"

আয়াতের এই অংশটি মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তির কাছে সত্য ব্যাখ্যা করে তাদের সময় নষ্ট না করার জন্য যিনি ইতিমধ্যেই তাদের মন তৈরি করেছেন। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। মনোযোগ এবং যত্নের যোগ্য একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে খোলা মনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সত্যকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে চান। যারা আগে থেকেই তাদের মন

তৈরি করেছে তাদের জন্য সময় উৎসর্গ করা শুধুমাত্র অগঠনমূলক বিতর্ক এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 145:

"... কিংবা আপনি তাদের কেবলার অনুসারী হবেন না..."

আয়াতের এই অংশটি, অন্যান্য সমাজকে খুশি করার জন্য মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস না করার জন্য সতর্ক করে। অন্যান্য সমাজের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা, ইসলাম যা আদেশ করে এবং অন্য সমাজের লোকদের খুশি করার জন্য নিজের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে।

নির্দেশনার দুটি উত্স, পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সকল উৎসকে এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি তারা ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেহেতু একজন ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 145:

"... তারা একে অপরের কেবলার অনুসারীও হবে না..."

উপরন্তু, আয়াতের এই অংশটিও হাইলাইট করে যে কিতাবের দুই সদস্য, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই সত্যিকারের একত্রিত হবে না, এমনকি যদি এটি বিশ্বের অন্যান্য অংশে সেভাবে প্রদর্শিত না হয়। কারণ তারা একে অপরের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি করে তা সর্বদা পার্থিব লাভের উপর ভিত্তি করে থাকবে, যেমন সম্পদ এবং ক্ষমতা। পার্থিব জিনিসগুলি প্রকৃতিগতভাবে অস্থির, তাই জাগতিক জিনিসের উপর ভিত্তি করে সমস্ত বন্ধন অবশেষে সময়ের সাথে সাথে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে ভেঙে যায়। এটি ইতিহাসে বেশ স্পষ্ট, যখন শক্তিশালী মিত্ররা শেষ পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যেকার পার্থিব বন্ধুত্বের বন্ধন সময়ের সাথে সাথে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে ছিন্ন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন কারণ তারা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল, পার্থিব জিনিস নয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যান্য সমস্ত বন্ধন, এমনকি পারিবারিক বন্ধনের চেয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ এটি তাদের মধ্যে ঐক্যের দিকে পরিচালিত করবে, কারণ তাদের সকলের একটি অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে, পবিত্র কুরআনের উপর আমল করে মহান আল্লাহকে খুশি করা। এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। যখন একটি গোষ্ঠীর একটি অভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

মহান আল্লাহ তারপর একটি গভীর সুনির্দিষ্ট এবং সাধারণ সত্য নির্দেশ করেন। বইয়ের লোকেরা যেহেতু কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করেছিল, যেহেতু তারা চেরি বেছে নিয়েছিল কোন ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি অনুসরণ করতে হবে, কোনটি সম্পাদনা করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে, তাদের বিশ্বাস তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপাসনা ছাড়া আর কিছুর উপর ভিত্তি করে ছিল না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 145:

"... সুতরাং আপনি যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করতেন ..."

মহান আল্লাহ তাদের ধর্ম বা বিশ্বাস অনুসরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেননি, বরং তিনি তাদের বিশ্বাস এবং জীবনযাপনের সত্যতা নির্দেশ করেছেন যে এটি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপাসনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেন যে, এই পৃথিবীতে জীবনের পথ ও পথ মাত্র দুটি। সঠিক পথ ও জীবন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, যে আশীর্বাদগুলো একজনকে দেওয়া হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। . এই পথগুলি উভয় জগতেই মনের শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দ্বিতীয় পথটি হল নিজের ইচ্ছাপূরণের পথ। এই পথ অনেক রূপ নিতে পারে কিন্তু এই রূপের সারমর্ম একই। এটি একজনের ধর্মের শিক্ষা থেকে চেরি বাছাইয়ের রূপ নিতে পারে, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য লোকেদের আনুগত্য করা এবং অনুসরণ করা। এই সবের সারমর্ম হল নিজের ইচ্ছা এবং অন্যের ইচ্ছা পূরণ করা। এই পথটি উভয় জগতে দুঃখ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি কেউ মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে এবং এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, কারণ কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আয়াত 145 এর শেষে এই দুটি পথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 145:

"... *সুতরাং তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।*"

এই আলোচনার সত্যতা বোঝার জন্য ইতিহাস এবং তাদের চারপাশের লোকদের পর্যবেক্ষণ করা এবং তারপরে তারা নিজের জন্য কোন পথ বেছে নেবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, কারণ কেউ তাদের পছন্দ এবং কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারবে না।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 146-147

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ
وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١٤٧

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেভাবে চেনে যেভাবে তাদের সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তাদের একদল সত্যকে গোপন করে, অথচ তারা জানে।

সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, কাজেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

এই আয়াতগুলোর প্রথম অংশকে বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেভাবে চেনে যেভাবে তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তাকে সর্বনাম হতে পারে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ করে। এটি ইঙ্গিত করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতা কিতাবধারী আলেমদের কাছে পরিচিত ছিল যেভাবে তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু গুণাবলী যা তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে তা সহীহ বুখারীর 2125 নম্বর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবধারী আলেমগণ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেভাবে চেনে যেভাবে তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

সর্বনাম তাকেও বোঝাতে পারে, যার অর্থ এটি পবিত্র কুরআনকে নির্দেশ করতে পারে। কিতাবধারী আলেমগণ পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিলেন। একটি নির্দিষ্ট লেখকের সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি সহজেই তাদের কাজ চিনতে পারেন। এছাড়া পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও পবিত্র কুরআন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আবার এই জ্ঞানকে কিছু আলেম কিতাবের লোকদের থেকে গোপন ও সম্পাদনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেভাবে চেনে যেভাবে তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন এবং এই সত্যটি কিতাবের লোকদের কাছে কীভাবে পরিচিত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, তাই সর্বনাম তিনি, যার অর্থ হতে পারে, এটি মুসলমানদের চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দুকেও নির্দেশ করতে পারে, যা হল ঘর। মহান আল্লাহর, মসজিদ আল হারাম, মক্কায়। কিন্তু আবার এই জ্ঞানকে কিছু আলেম কিতাবের লোকদের থেকে গোপন ও সম্পাদনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

প্রতিটি ক্ষেত্রেই, কিতাবধারী আলেমরা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ হল এটি তাদের জীবন পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার অভ্যাস ছিল এবং ইসলাম এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং মানুষকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। উপরন্তু, ইসলামের আগমন তাদের সমাজে তাদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেবে। অধিকন্তু, গ্রন্থের লোকেরা, বিশেষ করে ইহুদীদের বিশ্বাস বংশকে কেন্দ্র করে ছিল বলে তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে পারেনি, কারণ তিনি তাদের থেকে ভিন্ন বংশের ছিলেন। যদি তারা তাকে গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে তবে এটি তাদের বংশের কারণে বাকি মানবজাতির থেকে শ্রেষ্ঠত্বের তাদের মিথ্যা দাবিকে ধ্বংস করে দেবে। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার সেই অংশগুলিকে উপেক্ষা করার এই মনোভাব পরিহার করতে হবে যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং জেনে রাখা উচিত যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের

জন্য সবচেয়ে ভাল, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই জ্ঞানী ধৈর্যশীল ব্যক্তি যেভাবে মানসিক ও দেহের শান্তি লাভ করবে, সেইভাবে সেই মুসলমান যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, পবিত্র কুরআনে এবং এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এমনকি যদি এই আচরণ তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী হয়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

কিন্তু যে চেরি জেনেশুনে কোন ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে তা বেছে নেয়, সে তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের থেকে দরকারী জ্ঞান গোপন করার এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৯ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে তাকে বিচারের দিন আগুনে লাগাম দেওয়া হবে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের অর্জিত দরকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। না করাটা নিছক বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য যে যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র দরকারী জ্ঞানই শেয়ার করতে হবে না বরং সর্বদা সত্যের উপর কাজ করতে হবে। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে তাদের নিয়তে সত্যবাদিতা অবলম্বন করবে। তাদের বক্তৃতায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তারা শুধু ভালো ও সত্য কথাই বলে অথবা নীরব থাকে। এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে তাদের কর্মে সত্যতা অবলম্বন করতে হবে। যে ব্যক্তি এই আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করবেন। অথচ যে ব্যক্তি তাদের নিয়তে, কথায় ও কাজে মিথ্যাকে অবলম্বন করবে, তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিচার দিবসে মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তার কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও আলেম লাগে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

এটি তখনও ঘটতে পারে যখন একজনের জ্ঞান থাকে কিন্তু তাতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, ইসলামি ও পার্থিব জ্ঞান তখনই কাজে লাগে যখন কেউ এর উপর আমল করে, অন্যথায় ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্য খুবই কম। যেমন নিরাপত্তার পথের জ্ঞান থাকা কারো উপকারে আসবে না যতক্ষণ না তারা প্রকৃতপক্ষে পথে যাত্রা করে এবং নিরাপদে না পৌঁছায়, তেমনি ইসলামিক জ্ঞান উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় যখন এটি কার্যকর না হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

"... *কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একটি দল সত্য গোপন করে যখন তারা জানে।*"

এই আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে, সমস্ত কিতাবের লোকেরা এইভাবে আচরণ করেনি। তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে মঞ্জুর করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

অতঃপর মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন, অন্যের কর্মের কারণে ইসলামের সত্যতা নিয়ে সন্দেহের মধ্যে না পড়তে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 147:

"সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, কাজেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন অমুসলিম এবং অন্য মানুষের কর্মের উপর ভিত্তি করে ইসলাম ও এর শিক্ষার বিচার করা এড়িয়ে চলা একজন অমুসলিম এবং একজন মুসলমানের কর্তব্য। পরিবর্তে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা, এবং যেকোনো পার্থিব বিষয়ের কাছে খোলা মনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং একটি প্রামাণিক উত্সের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে হবে যাতে এটি সত্য কিনা। দুঃখজনকভাবে, অনেক অজ্ঞ মুসলিমরা অন্য মুসলিমদেরকে দেখে যারা ধারণা করা হয় জ্ঞানের অধিকারী তাদের খারাপ ব্যবহার করে এবং ধরে নেয় যে ইসলাম এই ধরনের আচরণ শেখায়, যখন তা করে না। মহান আল্লাহ কখনোই একজন মুসলিমের অজুহাত গ্রহণ করবেন না যে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা এড়িয়ে চলে, যেমনটি অন্য লোকেদের দ্বারা যারা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে তাদের দ্বারা তা করা থেকে বিরত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের জন্য সত্য অনুসন্ধান এবং সনাক্ত করার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করার জন্য দায়ী।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্য লোকেদের কাছে ইসলামের ভুল বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা তাদের ইসলাম সম্পর্কে শেখা থেকে বিরত

রাখে। প্রত্যেক মুসলমান পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাই এই দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকবে। এই দায়িত্ব তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কেউ পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের চরিত্র পরিবর্তন করে, যাতে অন্যরা তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতাকে চিনতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 147:

"সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, কাজেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের মতো লোকেরা প্রায়শই একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা শিখতে এবং আমল করতে হবে কিনা সন্দেহের মধ্যে পড়তে পারে। একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের সঙ্গীকে বুদ্ধিমানের সাথে বেছে নিতে হবে কারণ তারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে। অজ্ঞতার কারণে, একজন আত্মীয় বা বন্ধু অন্যদেরকে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা আন্তরিকভাবে তাদের সঙ্গীকে উপদেশ দিচ্ছে। এটি এড়ানোর জন্য এবং সাধারণভাবে ঈমানের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শিখতে এবং আমল করতে হবে, যাতে তারা ঈমানের দৃঢ়তা লাভ করে। জ্ঞানের মাধ্যমে একজন মুসলিম খারাপ সাহচর্যকে ভালো সাহচর্য থেকে এবং খারাপ উপদেশকে ভালো উপদেশ থেকে আলাদা করতে পারবে। উপরন্তু, বিশ্বাসের নিশ্চিততা তাদেরকে মহান আল্লাহর পছন্দ ও পরামর্শ সম্পর্কে সন্দেহ করা থেকে বিরত রাখবে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। বরং ঈমানের দৃঢ়তা তাদেরকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর

আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহর প্রতি, তারা যে আশীর্বাদগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করে। এবং অসুবিধার সময়ে, তারা আল্লাহকে জেনে ধৈর্য্য ধারণ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র সেরাটি বেছে নেন। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথাবার্তায় অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা। অতএব, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি তার মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে পুরস্কার এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমানের নিশ্চিততা ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে নিহিত, এটি অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, যেমন বহু বছর ধরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 147:

"সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, কাজেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার,

নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্‌ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 148-150

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

"প্রত্যেকের জন্য একটি দিক যার দিকে তারা মুখ করে। সুতরাং [সব কিছু] ভাল জন্য দৌড়. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সুতরাং আপনি যেখান থেকেই [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বের হন, আপনার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে [নামাজের জন্য] করুন এবং অবশ্যই এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।

এবং আপনি যেখান থেকে [নামাজের জন্য] বের হন, আপনার মুখ আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে করুন। আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাকো না কেন, তোমার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দাও যাতে লোকেদের তোমার বিরুদ্ধে কোন তর্ক-বিতর্ক না থাকে, তবে তাদের মধ্যে যারা অন্যায় করে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করো

না বরং আমাকে ভয় করো। আর [এটি] যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও।"

প্রত্যেকের, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, তাদের একটি দিক রয়েছে যেখানে তারা মুখোমুখি হয়, অর্থ, জীবনের একটি নির্দিষ্ট পথ তারা বেছে নিয়েছে। কেউ কেউ পার্থিব জিনিসের মুখোমুখি হওয়া এবং নিজেকে উৎসর্গ করা বেছে নিয়েছে, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার বা বন্ধুবান্ধব পাওয়া। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির দিকনির্দেশ অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়, তবুও কম নয়, তারা সবাই একই জিনিস, মনের শান্তির সন্ধান করছে। প্রতিটি ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট দিকের মুখোমুখি হয় এবং জীবনের একটি নির্দিষ্ট পথ বেছে নেয় কারণ তারা সত্যিকারের বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যাবে। এই বিশ্বের প্রতিটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের পিছনে এটি সর্বদা চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা সম্পদ অর্জনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটির মালিকানা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"প্রত্যেকের জন্য একটি দিক যার দিকে তারা মুখোমুখি হয়..."

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, বিশেষ করে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই নির্ধারণ করেন কে মানসিক শান্তি পাবে। তাই তিনি লোকেদের উপদেশ দেন যে দিকনির্দেশনা তাদের উভয় জগতের জন্য উপকারী, অর্থাৎ, তাদের সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"... সুতরাং [যা যা আছে] ভালোর দিকে দৌড়াও..."

যেহেতু এই ভালটিকে সাধারণ রেখে দেওয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট করা হয়নি, এটি নির্দেশ করে যে প্রত্যেক একক ব্যক্তি, তাদের সামাজিক মর্যাদা বা জাগতিক জিনিসগুলি নির্বিশেষে, তারা এই ভালটি অর্জন করতে পারে যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। এই সুযোগ থেকে কেউ বাদ যায় না, কারণ এটি সম্পদের মতো অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী হওয়ার উপর নির্ভর করে না। এটা সহজভাবে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। যে পথের মুখোমুখি হতে এবং তাদের সম্পদকেও উৎসর্গ করার জন্য বেছে নেয়, এই দিকটি পার্থিব জিনিসের দিকে হোক বা এই দিকটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে হোক না কেন, তারা উভয় জগতে তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হবে, কারণ কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারবে না। এবং মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"...তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রে বের করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

যে ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা এবং সম্পদকে পার্থিব জিনিসের মুখোমুখি করা এবং পরিচালনা করা বেছে নেয় সে অনিবার্যভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতে দুঃখ, অসুবিধা এবং চাপ পাবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব

করে। ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সংশোধন করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন দিকনির্দেশের মুখোমুখি হয় যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাদের প্রদত্ত সম্পদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করে, সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাই একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে যে এটি উভয় জগতে তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যে তাদের মেডিকা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তেতো ওষুধ দেওয়া হয়। এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"প্রত্যেকের জন্য একটি দিক যার দিকে তারা মুখ করে। তাই ভালোর দিকে দৌড়াও..."

জীবনের প্রতিটি দিক এবং সংগ্রামের পিছনে একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। সুতরাং এটি একজনের উদ্দেশ্য সংশোধনের গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, কারণ এই নিয়তই উভয় জগতের সকল কল্যাণের উৎস। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল একজনের উদ্দেশ্য। এই অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যদি কলুষিত হয়, তবে এর থেকে যা কিছু আসবে সবই কলুষিত হবে। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে তাকে বিচারের দিন

বলা হবে যে তারা যে জিনিসগুলি এবং লোকদের খুশি করার জন্য কাজ করেছে তার থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে, যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সঠিক নিয়ত গ্রহণের একটি ভালো লক্ষণ হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"প্রত্যেকের জন্য একটি দিক যার দিকে তারা মুখ করে। তাই ভালোর দিকে দৌড়াও..."

সুনির্দিষ্টভাবে, এই আয়াতে উল্লিখিত উত্তম বলতে ফরজ নামাজকে বোঝানো হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে একজনের ভাল কাজের সারমর্ম হল ফরজ নামাজ। তাদের ছাড়া মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন সাধারণত সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঈমান ও ফরজ নামাজকে পরস্পর পরিবর্তিতভাবে আলোচনা করেছেন তা তাদের গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট এবং সেই সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন। জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বর, যে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরয নামায ত্যাগ করা। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, ঈমান হল একটি গাছের মতো যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ফরজ নামাজ। যেভাবে একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হয়, যেমন পানি, মরে যায়, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও ভালো হতে পারে যারা তাদের ঈমানকে ফরজ নামাজের মতো আমলের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 148:

"... সুতরাং [সবকিছু] ভালোর জন্য দৌড়াও..."

এই আয়াতে ভাল কাজের জন্য ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এই পৃথিবীতে মানুষের সময় অত্যন্ত সীমিত। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 35:

"... যেদিন তারা দেখবে যে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে- যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ, অর্থাৎ, ভাল কাজ করতে বিলম্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেহেতু এই পৃথিবীতে একজনের

জীবনকাল অজানা, তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাদের দেওয়া প্রতিটি সুযোগ এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা মনের শান্তির মাধ্যমে উভয় জগতেই উপকৃত হয়। তারা অবশ্যই পরবর্তী তারিখে ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে, বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে বিলম্ব করবে না, কারণ তারা সেই ভবিষ্যতের তারিখে পৌঁছাতে পারে না। এবং এই বিলম্ব শুধুমাত্র তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়।

একজন ব্যক্তির জীবনের সাধারণ দিক নির্দেশ করার পর, মহান আল্লাহ, তারপর একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেন, নামাজের সময় মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 149:

" *সুতরাং আপনি যেখান থেকেই [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বের হন, আপনার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে করুন [নামাজের জন্য] এবং অবশ্যই এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য...*"

এই বিশেষ দিকটি, যা মুসলমানরা দিনে অন্তত পাঁচবার মুখোমুখি হয়, তাই তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় তারা যে সাধারণ দিকটির মুখোমুখি হয় তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এটি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছড়িয়ে পড়ার একটি প্রধান সুবিধা। যখনই কেউ পার্থিব বিষয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের কাছে তাদের সম্পদ উৎসর্গ করতে শুরু করে, তখন পরবর্তী ফরয সালাত, যে সময় তারা আল্লাহর ঘর, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে, তার অর্থ হল তাদের আচরণকে সংশোধন করা যাতে তারা তাদের মুখোমুখি হয়। তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। যে ব্যক্তি ফরয নামাযের এই উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয় সে তাদের

নামায পড়তে পারে কিন্তু তারা তাদের প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে তাদের নামাজের মধ্যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে ব্যর্থ হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র তাদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, যার ফলে তারা তাদের বাধ্যতামূলক নামায পড়া সত্ত্বেও মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়। তাই একজন মুসলমানকে তাদের বাধ্যতামূলক নামাজের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা ক্রমাগত জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনার মুখোমুখি হয়, কারণ মহান আল্লাহ তারা যা করেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তাই তাদের ধরে রাখবেন। উভয় জগতে দায়বদ্ধ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 149:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

মহান আল্লাহ, তারপর শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন, কারণ এটিই একমাত্র পথ যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 150:

" *এবং আপনি [নবী মুহাম্মদ (সাঃ)] যেখান থেকে [নামাজের জন্য] বের হন, আপনার মুখ আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে করুন। আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাকো না কেন, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও..."*

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি জীবনের সঠিক দিকনির্দেশের মুখোমুখি হতে পারে, তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে, যখন এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখোমুখি দিকনির্দেশের সাথে মিলে যায়। এটি নির্দেশনার দুটি উত্সকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে কাজ করা এড়িয়ে চলা, এমনকি যদি তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে। . ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। .

মহান আল্লাহ তখন ইঙ্গিত করেন যে যখনই একজন মুসলমান তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে তাকে সন্তুষ্ট করে এমন দিকনির্দেশের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার জন্য যা তারা তাকে সন্তুষ্ট করে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, তারা অন্যদের কাছ থেকে সমালোচনার মুখোমুখি হবে যারা একই দিকে মুখ করে না। এই সমালোচনা প্রায়ই একজনের আত্মীয়দের কাছ থেকে

আসে, যাদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার আশা করা যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 150:

"... আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাকো না কেন, তোমার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দাও, যাতে লোকেদের তোমার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে, তাদের মধ্যে যারা অন্যায় করে..."

বিশেষভাবে, বইটির লোকেরা কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে ইসলাম মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি, অন্যথায় মুসলিমরা প্রথম দিন থেকেই চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দু বেছে নিত। কিন্তু এটি ছিল একটি মূর্খতার মনোভাব, কারণ কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা ছিল তা স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য যে, কে কোন দিকে ফিরবে, যে দিকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বিশেষ করে কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা সাধারণভাবে একজনের জীবনের কোন দিক, এবং যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ নতুন দিক তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 143:

"...এবং আমরা কেবলা বানাইনি যে কেবলাকে তুমি মুখ করে থাকো এই জন্য যে আমরা স্পষ্ট করে দিই যে কে রাসুলের অনুসরণ করবে কে তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তাদের ব্যতীত এটি কঠিন ..."

সর্বক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে সর্বদা ইসলামী শিক্ষার দ্বারা যে দিকেই ঘুরানো হোক না কেন, সমালোচনা নির্বিশেষে তাকে অবশ্যই যেতে হবে। আয়াত 150 দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মানুষকে খুশি করা তাদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি থেকে রক্ষা করবে না, তবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার নেতিবাচক পরিণতি থেকে রক্ষা করবে, এমনকি যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 150:

"... সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো..."

এবং গ অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সমালোচনা এবং অসুবিধা থেকে এই প্রস্থান সীমা ছাড়াই প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। যিনি সর্বাবস্থায় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মুখোমুখি হওয়ার মনোভাবকে মেনে চলেন, যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, এই দুনিয়া ও পরকালে মহান আল্লাহ তায়ালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ লাভ করবেন, যথা, প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথনির্দেশ

যাতে তারা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 150:

"... এবং [এটি] যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হতে পার।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য এবং তাদের গঠনমূলক সমালোচনা এড়িয়ে চলার জন্য কাজ করে, সে অনিবার্যভাবে মানুষকে খুশি করবে না, কারণ মানুষ চঞ্চল প্রকৃতির এবং তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে। এই মনোভাব কেবল তাদের সঠিক পথনির্দেশ থেকে বঞ্চিত করবে এবং তাই উভয় জগতের মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 150:

"... এবং [এটি] যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হতে পার।"

একটি নতুন এবং ভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু নিযুক্ত করার এই অনুগ্রহের একটি দিক, তারপরে কিতাবের লোকেরা আল্লাহ, মহান ও তাঁর দ্বীনের নতুন প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হওয়া জড়িত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

" তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হয়েছিল, যখন তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং তাই যদি তারা সঠিকভাবে তার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের কোন অজুহাত থাকবে না। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন উদারতা, সততা এবং আন্তরিকতা শেখে এবং গ্রহণ করে এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, লোভ এবং অহংকার পরিত্যাগ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে অন্যান্য মুসলিম এবং অমুসলিমরা তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতাকে উপলব্ধি করবে। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি এই আচরণে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে ভুল চরিত্র অবলম্বন করে, তাহলে তারা বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে। তারা নিঃসন্দেহে এই ব্যর্থতার পরিণতি উভয় জগতেই ভোগ করবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 151-152

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢

“যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত ঘোষণার আগে তাদের মধ্যে 40 বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাই তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি..."

সত্য যে তারা তাকে তাদের সমাজের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং সৎ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং সর্বদা তার অতুলনীয় চরিত্রের প্রশংসা করেছে তাদের পক্ষে তার বার্তা গ্রহণ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, শৈশবকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মহান আল্লাহর আশ্রয়ে ছিলেন। আল্লাহ, মহান, তাকে সেসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন যা জাহেলিয়াতের যুগে ব্যাপক ছিল: ইসলামের পূর্বের সময়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রাপ্তবয়স্কতায় উপনীত হন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, চরিত্র ও খ্যাতিতে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম, সবচেয়ে বিচক্ষণ, কথাবার্তায় সবচেয়ে সৎ এবং সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বস্ত তিনি সমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 180 এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 10 ইউনুস, 16 নং আয়াত:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

তথাপি, মক্কার অনেক অমুসলিম মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, তাদের সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং বাধা পাওয়ার ভয়ে। তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 78:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে বিমুখ ছিল।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি..."

এটি এই বিষয়টিকেও নির্দেশ করতে পারে যে কিতাবের লোকেরা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ উভয়ই তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এটি তাদের যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মহান আল্লাহ অতঃপর তাদের নবী (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

" *যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন..."*

নিজের নিয়তকে শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, একজনের কথাকে শুদ্ধ করে, যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে এবং নিজের কাজকে পরিশুদ্ধ করে, যাতে তারা তাদের নেয়ামত ব্যবহার করে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত , মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত , শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে। শুধু বুঝতে পারে না এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এই শুদ্ধি হবে না। এইভাবে যখন কেউ তাদের মন ও শরীরকে শুদ্ধ করে তখনই তারা উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি লাভ করবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

“…তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করা এবং তোমাদেরকে পবিত্র করা এবং তোমাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেওয়া…”

বইটি আইন ও আচরণবিধির উল্লেখ করতে পারে যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের মনের শান্তি এবং ন্যায়বিচার সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। মনুষ্যসৃষ্ট আইন এবং আচরণবিধির সমস্যা হল যে তারা সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট হবে একদল লোকের উপর অন্য দলের পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, ধনীরা সমাজের দরিদ্র সদস্যদের উপর পক্ষপাতী। ঐশ্বরিক আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের একটি দিককে আয়াত 151 এ প্রজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 151:

"…তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করি এবং তোমাদেরকে পবিত্র করি এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা করি…"

প্রজ্ঞা একজন ব্যক্তিকে শেখায় কীভাবে তার কাছে থাকা জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। জ্ঞান অত্যাবশ্যক কারণ যে কোনো জ্ঞান বা আচরণবিধি মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানকে অন্যের উপকার করার জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ওষুধ তৈরি করা, বা এটি মানুষের ক্ষতি করার জন্য অপব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন অস্ত্র তৈরি করা। এই প্রজ্ঞা ভাল নৈতিকতা এবং বৈশিষ্ট্যের আকার নিতে পারে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা, যাতে একজনকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে প্রদত্ত আচরণবিধি প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

উপরন্তু, 151 শ্লোক দ্বারা নির্দেশিত, যেহেতু মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত যখন এটি মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে সাথে সমাজের মধ্যে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আসে, একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি

প্রদান করতে পারেন যা পুরোপুরি ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃতির জন্য এবং সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য সমাজের সমস্ত ধরণের সমস্যা সংশোধন করে, তিনিই সর্ব বিষয়ে জানেন, যথা, মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নকারী সমাজের মধ্যে কীভাবে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে তা দেখার জন্য একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"...এবং তোমাকে এমন শিক্ষা দিচ্ছে যা তুমি জানতে না।"

যখন কেউ আলোচিত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যার সংক্ষিপ্তসারে তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা পবিত্র কুরআনে এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে পারে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শর্ত পূরণ করতেন যা আমাদের দিকে নিয়ে যায়। মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এইভাবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, সে দেখতে পাবে যে তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

" সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বাসকে কৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসকে অকৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এটা প্রায়ই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে ঘটে। এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। অর্থ, কৃতজ্ঞতা হল মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের প্রথম ধাপ। এটি কর্মের সাথে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্বকে আরও তুলে ধরে, কারণ কর্ম ছাড়া কৃতজ্ঞতা দেখানো যায় না, যার অর্থ হবে, ভাল কাজ ছাড়া বিশ্বাস পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলা যায়, নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা বলতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা জড়িত। একজনের বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং একজনের কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে সেই আশীর্বাদগুলিকে

ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"... এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

উপরন্তু, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হল মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি অংশ, যেহেতু আল্লাহ, মহিমান্বিত, প্রায়শই মানুষকে কিছু আশীর্বাদ প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন, যেমন একজনের পিতামাতাকে। তাই মানুষকে তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, যদিও তা শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে মঙ্গল প্রার্থনার মাধ্যমেই হয়, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত- এর একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন। তিরমিযী, নম্বর 1954, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।

উপসংহারে বলা যায়, একজন বিজ্ঞ রোগী যেমন তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, তাদের তেতো ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া সত্ত্বেও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। , মহিমান্বিত, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যাতে তারা উভয় জগতে একটি সুস্থ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পায় যদিও এই আচরণ কখনও কখনও তাদের পার্থিব ইচ্ছার বিরোধিতা করে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 153-157

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ ١٥٤

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧

“হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।

আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।

যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব’।

তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

" *হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর...*"

ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে যায় এবং তাদের অগ্নিপরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা। একজন ব্যক্তি যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, ততই তারা বুঝতে পারবে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার সবকিছুই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে প্রজ্ঞা। তাদের কাছ থেকে লুকানো। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী, যিনি তার ভাইদের দ্বারা অল্প বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্ধকার ও গভীর কূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, একটি শিশু ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা শিখতে দেয় যা তাকে মিশরের জনসংখ্যাকে একটি বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত করে। তিনি যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সহ্য না করলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই প্রজ্ঞাগুলিতে বিশ্বাস করা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, তাই একজন ব্যক্তির ঈমানের অংশ। মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর প্রশংসা করা সহজ কিন্তু আসল পরীক্ষা হল যখন কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তারপরও তাঁর আনুগত্য করে এবং প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকে তাদের অসুবিধাগুলিকে অন্যান্য লোকেদের সাথে তুলনা করতে সাহায্য করে, যারা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং আরও বেশি অসুবিধা সহ্য করেছিল। এই তুলনা একজনকে তাদের নিজেদের অসুবিধাকে ছোট করতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্য লোকেদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ইসলামিক শিক্ষাগুলি একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব এবং কীভাবে তাদের জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হবে তা বোঝার অনুমতি দেয়, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধা, অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু সম্পর্কে অভিযোগ করলে কোন উপকার হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত পুরষ্কারটি হারাবেন যা তারা

অনাকাঙ্ক্ষিত অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে রেখে পেতে পারে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

একজন ব্যক্তির তাই ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং একটি অগণিত পুরস্কার অর্জন বা অধৈর্যতার সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের প্রাপ্ত পুরস্কার হারানোর মধ্যে একটি বিকল্প রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে উপকার লাভ করা বোধগম্য। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকেও বুঝতে পারে যে তারা এই পৃথিবীতে যে জিনিসগুলি কামনা করে তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চায় যে এটি তাদের জন্য সেরা, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য খারাপ, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে তারা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম অধৈর্য হবেন যা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, কারণ তারা বোঝে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

এছাড়াও, তাপের মাধ্যমে সোনা যেমন বিশুদ্ধ হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে মানসিক শক্তি লাভ করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা প্রায়ই মানসম্মত এবং এমনকি ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় মানসিক ভাঙ্গন অনুভব করে, যেমন বিবাহের সমস্যা। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করে দেন যাতে তারা সহজেই ভবিষ্যতের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

ইসলাম যেমন শিক্ষা দিয়েছে, সব পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও ধৈর্যের প্রয়োজন। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যেমন সুস্বাস্থ্য বা তাদের বেতন বৃদ্ধি।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের অধ্যয়ন করা, শেখা এবং তাদের উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার লাভ করে। একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

ধৈর্যের মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যে তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামী থেকে আলাদা হওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ দেখানো যেভাবেই হোক ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যেমন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার দুঃখের জন্য এত বেশি কান্নাকাটি করেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরও মহান আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা করেননি। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 84:

" এবং তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গেলেন এবং বললেন, "ওহ, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ," এবং তার চোখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন একজন দমনকারী।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (আঃ) এর মৃত্যুর মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা দেখানো ধৈর্যের পরিপন্থী, এটি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্না করা এবং দুঃখ বোধ করা। .

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কষ্টের শুরু থেকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 1302 নং একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য প্রদর্শন করা প্রকৃত ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সবার সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে তাদের কথাবার্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় রাখে, কারণ অধৈর্যতা প্রদর্শন করে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে। লাইন

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর..."

প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহর রহমত স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধাগুলিকে স্থানান্তরিত করে এবং একজন মুসলিমকে শক্তিশালী করে যাতে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে।

উপরন্তু, যখন এটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রার্থনা বিচার দিবসের একটি ধ্রুবক অনুস্মারক। ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

"তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অতএব, নামাজ কায়েম করা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা যে কোনো সমস্যায় সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য ঐশ্বরিক রহমত এবং মানসিক শক্তির দিকে নিয়ে যায়, যেমন মহান আল্লাহ যে কোনো পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একজন তার আনুগত্যের উপর অটল থাকে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

উপরন্তু, প্রার্থনা যেমন বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলির ভয়াবহতা এবং অসুবিধাগুলি এই বিশ্বের অসুবিধাগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, এই অনুস্মারকটি তাই তাদের যে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে তাকে ছোট করতে সাহায্য করবে, কারণ সমস্ত জাগতিক অসুবিধাগুলি তাদের সমস্যার তুলনায় নগণ্য। বিচার দিবস। এই পৃথিবীতে তারা যত কষ্টের মুখোমুখি হবে, তত বেশি তারা ধৈর্যের সাথে তাদের মোকাবেলা করবে।

যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করে এবং নামাজ কায়েম করে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

"... ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সফলতা লাভ করবে, যদিও তারা পথে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

একজন মানুষ যেমন এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার পিছনের সমস্ত প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না, একইভাবে, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের জীবন এবং পার্থিব নিয়ামত উৎসর্গ করে তাদের পুরস্কার ও আশীর্বাদ তারা অনুধাবন করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 154:

" আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।"

এই মহান পদমর্যাদা অর্জনের জন্য ধৈর্য্য ও নামায কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, কারণ নিজের জীবন ও বরকতকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে উৎসর্গ করা একটি কঠিন কাজ, কারণ শয়তান, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শয়তান এবং বস্তুজগত। ক্রমাগত একজন ব্যক্তিকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 153-154:

"... ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে, তিনিই একমাত্র এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সত্যিকারের জীবিত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে জৈবিকভাবে জীবিত হলেও উভয় জগতেই মৃত। কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাদের ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারি, 6407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য হল মহান আল্লাহর স্মরণ। অর্থ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, সেই নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত রয়েছে, সে জীবিত। এমনকি তারা মারা যাওয়ার পরেও। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই তা বোঝা যায়। যারা এই আচরণ করেছিলেন, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারা জীবিত থাকাকালীন ইতিবাচকভাবে স্মরণ করা হয়েছিল এবং তাদের মৃত্যুর পরে স্মরণ করা হয়। তাদের শিক্ষা এবং জীবন এমনভাবে অধ্যয়ন করা হয় যা এই ধারণা দেয় যে তারা এখনও মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত। এটাও সুস্পষ্ট যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে, যারা পার্থিব জিনিস থাকা সত্ত্বেও একটি হতাশাগ্রস্ত ও দুঃখজনক জীবনযাপন করে, এমন একটি জীবন যা আভ্যন্তরীণভাবে শূন্য, ফুলদানির মতো জীবন পূর্ণ দেখায়। এটি মোটেও বেঁচে

নেই। এবং তারা মারা যাওয়ার পরে, তারা খুব কমই ইতিবাচক উপায়ে বিশ্ব দ্বারা স্মরণ করে এবং ইতিহাসের পাদটীকা হয়ে ওঠে যখন তাদের ভক্তরা অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য পরবর্তী সেলিব্রিটির দিকে চলে যায়। এবং যদি মৃত ব্যক্তি জাহান্নামে শেষ হয়, তবে তারা বিস্মৃতিতে পড়ে থাকবে, জীবিত বা মরবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 74:

" নিশ্চয়ই, যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হয়, তার জন্য জাহান্নাম; সে সেখানে মরবে না বা বাঁচবে না।"

অতএব, যে ব্যক্তি সত্যই উভয় জগতে বাস করতে চায় তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদসমূহকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 154:

" আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, 154 শ্লোকের শুরুটি একজনের কথাবার্তার উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বক্তৃতা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল উত্তম বক্তৃতা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। বক্তৃতার চূড়ান্ত শ্রেণী হল অসার

বক্তৃতা। এই ধরনের বক্তৃতা পাপ বা ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় না তবে এই ধরনের কথা খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়, এটিও এড়িয়ে চলাই উত্তম। উপরন্তু, অসার কথাবার্তা বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনার কারণ হবে যখন তারা অযথা কথা বলার সুযোগ এবং সময় নষ্ট করে। তাই একজন মুসলিমকে হয় ভালো কথা বলতে হবে অথবা নীরব থাকতে হবে। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তখন মানুষকে এই দুনিয়ার উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155:

" এবং আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও জীবন ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে..."

জীবনের পরীক্ষা সহজ: মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে কিছু আশীর্বাদ দান করেছেন এবং তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য হওয়ার জন্য, একজন ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ, মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ এবং একক নিয়ন্ত্রণ এবং একজন ব্যক্তি যে ঘটনার সম্মুখীন হয়, জীবনের এই পরীক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং চ্যালেঞ্জ করা তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ, মহান, এই পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী ছাত্রকে মেনে নিতে হবে তাদের স্কুল, একাডেমিক অ্যাসাইনমেন্ট, হোমওয়ার্ক এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা এবং সহ্য

করতে হবে। এই পৃথিবীতে সাফল্য, যদিও ছাত্রদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যয়ন অপছন্দ. একইভাবে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই পৃথিবীতে একটি কাজ করবে না যদি তারা এটি ছাড়া নিজেদের টিকিয়ে রাখার উপায় খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটি সম্ভব নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, নিজেদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের টিকিয়ে রাখার জন্য বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে কাজ করতে হবে। এগুলি পার্থিব বাস্তবতা যা সবাই গ্রহণ করে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। একইভাবে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, যদিও এটি তাদের কাছে অর্থহীন নয়, কারণ এটির মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য।

আগেই বলা হয়েছে, যারা ধৈর্য্য ও নামায কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক শক্তি অন্বেষণ করে, তারা মহান আল্লাহর সঙ্গ লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

“ হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

মহান আল্লাহর সঙ্গ উভয় জগতেই ঐশ্বরিক রহমতের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155:

"... তবে ধৈর্য্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"

এই সুসংবাদটি একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মহান আল্লাহর রহমত তাদের সাথে রয়েছে এবং এটি তাদের শক্তিশালী করবে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সফলভাবে যাত্রা করতে পারে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, এমনকি কঠিন সময়েও, ঠিক যেমন মহানবী ইব্রাহীম (আ.)-কে একটি মহান আগুনে নিক্ষেপ করার সময় মানসিক শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

"তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমার দেবতাদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

এই ধৈর্যশীল লোকেরাই সহজাত সত্যকে স্বীকার করে যে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিই অনিবার্য এবং অনিবার্য ছিল, ঠিক যেমন একটি তীরের মতো যা তার অভিপ্রেত শিকারকে আঘাত করে। এই অর্থটি 156 নং আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 156:

"কে, যখন দুর্যোগ তাদের আঘাত করে..."

তারা বুঝতে পারে যে তারা নিয়তি থেকে পালাতে পারে না, অধৈর্য দেখিয়ে অগণিত পুরষ্কার হারানোর পরিবর্তে ধৈর্য অবলম্বন করে তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা থেকে পুরষ্কার অর্জন করা অর্থপূর্ণ। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

যে ব্যক্তি তাদের ভাগ্যকে গ্রহণ করে এবং বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম যা বেছে নেন, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাগুলিকে চিনতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি ধৈর্যের দিকে পরিচালিত হবেন। অধ্যায় 64 তাগাবুনে, আয়াত 11:

" আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপর্যয় আসে না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে পথ দেখাবেন..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই ধৈর্যশীল লোকেরাই স্বীকার করে যে তারা এবং এই পৃথিবীতে তাদের যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, তাই তিনি বেছে নেন কখন এই আশীর্বাদগুলি মঞ্জুর করা হবে এবং কখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর..."

একইভাবে একজন ব্যক্তির প্রশ্ন বা অভিযোগ করার অধিকার নেই যখন একটি সংস্থা বা ব্যক্তি অন্য কাউকে ঋণের জন্য প্রদত্ত কিছু ফিরিয়ে নেয়, যেমন অর্থ, একইভাবে একজন ব্যক্তিরও মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার নেই। এই পৃথিবীতে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তিনি ফিরিয়ে নেন, কারণ তাদের যা দেওয়া হয়েছে, এমনকি তাদের নিজের জীবনও, কেবল মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ। এই কারণেই একজন ব্যক্তিকে তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে, কারণ এইভাবে একজন ব্যক্তি তাদের ঋণ দেওয়া নেয়ামত শোধ করে। যদিও, জান্নাতের আশীর্বাদগুলি একটি উপহার যা একজন ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"...এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করে এবং তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হয়, যার মধ্যে তারা যে সময়গুলো কষ্টের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ধরেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"...এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতার কথা মনে রাখা সবসময়ই একজনকে কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করার জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার হয়েছে, একজনের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা বজায় রাখার একটি চমৎকার হাতিয়ার, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাকে

উপরন্তু, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতার কথা মনে রাখা এই পৃথিবীতে যে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, কারণ বিচার দিবসের ভয়াবহতা এবং অসুবিধাগুলির তুলনায় সমস্ত

জাগতিক অসুবিধাগুলি তুচ্ছ হয়ে যায়। এই মনোভাব একজনকে ধৈর্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"...এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের নামাজ কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক শক্তি অর্জন করে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলো তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করবে যাতে তারা মানসিক প্রশান্তি নিয়ে সেগুলোতে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 157:

"এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ত্যাগ করে এবং নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হয়, সে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকার মানসিক শক্তি পাবে না। এটি শুধুমাত্র তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, দুর্দশা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ তারা নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। মহান আল্লাহ। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 158

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"নিশ্চয়ই, আশ-সাফা এবং আল-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি। সুতরাং যে ব্যক্তি গৃহে হজ্জ করে বা উমরাহ [সাক্ষাত] করে, তার উভয়ের মধ্যে চলাফেরা করায় তার কোন দোষ নেই। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।"

ধৈর্যের গুরুত্ব এবং কিছু ভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করেন , যাতে বোঝা যায় কে আন্তরিকতার সাথে সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করে এবং কে না করে, মহান আল্লাহ, তারপর একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যা উল্লেখিত পরীক্ষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155-157:

"আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জান ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদের উপর বিপর্যয় নেমে এলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব'। তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 158:

"নিশ্চয়ই, আশ-সাফা এবং আল-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি..."

মক্কার দুটি বিখ্যাত পর্বত, সাফা পর্বত এবং মারওয়াহ পর্বতের পিছনের মূল কাহিনীটি হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে তাঁর স্ত্রী হাজারা (আ.) এবং তাদের শিশু পুত্র পবিত্র ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, একটি অনুর্বর মরুভূমিতে যার কোন সংস্থান নেই, যা পরে মক্কায় পরিণত হয়। হাজরা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আদেশ, ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ

করেছিলেন এবং তার পরীক্ষা সফলভাবে সহ্য করেছিলেন। তিনি দুটি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়েছিলেন: মাউন্ট সাফা এবং মাউন্ট মারওয়াহ বারবার তার ছেলের জন্য পানি বা খাবারের কোনো চিহ্ন খুঁজছিলেন। মহান আল্লাহ তখন পৃথিবী থেকে একটি অলৌকিক ঝর্ণা নির্গত করেন, যা আজও প্রবাহিত হয় এবং যাকে জমজম কূপ বলা হয়। মহান আল্লাহ তার ধৈর্য ও কর্মকে এতটাই ভালোবাসতেন যে তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোকে সফর (উমরা) এবং পবিত্র হজ্জের একটি অংশ বানিয়েছিলেন। তিনি এবং তার পরিবার পূর্বের আয়াতগুলিতে উল্লিখিত সমস্ত পরীক্ষা সফলভাবে সহ্য করেছেন: ভয়, ক্ষুধা এবং তার জীবন এবং তার শিশু পুত্রের জীবনের জন্য একটি সত্যিকারের হুমকি। সহীহ বুখারী, ৩৩৬৪ নং হাদিসে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"নিশ্চয়ই, আশ-সাফা এবং আল-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই উপলব্ধি অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টির মধ্যে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে এবং তারা যে ঘটনাগুলির মুখোমুখি হয় সেগুলিকে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে দেখে। মহান আল্লাহর এই অবিরাম স্মরণ, তাঁর প্রতি একজনের আনুগত্য বজায় রাখার একটি চমৎকার উপায়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাঁকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, যখন তারা প্রার্থনা করছে বা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছে, সে সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে, কারণ তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য মহান আল্লাহর অবিরাম স্মরণ প্রয়োজন। একজনকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তার অপব্যবহার করলে উভয় জগতেই মানসিক চাপ, দুর্দশা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের সময়গুলো অনুভব করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

সৃষ্টির ব্যাপারে, আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন সৃষ্ট দেহ পর্যবেক্ষণ করা মহান আল্লাহর এক চরম ও সীমাহীন শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না এবং তাই সর্বদা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। বিশ্বের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন, যেমন দিন এবং রাতের আগমন এবং যাওয়া, তাদের মৃত্যু এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া উচিত। এটি তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবে। এটাই হওয়া উচিত সেই মুসলমানের মনোভাব এবং উপলব্ধি যারা সফর এবং পবিত্র তীর্থযাত্রা করে। তাদের যাত্রার প্রতিটি পর্যায় অবশ্যই তাদের মহান আল্লাহর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং বিচার দিবসে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। যিনি এই পদ্ধতিতে দর্শন এবং পবিত্র তীর্থযাত্রা করেন তিনি একজন পরিবর্তিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেবেন, যা একটি সফল ভ্রমণের লক্ষণ। আর একটি সফল পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই মুসলিম সঠিক উপলব্ধি ও মনোভাব নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, যা তাদেরকে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে।

একজন ব্যক্তি তাদের জীবনের মধ্যে যে ঘটনাগুলির মুখোমুখি হয়, সেগুলিকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অনিবার্য ঘটনা হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা, মহান, যিনি শুধুমাত্র জড়িত প্রত্যেকের জন্য যা ভাল তা চয়ন করেন, এমনকি যদি তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে তবে একজনকে অনুমতি দেবেন।

প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে রাখা। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা জড়িত। যে ব্যক্তি তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি ঘটনার পিছনে মহান আল্লাহর কাজ পর্যবেক্ষণ করে সে মনে রাখবে যে তিনি সর্বদা তাদের দেখছেন এবং শুনছেন। এটি তাদের বক্তৃতা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করবে, বিশেষত অসুবিধার সময়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"নিশ্চয়ই, আশ-সাফা এবং আল-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরা পবিত্র স্থান এবং দিনগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে ভাল যেগুলি ইসলামে পবিত্র বলে বিবেচিত হয় তবুও অন্যান্য জিনিসগুলিকে উপেক্ষা করে, যেমন মানুষ এবং তাদের সম্পত্তির পবিত্রতা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 67 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান পবিত্র। অতএব, শুধুমাত্র পবিত্র স্থান এবং দিনগুলি নয়, ইসলাম যে সমস্ত জিনিসকে পবিত্র করে তুলেছে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করতে হবে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা অন্য লোকেদের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

পবিত্র তীর্থযাত্রা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রথাগুলি শিরকের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল। কতিপয় সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো থেকে বিরত ছিলেন এই ভয়ে যে এটি একটি পৌত্তলিক কাজ। অতঃপর আল্লাহ তাদের চিন্তাধারা সংশোধন করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে, ইসলামের নির্দেশিত দুই পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো একটি ভালো কাজ। এটি সহীহ বুখারি, 1643 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 158:

" নিশ্চয়ই আশ-সাফা ও আল-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি গৃহে হজ্জ করে বা উমরাহ পালন করে, তার উভয়ের মধ্যে চলাফেরা করায় তার কোন দোষ নেই..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, কারণ পবিত্র তীর্থযাত্রা সম্পাদনের মূল অনুশীলনটি তখনই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যখন ঐশ্বরিক জ্ঞান পরিত্যাগ করা হয়েছিল। . তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের দুটি উৎসকে মেনে চলতে হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস ত্যাগ করতে হবে, যদিও তারা একটি ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলি অনুসরণ করবে, তারা তত কম হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর কাজ করবে, যার ফলস্বরূপ বিপথগামী হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন।

মহান আল্লাহ এটিকে একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে অনুসরণ করেন যা আকার নির্বিশেষে যেকোনো ভালো কাজ সম্পাদনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"... *আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞ...*"

মহান আল্লাহ কোনো কাজের পরিমাণ দেখেন না বরং তার গুণ, অর্থ, ভালো কাজের পেছনের উদ্দেশ্য দেখেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ আন্তরিকভাবে তাদের বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর ফল দান করে, মহান আল্লাহ তাদের একটি পাহাড়ের চেয়েও বেশি পুরস্কার দেবেন। অতএব, একজনকে অবশ্যই সেই অজুহাতগুলি পরিত্যাগ করতে হবে যা তাদের ভাল কাজ করতে বাধা দেয় এবং ভাল কাজ করার জন্য তাদের দেওয়া প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

ভাল বলতে বোঝায় যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই পৃথিবীতে যতই স্বল্প সম্পদ থাকুক না কেন, কেউ সৎকাজ থেকে মাফ করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"... *আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে- তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞ..."*

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরেও সব ধরনের ভালো কাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি এমন একজনের চিহ্ন যা মহান আল্লাহকে খুশি করতে চায়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব, যারা সারা জীবন সৎকর্ম সম্পাদনে অবিচল ছিলেন। উপরন্তু, বাধ্যতামূলক কর্তব্যের বাইরে চেষ্টা করা ঐশ্বরিক ভালবাসাকে আকর্ষণ করে এবং যিনি মহান আল্লাহর প্রিয় হয়ে ওঠেন, তার মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের নিশ্চয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর এই প্রিয়তমের দুআ কবুল হবে এবং তাদেরকে উভয় জগতে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও আশ্রয় দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীর ৬৫০২ নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, যে যত বেশি ভালো করবে, উভয় জগতেই সে তত বেশি উপকৃত হবে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা উভয় জগতে নিজেদের কতটা উপকার করতে চায় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

যদিও ভাল কাজ করার শক্তি, সুযোগ, ক্ষমতা, অনুপ্রেরণা এবং জ্ঞান মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসে না, তবুও তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"... *আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞ..."*

একজনকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক গুণের উপর কাজ করতে হবে, তাদের সৃষ্ট ক্ষমতা অনুসারে, তারা তাদের প্রতি যে ভালো কাজ করে তার জন্য অন্যদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। যেহেতু মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন , একজনকে সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা দেখানো, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে একজনের বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যা ভাল তা বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকা এবং এর মধ্যে রয়েছে একজনের কর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যে আশীর্বাদগুলি একজনকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করে যা ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার এই সমস্ত দিকগুলিকে পরিবেষ্টন করে তার জন্য উভয় জগতে নিয়ামত ও পুরস্কার বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

অন্যান্য লোকেদের কাছেও প্রশংসা দেখাতে হবে, যেমন একজনের পিতা-মাতা, যেমন আল্লাহ, মহান, প্রায়শই অন্য লোকেদের কিছু পার্থিব আশীর্বাদ প্রদানের জন্য লোকদের বেছে নেন। অতএব, এই নিয়তে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অংশ। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তাদের অনুগ্রহ তাদের সামর্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী শোধ করা, এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনা জড়িত থাকে।

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই যথাসম্ভব আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে, তাদের আকার নির্বিশেষে, এবং মহান আল্লাহ, এবং মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং তা ধরে রাখবেন। উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 158:

"এবং যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 159-160

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

"নিশ্চয়ই, যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পরেও আমরা যা অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশনাকে গোপন করে, তারা আল্লাহর দ্বারা অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।

তারা ব্যতীত যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে [যা তারা গোপন করেছিল]। যারা - আমি তাদের তওবা কবুল করব এবং আমিই তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

মহান আল্লাহ তাদের ঐশী কিতাবের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনা, অপব্যাখ্যা ও গোপন করা থেকে বিরত থাকার জন্য কিতাবধারীদের পক্ষ থেকে আলেমদের সমালোচনা ও সতর্ক করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।*"

তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহারকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল এবং তাদের আচরণকে তাদের সমাজে ঘুষের মাধ্যমে এবং উচ্চ সামাজিক অবস্থান অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিল। উপরন্তু, তারা তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে অন্যদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল, যেহেতু পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

উপরন্তু, তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিল। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানকে সম্পাদনা, অপব্যাখ্যা এবং লুকিয়ে রেখেছিল যা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, কারণ ইসলাম সরাসরি তাদের জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাদের আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয়। মঞ্জুর উপরন্তু, যেহেতু তাদের বিশ্বাস বংশের গভীরে প্রোথিত ছিল, বিশেষ করে ইহুদি বিশ্বাস, তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারেনি, কারণ তিনি তাদের বংশধর, ইস্রায়েলের সন্তান নন। তাকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করলে তারা মহানবী ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর হওয়ায় তাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার মিথ্যা দাবীটি ধ্বংস হয়ে যেত। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

তাদের আচরণের ফলে তারা ইসলামের সত্যতা থেকে অনেককে বিপথগামী করেছে এবং তাই উভয় জগতে মহান আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের দাওয়াত দিয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলিমদের সতর্ক করে যে, তারা পার্থিব লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যাখ্যা করে এবং গোপন করে এবং সম্প্রসারণ করে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। . এর মধ্যে রয়েছে নিজের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কোন ইসলামী শিক্ষাগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়া এবং বেছে নেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহর ইবাদত করে না, তারা কেবল নিজের ইচ্ছার পূজা করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামকে একটি কোটের মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যেটি তারা পরে এবং যখনই এটি তাদের উপযুক্ত হয় তখনই খুলে ফেলে। ইসলাম হল এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার উপর প্রতিটি পরিস্থিতিতেই কাজ করতে হবে, তা নির্বিশেষে তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে বা ইসলামের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে। শুধুমাত্র এই মনোভাবের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

তাদের অবশ্যই বুদ্ধিমান রোগীর মত আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। কিন্তু একজন মূর্খ রোগীর মতো যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমনটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী , মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে, তেমনি যে ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের সমস্ত শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী এবং মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিতাবধারীদের মধ্য থেকে কিছু আলেম মহান আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ পেয়েছিলেন, কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অন্য অনেককে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিপথগামী না হওয়ার জন্য অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে , জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য, তাই একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞান অর্জন ও আমল করতে হবে। তার উপর বর্ষিত হউক, যেহেতু তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পথনির্দেশ নিয়ে গঠিত যা মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেছেন। এটি 159 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।"*

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামের সত্যতাকে নিজের জন্য আবিষ্কার করার জন্য তাকে দেওয়া বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। এটি তাদের অন্যদের দ্বারা বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে

যাতে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অন্যদেরকে পাপের দিকে দাওয়াত দিয়ে বিপথগামী করা থেকে বিরত থাকতে হবে। একজন ব্যক্তির পাপ বাড়বে তার উপর নির্ভর করে কতজন লোক তাদের খারাপ দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে, এমনকি তারা মারা যাওয়ার পরেও। একইভাবে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে নেক কাজের দিকে দাওয়াত দেয় তার নেক আমল ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়তে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার সৎ নির্দেশনা ও উপদেশের উপর আমল করবে, যদিও সে মারা গেছে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।* "

এই আয়াতটি পার্থিব জিনিস, যেমন একটি উচ্চ খ্যাতি অর্জনের অভিপ্রায়ে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে, কারণ এই অভিপ্রায় সর্বদা তাদের কাছে

থাকা ধর্মীয় জ্ঞানকে ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করার দিকে পরিচালিত করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বর হাদিসে যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে তাকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং যদি এটি নষ্ট হয় তবে তার সমস্ত কাজই হবে কলুষিত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে। এই ভাল উদ্দেশ্য তাদের কর্মে প্রতিফলিত হবে কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা বা গোপন করবে না। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম জীবিকা অর্জনের জন্য আলেম হতে পারে না, কারণ একটি বৈধ জীবিকা অর্জন করা নিজেই একটি ভাল কাজ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হবে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করতে উত্সাহিত হবে না। অথবা তারা যে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে তা গোপন করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।*"

এই আয়াতের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত একটি সমস্যা হল যখন একজন পণ্ডিত বা প্রচারক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে যান যেগুলিকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে এবং পরিবর্তে তারা তাদের শক্তি এমন বিষয়গুলিতে উত্সর্গ করে যেগুলিকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না, যার ফলে তাদের দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্পষ্ট করুন। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন কোনো বিষয় বা বিষয় অধ্যয়ন বা প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা বিচারের দিনে

প্রশ্ন করা হবে না কারণ এটি শুধুমাত্র নিজেকে এবং অন্যদেরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিভ্রান্ত করে, যে বিষয়ে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে। এই মনোভাবও অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়, কারণ বেশিরভাগ মুসলিম সম্প্রদায় আজ এমন বিষয়গুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যেগুলিকে বিচারের দিনে প্রশ্ন করা হবে না।

যথারীতি, মহান আল্লাহ, তারপর সমস্ত মানুষকে তাঁর রহমত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 160:

" *তারা ব্যতীত যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে [যা তারা গোপন করেছিল]। যারা - আমি তাদের তওবা কবুল করব এবং আমিই তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করা। বিশেষ করে, শ্লোক 160 দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, একজনের চরিত্র সংস্কারের অংশ হল ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানকে গোপন করা যা একজনের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করে। এর মধ্যে রয়েছে বাছাই করা ত্যাগ করা এবং নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোন ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়া। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে নিজেদেরকে সংশোধন করবে সে উভয়

জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে। যিনি মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য পরিচালিত হবেন এবং অনুপ্রাণিত হবেন, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 160:

" *...এবং আমি তওবা কবুলকারী, করুণাময়।"*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে তাদের সৃষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলীর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের জন্য তাদের অন্যকে ক্ষমা করতে শেখা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এর অর্থ এই নয় যে অন্য ব্যক্তির দ্বারা আবার অন্যায় করা এড়াতে তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত নয়, কারণ এটি করা ইসলামী শিক্ষার একটি অংশ। কিন্তু এই আলোচনার অর্থ হল, নিজের পরিস্থিতিকে সামঞ্জস্য করার পর যাতে তারা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি থেকে নিরাপদে থাকে, তাদের উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে শেখা, কারণ যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাকে দয়া করেন। উচ্চাভিলাষী। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4941 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 161-162

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ।

সেখানে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।"

একটি ডিভাইস যা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে সর্বদা একটি ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করা হবে, এমনকি এটির অন্যান্য অনেক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকলেও। একইভাবে, একজন মানুষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহর সৃষ্টি। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

এই উদ্দেশ্যের সাথে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জড়িত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, সে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে উভয় জগতেই দুঃখ, চাপ ও ঝামেলার সম্মুখীন হবে, যদিও তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলো উপভোগ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 161:

" নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ।

একজন ব্যক্তি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার চূড়ান্ত উপায় হল তাকে অবিশ্বাস করা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অসংখ্য আশীর্বাদ দিয়েছেন। একটি উদ্ভাবন যেমন তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, তেমনি সেই ব্যক্তিও যে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 161-162:

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ। সেখানে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারের অধীন, সেহেতু তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলা ছাড়া একজন ব্যক্তির আর কোনো বিকল্প নেই। একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে থাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে একজন ব্যক্তি যেমন সমস্যায় পড়বেন, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই সমস্যায় পড়বেন। একজন ব্যক্তি একটি দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারে যদি তারা তার নিয়মে

সন্তুষ্ট না হয় তবে তারা এমন জায়গায় পালাতে সক্ষম হবে না যেখানে মহান আল্লাহর বিধান এবং এখতিয়ার প্রযোজ্য নয়। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের স্বার্থে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 161:

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ।

এই আয়াতটি মানুষকে খারাপ সাহচর্য সম্পর্কে সতর্ক করে, কারণ একজন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক। যে ব্যক্তি খারাপ সঙ্গী অবলম্বন করবে সে শেষ পর্যন্ত নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে এবং এর ফলে কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গী ও সঙ্গীদের অভিসম্পাত হবে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 27-29:

"আর যেদিন অন্যায়কারী তার হাত কামড়াবে [অনুশোচনায়] সে বলবে, "হায়, আমি যদি রসূলের সাথে একটি পথ গ্রহণ করতাম, হায়, আমার হায়, আমি যদি তাকে বন্ধু

হিসাবে না নিতাম। তিনি আমাকে স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে গেলেন এবং মানুষের কাছে শয়তান সর্বদা পরিত্যাগকারী।"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল মানুষকে খারাপ সঙ্গী গ্রহণ করতে উত্সাহিত করা কারণ এটি বিভ্রান্তির একটি রেসিপি। এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই উত্তম সঙ্গী গ্রহণ করতে হবে যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, কারণ এটি উভয় জগতে তাদের উপকার করবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

যদি একজন মুসলিমের সাহচর্য যথেষ্ট খারাপ হয়, তবে এটি তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করা এড়াতে উত্সাহিত করতে পারে, যার ফলে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। বিশ্বাস একটি উদ্ভিদের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। যেমন একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি পায় না, যেমন জল, মরে যাবে, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও ভালো হতে পারে যে আনুগত্যের সাথে তাদের ঈমানকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। মূল আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এছাড়াও, ভাল কাজগুলিও একটি প্রমাণ যা একজনের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজন। অতএব, কেবলমাত্র নিজের জিহ্বা দিয়ে বিশ্বাসের দাবি করা যথেষ্ট ভাল নয় যতক্ষণ না এটি আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

মূল আয়াতগুলি এটাও স্পষ্ট করে যে এই পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, সেভাবেই তাদের মৃত্যু হবে এবং সহীহ মুসলিমের 7232 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মারা গেছেন সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। , যদি কেউ একজন মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত হতে চায় যিনি মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদি কেউ মুসলিম হিসেবে মরতে চায়, তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবেই বাঁচতে হবে এবং কাজ করতে হবে। মুসলিম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অন্য কথায়, মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য ইসলামি শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 161-162:

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ। সেখানে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।"

এই আয়াতগুলি মানুষকে আশাও দেয় কারণ এই শাস্তি শুধুমাত্র তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করে মারা যায়। এটি প্রত্যেকের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়, যতক্ষণ তারা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। সত্যকে গ্রহণ করার এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের দরজা, যাতে তারা একটি অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের নেতৃত্ব দেয় যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যে পূর্ণ। উপরন্তু, রহমতের এই দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত, একজন মুসলমানের কখনই একজন অমুসলিমকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয় কারণ তারা জানে না যে তারা মুসলিম হিসাবে মারা যাবে কি না। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত অমুসলিমদের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করে সমস্ত নবী (সা.)-এর ঐতিহ্যকে গ্রহণ করা এবং তার

পরিবর্তে তাদের উচিত ইসলামী শিক্ষা শেখার ও আমলের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে লালন ও শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করা যাতে তারা তারা যে নিয়ামত দান করেছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করুন। অন্য কথায়, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হতে হবে, যেহেতু কেউ একজন মুসলমান মারা যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়নি, তারপরে অন্য লোকেদের সমালোচনা করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করুন।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 163-167

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

“আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং [মহান] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। , এর দ্বারা পৃথিবীকে তার নিষ্প্রাণতার

পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তাঁর] বায়ু এবং আকাশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘের নির্দেশনা। আর পৃথিবী নিদর্শন তাদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে।

এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী। আর যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

[এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে।

যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেমন তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে একমাত্র তাদের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে তাদের আনুগত্য করতে হবে, তিনি হলেন তাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, মহান আল্লাহ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

" *আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য [উপাসনার যোগ্য] নেই.."*

প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ এইভাবে মেনে চলে তাদের জীবনকে মডেল করে তারা যার উপাসনা করে, যদিও তারা দাবি করে যে তারা কোনো দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের অবশ্যই কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। এই কিছু অন্য মানুষ, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা আছে কিনা. 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন ব্যক্তি যাকে বা যাকে মান্য করে এবং অনুসরণ করে তারা যাকে উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্য সকল বিষয়ের তুলনায় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে

তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় দ্বারা মানসিক শান্তি এবং সাফল্য প্রদান করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

“ আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই , যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব[পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পরিবর্তে অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে সমস্ত জগতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। মজা এবং বিনোদন, যেহেতু কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

"এবং তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ..."

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলদের অবাধ্যতা এবং তাদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করার পর, যদিও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়, মহান আল্লাহ, মহান বলে দাবি করেছিল, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে একই ঈশ্বর যিনি বনী ইসরাঈলকে শাস্তি

দিয়েছিলেন। তাদের অবাধ্যতা, অন্য কোন সম্প্রদায়কেও শাস্তি দেবে, যেমন মুসলিম সম্প্রদায়, যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য সর্বজনীন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 62:

"[এটি] পূর্ববর্তীদের সাথে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পথ; আর তুমি আল্লাহর পথে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই বিভ্রান্তিকর মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা পূর্ববর্তী জাতিগুলির থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহর বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তার দিকে পরিচালিত করে, তাঁর প্রতি আশা নয়। করুণা মহান আল্লাহর রহমতের আশা সর্বদা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারপর আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ তা দেবেন। উভয় জগতে তাদের রহমত ও ক্ষমা। যেখানে, ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাকারী আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা উভয় জগতে তাদের রহমত ও ক্ষমা প্রদান করবে শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা মৌখিকভাবে মুসলিম বলে দাবি করে। আশা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারার মধ্যে এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। যারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তাদের শাস্তি দেওয়ার মহান আল্লাহর প্রথা অতীতে কোন সম্প্রদায়ের জন্য পরিবর্তিত হয়নি এবং হবেও না। মুসলিম জাতির জন্য পরিবর্তন, অন্যথায় চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং উভয় জগতে শাস্তির দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

“আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এই আয়াতটি আরো ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টি সৃষ্টির কারণ যেমন তাদের প্রতি রহমত করা, তেমনি এই রহমত লাভ করা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গজব অর্জনের চেয়ে সহজ। অর্থ, উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহান আল্লাহর রহমত অর্জন করার ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটি কেবলমাত্র একজনেরই প্রয়োজন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তারপর মহাবিশ্বের মধ্যে কিছু নিদর্শন ব্যাখ্যা করেন যা স্পষ্টভাবে তাঁর একত্বকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 163-164:

“ আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়। নিঃসন্দেহে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে..."

যখন কেউ নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অগণিত সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে একমাত্র একজনই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন, কারণ সূর্য তার থেকে সামান্য কাছাকাছি বা আরও দূরে থাকলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হবে না। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন...*"

দিন এবং রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বৈচিত্র্যময় দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে দেয়। দিন দীর্ঘ হলে মানুষ দীর্ঘ সময় থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাত দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকত না এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসগুলি। যদি রাতগুলি ছোট হয়, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পারবে না। দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনগুলি ফসলের উপরও প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণীদের বিধানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এই সত্য যে মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত্রি এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্বের ইঙ্গিত দেয়, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস চান, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"...একটি *[মহা] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন..."*

যখন কেউ নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন সৃষ্টিকর্তাকে নির্দেশ করে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে এবং তারপর ঘনীভূত হয়ে অ্যাসিডিক বৃষ্টি তৈরি করে যা পাহাড়ে নেমে আসে । এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিকে নিরপেক্ষ করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় তবে এটি পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মধ্যে থাকা মৃত প্রাণীকে দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয় তবে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সাগর ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন তার মধ্যে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে যাত্রা করতে পারে। যদি পানির সংমিশ্রণ কিছুটা ভিন্ন হয় তবে একটি ভারসাম্যহীনতা ঘটত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করবে বা জাহাজগুলিকে এটির উপরে যাত্রা করার অনুমতি দেবে তবে উভয়ই একই সময়ে সম্ভব হবে না। এমনকি আজ অবধি, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও সারা বিশ্বে পণ্য

পরিবহনের সর্বাধিক ব্যবহৃত রূপ। এই নিখুঁত ভারসাম্য তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যা নাযিল করেছেন বৃষ্টি, তার দ্বারা পৃথিবীকে তার প্রাণহীনতার পর জীবন দান করেছেন...*"

কেয়ামতের দিনে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি যখন পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা সারা দিন, মাস এবং বছর জুড়ে ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ একটি মৃত অনুর্বর জমিকে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেক কিছুর প্রতিফলন বিচার দিবসে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং তাতে ছড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি [প্রকার] চলমান প্রাণী..."*

বিবর্তন হল মিউটেশনের একটি রূপ, যা প্রকৃতির দ্বারা অপূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অগণিত প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে তারা একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তারা উন্নতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটটি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানি পান করার প্রয়োজন ছাড়াই। তারা পুরোপুরি মরুভূমি জীবনের জন্য ডিজাইন করা হয়. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 17:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটি এমন নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে তার শরীরের অমেধ্যগুলি এটি থেকে উৎপন্ন দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির যে কোনো মিশ্রণ দুধকে পানের অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 66:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, গবাদি পশু চারণে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষা। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমরা আপনাকে পান করি - মলত্যাগ এবং রক্তের মধ্যে - খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতিকে একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্যদের অতিক্রম করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছিদের জীবনকাল খুব কম, 3-4 সপ্তাহ এবং 500টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়, তাহলে মাছিদের জনসংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তারা এই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে অভিভূত করে ফেলত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব বেশি তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যাকে সংযত করার অনুমতি দেয়। এই সব একটি দুর্ঘটনা হতে পারে না বা বিবর্তনের প্রক্রিয়া এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের [তার] নির্দেশনা...*"

বায়ু পরাগায়নের জন্য বায়ু অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছকে পুনরুত্পাদন করতে দেয়। আগের দিনগুলিতে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বায়ু অপরিহার্য ছিল, যা আজও সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য রেইনক্লাউডগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে সরানোর জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বায়ুর একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টি খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টি ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 18:

“এবং আমি আকাশ থেকে পরিমাপক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা এটি কেড়ে নিতে সক্ষম।"

এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তার হাত দেখায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

" *নিশ্চয়ই, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে, একটি [মহা] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে নাযিল করেছেন। বৃষ্টির, এর দ্বারা পৃথিবীকে তার প্রাণহীনতার পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তার] বায়ু ও মেঘের নির্দেশনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সেই লোকদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে।"*

যিনি এই সমস্ত নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে একক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। উপরন্তু, যখন কেউ এই নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করবে তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়, যথা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারীরা তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তারা একটি সরকার দ্বারা শাস্তি পায়। এটা বোঝা যৌক্তিক যে একক স্রষ্টা, আল্লাহ, মহান, যিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য আনবেন, যা এই বিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য ঘটানোর জন্য, মানুষের ক্রিয়াগুলি প্রথমে শেষ হতে হবে। এই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং ভারসাম্য চিরকাল থাকবে।

কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার জন্য তাদের মন তৈরি করে ফেলেছে এবং তাদের ইচ্ছা বা অন্যের

আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করে তারা মহাবিশ্বের মধ্যে থাকা লক্ষণগুলির প্রশংসা করবে না বা প্রভাবিত হবে না। যা সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্ব, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব এবং অনিবার্য বিচার দিবসকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164-165:

"... এমন লোকদের জন্য লক্ষণ যারা যুক্তি ব্যবহার করে। এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদের ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসতে হবে..."

যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নিদর্শনগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় তখন তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করবে, যেমন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং মানুষ। এটি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যা কেবলমাত্র উভয় জগতেই দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

শুধুমাত্র তারাই তা করবে যারা মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে, যা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

"... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী..."

তারা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করার চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা তাকে খুশি করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে এমনকি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষা ইসলামী শিক্ষার সাথে বিরোধী হয় কারণ তারা জানে যে এটি করা তাদের জন্য সর্বোত্তম। তারা বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, তারা

মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য মঞ্জুর করা হবে, যদিও তারা সম্পদের মতো অনেক কিছুর অধিকারী নাও হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

" এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী..."

আহলে কিতাবগণ বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের মতামতকে মহান আল্লাহর বাণী ও আদেশ বলে তাদের আলেমদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 31:

"তারা [কিতাবেরা] আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

দুঃখজনকভাবে, এটি প্রায়শই মুসলমানদের মধ্যে ঘটে যারা তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং তাদের নির্দেশিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং অনুকরণ করে যা আল্লাহ, মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ, পবিত্র কুরআনের পথ এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলেন। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার পরিবর্তে নির্দেশের দুটি উত্স, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্যের শিক্ষা অধ্যয়ন ও শেখার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। , ধার্মিক প্রদর্শিত লোকেদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্ম জ্ঞানের অন্যান্য উত্সকে অনুসরণ করবে এবং মেনে চলবে তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্সকে অনুসরণ করবে এবং মেনে চলবে, যা ফলস্বরূপ বিপথগামী হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। .

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অবাধ্যতাকারীদেরকে সতর্ক করে দেন, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা কখনই তাদের কর্মের পরিণাম থেকে বাঁচতে পারবে না এই দুনিয়ায় বা পরকালে, যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। জিনিস, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

"... আর যারা অন্যায় করেছে তারা যদি শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা।"

আগেই বলা হয়েছে, এই শাস্তি এই দুনিয়াতেই শুরু হবে যার ফলে পার্থিব জিনিসগুলোই তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা এক মানসিক চাপ থেকে পরবর্তীতে চলে যাবে এবং একটি অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

তাদের উদাসীনতার কারণে তারা তাদের হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশার কারণকে তাদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে সংযুক্ত করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের

জীবনের মধ্যে ভুল জিনিসগুলিকে দোষারোপ করবে, যেমন তাদের কাছে থাকা কিছু ভাল বন্ধু এবং আত্মীয়। এটি তাদের জীবন থেকে এই ভাল উপাদানগুলিকে সরিয়ে দেবে, যা তাদের জন্য কেবল আরও দুঃখ এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়। এবং পরকালে তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আরও তিক্ত ও বিপর্যয়কর। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 165:

"... আর যারা অন্যায় করেছে তারা যদি শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা।"

পরকালে তাদের শাস্তি, মানসিক চাপ ও যন্ত্রণা তাদেরকে দোষারোপ করতে বাধ্য করবে যারা এই দুনিয়ায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, যাদেরকে তারা তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সকল পরিস্থিতিতে তাদের আনুগত্য করেছে। তবে এটি

তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং তারা অন্যদের দোষ দিতে সক্ষম হবে না, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব কর্মের জন্য দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি শয়তানও বিচার দিবসে এই সত্যটি ঘোষণা করবে যার ফলে তাকে দোষারোপ করে তাদের নিজেদের কর্মের পরিণতি থেকে পালাবার অন্যায়কারীদের আশা ধ্বংস হবে। গ অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেদেরকে দোষারোপ করো।

তাদের মানসিক চাপ এবং যন্ত্রণা তখনই বাড়বে যখন তারা লক্ষ্য করবে যে, যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের বিপথগামী উপায়ে তাদের সমর্থন করেছিল, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা, তারা তাদের শাস্তিতে অংশীদার হতে চায় না বলে তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 166:

"[এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যে] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে।

যারা এই পৃথিবীতে ভালো মানুষের সঙ্গী হবে তারাই উভয় জগতে তাদের সাহচর্য থেকে উপকৃত হবে। যে সমস্ত লোকেরা তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করে, তারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে তা ব্যবহার করে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

একমাত্র বন্ধন যা দৃঢ় থাকবে এবং বিচারের দিনে একজনের পক্ষে গণনা করা হবে তা হল মহান আল্লাহর আনুগত্যে তৈরি করা বন্ধন, এই বন্ধনগুলি ভাল মানুষের সাথে হোক, পবিত্র কুরআন বা নেক আমল। তাই একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সম্পর্ক স্থাপনে মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

“...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

কিন্তু যারা গোমরাহীর পথ বেছে নেয় এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য ও উপাসনা করে, তারা অবশেষে অনিবার্য বিচার দিবসের মুখোমুখি হবে, যখন

তাদের আচরণ সংস্কারের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না। তাদের অনুশোচনা থাকবে যা তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে, তাদের অনুশোচনা তাদের যন্ত্রণা এবং চাপকে বাড়িয়ে তুলবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 167:

" যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেভাবে তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই মুসলমানদের এই পৃথিবীতে তাদের আচরণ সংস্কারের অসংখ্য সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের সমস্ত সময় এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলিকে উৎসর্গ করে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, মানুষ, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছার আনুগত্য ও উপাসনা করা থেকে বিরত থাকে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করে এবং দুনিয়ার অন্ধকার ও সংকীর্ণ জীবন এবং পরকালের অকল্পনীয় শাস্তি ও অনুশোচনা থেকে রেহাই পায়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 168-171

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

“হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও উত্তম তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?

কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

অন্যান্য অনেক ধর্ম এবং জীবন পদ্ধতির বিপরীতে, ইসলাম সমস্ত মানুষকে সমানভাবে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের কোনো পক্ষপাত ছাড়াই সাফল্যের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি..."

ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে একমাত্র জিনিস যা একজনকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে একটি আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য লুকানো থাকায় কেউ দাবি করতে পারে না যে তারা বা অন্যরা অন্য লোকেদের চেয়ে উচ্চতর। পরিবর্তে, একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং অন্যকেও একই কাজ করার উপদেশ দিতে হবে।

ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ভালো নিয়্যত গ্রহণ করা, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল যা উপার্জন করা এবং সেবন করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

যে হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে সে তাদের সমস্ত কাজকে ধ্বংস করে দেবে, কারণ তারা তাদের ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তিকে কলুষিত করেছে। এটিকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে সে কখনোই এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের বিষয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তি বেআইনি উপায়ে তারা যে জিনিসগুলি পায় তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই যা খাঁটি ও স্বাস্থ্যকর তা উপার্জন ও সেবনের চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, তার এক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং বায়ু থেকে তৃতীয় বাকি. এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের পূর্ণ হওয়ার আগেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং যদি তাদের অন্য খাবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা অন্যদেরকে সতর্ক না করেই এতে অংশ নিতে পারে যে তারা ইতিমধ্যেই খেয়েছে। যেহেতু অতিরিক্ত খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার অগণিত মানসিক ও শারীরিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, সেহেতু যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে, সে মন ও শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের দিকে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। . পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি হারাম যা গ্রহণ করে এবং সেবন করে, সে একটি

ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, যা অগণিত মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করে। উভয় জগতের এই দুর্দশাই শয়তান মানবজাতির জন্য কামনা করে এবং তাই সে তাদেরকে বেআইনি ও অস্বাস্থ্যকর জীবনধারার দিকে উৎসাহিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

“... পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

শয়তানের এই ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তাদের হালাল রিযিক যেমন তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, এটি অনিবার্যভাবে তাদের কাছে পৌঁছাবে এবং অন্য কেউ তাদের থেকে তা আটকাতে বা বাড়াতে পারবে না। এটা তাদের জন্য। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাদের বৈধ রিযিক পাওয়ার জন্য যে শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের পক্ষ পূর্ণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত, মহান আল্লাহ, তারা নিশ্চিত করবেন যে তারা তাদের জন্য এতদিন আগে বরাদ্দকৃত বৈধ রিজিক পাবে, এমনকি যদি এটি অর্জনের জন্য তাকে আসমান ও জমিনকে স্থানান্তর করতে হয়। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।”

উপরন্তু, শয়তান যতই বেআইনি বিধানকে সুন্দর করার চেষ্টা করুক না কেন, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না এবং উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"... *আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"*

এর মধ্যে ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত জীবন পদ্ধতি এবং আচরণবিধি ব্যতীত অন্য একটি জীবন পদ্ধতি এবং আচরণবিধি গ্রহণ করা জড়িত। বাস্তবে, তারা এই পৃথিবীতে মাত্র দুটি পথ। প্রথম পথের মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। . এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুর বিষয় এবং ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব[পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

এই পথ মানুষকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করবে, যার ফলে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির বিস্তার নিশ্চিত হবে। উপরন্তু, এই পথ নির্দেশনার দুটি উত্স, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সকল পরিস্থিতিতে কঠোরভাবে মেনে চলার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলো ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে। আসল বিষয়টি এই যে, কেউ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অন্য পথ, শয়তানের পথ, যে আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে তার অপব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 168-169:

“... আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।"

এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই দুঃখ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি যদি কেউ মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী এবং বিখ্যাত এবং তাদের সম্পদ এবং খ্যাতি সত্ত্বেও তাদের হতাশাগ্রস্ত এবং দুঃখজনক জীবনযাপন দেখে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। উপরন্তু, এই পথটি শুধুমাত্র সমাজের মধ্যে মন্দ ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়, কারণ লোকেদেরকে গবাদি পশুর মতো আচরণ করতে উত্সাহিত করা হয় যারা কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আগ্রহী এবং তাই তাদের জীবনযাত্রার বিরোধিতা করে এমন কিছুকে উপেক্ষা করে যাতে তারা বধির হওয়ার মতো আচরণ করে। , বোবা এবং অন্ধ। এটি তাদের আল্লাহ, মহান বা অন্যান্য লোকের অধিকার পূরণে বাধা দেবে এবং তাই সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসারকে বাধা দেবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 171:

" কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

যে সমাজ এমন আচরণ করবে তার মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার রোধ করবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজনকে অবশ্যই জীবনের সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, কারণ এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 169:

"... *আর আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তুমি জানো না।"*

শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ হল মানুষকে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে উৎসাহিত করা যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি একজন ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তবে তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করবে, যা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি তাদের কেবলমাত্র তাঁর অবাধ্য হতে উত্সাহিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সত্যটি গ্রহণ করবে যে আল্লাহ, মহান, সমস্ত ক্ষমাশীল প্রসঙ্গের বাইরে এবং তাই তারা পাপ এবং তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকবে এবং ধরে নেবে যে তারা মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অর্থ হবে মহান আল্লাহ অন্যায় ও অন্যায্য এবং তিনি মন্দ কাজকারীর সাথে ভালো কাজকারীর সমান আচরণ করবেন। এ ধরনের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসম্মানজনক। উপরন্তু, এই মিথ্যা মনোভাব কেবলমাত্র একজনকে তাদের অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকতে উৎসাহিত করবে যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই শাস্তির কারণ হতে পারে। অতএব, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং বিচার দিবসের প্রতি সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর আমল করতে হবে, যাতে তারা দৃঢ় থাকে। সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, লোকেরা ইসলামের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করার এবং এর শিক্ষা অনুসারে কাজ করার একটি বড় কারণ হল এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। মানুষ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার আরেকটি বড় কারণ আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

" *আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, "বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব।" যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?*

অন্যের অন্ধ অনুকরণ সর্বদাই বিভ্রান্তির প্রধান উৎস। মানুষকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি উপযুক্ত বিকল্প বেছে নেওয়ার জন্য তথ্য ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। বেশিরভাগ ধর্মের বিপরীতে, ইসলাম অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করে এবং মানবজাতিকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যাতে তারা ইসলামের সত্যতা নিজেদের জন্য অনুমান করতে পারে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

" বলুন, "আমি তোমাদের শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং পৃথকভাবে [সত্যের সন্ধানে] দাঁড়াও এবং তারপর চিন্তা কর।" তোমার সঙ্গীতে নেই কোন উন্মাদনা। কঠিন শাস্তির পূর্বে তিনি তোমাদের জন্য সতর্ককারী মাত্র।"

তাই একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে চিনতে অন্যের অন্ধ অনুসরণ না করে জ্ঞান অন্বেষণ ও তার উপর আমল করার পথ অবলম্বন করতে হবে। এই মনোভাব শিশুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু বড়দের মধ্যে নয়। যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা এড়িয়ে চলে, তখন তারা অনিবার্যভাবে শয়তানের ফাঁদে পড়ে এমন একটি আচরণবিধি এবং জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে যা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি যদি একজন মুসলিম মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করে, যা সাধারণত দিনের এক ঘন্টারও কম সময় নেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 168-169:

"... *আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।*

এমনকি ভাল কাজ করার ক্ষেত্রেও অন্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ইসলামে বাঞ্ছনীয় নয়, যদিও কেউ ভাল করছে। এর কারণ হল ইসলাম একজনকে সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে শেখায় এবং তাই এটিকে সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কাজ করে এবং অন্য কেউ তাদের বলেছে বলে এটিতে কাজ না করে। যদিও ভালো কিছুর

ক্ষেত্রে অন্যের অন্ধ অনুকরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিরা কঠিন সময়ে সহজেই অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কারণ তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই যা ইসলামিক জ্ঞানের সাথে আসে। সব সময় ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ। এই ব্যক্তি আনুগত্য এবং অবাধ্যতার মধ্যে নড়বড়ে হবে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বা এই জড় জগতের বাইরে জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য লক্ষ্য না করে। এই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, এমনকি যদি তারা আখিরাতে নাজাত পায় এবং যে ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর আমল করে এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের জীবন যাপন করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ আলাদা।

অনুরূপ মানসিকতায়, কিতাবেরা তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণ করে এবং বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের মতামতকে মহান আল্লাহর বাণী ও আদেশ বলে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 31:

"তারা [কিতাবেরা] আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

দুঃখের বিষয়, কিছু মুসলমানও মহান আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি ব্যবহার না করে তাদের আলেম ও নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যদিও একজন সঠিকভাবে পরিচালিত আলেমকে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ তবুও একজন মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে এবং অন্ধভাবে তাদের পণ্ডিতদের অনুসরণ করে যেন তারা নিখুঁত এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত। অতএব, একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ

করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের আলেম সর্বদা সঠিক তাই তাদের আলেমদের মতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

একজন ব্যক্তি যদি অন্ধ অনুকরণে অটল থাকে, তবে তাদের জীবন গবাদি পশুর জীবন ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না, যারা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা, চাপ এবং দুর্দশার দিকে পরিচালিত করবে কারণ ব্যক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার শক্তি থাকবে না, এমনকি যদি তারা ভাল লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এবং অন্ধ অনুকরণকারীর পক্ষে খারাপ লোকদের এবং তাদের মতামতের অনুসরণ করা অনিবার্য, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, যদিও তারা ধার্মিক লোক হিসাবে দেখা দেয়। দুঃখের বিষয় হল এই অন্ধ অনুকরণকারীরা ধরে নেবে যে তারা সঠিকভাবে কাজ করছে যখন প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যই সরল পথ থেকে কতটা দূরে তা তারা জানে না। যে জানে যে তারা হারিয়ে গেছে সে হয়তো তাদের গতিপথ সামঞ্জস্য করতে পারে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক পথে রয়েছে সে তাদের পথ সামঞ্জস্য করার সম্ভাবনা কম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 171:

" *কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।*"

অন্ধ অনুকরণকারী তাদের কোন ভাল পরামর্শের প্রতি মনোযোগ দিতে অসম্ভাব্য, যখনই এটি তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের পথের বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে তাদের সাথে কথা বলা আর গবাদি পশুর সাথে কথা বলা এক। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা বিশ্বাসের নিশ্চিততা লাভ করে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে এবং পূরণ করতে পারে। 170 নং আয়াতে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করার পরিবর্তে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর"...

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, যদিও তা অন্যের পথ ও বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

" *আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, "বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব।" যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?*

এই আয়াতটি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের অধিকারী এবং এর উপর আমলকারীদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সাবধানে বেছে নিতে হবে যে তারা তাদের বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করবে এবং এই লোকেদের সীমাবদ্ধ করবে যারা তাদের বিষয়ে জ্ঞান রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, যার চিকিৎসা সমস্যা আছে তাকে চিকিৎসা জ্ঞানের অধিকারী একজনকে খোঁজা উচিত, যেমন একজন ডাক্তার। আর যে ব্যক্তি দ্বীনী উপদেশ চায় তাকে অবশ্যই দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যেমন আলেমকে তালাশ করতে হবে। এটা লক্ষ্য করা দুঃখজনক যে, পার্থিব বিষয়ে, মুসলিমরা প্রায়শই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয় কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তারা প্রায়শই যে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুসরণ করে। উপরন্তু, একজনকে কেবলমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারাই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কখনই অন্যদেরকে কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেবে না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অতএব, একজনকে কেবল তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। অন্যথায় তারা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে যারা তাদের পথভ্রষ্ট করবে, যদিও এটি তাদের উদ্দেশ্য নাও হয়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 172-173

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

“হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম (অর্থাৎ, হালাল) রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [তাকে] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙ্ঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিজিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে, মহান আল্লাহ সমস্ত মানবজাতিকে তাঁর আনুগত্যের দিকে আহবান করেছেন যা হালাল ও বিশুদ্ধ তা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে মানবজাতির মধ্যে যারা সত্যই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারাই বৈধ ও উত্তম যা পাওয়ার ও ব্যবহারে দৃঢ় থাকবে। সুতরাং তারা এই আদেশ পালন করে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা বিশ্বাসী বলে বিবেচিত কিনা তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। উপরন্তু, বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ বৈধ উল্লেখ করেন না এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র ভাল জিনিস উল্লেখ করেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেবলমাত্র একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীই

বেআইনি জিনিসগুলি গ্রহণ এবং ব্যবহার করা এড়িয়ে চলবেন, কারণ বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট আদেশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে সে যদি হারাম জিনিস গ্রহন করে এবং ব্যবহার করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত বিশ্বাসী হিসাবে বিবেচিত হবে না। কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল যা হালাল তা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা। এই বাহ্যিক ভিত্তি যদি কলুষিত হয়, তবে একজন ব্যক্তি যা কিছু করে তার সবই নষ্ট হয়ে যাবে। হালাল শব্দটি বাদ দেওয়া এবং ভাল শব্দটি রাখাও ইঙ্গিত দেয় যে এই পৃথিবীতে একমাত্র আসল ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিসগুলিই মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

"...এবং তাদের জন্য ভালো জিনিস হালাল করে এবং মন্দ কাজ থেকে হারাম করে..."

যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই মহাবিশ্ব এবং তাদের ভিতরের সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি একাই জানেন যে একজন ব্যক্তির জন্য কোনটি ভাল এবং কোনটি তাদের জন্য খারাপ, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানবদেহ ও মনের উপর অ্যালকোহলের অনেক নেতিবাচক প্রভাব সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা উত্তম [অর্থাৎ হালাল] বস্তু থেকে আহার কর..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই যা খাঁটি ও স্বাস্থ্যকর তা উপার্জন ও সেবনের চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, তার এক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং বায়ু থেকে তৃতীয় বাকি. এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের পূর্ণ হওয়ার আগেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং যদি তাদের অন্য খাবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা অন্যদেরকে সতর্ক না করেই এতে অংশ নিতে পারে যে তারা ইতিমধ্যেই খেয়েছে। যেহেতু অতিরিক্ত খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার অগণিত মানসিক ও শারীরিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, সেহেতু যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে, সে মন ও শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের দিকে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। . পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি হারাম যা গ্রহণ করে এবং সেবন করে, সে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, যা অগণিত মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা উত্তম [অর্থাৎ হালাল] বস্তু থেকে আহার কর..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে অন্যান্য বিষয়গুলি অনুসরণ করার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষাগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন তাদের নিজস্ব মতামত, সাংস্কৃতিক অনুশীলন বা নির্দেশনার দুটি উত্স ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানের উত্স, পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে, যার ফলে বিপথগামী হয় এবং একটি অস্বাস্থ্যকর এবং ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

মহান আল্লাহ, তারপর সমস্ত মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত পার্থিব জিনিস মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর..."

এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা কেবল একটি ঋণ, এটি একটি উপহার নয়। সমস্ত ঋণের মতোই, মহান আল্লাহ পাক প্রদত্ত ঋণ, পার্থিব নেয়ামতের আকারে তাঁর কাছে ফেরত দিতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ধার করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের ঋণ

সঠিকভাবে শোধ করে, তাকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য দেওয়া হবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয়, সে যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি যারা তাদের পার্থিব ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয় তাদের শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তারা যে আশীর্বাদের অধিকারী তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। আর আখেরাতের শাস্তি আরও তিক্ত। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যদিকে, জান্নাতে মুসলমানদের জন্য প্রদত্ত নেয়ামত একটি উপহার। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"... এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই কারণেই জান্নাতে একজন ব্যক্তি তাদের দান করা আশীর্বাদগুলিকে উপযুক্ত হিসাবে ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে।

তাই এই পৃথিবীতে দেওয়া ঋণ এবং জান্নাতে দেওয়া উপহারের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে আচরণ করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে ঋণ ফেরত দিয়ে, তাদের ধার দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। তাঁর সন্তুষ্টির উপায়, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিজিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

উপরন্তু, কৃতজ্ঞতা মানে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এর একটি চিহ্ন হল যে একজন ব্যক্তি তাদের সাহায্যকারী লোকদের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা কামনা করেন না বা আশা করেন না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা চুপ থাকা। এবং যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, নিজের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতা হল সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ঋণ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তার জন্য উভয় জগতে বরকত, রহমত ও ক্ষমা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা রয়েছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

উপরন্তু, এই পদ্ধতিতে আচরণ করা একটি বাস্তব প্রমাণ যা একজন মুসলমানের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ, হালাল] জীবিকা দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"

এটি আরও বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে মহান আল্লাহর ইবাদত প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্য এবং যোগাযোগ করার সময় এবং ব্যবহার করার সময় প্রতিটি আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে। এটা আরও সমর্থন করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা ভালো ও বৈধ যা পাওয়ার ও ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা তাঁর ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি ইবাদত নিয়ে আলোচনা করেননি । অতএব, মহান আল্লাহর ইবাদত দৈনিক পাঁচটি ফরজ নামাজের বাইরেও প্রসারিত, যেটি করতে দিনে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে।

মহান আল্লাহ, তারপর মানুষকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ধারণার মাধ্যমে একটি সাধারণ ধারণা ব্যাখ্যা করেন, কারণ এটি করা তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

" *তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিস যা ইসলামে হারাম করা হয়েছে এমন জিনিস যেখানে ক্ষতি অনুভূত সুবিধার চেয়ে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ করার আগে, মহান আল্লাহ এই নিয়মের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাদের ক্ষতি তাদের দ্বারা প্রাপ্ত যে কোনও অনুভূত উপকারের চেয়ে বেশি। সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কারও কাছে এটি স্পষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা 219:

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও কিছু] মানুষের জন্য উপকারী..."

কিন্তু কিছুতেই কম নয়, ইসলামের বিধি-বিধান শুধুমাত্র মানুষের উপকারের জন্যই রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের আনুগত্য বা অবাধ্যতা থেকে কোন উপকার বা ক্ষতি লাভ করেন না। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 6:

"... আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই নিজেদের স্বার্থে এবং উপকারের জন্য ইসলামের শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা, যেমনটি

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটি একাই পরিচালিত করে। মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যথায়, তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে উঠবে, কারণ তারা এমন জিনিসের পিছনে ছুটছিল যা তাদের কেবল শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতি করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাদের অবশ্যই সেই বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

" *তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে…"*

আধুনিক বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই পচা মৃতদেহ, রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর প্রকৃতি প্রমাণ করেছে। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পশু জবাই করা এবং খাওয়া একটি আধ্যাত্মিক রোগের দিকে পরিচালিত করে যা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে কলুষিত করতে পারে। যে এমন আচরণ করবে সে অনুমান করতে শুরু করবে যে অন্যদের জন্য তারা তাদের খাদ্য উৎসর্গ করবে তারা উভয় জগতের উপকার করতে পারে। এটি এমন একটি মনোভাব যা ইতিহাসে বহুঈশ্বরবাদের দিকে পরিচালিত করে এবং এমনকি একজন মুসলিমকেও এটি

করতে উত্সাহিত করতে পারে, এমনকি তাদের শিরকতা সূক্ষ্ম এবং এতটা স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 3:

"নিঃসন্দেহে, আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ ধর্ম। এবং যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অভিভাবক গ্রহণ করে [বলে], "আমরা তাদের ইবাদত করি শুধুমাত্র এ জন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"

অন্যের কাছে জিনিস উৎসর্গ করা একজনকে সুপারিশ করতে এবং উভয় জগতে তাদের রক্ষা করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে উত্সাহিত করতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে কেবলমাত্র একজনকে অলস এবং বিপথগামী মনোভাব গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে যেখানে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, বিশ্বাস করে যে অন্য কোনও ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে। উভয় জগতে তাদের রক্ষা করুন। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যা এবং চাপের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, এই মনোভাবের মূল কারণগুলির মধ্যে একটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে, যেখানে মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্যকে নয় বরং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার মাধ্যমে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

"তিনি তোমাদের জন্য শুধু মৃত পশু হারাম করেছেন, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে..."

যথারীতি, মহান আল্লাহ, তারপর ইসলামের সহজ চলমান প্রকৃতি নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

“...কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [এটা] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙ্ঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

চরম পরিস্থিতির কারণে যে ব্যক্তি অবৈধ কিছু করতে বাধ্য হয় তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি একজন ব্যক্তির উপর তাদের সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 2043 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ ভুলে গিয়ে বা জবরদস্তির মাধ্যমে পাপ করবে তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

এটি এটাও স্পষ্ট করে যে, প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলামের মধ্যে নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে কখনই পাপ করার জন্য নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যখন তারা দাবি করে যে তারা

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কারণ এই অজুহাত মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন না এবং এর ফলে উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে, ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং জেনে রাখা উচিত যে এটি অর্জন করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে রয়েছে। এই সেই ব্যক্তি যিনি উভয় জগতে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করবেন, যদিও তারা গাফিলতির মুহুর্তে পথের ধারে গুনাহ করে ফেলেন কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবেন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

"... *নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাভাবনা অবলম্বন করে, যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে ভাল বোধ করার জন্য অজুহাত দেখিয়ে পাপের উপর অবিচল থাকে, সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস, দুঃখ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 174-176

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا
يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى
ٱلنَّارِ ١٧٥

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ١٧٦

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহ কিতাব থেকে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং সামান্য মূল্যে বিনিময় করে, তারা আগুন ছাড়া তাদের পেটে প্রবেশ করে না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এরাই তারা যারা ভুলের জন্য হেদায়েত এবং শাস্তির জন্য ক্ষমার বিনিময় করেছে। তারা আগুনের জন্য কত ধৈর্যশীল!

এটা এজন্য যে, আল্লাহ কিতাব সত্যে অবতীর্ণ করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে যারা কিতাব নিয়ে মতভেদ পোষণ করে তারা চরম মতানৈক্যে রয়েছে।"

মহান আল্লাহ, মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকদের এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্প্রসারণ করে, পার্থিব লাভের জন্য, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য তাদের প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন ও অপব্যাখ্যা করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 174:

"*নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহ কিতাব থেকে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে নেয়, তারা আগুন ছাড়া তাদের পেটে প্রবেশ করে না...*"

কিতাবের আলেমগণ পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহকে চিনতে পেরেছিলেন। এবং তারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছে যেভাবে তাদের ঐশী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"*যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে...*"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানকে সম্পাদনা, অপব্যাখ্যা এবং লুকিয়ে রেখেছিল যা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, কারণ ইসলাম সরাসরি তাদের জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাদের আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয়। মঞ্জুর উপরন্তু, যেহেতু তাদের বিশ্বাস বংশের গভীরে প্রোথিত ছিল, বিশেষ করে ইহুদি বিশ্বাস, তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারেনি, কারণ তিনি তাদের বংশধর, ইস্রায়েলের সন্তান নন। তাকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করলে তারা মহানবী ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর হওয়ায় তাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার মিথ্যা দাবীটি ধ্বংস হয়ে যেত। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

তাদের আচরণের ফলে তারা ইসলামের সত্যতা থেকে অনেককে বিপথগামী করেছে এবং তাই উভয় জগতে মহান আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের দাওয়াত দিয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 159:

" *নিশ্চয়ই, যারা আমরা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল]-এ লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়ার পর আমরা যা নাযিল করেছি তা গোপন করে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং যারা অভিশাপ দেয় তাদের দ্বারা অভিশপ্ত।"*

পার্থিব লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যাখ্যা করে এবং গোপন করে এবং সম্প্রসারণ করে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। . এর মধ্যে রয়েছে নিজের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কোন ইসলামী শিক্ষাগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়া এবং বেছে নেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহর ইবাদত করে না, তারা কেবল নিজের ইচ্ছার পূজা করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামকে একটি কোটের মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যেটি তারা পরে এবং যখনই এটি তাদের উপযুক্ত হয় তখনই খুলে ফেলে। ইসলাম হল এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার উপর প্রতিটি পরিস্থিতিতেই কাজ করতে হবে, তা নির্বিশেষে তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে বা ইসলামের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে। শুধুমাত্র এই মনোভাবের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাদের অবশ্যই বুদ্ধিমান রোগীর মত আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। কিন্তু একজন মূর্খ রোগীর মতো যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমনটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে, তেমনি যে ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের সমস্ত শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হবে, এমনকি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী এবং মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 174:

" *অবশ্যই, যারা আল্লাহ কিতাব থেকে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং অল্প মূল্যে বিনিময় করে, তারা আগুন ছাড়া তাদের পেটে প্রবেশ করে না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না..."*

যারা এইভাবে আচরণ করবে তারা মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার মহৎ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক, কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই পৃথিবীতে তাঁর বাণী অগ্রাহ্য করেছে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্ধভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে এর শিক্ষাগুলিকে বোঝার এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই এর থেকে উপকৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে পরকালে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগ।

উপরন্তু, ঐশ্বরিক শিক্ষা উপেক্ষা করা একজনকে আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে শুদ্ধ হতে বাধা দেয়। ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি একজনের উদ্দেশ্যকে পরিশুদ্ধ করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই ইতিবাচক অভিপ্রায়ের একটি চিহ্ন হল যে কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না। ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি একজনের কথাবার্তাকে শুদ্ধ করে যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে। ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি একজনের কর্মকেও শুদ্ধ করে যাতে তারা এর শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে। এই শুদ্ধি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির

দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে, তারা পরকালের পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত হবে যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 174:

"... *এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না...*"

যখন কেউ এইভাবে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের শাস্তি অনিবার্য ও অনিবার্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 174:

"... আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

মহান আল্লাহ অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন যে এই মানুষগুলো যখন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করা বেছে নিয়েছিল তখন তারা যে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করেছিল, যার ফলে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্য পাওয়া যায়। যা পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার অন্তর্ভুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 175:

“ *এরাই তারা যারা পথের বদলা ভ্রান্তির বিনিময়ে এবং ক্ষমাকে শাস্তির বিনিময়ে। তারা আগুনের জন্য কত ধৈর্যশীল!*”

যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, কেউ যদি তাঁর অবাধ্যতা বেছে নেয় তবে উভয় জগতে তাদের অনিবার্য শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা সত্যিকারের জীবনে সন্তুষ্ট নয় এবং প্রায়শই বিশ্বের সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত এবং আত্মহত্যাকারী মানুষ।

তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের সামনের দুটি পথের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথম পথের মধ্যে একজনকে দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করা জড়িত, যা শুধুমাত্র উভয় জগতে বিভ্রান্তি ও শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় পথের মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতে সঠিক দিকনির্দেশনা এবং ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। তারা মাত্র দুটি পথ, তৃতীয় কোন পথ নয়। অতএব, প্রত্যেকের উচিত তাদের পছন্দসই পথ বেছে নেওয়া এবং এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 175:

“ *এরাই তারা যারা পথের বদলা ভ্রান্তির বিনিময়ে এবং ক্ষমাকে শাস্তির বিনিময়ে। তারা আগুনের জন্য কত ধৈর্যশীল!*”

মহান আল্লাহ তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এই দুটি পথকে স্ফটিক করে দিয়েছেন এবং তাই উভয় জগতের মানসিক শান্তি চাইলে সঠিক পথ বেছে নেওয়া এবং মেনে চলা ছাড়া আর কোনো অজুহাত অবশিষ্ট নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 176:

" *এটা এজন্য যে, আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন সত্যে...*"

প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য দিয়েও বোঝাতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য পূরণ করবে, যার মধ্যে এটি সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা, তা বোঝা এবং আন্তরিকভাবে এর উপর আমল করা জড়িত সে এই পৃথিবীতে সঠিক পথ বেছে নেবে। যে পথে আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। মুসলমানদের অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যে তারা বুঝতে পারে না এমন ভাষায় শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার প্রথম পর্যায়ে থাকবে না, কারণ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের বই নয়, এটি একটি নির্দেশনার বই। হেদায়েত তখনই অর্জিত হতে পারে যখন কেউ পবিত্র কুরআন বুঝে এবং আমল করে। দুঃখের বিষয়, যত মুসলমান পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা এবং ফরজ নামাজের মতো মৌলিক ফরজ দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তারা মনের শান্তি পায় না, কারণ তারা প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সঠিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে কারণ তারা এটি কিভাবে করতে হয় তা জানেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 176:

"... *এবং প্রকৃতপক্ষে, যারা কিতাব নিয়ে মতভেদ করে, তারা চরম মতভেদে।*"

তাই একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পবিত্র কুরআন এবং সম্প্রসারিতভাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলি বোঝার এবং আমল করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশের বিরোধিতা না করে। উচ্চাভিলাষী। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি কেবল উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 177

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٧

ধার্মিকতা এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [প্রকৃত] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং ধন-সম্পদ দান করে। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যখন তারা যোগাযোগ করে এবং তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে তখনই ধার্মিকতা এবং তাকওয়া প্রদর্শন করা উচিত। তাই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় এটি আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে মুখ করা থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

" *ধার্মিকতা এই নয় যে আপনি আপনার মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরান...*"

যে ব্যক্তি ইসলামকে একগুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করে, সে এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হবে এবং তাই ইসলামের নির্দেশিত কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও সে সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি একটি প্রধান কারণ যার কারণে অনেক মুসলমান প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা সত্ত্বেও মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ মানসিক শান্তি তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা এবং একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি তৈরি করে যা প্রভাবিত করে। তারা প্রতিটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তারা কীভাবে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

উল্লিখিত ধার্মিকতার প্রথম দিকটি হল মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা হল [তার] মধ্যে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে...*"

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা। যারা মহান আল্লাহকে তাদের রব বলে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দাসত্ব গ্রহণ করবে। একজন সত্যিকারের বান্দা তাদের নিজের আনন্দের সন্ধান করে না, তারা অন্যের কাছেও তাদের খুশি করার আশা করে না। তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে, যেমন মানুষের আনুগত্য করা এবং অনুসরণ করা, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। একজন বান্দার একমাত্র চাওয়া হচ্ছে তাদের প্রভুকে খুশি করা। উপরন্তু, একজন বান্দা স্বীকার করে যে তাদের নিজের জীবন সহ তাদের যা কিছু আছে সবই তাদের স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহর। অতএব, তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে তারা ত্বরা করবে। একজন প্রকৃত বান্দা বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু এবং সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং প্রভু, তাই তারা তাঁর অবাধ্য হয়ে মানসিক শান্তি পেতে পারে না, কারণ তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তির আবাস। তাই তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটিই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"*যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।*"

একজন ব্যক্তি যত বেশি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাস তত বেশি শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিত হবে যে বিচারের দিন তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে। এটি তাদের আরও উৎসাহিত করবে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে..."

অতএব, যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, ফলে বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ তাদের কল্যাণের অভাব। কাজগুলো তাদের আল্লাহ, মহান ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের প্রমাণ।

পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে এবং পবিত্র কোরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের দ্বারা নির্দেশিত মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ, মহান ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও শক্তিশালী করা যায়। তার উপর হতে উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের অগণিত ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব,

জলচক্র, মহাসাগরের ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর যাত্রা করার অনুমতি দেয় এবং সমুদ্রের জীবনকে উন্নতি করতে দেয়। তাদের, এবং আরো অনেক সিস্টেম, তারা একটি স্রষ্টার হাত পালন করবে. তাই অনেক নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম এলোমেলো ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকে তাহলে তা বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু কামনা করবে। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই ইঙ্গিত করে একক ঈশ্বর, আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

এছাড়াও মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যা বিচার দিবসের আগমনকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়, যথা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারীরা তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তারা একটি সরকার দ্বারা শাস্তি পায়। এটা বোঝা যৌক্তিক যে একক স্রষ্টা, আল্লাহ, মহান, যিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য আনবেন, যা এই বিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য ঘটানোর জন্য, মানুষের ক্রিয়াগুলি প্রথমে শেষ হতে হবে। এই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং ভারসাম্য চিরকাল থাকবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ, একটি মৃত অনুর্বর জমিতে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলির প্রতিফলন এবং আরও অনেকগুলি স্পষ্টভাবে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং বিচার দিবসে এর প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

ঈমানের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক হল অদৃশ্যে বিশ্বাস, যেমন জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্ব। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

“ … *কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা হল [তার] মধ্যে যে আল্লাহ , শেষ দিনে, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে...*

অদৃশ্যে বিশ্বাস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরের জিনিসগুলি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কারণ যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং বোঝা যায় সেগুলির প্রতি বিশ্বাসের মূল্য নেই এমন কিছুতে বিশ্বাস করার মতো যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। ইন্দ্রিয়, যদিও তারা তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে লক্ষণ. এ কারণেই মহান আল্লাহ তার বিশ্বাসকে কবুল করবেন না যে বিচার দিবসে তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয় কারণ তারা জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতাদের মতো অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে। তাই ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে সৃষ্টির অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে । এটি নিশ্চিত করবে যে অদেখা জিনিসগুলিতে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণার বাইরে চলে যাবে এবং এর পরিবর্তে তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হবে কারণ এটি তাদের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে উত্সাহিত করে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি নিশ্চিত যে দু'জন ফেরেশতা ক্রমাগত তাদের সাথে আছেন যারা বিচার দিবসের প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ লিপিবদ্ধ করছেন, তারা একা থাকা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ফেরেশতা, কিতাব..."

পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসের সাথে এর বিভিন্ন দিক পূরণ করা জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা, এটি বোঝা এবং এর শিক্ষার উপর আমল করা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রথম স্তরে থাকা এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে তারা কেবলমাত্র এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে যা তারা বোঝে না। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কিতাব নয়, এটি একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এর থেকে হেদায়েত তখনই অর্জিত হতে পারে যখন কেউ এটি বুঝতে পারে এবং তার উপর আমল করে। যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র একজনকে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে যদি তারা এটি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করে, পবিত্র কুরআন কেবল তখনই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন তারা এটি বুঝতে এবং আমল করে। দুঃখজনকভাবে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা নিয়মিত এটি পাঠ করে তাদের মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা এর শিক্ষাগুলি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এর উপর কাজ করা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা এর শিক্ষাগুলো বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ফেরেশতাগণ, কিতাব এবং নবীগণ..."

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কার্যত তাঁদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাঁদের আচার-আচরণ ও শিক্ষা যা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সুন্দর আচার-আচরণ সংক্ষিপ্ত, পরিপূর্ণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ আচরণ দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং মহৎ চরিত্রের উপর কার্যত শিক্ষা ও কাজ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের ওপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়া এই মৌখিক দাবির পরিপন্থী। সবাই যেমন বিচারের দিনে তাঁর সুপারিশের আশা করে, তারা অবশ্যই বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করবে যদি তারা তাঁর ঐতিহ্য এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, পবিত্র কুরআনের উপর শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 30:

"আর রসূল বলেছেন, "হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

বিচার দিবসে যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পরিবর্তে তার সুপারিশ কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্যের শিক্ষা শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, মৌখিকভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর চরিত্র ও আচার-আচরণ অনুসরণে ব্যর্থ হওয়া ইসলামে কোনো মূল্য নেই, কারণ পূর্ববর্তী জাতিগুলোও তাদের নবী-রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে। তাদের কিন্তু তারা তাদের শিক্ষাকে কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরকালে তারা তাদের সাথে একত্রিত হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাকে পরকালে বাস্তবিকভাবে তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুসরণ ও আমল করতে হবে।

মহান আল্লাহ, তারপর বিভিন্ন উপায়ে উল্লেখ করেন যে তিনি লোকেদের কাছ থেকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ যেমন সম্পদ, সময়, শক্তি এবং তাদের সামাজিক প্রভাব ব্যবহার করার আশা করেন । মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীকার করেন যে, আশীর্বাদ ব্যবহার করা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি লোকেরা প্রায়শই করে থাকে। নিজেদের, অন্য লোকেদের, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের জন্য আনন্দদায়ক উপায়ে তারা মঞ্জুর করা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে আগ্রহী। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দেয়, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও ...*"

একজন ব্যক্তিকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অতএব, যে আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা বেছে নেয়, সে মনের শান্তি পাবে না, যদিও তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলো অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের দেওয়া নেয়ামত এবং জান্নাতে পাওয়া নেয়ামতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"... এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে , একজন মুসলিম জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাত্, তাদের একটি উপহার হিসাবে এর মালিকানা দেওয়া হবে। এই কারণেই মুসলিমরা জান্নাতে যা খুশি তা করতে স্বাধীন থাকবে কারণ তাদেরকে এর মালিকানা দেওয়া হবে। অথচ এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলো মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, উপহার হিসেবে নয়। একটি উপহার মালিকানা নির্দেশ করে যেখানে একটি

ঋণ মানে আশীর্বাদ অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জড় জগতের নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হল সেগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ ও করুণা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

পার্থিব নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা প্রচুর সওয়াব পাবে কিন্তু যদি তা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে, তাহলে এই নিয়ামত তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

উপহার এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক যাতে তারা এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলোকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়।

অতএব, দান করা আশীর্বাদের অপব্যবহার করার তাগিদ থাকা সত্ত্বেও, তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যে তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও

তাদেরকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ওষুধ দেওয়া হয়। খাদ্য পরিকল্পনা। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন মানসিক ও শরীরের প্রশান্তি লাভ করবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে, সে কি পবিত্র কুরআন ও রেওয়ায়েতে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে একটি সরল ইসলামিক নীতি মনে রাখতে হবে, একজন ব্যক্তি যত বেশি দেবে, তত বেশি অর্থ পাবে, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তত বেশি ব্যবহার করবে, মহান, মনের শান্তি, করুণা তত বেশি। এবং উভয় জাহানে তাদের বরকত দেওয়া হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হবে না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক না হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উত্সর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করে এমন

জিনিসগুলিতে উত্সর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা যে জিনিসগুলি কামনা করে তাতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি হয় , যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন নেই যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম রয়েছে এবং এখনও তাদের ঘুম ছেড়ে দিয়েছে, কতজন আল্লাহর আনুগত্যে এইভাবে চেষ্টা করে, মহান, ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা হিসাবে, তাকে খুশি করার উপায়ে তারা মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব অবিশ্বাস্যভাবে অদ্ভুত। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

" যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার [অর্থাৎ নফস বা আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়দের ..."

মহান আল্লাহ সর্বদা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বব্যাপী উপদেশ প্রদান করেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে একজনের আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণের আহ্বান জানান , কারণ শুধুমাত্র এই একক উপদেশের উপর কাজ করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সদয় আচরণ করে, তাহলে বাইরের কোনো উৎস থেকে অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ করা হবে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দেরকে ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোন বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং দোষারোপ করার যোগ্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয়, আজকে অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসটি তাদের সাহায্য করছে তা ভাল বা খারাপ তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই

নিম্নলিখিত আয়াতে উপদেশ দেওয়া ক্রম মেনে চলতে হবে এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দেরকে সাহায্য করতে হবে যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে যুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, 83:

"... *আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং আত্মীয়দের সাথে...*"

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। লোকেদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি ভাল আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানকে বিরোধী করে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আত্মীয়দের অধিকার পূরণ করতে হবে, তারা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ভাল আত্মীয় হিসাবে বিবেচিত হোক বা না হোক। পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কখনই পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পার্থিব কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। উপরন্তু, যদিও একজন মুসলমান ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবে কোন অংশে কম নয়, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ভাল জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করা এবং খারাপ বিষয়ে সতর্ক করা। তাদের আত্মীয়কে তাদের বিপথগামী থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং সম্পদ দান করে, তার প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, মুসাফির, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য ..."

এতিমদের প্রায়ই ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা প্রায়শই তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের সাহায্য করবে। এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই দিন এবং যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে সেট আপ করতে পারে। এবং স্পনসরশিপের পরিমাণ প্রায়ই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম হয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য পাবে। সহীহ বুখারী, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, যেমন একজন বিধবার যত্ন নেয়, তাকে সারা রাত নামাজ পড়া এবং প্রতিদিন রোজা রাখার সমান সওয়াব দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী 6006 নং হাদিসে এটির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাতের নামায ও স্বেচ্ছায় রোযার মতো স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করা কঠিন মনে করে, তাকে এই সওয়াব অর্জনের জন্য এই হাদীসের উপর আমল করা উচিত। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা মনে রাখা জরুরী যে, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তাদের কাছে যা কিছু আছে যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল মনোভাব অবলম্বন করে তাদের পুরস্কার নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা একজন ব্যক্তির যে কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা রয়েছে। অতএব, কোন মুসলমান, যতই স্বল্প সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, এই আয়াতের উপর আমল করা থেকে নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, পথিককে ..."*

পথিক হল সেই আগন্তুক যে ভিনদেশে আটকে আছে। আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের তাদের প্রয়োজন হলে তাদের ভ্রমণে সাহায্য করার জন্য তাদের সম্পদের কিছু তাদের দিতে উত্সাহিত করেন। যার কাছে সম্পদ আছে তার উচিত এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের যে কোন উপায়ে সাহায্য করা, যদিও তা তাদের খাদ্য বা পরিবহনের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের ভ্রমণের সময় তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন কোনো অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, তার প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, মুসাফির, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য ..."*

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সময় বন্দীকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টি পরিচিত বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, ইসলাম দাস হিসাবে যুদ্ধের সময় বন্দীদের গ্রহণ নিষিদ্ধ করে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্যায় সুবিধা পেতে পারে না। এটি শুধুমাত্র মুসলিম ক্রীতদাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হবে যখন অবিশ্বাসী দাস জনসংখ্যা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তাই, ইসলাম প্রথমত ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে তাদের সাথে সর্বোচ্চ সম্মান ও যত্নের সাথে আচরণ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ দাসদের প্রতি এমন সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছেন যে তাদের সাথে পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদেশ করেছেন যে তারা তাদের ক্রীতদাসদেরকে তা খাওয়াতে যা তারা নিজেরা খায়, তারা যে পোশাক পরে তারা একই পোশাক তাদের পরিধান করে এবং তাদের উপর কখনই কাজের চাপ না দেয় এবং পরিবর্তে তাদের সাহায্য করে। তাদের দৈনন্দিন কাজ। সহীহ মুসলিমের 4313 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, ইসলাম একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কাজটিকে ভারী পুরস্কারের সাথে একটি অত্যন্ত সৎ কাজ করে দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের দাসকে মুক্ত করেছিলেন, জামে আত তিরমিযী, 1541 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, ইসলাম কিছু গুনাহের জন্য প্রথম কাফফারা নির্ধারণ করেছে একটি দাস মুক্ত করা। . উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 58 আল মুজাদিলা, আয়াত 3:

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে ইহার উচ্চারণ করে এবং তারপর তারা যা বলেছিল তার উপর ফিরে যেতে চায়- তারা একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

যখন এই শিক্ষাগুলো ইসলামী সমাজের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়, তখন দাসদের সাথে পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করা হয় এবং দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে শেষ পর্যন্ত তা নির্মূল করা হয়। দুঃখজনকভাবে, বিশ্বের কিছু অংশে, আর্থিক দাসত্বের মতো বিভিন্ন আকারে দাসত্ব এখনও বিদ্যমান। অতএব, মুসলমানদের

অবশ্যই তাদের অর্থ, যেমন আর্থিক সহায়তা অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূলে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

একজনকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে থাকা ভাল কাজগুলিকে মানুষের এবং তাঁর মধ্যে থাকা ভাল কাজের আগে তালিকাভুক্ত করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং কে] সালাত কায়েম করে...*"

এর অর্থ এই নয় যে তাদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে যে ভাল কাজগুলি রয়েছে তা স্থাপন করার প্রয়োজন নেই, তবে এর অর্থ হল যে তারা একটি সাধারণ ভুল ধারণার মধ্যে পড়বেন না যেখানে তারা বিশ্বাস করবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যে থাকা ভাল কাজগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নিজেরা এবং মহান আল্লাহ, তারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ। যে ব্যক্তি এই মনোভাব নিয়ে বিচার দিবসে প্রবেশ করবে তাকে সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেউলিয়া ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জনগণের প্রতি তারা জুলুম করেছে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভুক্তভোগীদের পাপ নিতে বাধ্য হবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানকে এই সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করতে হবে এবং তার পরিবর্তে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এবং যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তারা পূরণ করতে পারে

না, তারা যদি সত্যিকারের চেষ্টা করে তবে তারা এটি অর্জন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...[এবং কে] সালাত কায়েম করে..."

যেমন মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ধার্মিকতা 177 নং আয়াতের শুরুতে নামাযের সময় কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দিকের দিকে ফিরে যাওয়ার বাইরে যায়, তিনি ফরয নামায কায়েম করার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট করার জন্য যে তাঁর প্রাথমিক বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে তাদের প্রার্থনাকে অবহেলা করুন, কারণ এটি এখনও ধার্মিকতা এবং বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

" *ধার্মিকতা এই নয় যে আপনি আপনার মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরান..."*

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

"তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে

সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

"এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে

আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং যাকাত দেয়..."

বাধ্যতামূলক দাতব্য হল একজনের সামগ্রিক আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার একটি উদ্দেশ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, এবং তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে, একজনের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতই কেবল একটি ঋণ যা তার সঠিক মালিক মহান আল্লাহকে পরিশোধ করতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছিল, যেমন তাদের সম্পদ, সেগুলি তাদেরই এবং তাই বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির মুখোমুখি হবে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব ঋণ একটি জরিমানা সম্মুখীন. উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দান না করে, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, তারা যে সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *[যারা] তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়..."*

বৈধ কারণ ছাড়াই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ভণ্ডামির একটি দিক। সহীহ বুখারী, ২৭৪৯ নং হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে, তার আশংকা করা উচিত যে আখেরাতে তাদের সাথে তাদের পরিণতি হতে পারে। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি, প্রতিটি পরিস্থিতিতে যখন তারা তাঁকে তাদের রব বলে মেনে নেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রতিশ্রুতি একটি বাস্তবসম্মত। অতএব, এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা মৌখিকভাবে দাবি করার বাইরে চলে যায়। মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচারের দিন এর জন্য একজনকে জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতি সর্বদা [যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে]।"

এই প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অব্যক্ত এবং অলিখিতগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন যখন একজনের সন্তান হয়। একটি সন্তান থাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিতামাতাকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সন্তানের অধিকার পূরণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে। এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে পার্থিব বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত, যেমন ব্যবসায়িক লেনদেন এবং আর্থিক লেনদেন। একজন মুসলমানের উচিত হবে না তাদের পার্থিব বিষয়গুলোকে তাদের ধর্মীয় বিষয় থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা যখন তাদের জীবনের পার্থিব দিকগুলোকে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোন আগ্রহ নেই। এটি একটি মূর্খ মনোভাব কারণ ইসলাম হল একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান এবং আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে তারা জড়িত থাকে, সেগুলি জাগতিক বা ধর্মীয় হোক না কেন। অতএব, যে কোনো দায়িত্ব পালনের আগে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, কেননা এই জগতের সকল দায়িত্বই কোনো না কোনো প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ, যে বিষয়ে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে।

এখন পর্যন্ত ১৭৭ নং আয়াতে, কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন দিক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যেখানে একজনকে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়..."

মহান আল্লাহ, তারপর বাকি অর্ধেক উল্লেখ করেছেন যা কৃতজ্ঞতা, অর্থ, ধৈর্যের সাথে আবদ্ধ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

দারিদ্র্যের মধ্যে ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের সীমিত বিধান সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে যাওয়া এবং বেশি বিধান দেওয়া লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া এড়ানো। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দান করেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

" আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

অতএব, তাদের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতে হবে এই বিশ্বাসে যে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন তাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম বিধানের নিশ্চয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানবজাতির বিধান বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তাই কারও দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায় না। সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে, এটি তাদের জন্য ইতিমধ্যে বরাদ্দ এবং গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে জেনে হালাল বিধান অর্জনের চেষ্টা করে, যদিও এটি বোঝা কঠিন।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানসিক শান্তি, যা তর্কযোগ্যভাবে সবচেয়ে বড় পার্থিব আশীর্বাদ, যা অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার সাথে এটি সরাসরি যুক্ত। অতএব, যে কেউ মনের শান্তি পেতে পারে, তার কাছে যত জাগতিক জিনিসই থাকুক না কেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তদুপরি, অনেক পার্থিব জিনিস থাকার কারণে সাধারণত কেবলমাত্র সেগুলিকে অপব্যবহার করা হয়, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই অসুবিধা, ঝামেলা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মহান আল্লাহ তায়ালা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত এই নিয়ামতগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে মানসিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র ও কষ্টে ধৈর্যশীল..."

প্রথম জিনিসটি লক্ষ্য করা উচিত যে পরিস্থিতির শুরু থেকেই ধৈর্য দেখাতে হবে। সময়ের সাথে সাথে একটি পরিস্থিতির একটি অবাঞ্ছিত ফলাফল গ্রহণ করা প্রত্যেকের সাথে ঘটে, এমনকি যারা অধৈর্য। গ্রহণ করা তাই ধৈর্যের মতো নয়। জামে আত তিরমিযী, 2389 নং হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা পরিস্থিতির সূচনা থেকেই ধৈর্য ধারণ করবে এবং এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের ধৈর্য বজায় রাখবে, কারণ অনেক লোক ধৈর্যের সওয়াব হারাতে পারে। ভবিষ্যত তারিখে অধৈর্য দেখানোর মাধ্যমে।

কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরার মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথার মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী তাকে খুশি করার জন্য দেওয়া আশীর্বাদগুলি

ব্যবহার করা জড়িত। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে, কষ্টের সময়ে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যসমূহ শিখে এবং আমল করে। যে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে সে কিছু সত্য বুঝতে পারে যা তাকে কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বুঝতে পারবে যে এই জীবনে তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি অনিবার্য এবং তারা কখনই তাদের এড়াতে পারেনি। জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 57 আল হাদীদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

যে নিয়তির অনিবার্য ও অনিবার্য প্রকৃতি বোঝে সে অভিযোগ করবে না কারণ তাদের অভিযোগ কোনোভাবেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র সেই পুরস্কারটি মুছে ফেলবে যদি তারা এর মাধ্যমে ধৈর্য ধরে থাকে।

উপরন্তু, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারে যে এই পৃথিবী পরীক্ষা এবং কষ্টের জায়গা যাতে যারা মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত, তারা যারা নয় তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

অতএব, কষ্টের মুখোমুখি হওয়া এই পৃথিবীতে জীবনের একটি অনিবার্য এবং অনিবার্য দিক। এই স্বীকৃতি একজনকে কষ্টের সম্মুখীন হলে বাকি রোগীদের সাহায্য করবে।

অধিকন্তু, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে সবসময় মনে রাখবে যে, যত কঠিন কষ্টই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করার শক্তি তাদের আছে, কারণ মহান আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে তার সহ্য করার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই সত্য সর্বদা একজনকে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে , কারণ ধৈর্য প্রায়শই হারিয়ে যায় যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া সহ্য করতে পারে না।

আরেকটি সত্য যা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি বোঝেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেন যে প্রত্যেকের জন্য যা ভাল, তা তাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। যেহেতু একজন ব্যক্তির জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, তারা মহান আল্লাহর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না, যার জ্ঞান সমস্ত কিছুর বাইরে এবং বিস্তৃত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই আয়াতটি কতটা সত্য তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল তাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল, শুধুমাত্র এটি তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে এবং যখন তারা বিশ্বাস করে যে কিছু খারাপ ছিল, শুধুমাত্র এটি তাদের জন্য মঙ্গলের উৎস হয়ে ওঠে। এই সত্যটি বোঝা কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

এই সমস্ত এবং আরও অনেক সত্য এমন একজন ব্যক্তির হৃদয়ে উন্মোচিত হয় যে ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে এবং এর ফলে ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এর ফলে তারা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল এবং মহান আল্লাহর প্রতি বাধ্য থাকা নিশ্চিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

বিশেষভাবে বলতে গেলে, সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কারণ তাদের শত্রুরা মদিনায় হিজরত করার পরেও ইসলাম ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিরলসভাবে তাড়া করবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 89:

" তারা চায় তুমিও কাফের হও যেমন তারা অবিশ্বাস করেছিল যাতে তোমরা একই রকম হতে পার..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যুদ্ধের সাথে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা জড়িত, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, যদিও একজন মুসলিম নিরলসভাবে তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হবে। মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রলোভন সোশ্যাল মিডিয়া, সংস্কৃতি, ফ্যাশন, তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং একজনের আত্মীয় সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে আসে। এই সমস্ত প্রলোভনের মোকাবিলা করতে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধরনের ধৈর্য 177 শ্লোকে উল্লিখিত অন্যান্য প্রকারের তুলনায় যুক্তিযুক্তভাবে কঠিন, কারণ এটি ক্রমাগত এবং নিরলস। মুসলমান যেদিকেই ফিরে আসবে তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই দিন এবং যুগে, সোশ্যাল মিডিয়া অবাধে উপলব্ধ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়ায় এমন প্রলোভনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একজনকে তাদের শয়নকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এই সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব, যখন একজন দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে। দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং আমল করে। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে সেই পথের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয় যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় এবং যে পথটি উভয় জগতেই চাপ, সমস্যা এবং দুঃখের দিকে পরিচালিত করে। এই ক্ষেত্রে, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারবে যে তারা যদি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তবে তাদের কাছে যে আশীর্বাদ রয়েছে তা তাদের জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আল্লাহ, উন্নত, একা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করে, মনের শান্তির আবাস। ইসলামের শিক্ষায় এবং অনেক ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যারা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী তার কাছে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তা তাদের মানসিক চাপ, দুঃখ, হতাশার দিকে নিয়ে যায়। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, পদার্থের অপব্যবহার এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

বিপরীতভাবে, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারবে যে যতক্ষণ তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, ততক্ষণ তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, তাদের কাছে যত জাগতিক জিনিসই থাকুক না কেন, এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ, ইসলামী শিক্ষায় এবং এমন অসংখ্য লোকের উদাহরণ রয়েছে যারা এই জীবন পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করেছিলেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অতএব, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে এই বাস্তবতা বুঝতে পারবে এবং সেইজন্য প্রতিনিয়ত সেই প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। যে ব্যক্তি এই ব্যাপক অশান্তি, বিদ্রোহ ও প্রলোভনের যুগে এমন আচরণ করবে তাকে এমন পুরস্কৃত করা হবে যেন সে তার জীবদ্দশায় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হিজরত করেছিল। সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদীসে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া হ্রাস করে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার জন্য এই প্রলোভনের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে পারে। মানুষ এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় উপাদানে লিপ্ত হওয়াকে যত কম করবে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা এবং তাঁর আনুগত্যকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া তত সহজ হবে। এই ব্যক্তিকে তাদের জীবনে তৃপ্তি, তাদের বিষয় সংশোধন এবং সহজ উপায়ে তাদের রিযিক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জামি আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে, যে ব্যক্তি জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে লিপ্ত

হয় সে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার চেয়ে বস্তুগত জগতের উপভোগকে অগ্রাধিকার দেবে। পূর্বে উদ্ধৃত একই হাদিস এই ধরনের ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির অভাব সম্পর্কে সতর্ক করে, তাদের বিষয়গুলির কোন সংশোধন এবং তাদের নিশ্চিত রিযিক তাদের কাছে অনেক কষ্টে পৌঁছাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল...*"

যারা ১৭৭ নং আয়াতে উল্লিখিত বিশ্বাস ও ধার্মিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে তারা যখন ইসলামকে তাদের বিশ্বাস বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল তখন তাদের কথার প্রতি সত্য ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

ধার্মিকতা *এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [সত্য] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং সম্পদ দান করেও। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য হয়েছে...*"

তাই এই আয়াতটি ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা হিসাবে একজনের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যদি এটি কর্ম দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে এটি যথেষ্ট ভাল নয়। উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য পাওয়ার জন্য কর্মই প্রমাণ এবং মুদ্রার প্রয়োজন যা ধার্মিকদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *তারাই যারা সত্য এবং তারাই ধার্মিক।*"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি তারা মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করলেও, তারা দেখতে পাবে যে তাদের কাছে যে আশীর্বাদ রয়েছে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন, কারণ

মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, যারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় তাকে অবশ্যই ভয় করতে হবে যে তারা এই পৃথিবী ছাড়াই চলে যেতে পারে। এর কারণ হল ঈমান হল একটি গাছের মত যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি লাভ করতে না পারা উদ্ভিদ যেমন মরে যায়, তেমনি ভালো কাজ করতে ব্যর্থ ব্যক্তির ঈমানও নষ্ট হতে পারে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

তাই তাদের কথার প্রতি সত্য হতে হবে যখন তারা ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে ইসলামকে তাদের বিশ্বাস বলে ঘোষণা করে, যদি তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য চায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

ধার্মিকতা *এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [সত্য] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং সম্পদ দান করেও। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"*

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 178-179

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“হে ঈমানদারগণ, যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ নির্ধারিত হয়েছে – স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এবং আইনগত প্রতিশোধের [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

" হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে হত্যাকারীদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ..."

প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করা যায় তা হল প্রকৃত মুসলমানরা জীবনের সকল প্রকারকে সম্মান করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে অন্য সকলের প্রতি করুণা দেখানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে করুণা লাভ করবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4941 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তোমরা সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

এই ধরনের চিকিত্সা প্রাণী সহ সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রসারিত করা উচিত। সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্ম মানবজীবনকে এত মূল্য দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ

স্পষ্ট করে বলেছেন যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যার বিচার করা হবে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করা হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32:

" ...একটি আত্মাকে হত্যা করে যদি না একটি আত্মার জন্য বা দেশে দুর্নীতি [সম্পাদিত] হয় - যেন সে মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছে। আর যে একজনকে বাঁচায়- যেন তিনি মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন..."

সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত মুসলমান ও বিশ্বাসীর সংজ্ঞাটি স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলাম একজনকে তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখতে শেখায়। . এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলিম এবং একজন মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের কাছে যা আছে তা থেকে দূরে রাখে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় একজন পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য না হলে কখনোই অন্য ব্যক্তি বা প্রাণীর ক্ষতি করেননি। তিনি কখনই একজন মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু বা অ-সৈনিকের ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি এবং শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন যারা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছিল এবং অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের 6050 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী বলে দাবি করে তাহলে তাদের সব পরিস্থিতিতেই এইভাবে আচরণ করতে হবে।

যেহেতু ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বাস্তবধর্মী ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা, একজন মুসলমানকে তাদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবার এবং সম্পদ। কিন্তু এই আত্মরক্ষা অবশ্যই সংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে হতে হবে। মুসলমানদের প্রথমে অন্যদের আক্রমণ করার এবং নিরপরাধ লোকদের ক্ষতি করার অনুমতি নেই। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করা সে বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করা উচিত, যার সংক্ষিপ্তসারে বলা যেতে পারে অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হত্যাকারীদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ নির্ধারণ করা হয়েছে - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের বিনিময়ে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী...*"

ইসলামের আবির্ভাবের আগে, যে ব্যক্তি খুন করেছিল সে তার জায়গায় অন্য কাউকে শাস্তি দিতে বাধ্য করতে পারত, যেমন তার মালিকানাধীন দাস। কিন্তু ইসলাম স্পষ্ট করে বলেছে যে যারা হত্যা করবে তাকে তাদের অপরাধের ফল ভোগ করতে হবে এবং তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। যে মুক্ত ব্যক্তি খুন করবে সে-ই পরিণতির মুখোমুখি হবে, অর্থাৎ, বিনামূল্যের জন্য মুক্ত। যে ক্রীতদাস খুন করবে সে হবে তাদের কর্মের ফল, অর্থাৎ দাসের জন্য দাস। আর যে নারী খুন করবে সে হবে তার কর্মের ফল, অর্থাৎ নারীর জন্য নারী।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই নীতি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার পাপের পরিণতির মুখোমুখি হতে অন্যের দিকে যেতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, এখন পর্যন্ত এক নশ্বর অপরাধী ব্যক্তি শয়তানকে দোষারোপ করে কিন্তু সে বিচারের দিন ঘোষণা করবে যে সে কখনই শারীরিকভাবে কাউকে পাপ করতে বাধ্য করেনি, তাই তাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করা উচিত এবং তাকে নয়। গ অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

যদি কেউ তাদের পাপের দায় শয়তানের উপর স্থানান্তর করতে সক্ষম না হয়, যা মন্দের প্রধান উদ্দীপক, তবে তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তারা তাদের পাপের দোষ অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করতে সক্ষম হবে? এটি একটি মূর্খ মনোভাব যা শুধুমাত্র একজনকে আরও পাপ করতে উত্সাহিত করে এবং তাই ত্যাগ করা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের জন্য দায়ী থাকবে এবং এটি অনিবার্য। অতএব, একজনকে ক্রমাগত তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা শেষ বিচারের দিন তাদের অনিবার্য এবং অনিবার্য জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

“... *আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ একটি উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত* ..."

মহান আল্লাহ, সর্বদা মানুষের মধ্যে সদয় ও করুণাপূর্ণ আচরণকে উৎসাহিত করেন এবং শুধুমাত্র চরম ক্ষেত্রে এবং আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর আচরণের পরামর্শ দেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ খুনের উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার জন্য উত্সাহিত করেন কারণ এটি হত্যাকারীকে তাদের বিশ্বাসে এবং বা বংশের ভাই হিসাবে বর্ণনা করে, যেহেতু সমস্ত মানুষ হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে সম্পর্কিত, এবং তার স্ত্রী হাওয়া রা. যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলমানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হতে হবে অন্যের প্রতি করুণা ও দয়া কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত লাভের দিকে নিয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 4941 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমার এই কাজের জন্য, হত্যাকারীর উচিত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে একটি ক্ষতিপূরণমূলক ফি প্রদান করা, যদি না তারা স্বেচ্ছায় এটিকে তাদের পক্ষ থেকে দাতব্য কাজ হিসাবে ঘেউ করে। , যা আবার উভয় জগতে তাদের জন্য আরও পুরস্কার ও আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াতে উল্লিখিত উত্তম আচরণ বলতে বোঝায় উভয় পক্ষের করা আইনি চুক্তি দ্রুত পূরণ করা এবং একে অপরের সাথে করুণার সাথে আচরণ করা বা অন্ততপক্ষে তখন থেকে একে অপরের প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার এড়ানো।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যদের প্রতি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন কেউ অন্যদের প্রতি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের পার্থক্যের কারণে তাদের সাথে মিলিত হয় না। যদি একজন মুসলিম তাদের মধ্যে কিছু পূর্ববর্তী সমস্যার কারণে অন্যদের প্রতি ইতিবাচকভাবে আচরণ করতে না পারে, তবে তারা তাদের প্রতি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে যাতে তারা তাদের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি না দেখায় তবে তারা তাদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতিও দেখায় না। হয় উচ্চতর স্তর, যা আরও পুরষ্কারের দিকে পরিচালিত করে, অন্যদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করা, এমনকি যখন তাদের সাথে অতীতে সমস্যা ছিল , তবে এটি বাধ্যতামূলক নয় বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজনকে অবশ্যই তারা যে অপমানজনক এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সাথে জড়িত তা পরিবর্তন করতে হবে না, কারণ ইসলাম এটিকে সমর্থন করে না। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে তারা নিজেকে এবং অন্যদের শারীরিক এবং মৌখিক নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারে তবে তা করার পরে তাদের উচিত অতীতে যার সাথে তাদের সমস্যা ছিল তার প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করার চেষ্টা করা এবং তারপরে তার সাথে এগিয়ে যাওয়া। পরিষ্কার মনের সাথে তাদের নিজস্ব জীবন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলাকে তার স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে নির্যাতিত হতে হবে তাকে তার থেকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, কারণ ইসলাম এই ধরনের আচরণকে মোটেও সহ্য করার পরামর্শ দেয় না। কিন্তু একবার এই স্ত্রী তার জীবনযাপনের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যাতে সে এবং তার সন্তানরা নিরাপদ থাকে, তাহলে তার উচিত তার প্রাক্তন স্বামীকে ক্ষমা করার চেষ্টা করা এবং একটি পরিষ্কার মনে তার জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

"... আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত..."

হত্যাকারীর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ফি সহ বা ছাড়াই ক্ষমা করার বিকল্প। উভয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার বিকল্পটি ছিল মহান আল্লাহর রহমত, কারণ একটি বা অন্য বিকল্প লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া তাদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে উঠত, কারণ সমস্ত মানুষ আলাদা। যারা স্বাভাবিক করুণাময় আচরণের অধিকারী তারা ক্ষমার দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তাই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা কঠিন হবে, যদি ইসলাম তাদের উপর এই বিকল্পটি বাধ্য করে। অন্যদিকে, অন্যরা তাদের প্রিয়জনের হত্যাকারীকে ক্ষমা করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করবে এবং তাদের প্রিয়জনের হত্যাকারীর বাস্তবতার সাথে বেঁচে থাকতে পারে না একজন মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সমাজে ঘুরে বেড়ায় যখন তাদের প্রিয়জনের জীবন তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, বিশেষত যখন খুন হওয়া ব্যক্তির নির্ভরশীল ব্যক্তিরা তাদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করত। এই মনোভাবের অধিকারী ব্যক্তিকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা এবং ক্ষমা করা কঠিন হবে যদি এই বিকল্পটি ইসলাম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষের জন্য রহমত হিসাবে, মহান আল্লাহ, হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীর উপর বিকল্প রেখেছিলেন। ভিন্ন, এই দিন এবং যুগে বেশিরভাগ আইনী সংবিধান, যা হত্যাকারীর ভাগ্যকে আদালতের বিচারক বা সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সাথে আপস করে জুরির হাতে ছেড়ে দেয়। এই ভাঙা ব্যবস্থা উত্তরাধিকারীকে কিছু মনের শান্তি খুঁজে পেতে বাধা দেয় যা প্রাপ্ত হয় যখন তাদের হত্যাকারীর ভাগ্য বেছে নেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয় এবং বিষয়টিকে বিশ্রাম দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের জীবন নিয়ে

চলতে পারে। এই ভাঙা ব্যবস্থার কারণেই খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবার বা খুন ছাড়া অন্য অপরাধে, যেমন ধর্ষণের মতো, ভুক্তভোগী নিজেও তাদের পরিবারের সাথে প্রায়শই অভিযোগ করে যে বিচার হয়নি, এমনকি যখন অপরাধীকে কারাগারে দন্ডিত করা হয়, তখনও তাদের কারাগার। শাস্তি অপরাধের জন্য উপযুক্ত নয়। অর্থ, অপরাধী কয়েক বছরের মধ্যে মুক্তি পাবে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে, যেখানে তাদের সরকার থেকে সুবিধা প্রদান করা হয় যখন ভুক্তভোগী এবং ভুক্তভোগীর পরিবার জীবনের জন্য মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একমাত্র জিনিস যা এই মানসিক আঘাতকে কিছুটা উপশম করতে পারে তা হল যদি অপরাধীর সাথে কী ঘটবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা পরিবারকে দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

"... *আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।*

সীমালঙঘন বলতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের সরাসরি প্রতিশোধ নেওয়াকে বোঝায়, কারণ শুধুমাত্র সরকারই আইনি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে, বা ক্ষতিপূরণ বা ক্ষমার জন্য চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পরে প্রতিশোধ নিতে পারে। প্রথমবার ক্ষমা করার পর আবার খুনি হত্যাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে, আইনি বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ডের

আদেশ জারি করবেন, এমনকি যদি দ্বিতীয় খুন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষমা করতে সম্মত হন। এটি তাই বিচারের হাত থেকে বাঁচতে অপরাধী যে কোনো ফাঁকফোকর ব্যবহার করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179:

" *...তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা খুন করা হয়েছে তাদের জন্য আইনি প্রতিশোধ - স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] আছে..."*

আইনি প্রতিশোধের মধ্যে জীবন আছে, কারণ অনেক খুনি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তির দ্বারা এই আচরণ থেকে বিরত হয় না। এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন খুনি তার অপরাধের জন্য কয়েক বছর জেল খাটছে, শুধুমাত্র মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় হত্যা করার জন্য। তাই একজনের মৃত্যুদন্ড অন্যের জীবন বাঁচানোর দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই আইনী প্রতিশোধ ভিকটিমের আত্মীয়দের মানসিক অবস্থাকেও সাহায্য করে কারণ হত্যার কারণে তাদের অপরাধের জন্য তাদের জীবন দিয়ে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা জেনেও ভিকটিমদের আত্মীয়দের তাদের জীবন নিয়ে চলতে সাহায্য করার একটি উপায়। কিন্তু যখন খুনিকে শুধুমাত্র কারাগারে রাখা হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয়, তখন খুনিদের হাতে তাদের প্রিয়তমা যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা মনে করার যন্ত্রণা শিকারের আত্মীয়দের তাদের জীবন নিয়ে চলতে এবং শান্তিতে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক নির্যাতন ঠেকিয়ে জীবন দিচ্ছে তাদের। একইভাবে, সরকার যখন একজন অপরাধীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন শিকারের স্বজনরা প্রায়ই মনে করে যে ন্যায়বিচার করা হয়নি। এটি একটি কারণ যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, নিহতের আত্মীয়দের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা ছাড়াই তাদের ক্ষমা করার বিকল্প দেওয়া হয়। যখন সিদ্ধান্তটি ভুক্তভোগীর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তখন এটি মানসিক চাপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় যা সরকার সিদ্ধান্ত নিলে সৃষ্ট হবে। এটি আবার ভুক্তভোগীর স্বজনদের বিরক্তিতে ভরা জীবন যাপন করার পরিবর্তে তাদের জীবন নিয়ে চলতে দেয়, যা বাস্তবে মোটেও বেঁচে থাকে না। এই অসন্তোষ এতটাই শক্তিশালী হতে পারে যে এটি এমনকি ভিকটিমের পরিবারের মধ্যেও ঘর্ষণের দিকে নিয়ে যায়, যখন সদস্যদের তাদের জীবন নিয়ে কীভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে ভিন্ন মতামত থাকে। এটি সর্বদা ভাঙা পরিবারগুলির দিকে পরিচালিত করে, যেমন মৃত ব্যক্তির পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সুতরাং হত্যাকারীর সাথে কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবারকে দেওয়া, শিকারের পরিবারের ধ্বংস রোধ করে যারা হত্যাকারীর পরিণতি তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দিলে তাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে আইনগত প্রতিশোধও প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচায় যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিস্তৃত হতে পারে। অতএব, একজন খুনীকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা অনেক হত্যা রোধ করে। উপরন্তু, যখন একজন ব্যক্তি যার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, প্রতিশোধমূলক

হত্যাকাণ্ডের কারণে, এটি তাদের নির্ভরশীলদের জীবনকে ধ্বংস করে, যেমন তাদের সন্তানদের। এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে যখন নিহতের পরিবারকে হত্যাকারীর কাছে যা ঘটবে তার পছন্দ দেওয়া হয়, কারণ এটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নিহত বা আহত সকলের উপর নির্ভরশীলদের ধ্বংসের কারণ হতে বাধা দেয়। অতএব, আইনি প্রতিশোধ এই সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলি সবই সত্য যখন আইনি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। কাউকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত এবং শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন, যা অবশ্যই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে। ইসলামে, মামলার মধ্যে যেকোন সন্দেহের কারণে মৃত্যুদণ্ডের মতো সম্পূর্ণ আইনি শাস্তি মওকুফ করা হয়। উপরন্তু, এই দিন এবং যুগে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সহজ যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উত্পাদিত হয়েছে যা সঠিকভাবে অপরাধীদের খুব উচ্চ মাত্রার নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই সবই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ কমিয়ে দেয়। এমনকি যদি অ-ইসলামী দেশগুলি শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আইনি প্রতিশোধ প্রয়োগ করে তবে তা অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এসব ক্ষেত্রে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ভয়ে মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর অজুহাত প্রযোজ্য নয় কারণ সঠিক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179:

" *...তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা খুন করা হয়েছে তাদের জন্য আইনি প্রতিশোধ - স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী।*

কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] আছে..."

কিন্তু এই আয়াতগুলো দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, যারা তাদের চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে তারাই আইনি প্রতিশোধের ব্যাপক সুবিধা বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যার বোধগম্যতা নেই সে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করবে, কারণ তারা এই বিবৃতিটির শুধুমাত্র একটি দিকে মনোনিবেশ করে, যার অর্থ, শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলা। তারা বৃহত্তর চিত্রের অর্থ প্রতিফলিত করে না, তাদের জীবন বাঁচানো, এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করে। যদিও, যিনি স্পষ্টভাবে মনে করেন তিনি একমত হবেন যে শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা খুবই গুরুতর কিন্তু এটি ছেড়ে যাওয়া আরও খারাপ কিছুর দিকে নিয়ে যাবে, মৃত্যু। তাই তারা বৃহত্তর চিত্রটি প্রতিফলিত করে এবং তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আলোচনার অধীন আয়াতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। হত্যার জন্য সমাজের একজন সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কঠোর শোনায় তবে এটি যদি ভিকটিমের স্বজন সহ বাকি সমাজের জন্য অনেক সুবিধার দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি করা সঠিক কাজ, কারণ একটি সরকারকে অবশ্যই বৃহত্তর চিত্রের অর্থ বিবেচনা করতে হবে, এর মঙ্গল। একজন দোষী সাব্যস্ত খুনির জীবনের উপর সমগ্র সমাজ, যারা তাদের মানবাধিকার ছেড়ে দিয়েছে যখন তারা মানুষের মতো আচরণ করা বন্ধ করে দিয়েছে, বা খুব বিরল ক্ষেত্রে, ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির একক জীবন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 179:

" এবং আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য আছে, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

এই আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি প্রতিশোধও সাধারণ জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যখন তারা খুনিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হতে দেখবে, তখন যারা কাউকে ক্ষতি করতে বা হত্যা করতে চায় তাদের নিজেদের জীবন হারানোর ভয়ে তাদের হাত আটকে রাখতে এবং নিজের এবং অন্যদের জীবন দিতে বাধা দেবে। এটি সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যদি ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি আরও গুরুতর হয়, তাহলে অনেক সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখত। সমাজে অপরাধের হার না কমার একটি প্রধান কারণ হল নরম আইন থাকা।

আইনগত প্রতিশোধের একটি দিক হচ্ছে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা। দয়ার এই কাজটি হত্যাকারীকে তাদের অপরাধের জীবন থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উত্সাহিত করতে পারে, যা তাদের নিজের জীবনের পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের সুরক্ষামূলক জীবনকে তারা ক্ষতিগ্রস্থ করত যদি তারা তাদের খারাপ পথে চলতে থাকে। উপরন্তু, এটি অন্যান্য সম্ভাব্য ভুক্তভোগী এবং তাদের আত্মীয়দের তাদের নিপীড়কদের ক্ষমা করতে উত্সাহিত করতে পারে, যা আবার অনেক জীবন বাঁচাতে এবং সমাজে শান্তি ও করুণার বিস্তার ঘটায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 179:

" এবং আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য আছে, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটি সমাজ তখনই অপরাধ হ্রাস করতে পারে যখন এই দুটি নীতি তার লোকেরা গ্রহণ করে। প্রথমটি হল আইনি প্রতিশোধের অর্থ, একটি কঠোর আইন যা অপরাধকে যথাযথভাবে শাস্তি দেয় যাতে সম্ভাব্য অপরাধীদের অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা যায়। এমনকি একটি শিশুও বুঝতে পারে যে একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ করার সম্ভাবনা কম থাকে যখন আইনি শাস্তি আরও গুরুতর হয়। আইন যত নরম হবে, একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ করার সম্ভাবনা তত বেশি।

অন্য দিকটি হল মহান আল্লাহকে ভয় করা, যা পরকালে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া জড়িত। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তি অপরাধ এবং পাপ করে যখন তারা মনে করে যে তারা হয় তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবে না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং এই পৃথিবীতে পরিণতি এড়াতে তারা যাই করুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যেখানে তাদের আটক করা হবে। তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তারা সর্বদা অপরাধ বা পাপ করার আগে দুবার চিন্তা করবে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। সমাজের সদস্যরা এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়বে। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সমাজে

ইসলামী আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে। এই সত্যটিই বিশ্বাসের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 180-182

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে যখন মৃত্যু [যখন তোমাদের মধ্যে কারো] নিকটবর্তী হয়, যদি সে সৎকর্ম রেখে যায় [তাহলে সে যেন পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য যা গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্য ওসিয়ত করে- নেককারদের উপর একটি কর্তব্য।

অতঃপর যে ব্যক্তি এটি শোনার পর তা পরিবর্তন করে [অর্থাৎ অসিয়ত] - গুনাহ কেবল তাদেরই হবে যারা এটি পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

কিন্তু কেউ যদি অসিয়তকারীর [কিছু] ত্রুটি বা পাপের আশঙ্কা করে এবং তাদের [অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পক্ষের] মধ্যে যা আছে তা সংশোধন করে তবে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইসলাম মুসলমানদের ক্রমাগত তাদের মৃত্যু এবং পরকালের অনিবার্য যাত্রার কথা মনে রাখতে উত্সাহিত করে, যেখানে তারা তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবে। এই ধ্রুবক অনুস্মারকটি গুরুত্বপূর্ণ যাতে লোকেরা ক্রমাগত তাদের মৃত্যু এবং পরকালের যাত্রা এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই ব্যবহারিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই বাস্তব প্রস্তুতির একটি দিক এই পৃথিবীতে ভাল কিছু রেখে যাচ্ছে, যাতে অন্যরা, বিশেষ করে তাদের নির্ভরশীলরা এর থেকে উপকৃত হতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 180:

"তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে যখন মৃত্যু এসে পৌছায়, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কল্যাণ রেখে যায়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে এই পৃথিবীতে ভালো কিছু রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটি তাদের উভয় জগতেই উপকৃত হবে, কারণ এটি একটি ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনটি জিনিস একজন মুসলমানকে তার মৃত্যুর পরেও উপকৃত করে, যথা, চলমান দান, যা এমন জিনিস যা। মানুষের উপকার করতে থাকুন, যেমন একটি জলের কূপ, দরকারী জ্ঞান যা তারা রেখে যায় বা একটি ধার্মিক সন্তান যে তাদের মৃত পিতামাতার পক্ষে প্রার্থনা করে। এটি একটি উত্তরাধিকার যা একজন মুসলিমকে এই পৃথিবীতে রেখে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে, কারণ সমস্ত পার্থিব উত্তরাধিকার সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর প্রতিষ্ঠাতাকে কোনভাবেই উপকার করবে না, বিশেষ করে বিচারের দিনে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 180:

"তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে যখন মৃত্যু [যখন] তোমাদের কারোর কাছে আসে, যদি সে সৎকর্ম রেখে যায় [তা হল] পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য যা গ্রহণযোগ্য সে অনুযায়ী ওসিয়ত করবে..."

এই আয়াতে উল্লিখিত ভাল জিনিসগুলি সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসগুলিকে বোঝায় যা থেকে অন্যরা উপকৃত হতে পারে, যেমন একটি বাড়ি। উইল তৈরি করে অন্যদের উপর অন্যায় করা সাধারণ অভ্যাস ছিল এবং এখনও রয়েছে যার লক্ষ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের, বিশেষ করে আত্মীয়দের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেকবার মৃতের উত্তরাধিকারীদের সঠিক অংশ বরাদ্দ করে এই ভুল মনোভাব সংশোধন করেছেন। আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলি প্রাথমিকভাবে নাযিল করা হয়েছিল এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আরও সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত আয়াত নাযিল করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীদের সঠিক ভাগের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায় তারা তাদের উত্তরাধিকার সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম তা জেনেও ন্যায্যভাবে আশীর্বাদ বিতরণ করতে পারেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ। উপরন্তু, যেহেতু একজন ব্যক্তির অধিকারী সমস্ত পার্থিব নিয়ামত যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কে উত্তরাধিকারী হবে এবং তাদের অংশ কী হবে তা বেছে নেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। সুতরাং, একজন ব্যক্তির ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত উত্তরাধিকার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন

তোলার কোন অধিকার নেই, কারণ তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি তাদের অন্তর্গত নয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যের অধিকার পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য ইসলামের উভয় দিকই পরিপূর্ণ হতে হবে। প্রথম দিকটি হল আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা , যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যেমন একজনের উত্তরাধিকার ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বন্টন করা নিশ্চিত করা। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমানের জন্য এটা সাধারণ অভ্যাস হয়ে গেছে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার অধিকার পূরণের জন্য সংগ্রাম করে, মানুষের অধিকারকে অবহেলা করে, বিশ্বাস করে যে তারা এই পদ্ধতিতে সফলতা অর্জন করবে কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলভাবে বিশ্বাস করে, সে সম্পর্কে পরোয়া করে না। অন্যদের অধিকার। সকল মুসলমানের জানা উচিত যে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। একজন ব্যক্তি তাদের ভাল কাজগুলি দুনিয়াতে যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তারা যাদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের পাপ নিতে বাধ্য হবে। এর ফলে বিচার দিবসে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং, মানুষকে যেমন মহান আল্লাহর অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে, তেমনিভাবে মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। প্রথমটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা নিজেরাই মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে সাহায্য করা যা মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়, এবং তাদেরকে সতর্ক করা যা আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়, যেহেতু মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অন্য সকল বিষয়, মানুষ ও সম্পর্কের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 180:

"তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে যখন মৃত্যু [যখন] তোমাদের কারোর কাছে আসে, যদি সে সৎকর্ম রেখে যায় [তা হল] পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য যা গ্রহণযোগ্য সে অনুযায়ী ওসিয়ত করবে..."

এই আয়াতে সম্পদকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সম্পদ এবং বেশিরভাগ পার্থিব জিনিস, যেমন সামাজিক প্রভাব এবং কর্তৃত্ব, খারাপ জিনিস নয়। এটি কীভাবে তাদের ব্যবহার করে তা নির্ধারণ করে যে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য একটি ভাল জিনিস বা তাদের জন্য একটি খারাপ জিনিস হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ তাদের উত্তরাধিকার সঠিকভাবে সংগঠিত করে, তবে এটি একটি ভাল কাজ হয়ে যায়, যদিও এর সাথে পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ জড়িত থাকে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে সমস্ত পার্থিব জিনিস তাদের দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য কল্যাণের উত্স হিসাবে তৈরি করা। এটি অর্জিত হয় যখন তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে পার্থিব আশীর্বাদ তাদের দেওয়া হয়েছে তা উভয় জগতে তাদের জন্য মানসিক শান্তির উত্স হয়ে উঠবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং ঝামেলার উৎস হয়ে উঠবে, কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের সমস্ত বিষয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যার বাসস্থান। মনের শান্তি, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

180 নং আয়াতের শেষ অংশে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তারাই আল্লাহ,

মহান এবং মানুষের উভয়ের অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 180:

"তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে যখন মৃত্যু [যখন] তোমাদের কারোর কাছে আসে, যদি সে সৎকর্ম রেখে যায় [তাহলে সে যেন পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য গ্রহণযোগ্য অনুযায়ী ওসিয়ত করে- নেককারদের উপর কর্তব্য।"

এটা স্পষ্ট করে যে, ধার্মিকতা, তাকওয়া এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা সরাসরি অন্যের অধিকার পূরণের সাথে জড়িত, যেমন এটি মহান আল্লাহর অধিকার পূরণের সাথে যুক্ত। যারা উভয় জগতে নিজেদের জন্য ধ্বংস কামনা করে তারাই উভয়কে আলাদা করার চেষ্টা করবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উইল সম্পাদনকারীকে সতর্ক করেন যে মৃত ব্যক্তির দ্বারা যা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এবং কোনোভাবেই উইলের পরিবর্তন না করার জন্য যাতে উত্তরাধিকারীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 181:

"অতঃপর যে ব্যক্তি এটি শোনার পর এটি পরিবর্তন করে [অর্থাৎ, অসিয়ত] - গুনাহ কেবল তাদের জন্য যারা এটি পরিবর্তন করেছে..."

দুঃখজনকভাবে, এটা মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ প্রথা এবং ছিল, যারা উত্তরাধিকারে তাদের অংশ বাড়াতে বা অন্যের অংশ কমানোর জন্য উইল সম্পাদনকারীকে ঘুষ দিতেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যকে ভুল উপায়ে প্রভাবিত করা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। আজও, বিশ্বের মধ্যে দুর্নীতির প্রধান কারণ রাজনীতিবিদদের মতো সমাজের অন্যান্য সদস্যদের উপর মানুষ, কোম্পানি এবং সংস্থাগুলির নেতিবাচক প্রভাব। একজন মুসলমানকে কখনই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত নয় যখন তারা নিজেকে বোকা বানায় যে অন্যরা যেমন করে তেমনি গ্রহণ করা একটি গ্রহণযোগ্য মনোভাব। এটি একটি মূর্খতা এবং বিপথগামী মনোভাব কারণ এটি মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন না। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে, যার ফলে সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসার ঘটবে, ফলস্বরূপ এটি প্রভাবকের জন্য ভাল কাজের উত্স হয়ে উঠবে। একজন ব্যক্তি যে মনোভাবই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যদেরকে ভালো বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে না কেন, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, যেমন তিনি জানেন, তারা যা করছেন তা দেখেন এবং শোনেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 181:

"অতঃপর যে ব্যক্তি এটি [অর্থাৎ, অসিয়ত] শোনার পর পরিবর্তন করে, তার পাপ কেবল তাদেরই হবে যারা এটি পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞাতা।"

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় প্ররোচিত করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে। তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত

সম্পদের মতো পার্থিব লাভের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে আপোষ করা তাদের জন্য উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। , যেমন মহান আল্লাহ একাই তাদের বিষয় এবং অন্য সকলের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে তারা যাদেরকে খুশি করার লক্ষ্য রাখে তারাই শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তাদের সমালোচক ও শত্রুতে পরিণত হবে। অতএব, এইভাবে আচরণ করে তারা কিছুই লাভ করবে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, তাকে মনের শান্তি এবং উভয় জগতেই সফলতা দান করা হবে এবং তারা যাদের অবাধ্যতা করেছে তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মহান আল্লাহ, তারপরে ইচ্ছার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে এমন আরেকটি সম্ভাব্য পরিস্থিতির সমাধান করেন। অধ্যায় 2, শ্লোক 182:

" *কিন্তু যদি কেউ অসিয়তকারীর [কিছু] ত্রুটি বা পাপের ভয় করে এবং তাদের [অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের] মধ্যে যা আছে তা সংশোধন করে, তবে তার কোন পাপ নেই..."*

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে, মহান আল্লাহ প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে অসিয়ত করার সময় তাদের পক্ষ থেকে একটি ত্রুটি নির্দেশ করে সন্দেহের সুবিধা দিয়েছেন তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের একটি অন্যায্য ইচ্ছা সৃষ্টির সুযোগ উল্লেখ করেছেন । এটি তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার আগে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে

আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনা করার একটি দিক। অর্থ, এটা তাঁর আনুগত্য করার একটি দিক। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অনুমান এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তারা প্রায়শই গীবত, অপবাদ এবং অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো পাপের পরিণতি ঘটায়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

পরিবর্তে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের কথা ও কাজকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করতে হবে যদি না অন্যথার পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে অবশ্যই নির্বোধ এবং নির্বোধ হতে হবে, কারণ তাদের অবশ্যই সতর্কতার সাথে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করতে হবে, যেমন ব্যবসায়িক লেনদেন, কিন্তু একই সাথে তারা প্রমাণ ছাড়া অন্য লোকেদের খারাপ অনুমান করা উচিত নয়। অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচকভাবে অনুমান করাও সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়, কারণ এই ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যারা অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিস অনুমান করে এবং যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তাদের সাথে যারা আচরণ করে তাদের পক্ষে এটি কঠিন হয়ে পড়ে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 182:

" *কিন্তু যদি কেউ অসিয়তকারীর [কিছু] ত্রুটি বা পাপের ভয় করে এবং তাদের [অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের] মধ্যে যা আছে তা সংশোধন করে, তবে তার কোন পাপ নেই..*"

উইলের নির্বাহক এবং জড়িতদের অবশ্যই ইচ্ছার মধ্যে যেকোন ত্রুটি, যা ইসলামী আইনকে চ্যালেঞ্জ করে, সংশোধন করতে হবে। ইচ্ছার মধ্যে অন্য কিছু পরিবর্তন করার অধিকার তাদের নেই, এমনকি যদি তা তাদের ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধী হয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত পাপের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি ত্রুটি করা হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তাদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ত্রুটিগুলি সংশোধন করা উচিত। এভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, উভয় জগতেই তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, উত্তরাধিকারীদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মৃত ব্যক্তির যেকোন ভুলত্রুটি ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে, এই আশায় যে তিনি তাদের ভুল ও পাপও ক্ষমা করবেন। . এটি 182 নং আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 182:

"... *নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 183-185

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।

সীমিত সংখ্যক দিনের জন্য [রোজা]। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে, তবে অন্যান্য দিনের সমপরিমাণ সংখ্যক [কজনা করা হবে]। এবং যারা [রোজা রাখতে, কিন্তু কষ্টের সাথে] সক্ষম তাদের উপর - একজন দরিদ্রকে [প্রতিদিন] খাওয়ানোর জন্য মুক্তিপণ। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে [অর্থাৎ, অতিরিক্ত] - তা তার জন্য উত্তম। তবে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

রমজান মাস [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি মাসের চাঁদ দেখে সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, তবে অন্য দিনের সমান সংখ্যক। আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করতে চান এবং আপনার জন্য কষ্ট চান না এবং [চান] যে আপনি সময়কাল পূর্ণ করুন এবং তিনি আপনাকে যে পথ

দেখিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করুন। এবং সম্ভবত আপনি কৃতজ্ঞ হবেন।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে...*"

রোজা একটি খুব অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ এটি অন্যদের দৃষ্টি থেকে লুকানো থাকে এবং অন্যান্য লুকানো কর্মের বিপরীতে সারা দিন ঘটে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের রোজাকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গোপন রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যদের জানিয়ে তাদের সওয়াব নষ্ট করা এড়াতে হবে যদি না তাকে বাধ্য করা হয়। এই কারণেই আল্লাহ সুনানে আন নাসায়ী, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদীসে বলেছেন যে, রোজা বিশেষভাবে তাঁর জন্য, তাই তিনি সরাসরি এর প্রতিদান দেবেন। এই প্রত্যক্ষ প্রতিদানের অর্থ হল তিনি রোজাদারের পুরস্কার, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিত রোজা রাখে তাকে পরকালে মহান আল্লাহ তায়ালাকে দেখার সুযোগ দেওয়া হবে, যা এমন একটি পুরস্কার যার সমান বা সীমা নেই। মহানতা

রোজা একজন ব্যক্তির প্রতিটি দিকের উপর একটি তালা লাগিয়ে দেয় এবং তাই যে সঠিকভাবে রোজা রাখে সে সকল প্রকার মৌখিক ও শারীরিক পাপ এবং নিরর্থক জিনিস এড়িয়ে চলে। একজন মুসলমানকে তাই রোজা রাখার সময় তাদের নিয়ত, কথাবার্তা এবং কাজের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি গুনাহের উপর অটল থাকে, যেমন মিথ্যা বলা, রোজা রাখার সময় জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। 707, তাদের

রোজা নষ্ট করা যাতে তা মহান আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া আরেকটি হাদিস, 1690 নম্বর , সতর্ক করে যে কিছু লোক রোজা থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জন করে না।

রোজা রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য হল যে, রোজা রাখার সময় একজন ব্যক্তি যে সতর্কতা অবলম্বন করে তা সেই দিনগুলিতে বহন করা হয় যখন তারা রোজা রাখে না, যাতে তারা পাপ ও অনর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আলোচনার অধীনে মূল আয়াতগুলিতে নির্দেশিত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।*"

উপরন্তু, রোজা ব্যক্তির খারাপ ইচ্ছা হ্রাস করে। এটি অহংকার প্রতিরোধ করে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং একজন রোজাদারের পাপ থেকে বাঁচার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাপের উত্সাহ দেয়। রোজা পেটের ক্ষুধা এবং দৈহিক কামনা বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক সময় অন্য অনেক পাপের দিকে নিয়ে যায়। এই দুটি ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি। অতএব, যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই সর্বোচ্চ সিয়াম সাধনার জন্য এবং এর উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের নিয়ত, কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে এবং সমস্ত পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে দূরে থাকে এমনকি যখন তারা রোজা রাখছেন না।

পরিশেষে, ফরজ রোজা রাখা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কেউ বৈধ ছাড়া একটি ফরজ রোজা বাদ দেয়। কারণ, তারা সারা জীবন রোজা রাখলেও সওয়াবের বিনিময়ে তা পূরণ করতে পারবে না। তাই মুসলমানদেরকে তাদের ফরজ রোজাগুলো সঠিকভাবে পালন করতে এবং তাদের সামর্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছায় রোজা পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।* "

উপরন্তু, এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের মধ্যে পাওয়া অগণিতের মধ্যে আরেকটি প্রমাণ যা এটি স্পষ্ট করে যে কেউ ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা সিয়াম

পালনের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে। ধার্মিকতা একটি গাছের মতো যা সুস্বাদু ফল উৎপন্ন করতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলে যেমন উদ্ভিদ ফুটতে পারে না, তেমনি কোনো ব্যক্তির ঈমানও ফুটে উঠতে পারে না যাতে তারা সৎকর্মের মাধ্যমে পুষ্টি না পেয়ে ন্যায়পরায়ণতা লাভ করে। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করে এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপে তাদের দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তাকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাস হারানোর ভয় করতে হবে। যে উদ্ভিদ পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হয় সে যেমন শেষ পর্যন্ত মরে যায়, তেমনি ভালো কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে তাদের বিশ্বাসও ভালো হতে পারে।

এই দায়িত্বের কষ্ট কমানোর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেছেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের এমন কোন কঠিন বা ভারী দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যা তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বহন করেনি। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি কখনই কোন ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্ব যেমন বহন করেন না, যা তারা বহন করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই বাস্তবতাকে মাথায় রাখা একজন মুসলমানের জন্য ইসলামের দায়িত্ব পালনকে সহজ করে তুলবে, কারণ তাদের মধ্যে কিছু মানুষের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যে

তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং জেনে রাখা যে তারা তাদের দেওয়া চিকিত্সা পরিকল্পনা পরিচালনা করতে পারে, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট দেওয়া হয়। পরিকল্পনা এই বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি অর্জন করবে, সেইভাবে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করবে।

মহান আল্লাহ, উপবাসের সাথে যুক্ত অসুবিধাকে আরও কমিয়ে দেন লোকেদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে এটি বছরের মাত্র কয়েক দিনের জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

" *[রোজা] সীমিত সংখ্যক দিনের জন্য...*"

যথারীতি, মহান আল্লাহ, যারা এই বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে অক্ষম তাদের জন্য ছাড় দেন, যেমন তিনি অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করেন, কারণ ইসলাম একটি ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের প্রকৃতির জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তাই তাদের সম্মান করে। সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

“… *সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে থাকে [তাদের মধ্যে] - তবে অন্যান্য দিনের সমপরিমাণ সংখ্যক [কাজ করতে হবে]। এবং যারা [রোজা রাখতে সক্ষম, কিন্তু কষ্টের সাথে] - একজন দরিদ্রকে [প্রতিদিন] খাওয়ানোর জন্য মুক্তিপণ।*

প্রতিটি পরিস্থিতিতে, ইসলাম মানুষকে দরিদ্রদের সাহায্য করতে উত্সাহিত করে। কিছু ক্ষেত্রে, তাদের সাহায্য করা বাধ্যতামূলক, অন্যদের ক্ষেত্রে এটি একটি জরিমানা বা মুক্তিপণ এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে এটি একটি স্বেচ্ছাকৃত ভাল কাজ যা অত্যন্ত পুরস্কৃত। এটি অন্যদের, বিশেষ করে দরিদ্রদের সাহায্য করার গুরুত্ব তুলে ধরে। ইসলাম এমন কোন স্বার্থপর জীবনধারা প্রচার করে না যেখানে একজন শুধুমাত্র নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য চিন্তা করে, এমনকি পশুরাও এইভাবে আচরণ করে। পরিবর্তে, ইসলাম মানুষকে এর ঊর্ধ্বে উঠতে এবং তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যার মধ্যে রয়েছে অন্যদের আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন। সত্য হল প্রতিটি মুসলিম যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামের এই মৌলিক নীতির উপর আমল করে তাহলে তারা এই পৃথিবীতে কোন অভাবী মানুষ থাকবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি আয়াত 184 এর পরবর্তী অংশে নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 184:

"... *এবং যে ব্যক্তি ভাল [অর্থাৎ, অতিরিক্ত] স্বেচ্ছায় কাজ করে - এটি তার জন্য ভাল...*"

মহান আল্লাহ মানুষকে এই সহজ সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেন যে অন্যদের সাহায্য করা বাস্তবে নিজেকে সাহায্য করা, কারণ এটি তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 7:

"[এবং বললেন], "যদি তোমরা ভালো কাজ করো, তবে তোমরা নিজেদের জন্যই ভালো করবে; আর যদি মন্দ করো, তবে তাদের [অর্থাৎ নিজেদের] জন্যই করবে।"..."

যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করতে থাকবেন। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার কাছে মহান আল্লাহর সমর্থন রয়েছে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করা একজনকে এমন আচরণ করা থেকেও বিরত রাখবে যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করছে যখন তারা তাদের সাহায্য করছে, কারণ এটি অহংকার দ্বারা তাদের পুরস্কারকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিজের সুবিধার জন্য, তার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

"... *এবং যে ব্যক্তি ভাল [অর্থাৎ, অতিরিক্ত] স্বেচ্ছায় কাজ করে - এটি তার জন্য ভাল ...*"

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতিকেও তুলে ধরে যে একজন ব্যক্তি যা দেয় তা হল সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কী পাবে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী

পুরস্কৃত হয়। যদি তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, যেমন শুধুমাত্র মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করা, যা পালন করতে দিনে এক ঘন্টারও কম সময় লাগে, তবে তারা সেই অনুযায়ী উভয় জগতে পুরস্কার ও বরকত পাবে। এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা উভয় জগতের সর্বোচ্চ স্তরের আশীর্বাদ এবং পুরষ্কার কামনা করে কিন্তু সর্বোত্তমভাবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা চালায়। অতএব, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একজনকে তাদের প্রচেষ্টার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং যদি তারা একটি বৃহত্তর স্তরের পুরষ্কার ও আশীর্বাদ চায়, যার ফলে তাদের শান্তি বৃদ্ধি পায়। উভয় জগতের মনের। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

“… তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

ছাড় দেওয়ার পর, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে নিজেকে ঠেলে দিয়ে মানুষকে উচ্চ স্তরের দিকে আহ্বান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

“… *সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে থাকে [তাদের মধ্যে] - তবে অন্যান্য দিনের সমপরিমাণ সংখ্যক [কাজ করতে হবে]। এবং যারা [রোজা রাখতে, কিন্তু কষ্টের সাথে] সক্ষম তাদের উপর - একজন দরিদ্রকে [প্রতিদিন] খাওয়ানোর জন্য*

মুক্তিপণ। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে [অর্থাৎ, অতিরিক্ত] - তা তার জন্য উত্তম। তবে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

একজনকে অবশ্যই অগণিত ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে যেখানে তারা পার্থিব লাভের জন্য নিজেদেরকে তাদের সীমার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যেমন খেলাধুলায়, এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় একই মনোভাব প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেকেই তাদের সম্ভাব্যতা এবং সীমা জানে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 84:

"বলুন, প্রত্যেকে তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু আপনার পালনকর্তা সবচেয়ে বেশি জানেন কে সবচেয়ে ভালো পথপ্রাপ্ত।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

"... *যদি আপনি জানতেন।"*

এই বিবৃতিটি প্রায়শই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য প্রচেষ্টার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে কেউ সঠিক এবং ভুল কর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তাই এটি মানুষকে অন্যদের অন্ধ অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠতে এবং প্রমাণ এবং জ্ঞানের উপর

ভিত্তি করে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যাতে তারা যে কাজগুলি সম্পাদন করে তার মূল্য বুঝতে পারে। যে ভালো-মন্দ কাজের মূল্য বোঝে, সে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং ভালো কাজ করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 796 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, লোকেরা যদি জানতে পারে যে ভোরবেলা এবং সন্ধ্যার ফরজ নামাজে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সওয়াব। ধর্মসভা, তারা তাদের কাছে আসতেন এমনকি যদি তাদের সারা পথ হামাগুড়ি দিতে হয়। যে ব্যক্তি এই হাদিসটি নিশ্চিতভাবে জানত এবং বিশ্বাস করে সে মসজিদে এই ফরয নামাজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করবে, যদিও এটি তাদের জন্য কিছুটা অসুবিধার কারণ হয়।

মহান আল্লাহ অতঃপর রমজান মাসের বিশেষ প্রকৃতি উল্লেখ করেছেন, রোজার মাস। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

" *রমজান মাসই [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন..."*

একযোগে নাজিল হয়েছিল সংরক্ষিত ট্যাবলেট থেকে । অধ্যায় 97 আল কদর, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই, আমি এটি [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি শবে কদরের রাতে।"

তারপর এটি সর্বনিম্ন স্বর্গের হাউস অফ মাইট-এ স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর 23 বছরেরও বেশি সময় ধরে ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তা নাযিল হয়। তাফসীর আল কুরতুবী, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 472-এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তারপর পবিত্র কুরআনের কিছু বরকতময় গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"রমজান মাসই [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক..."

এর অর্থ হতে পারে যে পবিত্র কুরআন মানুষকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, যতক্ষণ না তারা এর শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। কিন্তু, অন্যান্য ধর্ম ও জীবনধারার বিপরীতে, পবিত্র কুরআন মানুষকে এর সত্যতা প্রমাণ ও প্রমাণ ছাড়া অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় না। পরিবর্তে, প্রতিটি পর্যায়ে, যখনই পবিত্র কুরআন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে বা একটি নির্দিষ্ট নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার বা একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তখন এটি স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ দেয় যে কীভাবে এর পরামর্শ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। উভয় জগতে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

“রমজান মাসই [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রমাণ...”

এটি শুধুমাত্র মানুষকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্যের পথ দেখায় না বরং এর দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাকে সমর্থন করে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণও প্রদান করে। এটি এমন একটি জিনিস যা অতুলনীয়, কারণ অন্যান্য সমস্ত ধর্ম এবং জীবনধারা তার অনুসারীদের দাবি করে যে তারা যাকে সত্য বলে সমর্থন করে তার উপর বিশ্বাস রাখতে, স্পষ্ট প্রমাণের প্রতিফলন করার পরিবর্তে এবং নিজেদের জন্য অনুমান করার পরিবর্তে যে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে তা সত্য। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং পৃথকভাবে [সত্যের সন্ধানে] দাঁড়াও এবং তারপর চিন্তা কর।" ...”

এবং 12 অধ্যায় ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনে পাওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলিকে অনুসরণ করতে হবে, যাতে তারা অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা লাভ করে। অন্যান্য লোকেদের আদেশ এবং পরামর্শের উপর। বিশ্বাসের নিশ্চিততা নিশ্চিত করবে যে তারা যেকোন পরিস্থিতিতেই ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধা হোক, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, অন্যদের অন্ধ অনুকরণে যার মূলে দুর্বল বিশ্বাস রয়েছে, তার আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার সম্ভাবনা কম, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যেমন অসুবিধার সময়। মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি কেউ মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

" *রমজান মাস [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হিদায়াত ও মাপকাঠির সুস্পষ্ট প্রমাণ..."*

পবিত্র কুরআন একটি মাপকাঠি কারণ এটি ভাল এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য করে, অকেজো জিনিস থেকে দরকারী জিনিস এবং মানসিক চাপে ভরা জীবন থেকে

মানসিক শান্তি লাভ করে। একটি সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মতো বিভিন্ন বিষয়ে তারা যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তারা কখনই এমন আচরণবিধি তৈরি করতে পারবে না যা মানুষের প্রকৃতির জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযোগী এবং যা ব্যক্তি বা সমাজ হিসাবে পৃথিবীতে তাদের জীবন চলাকালীন মুখোমুখি হতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতি, রাজ্য এবং পরিস্থিতি পূরণ করে। এটি অর্জন করা কেবল অসম্ভব, কারণ মানুষ এখনও মানুষের নির্দিষ্ট উপাদান সম্পর্কে নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে, যেমন মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পিছনে উদ্দেশ্য, একটি নিখুঁত আচরণবিধি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা যাক যা শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সমাজের মধ্যে মন এবং ন্যায়বিচার। একমাত্র আল্লাহ যিনি এটি অর্জন করতে পারেন, তিনিই মহান, যেহেতু তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জ্ঞান অসীম এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে বেষ্টন করে রেখেছেন। অতএব, তিনি একাই মানুষকে একটি আচরণবিধি প্রদান করার অধিকারী, একটি মাপকাঠি যা পরিষ্কারভাবে ভাল এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য করে, অকেজো জিনিস থেকে দরকারী জিনিস এবং মানসিক চাপে ভরা জীবন থেকে মানসিক শান্তি লাভ করে। ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে যখন এই মানদণ্ডটি মানুষের জীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তখন এটি মনের শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সমাজে শান্তির প্রসার ঘটায়। অতএব, মানুষকে অবশ্যই তাদের জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডটি মেনে নিতে হবে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এর কিছু দিক তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, তারা জেনেও যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া সত্ত্বেও।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

" রমজান মাস [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হিদায়াত ও মাপকাঠির সুস্পষ্ট প্রমাণ..."

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্‌ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে

এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

মহান আল্লাহ, তারপর রমজান মাসে রোজা রাখার গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য তাগিদ দেন কিন্তু যারা এটি করতে অক্ষম তাদের জন্য একটি ছাড় অন্তর্ভুক্ত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... *সুতরাং যে ব্যক্তি [চন্দ্রাকার] মাস দেখে, সে যেন রোজা রাখে; এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে - তবে অন্যান্য দিনের সমান সংখ্যক...*"

ইসলামের মধ্যে আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, ছাড় এবং উপদেশ সবই উভয় জগতের মানুষকে মানসিক শান্তির পথ দেখাতে চায়। এগুলি মানুষের উপর কঠিন করার জন্য দেওয়া হয়নি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

যদিও কেউ অন্যায়ভাবে দাবি করতে পারে যে, মহান আল্লাহ যদি মানুষের জন্য সহজ করতে চান, তবে তিনি তাদের যা ইচ্ছা তা করতে দিতে পারতেন। কিন্তু এটি লোকেদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে পরিচালিত করবে না, কারণ তাদের জন্য কী ভাল তা নির্ধারণ করার জন্য তাদের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। এগুলি প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণ যেখানে তারা কেবলমাত্র এটি তাদের জন্য খারাপ তা উপলব্ধি করার জন্য কিছু চেয়েছিল এবং যখন তারা কিছু অপছন্দ করে তখন বুঝতে পারে যে এটি তাদের জন্য ভাল। সত্য হল যে সমস্ত মানুষ শিশুর মতো যারা ভুল সময়ে ভুল জিনিস কামনা করে, যেমন আইসক্রিম যখন তাদের ঠান্ডা হয়। যেমন একজন ভালো পিতামাতা তাদের সন্তানকে তাদের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে রক্ষা করেন, মহান আল্লাহ, একাই জানেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কোনটি সর্বোত্তম এবং তাদের সেদিকে পরিচালিত করেন, তাদের যা করতে হবে তা হল কেবল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আরেকটি উদাহরণ হল একজন মেডিক্যাল ডাক্তার যিনি তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান লিখে দেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয় তারা তাদের রোগীর জন্য অসুবিধা চায় কিন্তু সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কেউ বুঝতে পারবে যে তারা আসলে তাদের রোগীর জন্য মানসিক ও শরীরের শান্তি চায়, কারণ তিক্ত ওষুধ এবং তাদের দেওয়া কঠোর ডায়েট প্ল্যান এটির দিকে পরিচালিত করবে, যদি তাদের রোগী গ্রহণ করে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। একজনকে শুধুমাত্র ধনী এবং

বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে, যার ফলে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে এটি শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির দিকে পরিচালিত করে, যেমন স্ট্রেস, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। মনের শান্তি যে কারো আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে জীবন যাপন করার মধ্যে নেই। যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই মানুষের মন ও দেহ জানেন এবং তাঁর জ্ঞান অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সহ সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে, তাই তিনি একাই জানেন যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কী ভাল। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

" আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিশেষ করে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে উভয় জগতেই দুঃখ-কষ্ট, কষ্ট ও চাপ ভোগ করবে।

অধিকন্তু, একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলি হল সেই জিনিসগুলি যেখানে ক্ষতির কারণ সেগুলি থেকে যে উপকার পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, তারা মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার পিছনে অনেক বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক কারণ রয়েছে, যেমন মদ নিষিদ্ধ।

অতএব, তাঁর আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, ছাড় এবং উপদেশ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম কারণ এটি একাই উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যায়, যদিও এটি তাদের অজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

" যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে লিখিত [অর্থাৎ বর্ণিত] খুঁজে পায়, যিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য হালাল করেন। যা ভালো এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করে এবং তাদের বোঝা ও শিকল থেকে মুক্তি দেয়..."

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... *সুতরাং যে ব্যক্তি [চন্দ্রাকার] মাস দেখে, সে যেন রোজা রাখে; আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, তবে অন্য দিনের সমান সংখ্যক। আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করতে চান এবং আপনার জন্য কষ্ট চান না এবং আপনি সময় পূর্ণ করতে চান ..."*

এই বিশেষ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ, উপবাসের মাধ্যমে সহজ করতে চান, কারণ উপবাস হল তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য মুসলমানদের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, যা তারা নিশ্চিত করে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত

আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার।"*

যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, রোজা একজন ব্যক্তিকে তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে দেয় যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর আরও প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ় হয়। তাই, মুসলমানরা তাদের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের সময় কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়ে যায় যখন তারা মনের এবং শরীরের শান্তির মতো অসংখ্য উপকার লাভের জন্য উপবাস করে। এটি এমন একজন অ্যাথলিটের মতো যে অগণিত ঘন্টার কঠিন ব্যায়াম এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যানের মধ্য দিয়ে যায় যাতে তারা তাদের খেলাধুলায় সাফল্য অর্জন করতে পারে বা এমন একজন শিক্ষার্থীর মতো যারা একটি প্রাপ্তির জন্য সময় ব্যয় করার সময় সংশোধন এবং পরীক্ষা দেওয়ার সময় কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ভাল চাকরি, যা তাদের সারা জীবনের জন্য তাদের আর্থিক চাহিদার যত্ন নিতে দেয়।

এছাড়াও, উপবাস, যা একজনকে তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে দেয় যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, এটি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সর্বোত্তম মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের যা আছে তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন

এবং দান করেছেন এবং তিনি একাই তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের পথ দেখান। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... *এবং তিনি আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা; এবং সম্ভবত আপনি কৃতজ্ঞ হবেন।"*

রোজা একজনকে তাদের উদ্দেশ্যের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে, নিশ্চিত করে যে কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এই মনোভাবের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল তারা মানুষের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা আশা করবে না বা আশা করবে না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। রোজা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে, কারণ এটি তাদের হয় ভালো কথা বলতে বা নীরব থাকতে উৎসাহিত করে। এবং রোজা একজনকে তাদের কর্মের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে কারণ এটি তাদের তাদের সময় এবং সম্পদের মতো আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কৃতজ্ঞতার সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করা উভয় জগতের আশীর্বাদ, ক্ষমা, করুণা এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তাদের কাছে খ্যাতি এবং সম্পদের মতো আশীর্বাদগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে উঠবে। যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, যেমন মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟
لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে- আমি তো কাছেই আছি। যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার [আনুগত্যের মাধ্যমে] সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক যাতে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়।”

এই আয়াতটি রমজান মাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতের পরে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে এবং সারা বছর এই আনুগত্য বজায় রাখতে উত্সাহিত করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

“রমজান মাস [সেই] মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি মাসটির [চন্দ্রালোক] দেখবে, সে যেন রোজা রাখে... এবং [চায়] যে আপনি সময়টি পূর্ণ করতে পারেন এবং তিনি আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে পারেন; এবং সম্ভবত আপনি কৃতজ্ঞ হবেন।"

এই পদ্ধতিতে আচরণ করা স্বাভাবিকভাবেই একজনকে নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দিকে নিয়ে যায়, যা একটি ইবাদতের কাজ যা ফরজ নামাজের মতো ভাল কাজ করার সাথে যুক্ত।

মূল আয়াতটি, অন্য অনেকের মতো, একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে যে সর্বোচ্চ পদে পৌঁছাতে পারে তা নির্দেশ করে, যথা, মহান আল্লাহর বান্দা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" *আর যখন আমার বান্দারা..."*

অনেক সময় মহান আল্লাহ যখন মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তিনি প্রায়শই তাদেরকে পবিত্র নবী হিসাবে উল্লেখ না করে তাঁর বান্দা হিসাবে উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, নিম্নোক্ত আয়াতে, মহান আল্লাহ, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বর্গযাত্রার কথা বলেছেন, যা তাঁর মহত্ত্বের পরিচায়ক, তথাপি তাঁকে তাঁর বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 1:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় নিয়ে গেলেন আল-মসজিদ আল-হারাম থেকে আল-মসজিদ আল-আকসায়, যার চারপাশে আমরা বরকত দান করেছি, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী, দেখেন।"

অন্য একটি উদাহরণে, মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীদের একজনের শিক্ষককে বোঝান, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল একজন বান্দা হিসাবে উল্লেখ করেন এবং উল্লেখও করেন না। শিক্ষকের নাম। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 64-65:

"[মূসা] বললেন, "আমরা এটাই খুঁজছিলাম।" তাই তারা তাদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ফিরে এল। এবং তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেয়েছিল যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দিয়েছিলাম এবং তাকে আমার কাছ থেকে একটি [নিশ্চিত] জ্ঞান শিখিয়েছিলাম।"

এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াত ও রসূল ঘোষণা করার আগে নিজেকে মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি অনেক হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 851 নম্বরে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, নবুওয়াত ও রসূলত্বের সারমর্ম হল মহান আল্লাহর দাসত্ব।

তাই মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এটা মনে রাখা জরুরী যে একজন বান্দা বোঝে যে তাদের কর্তব্য হল সর্বদা তাদের প্রভু, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। তাদের দায়িত্ব নিজের আনন্দ বা অন্যের আনন্দ চাওয়া নয়। তারা অন্যরা তাদের সন্তুষ্ট করতে চায় না এবং পরিবর্তে অন্যদেরকে সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে উত্সাহিত করে, যেমন তারা তা করার চেষ্টা করে, যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর বান্দা, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। উপরন্তু, মহান আল্লাহর একজন বান্দা স্বীকার করে যে তাদের যা কিছু আছে তা তাদের মালিক, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দিয়েছেন এবং তাই তাদের নিজের জীবন সহ তা তাঁরই। এই মনোভাব তাই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এই আশীর্বাদের মালিক, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করবে, যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তদুপরি, মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই কিছু বা কারও সেবক হতে হবে। একজন মানুষের পক্ষে সেবক না হওয়া সম্ভব নয়। একজন মহান আল্লাহর দাস হিসাবে আচরণ করতে পারে, যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ তিনি একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। এবং কে না. উপরন্তু, মহান আল্লাহকে সেবা করা মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করে কারণ একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখে এবং একাধিক প্রভুর উপর এক প্রভুকে সন্তুষ্ট করা অনেক সহজ, বিশেষ করে যখন তাদের প্রভু পরম করুণাময় এবং শুধুমাত্র তাঁর বান্দার কাছ থেকে সামান্য প্রচেষ্টা আশা করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে অনিবার্যভাবে অন্যান্য জিনিস বা মানুষের সেবক হয়ে যাবে, যেমন তাদের নিয়োগকর্তা, হলিউডের নির্বাহী, সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো। এই জিনিসগুলির চেয়েও খারাপ হয় যখন কেউ নিজের ইচ্ছার সেবক হয়ে যায়, কারণ এটি ধর্ষক এবং খুনিদের মতো মানবজাতির খারাপের মনোভাব। এই ব্যক্তি তাদের প্রভুদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখবে, যা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই দুঃখ, অসুবিধা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তও অনুভব করে কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে পারে না। এটা খুবই প্রতীয়মান হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা মহান আল্লাহর দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কিভাবে তারা সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী হয়েও দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, একজনের নিয়োগকর্তা বা আত্মীয়দের মতো মানুষের সেবক হওয়া শুধুমাত্র দুঃখের দিকে নিয়ে যাবে কারণ যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা কখনই অন্য লোকেদের পুরোপুরি খুশি করতে পারবে না। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। ফলে জনগণের এই সেবক সময়ের সাথে সাথে ক্ষুব্ধ ও তিক্ত হয়ে উঠবে কারণ তাদের ত্যাগ মানুষকে খুশি করতে পারেনি। এটি কেবল উভয় জগতে তাদের চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলা বাড়িয়ে তুলবে।

অতএব, যেহেতু একজন বান্দা হওয়া অনিবার্য, সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির উচিত নিজেদের প্রতি করুণাময় হওয়া এবং অন্যান্য জিনিসের চেয়ে মহান আল্লাহর

দাসত্বকে বেছে নেওয়া, কারণ এটিই একমাত্র মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। এই দাসত্বের সাথে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত হিসাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"... তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" *এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে...*"

এই আয়াতটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং গুণাবলী সম্পর্কে শেখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ তাঁর জ্ঞান পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত। এই মহান আল্লাহকে বোঝার একমাত্র উপায়, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে, যাতে কেউ আন্তরিকভাবে সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে পারে। বিকল্প উৎস থেকে মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী ও গুণাবলী সম্বন্ধে শেখা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহকে

অসম্মান করার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাকে সম্মান করছে এবং এমনকি কাউকে অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ পবিত্র কুরআনে আলোচিত মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়নকে উপেক্ষা করে, তখন তারা সহজেই তাঁর রহমত ও ক্ষমার বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা অবলম্বন করতে পারে। . এই ব্যক্তি ধরে নেবে যে তারা মহান আল্লাহর রহমতের উপর আশাবাদী, যদিও তারা কেবল ইচ্ছাপূরণের অধিকারী, যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন একজন মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা পাওয়ার আশা করে, কারণ তিনি সকল করুণাময় ও ক্ষমাশীল। যদিও, মহান আল্লাহ, পরম করুণাময় এবং সমস্ত ক্ষমাশীল, তবুও বিশ্বাস করা যে তিনি ভাল কাজকারী এবং মন্দ কাজকারীকে এই পৃথিবীতে সমানভাবে ব্যবহার করবেন এবং বিচারের দিনে এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক কারণ এটি তাকে সমস্ত ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

তাই মহান আল্লাহ তায়ালার ঐশী গুণাবলী ও গুণাবলীর প্রতি ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, সঠিক উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমে, যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে..."

উপরন্তু, এই আয়াতটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্যের উপর শিক্ষা ও কাজ করা জড়িত, কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে মাধ্যম বানিয়েছেন। মানবতার জন্য নির্দেশনা। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাই একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যদিও এটি ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেহেতু কেউ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে: পবিত্র কুরআন এবং এর ঐতিহ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার ফলশ্রুতিতে গোমরাহীর দিকে পরিচালিত হয়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" *এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে..."*

এই আয়াতটি ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টার গুরুত্বও নির্দেশ করে। মানুষ যেমন একটি ভাল পেশা অর্জনের জন্য পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তেমনি তাদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে এবং পূরণ করতে পারে, যার ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তা কখনই তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে পথ দেখাতে সক্ষম হবে না, তা অসুবিধার পরিস্থিতি হোক বা স্বাচ্ছন্দ্যের, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং পুরস্কার লাভ করে। উপরন্তু, জাগতিক জ্ঞান কাউকে শেখাবে না যে কীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। অতএব, পার্থিব জ্ঞান একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করা

যায় না, সে যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন। পরিবর্তে তাদের অবশ্যই ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে কিভাবে বাঁচতে হবে, কীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং কীভাবে তারা মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিকে পরিচালনা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" *এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে..."*

উপরন্তু, এই আয়াতটি শুধুমাত্র দরকারী জ্ঞান গবেষণার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াবে না, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে। 186 নং আয়াতের ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর স্বর্গীয় গুণাবলী ও

গুণাবলি অবশ্যই শিখতে হবে এবং নিজের সৃষ্ট সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, কারণ এটি তাদের আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করবে, যা বিচার দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" *এবং যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আমার সম্পর্কে - আমি অবশ্যই নিকটে আছি ...*"

মহান আল্লাহর নৈকট্যকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরো তুলে ধরার জন্য, তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেন। এই আয়াতটি মহান আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আশা উভয়ই উৎপন্ন করবে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পাওয়ার জন্য উভয়েরই প্রয়োজন কারণ ভয় একজনকে পাপ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আশা একজনকে ভালো কাজ করার দিকে চালিত করে। ভয় উৎপন্ন হয় যখন একজনের বোঝা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের এত কাছাকাছি, এমনভাবে যা সৃষ্টির দ্বারা বোঝা যায় না, তিনি তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা, অভিপ্রায়, কথাবার্তা এবং কাজ সম্পর্কে অবগত হন, তারা যতই গোপন হোক না কেন। অন্যান্য মানুষ থেকে হয়. তাই একজনকে অবশ্যই তাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কাজকে ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য ক্রমাগত মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতে তাদের থেকে উপকৃত হয়। আশা মূল আয়াত দ্বারা উত্পাদিত হয়, একজন ব্যক্তি যতই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন না কেন তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে যিনি তাদের অন্য কারও চেয়ে বেশি ভালোবাসেন এবং তাদের যত্ন করেন তিনি তাদের প্রতিটি অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং তাদের অগ্নিপরীক্ষা জুড়ে পর্যবেক্ষণ করেন। একজন মানুষ যেমন প্রিয়জনের সাথে

থাকলে তারা আরামদায়ক হয়, তেমনি তাদের আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা উচিত যে মহান আল্লাহ সর্বদা তাদের সাথে আছেন এবং তাদের প্রতি নজর রাখেন। যে ব্যক্তি এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে বোঝে সে খুব কমই একাকীত্ব অনুভব করবে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যেখানেই থাকুক না কেন বা তারা যার মুখোমুখি হচ্ছে। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

"... এবং আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার সাথে আছেন..."

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির এতই নিকটবর্তী যে যে কেউ তাঁকে ডাকে তিনি সরাসরি সাড়া দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে..."*

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর সাড়া সর্বদা তাঁর অসীম জ্ঞান ও তাঁর সময় অনুযায়ী এবং তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তির জন্য যা সর্বোত্তম তা অনুসারে। দুঃখজনকভাবে, অনেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার ধারণাটিকে ভুল বোঝেন এবং ধরে নেন যে তিনি তাদের কথা শোনেন না বা সাড়া দেন না, কারণ তারা তাদের সময়সূচী অনুযায়ী এবং তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যা চেয়েছিলেন তা তারা পান না। আল্লাহ, মহান এবং তাঁর অসীম ভান্ডারকে কখনই এমন একটি দোকানের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যেখানে কেউ নগদ অর্থ

প্রদান করে এবং তাদের ইচ্ছামত সময়সূচী অনুসারে যা ইচ্ছা সেভাবে ক্রয় করে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহ পরম করুণাময়, তিনি এমনভাবে সাড়া দেন যা প্রার্থনাকারীর জন্য সর্বোত্তম, এমনকি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও, যতবার একজন ব্যক্তি এমন কিছু জিজ্ঞাসা করে যা তাদের জন্য ভাল নয় বা তাদের জীবন থেকে কিছু অপসারণ করতে চান, যদিও এটি তাদের জন্য ভাল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবের কারণে উভয় জগতের মঙ্গলের জন্য সাধারণ প্রার্থনাকে মেনে চলা উচিত এবং ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও প্রতিক্রিয়াগুলিকে গ্রহণ করা উচিত, জেনে রাখা উচিত যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200-201:

"আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের রব, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন সুস্থ দেহ ও মন লাভ করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও পাবে যে মহান আল্লাহর সাড়া ও আদেশকে ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে...*"

এটা লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ বলেননি যে, যে মুসলিম তাকে ডাকে তাকে তিনি সাড়া দেন। পরিবর্তে তিনি তাদের বিশ্বাস, কর্ম এবং আচরণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রার্থনার দরজা খোলা রেখেছিলেন। এটি একটি অত্যন্ত অনন্য বাস্তবতা, কারণ বেশিরভাগ ধর্মই প্রচার করবে যে তাদের ঈশ্বর কেবল তাদের প্রতিই সাড়া দেন যে তাদের বিশ্বাস করে। কিন্তু সত্য হলো, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে ডাকবে, সে সাড়া পাবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। সকল মানুষের প্রতি এই স্বর্গীয় প্রতিক্রিয়া, তাদের বিশ্বাস

নির্বিশেষে, পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 65:

"এবং যখন তারা একটি জাহাজে আরোহণ করে, তখন তারা দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে দেশে পৌঁছে দেন, তখনই তারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।"

এটি আরেকটি সূক্ষ্ম বাস্তবতার সাথে যুক্ত। যখন একজন ব্যক্তি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যা অন্য কেউ সমাধান করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার, এই ব্যক্তি প্রায়শই ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়। ব্যক্তি একাধিক ঈশ্বরকে ডাকে না, কেবলমাত্র একক ঈশ্বর, অর্থ, মহান আল্লাহ। যেহেতু তারা গভীর অভ্যন্তরে জানে, তিনিই আছেন এবং তিনিই একমাত্র যিনি সমস্ত কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এই সত্য প্রতিটি মানুষের মধ্যে গেঁথে আছে এবং মহান আল্লাহর একত্বের আরেকটি প্রমাণ।

অতএব, সকল মানুষের উচিত মূল আয়াতের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা যা সকল প্রার্থনাকারীর প্রতি খোদায়ী সাড়া এবং ইসলামের সত্যতাকে চিনতে আলোচিত গোপন বাস্তবতাকে নির্দেশ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

" আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, [হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)], আমার সম্পর্কে - নিশ্চয় আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে..."

এই আয়াতটি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকেও নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝা যায়। দুঃখজনকভাবে, কিছু মুসলমানের বিশ্বাস মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি, একজন জাগতিক রাজার মতই। একজন জাগতিক রাজা তার রাজ্যের বিষয়গুলি নিজে নিজে পরিচালনা করতে পারে না এবং তাই সাহায্যকারী নিয়োগ করে, যেমন গভর্নরদের, তাকে তার রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, অনেক মুসলিম আধ্যাত্মিক লোকদের খুঁজে বের করার জন্য সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যারা অনুমিতভাবে মহান আল্লাহর সাথে একটি বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার সাথে একটি বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকে খুশি করা যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে পারে, যেমন একজন গভর্নর গভর্নরকে খুশি করে এমন ব্যক্তির পক্ষে রাজার কাছে সুপারিশ করতে পারে, উপহার এবং সম্মান ও ভালবাসার অপ্রাকৃতিক প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক লোকেরা সাধারণ জনগণ এবং মহান আল্লাহর মধ্যে দ্বাররক্ষক হিসাবে কাজ করে, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল আয়াতটি উভয় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহর নিকটতমকে, যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে একজন ব্যক্তি ও মহান আল্লাহর মধ্যকার সংযোগ থেকে সরিয়ে দেয়। , যেহেতু মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেন। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দারোয়ান হিসেবে কাজ করেননি বরং মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার সঠিক পথ শিখিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকে মহান আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। তবুও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা নির্দেশ করার জন্য যে একজন

ব্যক্তির আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য দারোয়ানদের খুশি করার প্রয়োজন নেই, মহান, আল্লাহ, মহান, আয়াতে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন 186 সরাসরি। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামিক জ্ঞান শিখতে হবে এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান দেখাতে হবে কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এমন লোকদের উপাসনা করা উচিত যারা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর এবং খুশি করার জন্য আধ্যাত্মিক বলে মনে হয়। এটি মূল আয়াত দ্বারা আরও সমর্থিত যা বলে যে আল্লাহ, মহান, যিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি তার প্রতি সাড়া দেন, এটি এই বলে না যে তিনি কেবল আধ্যাত্মিক বলে মনে করা লোকদের প্রার্থনায় সাড়া দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে...*"

অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা একটি যৌক্তিক সত্য বর্ণনা করেন যে, যিনি মহান আল্লাহকে তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে চান তাকে প্রথমে তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাড়া দেওয়া উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার [আনুগত্যের মাধ্যমে] সাড়া দিক...*"

186 নং আয়াতের পরবর্তী অংশে ব্যবহারিকভাবে একজনের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার বিষয়টি আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার [আনুগত্যের মাধ্যমে] সাড়া দিক এবং আমার প্রতি বিশ্বাস করুক...*"

উভয় জগতের মানসিক শান্তি পেতে হলে ভালো কর্ম হল প্রমাণ ও মুদ্রা। একটি উদ্ভিদ যেমন সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি লাভ করলেই ফল উৎপাদনের জন্য ফুল ফোটে, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস তখনই প্রস্ফুটিত হতে পারে যাতে তারা তাদের মনের শান্তির দিকে নিয়ে যায়, যখন তারা ভাল কাজ সম্পাদন করে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। আলোচ্য মূল আয়াতের পরবর্তী অংশে এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার [আনুগত্যের মাধ্যমে] সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক যাতে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়।"*

বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা, প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একজনকে পথ দেখায়, তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়ই হোক না কেন, যাতে তারা মনের শান্তি এবং অগণিত পুরষ্কার অর্জনের সাথে সাথে সফলভাবে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

যদিও, যে ব্যক্তি কার্যতঃ আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো তাদের প্রার্থনার প্রতি তার সাড়া পাবে কিন্তু তারা সফলভাবে মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক নির্দেশনা পাবে না, যা তাদের বাধা দেবে। উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করা থেকে , এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের বিষয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তি এবং সাফল্যের আবাস এবং তাই বেছে নেয় কে মনের শান্তি পাবে আর কে পাবে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অতএব, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রার্থনা কেবল তখনই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে যখন একজন আনুগত্যের কাজগুলি সম্পাদন করে, কারণ পবিত্র কুরআনের প্রতিটি প্রার্থনা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিষ্ঠিত রেওয়ায়েতের সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা, যেমন মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তবে কারো কাজের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়া ফলপ্রসূ হবে না। আলোচ্য মূল আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... *সত্যিই আমি কাছাকাছি. যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার [আনুগত্যের মাধ্যমে] সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক যাতে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়।”*

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 187

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ
مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ
ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

"তোমাদের জন্য রোযার আগের রাতে স্ত্রীদের কাছে যাওয়া জায়েয করা হয়েছে। তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক. আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা করতে, তাই তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা সন্ধান করুন [অর্থাৎ সন্তানের]। আর খাও ও পান কর যতক্ষণ না ভোরের সাদা সূতা তোমার কাছে কালো সুতো [রাতের] থেকে আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর রাত্রি [অর্থাৎ সূর্যাস্ত] পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। আর যতক্ষণ না মসজিদে ইবাদতের জন্য অবস্থান কর ততক্ষণ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখো না। এগুলো আল্লাহর সীমাবদ্ধতা, সুতরাং তাদের কাছে যেও না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ [অর্থাৎ বিধান] লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তারা ধার্মিক হতে পারে।"

প্রাথমিকভাবে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, গভীর রাতের ফরজ সালাতের পরে তাদের স্ত্রীদের সাথে খাওয়া, পান বা সম্পর্ক করেননি কারণ তারা এই সালাতের পরে শুরু হওয়া পরের দিনের ফরজ রোজাকে বিবেচনা করেছিলেন। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১০ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তাদের প্রাথমিক পদ্ধতি আল্লাহ, মহান, বা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা কঠোরভাবে নির্ধারিত ছিল না, তবুও তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল। আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা এটিকে সমর্থন করা হয়েছে কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, যখন কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, এই পদ্ধতিটি সঠিকভাবে পালন করেননি, তখন তারা নিজেদের অর্থে প্রতারণা করেছিলেন, তারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করেননি, উচ্চতর, কিন্তু পরিবর্তে তাদের নিজস্ব সেট রুটিন আপ বাস করতে ব্যর্থ. মহান আল্লাহ, তারপর তাদের জন্য সহজ করে দিয়ে তাদের সকলকে তাঁর ক্ষমা ও রহমত দিয়ে ঢেকে দিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

" *তোমাদের জন্য রোযার আগের রাতে স্ত্রীদের কাছে যাওয়া জায়েয করা হয়েছে। তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক. আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা করতে, তাই তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা সন্ধান করুন [অর্থাৎ সন্তানসন্ততি]...*"

এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন মুসলমানের নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে কঠিন করা উচিত নয় কারণ ইসলাম একটি ভারসাম্যের ধর্ম যা মানুষকে তাদের

শক্তি অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেয়। যেহেতু মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যতক্ষণ না তা পূরণ করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যতিক্রম ছাড়া বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন একজনের সময় এবং সম্পদ। এর বাইরে যা কিছু এবং বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন স্বেচ্ছাসেবী ইবাদত, তা অবশ্যই নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

উপরন্তু, মূল আয়াতটি নির্দেশনার দুটি উৎসকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার গুরুত্বও নির্দেশ করে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের পরিবর্তে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তাদের জীবন তত কঠিন হবে এবং তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

মহান আল্লাহ তখন এই আয়াতে স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক...*"

এর অর্থ এই হতে পারে যে পোশাক যেমন একজন ব্যক্তির শারীরিক ত্রুটিগুলিকে ঢেকে রাখে, একজন ব্যক্তিকে বিশ্বের বাকি অংশ থেকে তাদের স্ত্রীর ত্রুটিগুলি ঢেকে দেওয়ার জন্য বোঝানো হয়, কারণ তারা তাদের ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে একজনের চরিত্র এবং কর্মের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রুটিগুলি অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের স্ত্রীর ত্রুটিগুলিকে উপেক্ষা করতে হবে কারণ তাদের নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করা এবং তাদের স্ত্রীকেও তাদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে উত্সাহিত করা কর্তব্য। কিন্তু এর অর্থ হল তারা তাদের স্ত্রীর খুঁত অন্যদের কাছে আলোচনা বা প্রকাশ করবেন না, যেমন তাদের আত্মীয়। দুঃখজনকভাবে, এটি এমন কিছু যা প্রায়শই মুসলিমদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। যদি কেউ তাদের স্ত্রীর সম্পর্কে পরামর্শ চায় তবে এটি এমন একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যার ইসলামিক জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর ভয় রয়েছে, যাতে তারা যথাযথ পরামর্শ দেয় এবং এটি নিশ্চিত করে যে স্বামী / স্ত্রীর ত্রুটিগুলি অন্য লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে বা না। তাদের ত্রুটিগুলি উপহাস করা হয় এবং উপহাস করা হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক...*"

এর অর্থ এইও হতে পারে যে পোশাক যেমন একজন ব্যক্তিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার জীবনসঙ্গীকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ধরন, কারণ আধ্যাত্মিক বিপদ উভয় ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির মঙ্গলকে প্রভাবিত করে। পৃথিবী অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"*হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...*"

এটি অর্জন করা হয় যখন কেউ ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে যাতে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং যখন তারা তাদের পরিবারকে উত্সাহিত করে, যেমন তাদের স্ত্রীকে। একই কাজ করুন, কারণ এটি একা মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, একজনকে দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করা এবং নিজের পরিবারকে একই কাজ করতে উত্সাহিত করা, যেমন একজনের জীবনসঙ্গী, উভয় জগতের জন্য শুধুমাত্র মানসিক চাপ, সমস্যা এবং অসুবিধার কারণ হবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন স্বামী / স্ত্রীরা এইভাবে আচরণ করে এবং কীভাবে তারা তাদের স্ত্রীর জন্য চাপের উত্স হয়ে ওঠে তা পর্যবেক্ষণ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক..."*

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যেমন তাদের পোশাকে আরাম পায়, একজন ব্যক্তির উচিত তার স্ত্রীর কাছ থেকে আরাম পাওয়া। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 21:

"এবং তাঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পার; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে স্নেহ ও করুণা স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই স্বস্তি যদি বিবাহ থেকে অনুপস্থিত থাকে তবে এটি তাদের বাড়িকে কারাগারে পরিণত করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *তারা আপনার জন্য একটি পোশাক এবং আপনি তাদের জন্য একটি পোশাক...*"

পোশাক যেমন একজন ব্যক্তিকে সুন্দর করে, তেমনি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সুন্দর করে তোলে। এটা অর্জিত হয় যখন তারা একটি দল হিসেবে কাজ করে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। যখনই জুটির একটি এই আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়, অন্যটি তাদের সংশোধন করে। এই টিমওয়ার্ক তাদের ভাল কাজ, তাদের পার্থিব এবং পরকালের জীবনকে সুন্দর করতে সাহায্য করে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি এখন পর্যন্ত আলোচিত সুবিধাগুলো পেতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে বিয়ে করার জন্য সঠিক ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে। এই পছন্দটি অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে হতে হবে, কারণ পার্থিব কারণের উপর ভিত্তি করে একটি পছন্দ আলোচনা করা সুবিধার দিকে নিয়ে যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই ক্ষতির একটি দিক হল আলোচিত সুবিধা অর্জনে ব্যর্থতা। এই হাদিসে উল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত পার্থিব কারণ, সময়ের সাথে সাথে আসা এবং যাওয়া এবং একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যত সন্তানদের জন্য একজন ভাল জীবনসঙ্গী বা একজন ভাল পিতামাতা তৈরি করবে না এমন গ্যারান্টি দেয় না।

যদিও, তাকওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা একজনকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, মহান, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারা নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিকভাবে আচরণ করবে এবং তাদের স্ত্রীকেও একই কাজ করতে উত্সাহিত করবে, যার ফলস্বরূপ আলোচনা করা সুবিধাগুলি এবং শেষ পর্যন্ত এটি বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের সন্তানদের জন্য মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদেরকে প্রতারণা করতে..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে যখনই কেউ সঠিকভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তারা কেবল নিজের সাথে প্রতারণা করছে। মনে হতে পারে যে তারা অন্যদের ক্ষতি করছে বা কিছু বৈষয়িক সুবিধা লাভ করছে যখন তারা মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, তবুও তাদের বাহ্যিক চেহারা দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ

করেন। মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করার সময় তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করতে পারে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে, যদিও এটি তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।"

এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে এবং কিভাবে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে প্রাপ্ত জিনিসগুলোই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ব্যক্তি, তারা যেই হোক না কেন, এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, এবং সমস্ত মানুষ তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে পরবর্তী পৃথিবীতে গভীরভাবে স্পষ্টভাবে। অধ্যায় 50 ক্বাফ, আয়াত 22:

" [বলা হবে], "নিশ্চয়ই তুমি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলে, এবং আমরা তোমার উপর থেকে তোমার আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *তাই তিনি তোমার তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করেছেন...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখনই কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই এটি তাদের কাছে থাকা নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য হয়, যার ফলে উভয় জগতে তাদের জন্য অসুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি এবং সাফল্য পেতে চাইলে হেদায়েতের দুটি উত্সের দিকে ফিরে যেতে হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অকপট অনুতাপে দোষী বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ আবার করা এড়াতে হবে এবং কাফের হয়ে যাবে। যে কোনো অধিকারের জন্য যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সম্মানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তারপর সংক্ষেপে রোযার সাথে সম্পর্কিত কিছু নিয়মের রূপরেখা দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *আর খাও ও পান কর যতক্ষণ না ভোরের সাদা সুতো তোমার কাছে কালো সুতো [রাতের] থেকে আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর রাত্রি [অর্থাৎ সূর্যাস্ত] পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। আর যতক্ষণ না তুমি মসজিদে ইবাদতের জন্য অবস্থান কর, ততক্ষণ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখো না...*"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বোঝার ও তার উপর আমল করার জন্য একটি অত্যাবশ্যক সার্বজনীন নীতি বর্ণনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *এগুলি আল্লাহর সীমাবদ্ধতা, সুতরাং তাদের কাছে যেও না...*"

মহান আল্লাহ কখনো বলেননি তার সীমা অতিক্রম করবেন না, বরং তিনি এটা স্পষ্ট করেছেন যে মানুষ তার সীমার কাছেও যাবে না। এই উপদেশ পবিত্র কুরআন জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে জান্নাতের গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু গাছের কাছে যাওয়া হারাম না হওয়া সত্ত্বেও তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 19:

"এবং হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, পাছে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।"

এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যা নির্দেশ করে যে কিছু হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে কেউ এটি করবে, কারণ মহান আল্লাহর সীমার কাছে যাওয়া বেআইনি নয়, কেবল তাদের অতিক্রম করাই হারাম। কিছু হালাল জিনিস, যেমন নিরর্থক জিনিস, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি প্রায়ই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, নিরর্থক

কথাবার্তা, যাকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় না, তা প্রায়ই গীবত এবং মিথ্যা বলার মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়। ধন-সম্পদের অনর্থক ব্যয় অনেক সময় অপচয়ের দিকে নিয়ে যায়, যা একটি পাপ। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

অধিকাংশ মানুষ যারা বিপথগামী হয়েছে, তারা ধাপে ধাপে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা সেগুলিতে অংশ না নিয়ে বেআইনি জিনিসগুলির কাছে গিয়েছিল এবং অবশেষে, সময়ের সাথে সাথে, সেই বেআইনি জিনিসগুলিতে অংশ নিতে উত্সাহিত এবং প্রলুব্ধ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মদ পান করে এমন লোকদের সাথে যায়, অবশেষে এটি পান করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি মদ পান করে এমন লোকদের সাথে যায় না। কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে, নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার এই মনোভাব এমন একটি বিষয় যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি তা করতে পারে না। ধার্মিক হয়ে ওঠে, অর্থাত্, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহারে অটল হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কিছু হালাল জিনিস ত্যাগ করুন ভয়ে এটা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব, একজনকে কেবল হারাম জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে না বরং কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে, অসার জিনিসগুলি পরিহার করতে হবে, এই ভয়ে যে এটি শেষ পর্যন্ত হারামের দিকে নিয়ে যাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহ্‌র আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত

হয়েছে, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর, যা ধার্মিকতার সারাংশ এবং উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 187:

"... *এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ [অর্থাৎ, বিধানাবলী] লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তারা ধার্মিক হতে পারে।"*

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমারেখার কাছে না যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে হালাল জিনিষ, বিশেষ করে অনর্থক জিনিসে বাড়াবাড়ি করবে, যা তাদের হারাম কাজ করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে এবং এটি তাদের অপব্যবহারের কারণ হবে। তাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলোও অনুভব করে কারণ তারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে এড়াতে পারে না, উচ্চাভিলাষী। যারা এই ধরনের আচরণ করে, যেমন ধনী ব্যক্তিদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ
ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষ দিয়ে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিছু কর্তব্য, যেমন রোজা ইত্যাদি আলোচনা করার পর , তিনি এই আয়াতে কিছু উদাহরণ সহ অন্যান্য মানুষের অধিকার পূরণের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষ দিয়ে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে ইসলাম মহান আল্লাহর অধিকার, এবং তাঁর সাথে সরাসরি যুক্ত কর্তব্য যেমন রোজা রাখা এবং আত্মীয়স্বজনদের মতো অন্যান্য মানুষের অধিকার পূরণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখে এবং তাদের কাছে যা আছে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি যুক্ত দায়িত্ব পালন করাই মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। এটি একটি প্রধান কারণ যে লোকেরা আল্লাহ, মহানের সাথে সংযুক্ত মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করে, যেমন পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ কিন্তু মানুষের সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, ইসলামের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয় যখন একজন আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি তার কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহ তাকে সহজে ক্ষমা করবেন কিন্তু অন্যের সাথে করা অন্যায়কে তিনি ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না সে অন্যায়কারীকে ক্ষমা না করে। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে অন্যায়কারীকে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ নিতে বাধ্য হবে। এর ফলে

অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে । অতএব, মহান আল্লাহর হকের পাশাপাশি মানুষের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে কারণ উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মানুষের অধিকার পূর্ণ হয় যখন একজন অন্যের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরা অন্য লোকেদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। সহীহ বুখারী, ১৩ নং হাদিস অনুযায়ী এটাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না..."

এটি সমস্ত ধরনের অন্যায্য ব্যবসায়িক লেনদেনকে জড়িত করে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যার সাথে তারা ব্যবসা করছে তার সাথে প্রতারণা করে, সে প্রদানকারী

বা গ্রাহক হোক না কেন। একজনের জন্য ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত আচরণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে মহান আল্লাহ তাদের আর্থিক লেনদেনের মধ্যে আশীর্বাদ ও করুণা রাখেন। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসার উন্নতি অব্যাহত থাকবে এবং উভয় জগতেই তাদের উপকার হবে। কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে লোকদেরকে তাদের আর্থিক লেনদেনে প্রতারণা করে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটিগুলি লুকিয়ে রাখা, তাহলে তারা এই রহমত ও নিয়ামত হারাবে, যার ফলে তারা লোভী হয়ে পড়বে, কারণ তাদের সম্পদ কখনও পূরণ করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। তাদের চাহিদা। সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, সমস্ত ব্যবসায়ীরা বিচারের দিনে অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হয়, যদি না তারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ আচরণ করে এবং তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় সত্য কথা বলে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 1-6:

“হায় তাদের জন্য যারা [কার্যের চেয়ে] কম দেয়। যারা মানুষের কাছ থেকে পরিমাপ গ্রহণ করলে পূর্ণ গ্রহণ করে। কিন্তু মাপে বা ওজনে দান করলে ক্ষতি হয়। তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি অসাধারণ দিনের জন্য. যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না..."

এর মধ্যে অন্যের পার্থিব সম্পদ চুরি করা বা অপব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ এবং তাদের সম্পদের ক্ষতি করা, যেমন তাদের সম্পদ, একজন প্রকৃত মুসলিম ও বিশ্বাসীর সংজ্ঞার পরিপন্থী। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে গ্রহণ করা ইসলামে এমন একটি গুরুতর অপরাধ যে সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন। , 353 নম্বর , যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আইনী আদালতের মামলার মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করে সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি তারা একটি তুচ্ছ কিছু চুরি করে থাকে। একটি গাছের ডাল। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাচারকে একটি বড় পাপের ধ্বংসাত্মক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পবিত্র কুরআন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

"... সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"

এটা বোঝা জরুরী যে যে কোন সম্পদ বা অন্যান্য পার্থিব জিনিস যা হারাম উপায়ে অর্জিত হয় শুধুমাত্র তার বাহকের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে কেননা তারা ঐসব অবৈধভাবে অর্জিত জিনিসের সাথে যে সমস্ত ভাল কাজ করে তা মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উভয় জগতে তাদের পাপ এবং শাস্তি বৃদ্ধি, যদি তারা আন্তরিকভাবে তওবা করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন এবং ব্যবহার করা যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি একজনের উদ্দেশ্য। যদি একজনের ভিত্তি কলুষিত হয় তবে সেখান থেকে যা কিছু আসে তা কলুষিত হবে এবং তাই মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে, যদিও সেগুলি ভাল কাজই হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না ..."

উপরন্তু, সঠিক শব্দের প্রকৃত অর্থ হল আপনার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবেন না। এটি অন্য লোকেদের সম্পত্তির সাথে মিথস্ক্রিয়া করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যেন কেউ তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে। অর্থ, তারা যেভাবে মানুষের কাছে তাদের সম্পদকে সম্মান করতে চায়, একইভাবে তাদের উচিত অন্যের সম্পদকে সম্মান করা। তদ্ব্যতীত, এই আয়াতটি পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ অন্যের সম্পত্তির অপব্যবহার করে, তখন এটি কেবলমাত্র অন্য লোকদেরকে তাদের সম্পদ এবং অন্যের সম্পত্তির অপব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এটি শুধুমাত্র সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তারের দিকে পরিচালিত করে কারণ লোকেরা অন্যদের সাথে অন্যায় করার জন্য একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্যরা একইভাবে কাজ করছে তাদের আচরণ ন্যায়সঙ্গত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না..."

যেহেতু এই আয়াতে ব্যবহৃত সঠিক শব্দের অর্থ হল অন্যায়ভাবে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ গ্রাস না করা, তাই এই আয়াতের অর্থ হতে পারে যে কেউ তাদের সম্পদ যেমন ধন-সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যা ইসলামের অপছন্দনীয়, যেমন অযথা বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত বা অপচয় করা। . এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের পার্থিব জিনিসের অপব্যবহার করা, এমনকি যদি সেগুলি অসার উপায়ে ব্যবহার করা হয়, যা পাপ বলে বিবেচিত হয় না, তবে কেবল তাদের অবৈধ উপায়ে অপব্যবহার করার কাছাকাছি নিয়ে যায়। যেমন, যে অতিমাত্রায় ব্যয় করে সে সহজেই অপব্যয় হয়ে যায় যা সম্পূর্ণ। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

উপরন্তু, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া জাগতিক জিনিসগুলির অপব্যবহার করে, এমনকি নিরর্থক উপায়েও, যা পাপ বলে বিবেচিত হয় না, সে মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ এটি কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ তাদের দেওয়া জাগতিক জিনিসগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েতসমূহ। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মিথ্যাচার প্রায়ই ঘুষের সাথে হাত মিলিয়ে যায় এবং তাই আলোচনার মূল আয়াতের পরবর্তী অংশে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" *এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"*

জামে আত তিরমিযী, ১৩৩৭ নং হাদিসে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারীকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। অভিশাপ আল্লাহর রহমতকে দূর করে উঁচু, এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে, যার ফলস্বরূপ শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ, সমস্যা এবং অসুবিধা হতে পারে, এমনকি যদি এটি অভিশপ্ত ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়। ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া একমাত্র সময়ই গ্রহণযোগ্য হয় যখন কেউ যদি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে বা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে, অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর পড়ে যে অন্যদেরকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে। দুঃখজনকভাবে, মিথ্যাচার এবং ঘুষ উভয়ই অনেক মুসলিম দেশে একটি বিস্তৃত সমস্যা, কারণ তারা অজ্ঞতার কারণে এর গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করে। আগেই বলা হয়েছে, তারা এই বিশ্বাসের ভুল মনোভাব অবলম্বন করে যে, উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য তাদের শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অধিকার এবং তাঁর সাথে যুক্ত কর্তব্যগুলো পূরণ করতে হবে। উপরন্তু, লোকেরা প্রায়শই এই বড় পাপের সাথে অংশ নেয় কারণ তারা অন্য অনেককে তা করতে

দেখে। এটি আরেকটি খারাপ অজুহাত যা মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। অন্য অনেকে পাপ করার কারণে একজন ব্যক্তিকেও সেই পাপ করার ন্যায্যতা দেয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে এবং তাই একজনের উচিত হবে না অন্যের পাপ করার জন্য অন্ধভাবে অনুসরণ করা এবং তার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলা উচিত যাতে তারা সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং কাজগুলি সংশোধন করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, পরাক্রমশালী এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যার ফলে উভয় জগতে মানসিক শান্তি ও সাফল্য আসে এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটায়। এবং এই আচরণই ধার্মিকতার সারাংশ। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" *...অথবা শাসকদের কাছে পাঠান যাতে আপনি জানেন যে আপনি জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে গ্রাস করেন।"*

এটি জনস্বার্থের বিষয়ে কাকে সমর্থন করবে তা সতর্কতার সাথে বেছে নেওয়ার গুরুত্বও নির্দেশ করে, যেমন রাজনীতিবিদদের সমর্থন করা, এমন কাউকে সমর্থন

করা এড়াতে যে অন্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করে এবং জনগণের সম্পদের অপব্যবহার করে। দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের আচরণ বিশ্বে ব্যাপক এবং প্রতিটি দেশে পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিবিদরা জনগণের সম্পদের অপব্যবহার করেন এবং শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের মিত্রদের ধনী করার লক্ষ্য রাখেন যখন দেশের বাকি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলিমদের প্রায়ই রাজনৈতিক বিষয়ে অন্ধ আনুগত্যের কারণে যাদের সাথে তারা সংযুক্ত, যেমন আত্মীয়দের সমর্থন করার মনোভাব থাকে। এটা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যক্তিকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করে, তারা সমাজের মধ্যে ক্ষমতার পদে নির্বাচিত হলে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া মন্দের একটি অংশ পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 85:

"যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করবে তার একটি অংশ [অর্থাৎ, পুরস্কার] পাবে; আর যে কেউ মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে তার জন্য তা থেকে একটি অংশ [অর্থাৎ বোঝা] পাবে। আর সর্বদাই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে রক্ষক।"

যদিও একজন একক মুসলিম একটি দেশের সমগ্র রাজনৈতিক সংবিধানকে প্রভাবিত করতে পারে না কিন্তু আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, তারা রাজনৈতিকভাবে কাকে সমর্থন করবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সতর্ক থাকতে পারে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের গবেষণা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ অনুসারে জনসাধারণের বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করে। শুধুমাত্র যখন কেউ সঠিক ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার এই প্রচেষ্টা চালায় তখনই তারা উভয় জগতেই ভুল ব্যক্তিকে সমর্থন করার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। এটি 188 নং আয়াতের শেষ অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 189

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

"তারা আপনাকে (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এগুলি মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময়ের পরিমাপ।" আর গৃহে পিছন দিক থেকে প্রবেশ করা ধার্মিকতা নয়, ধার্মিকতা তার মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করে। এবং তাদের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

চাঁদের বিভিন্ন পর্যায় যুগে যুগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সব ধরনের কাল্পনিক ধারণা, কুসংস্কার এবং আচার-অনুষ্ঠান এর সাথে যুক্ত ছিল এবং আজও রয়েছে। চাঁদকে ভাল এবং খারাপ লক্ষণের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হত। চাঁদের উদয় ও অস্ত, তার বিভিন্ন পর্যায় এবং গ্রহন মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে বলে কিছু তারিখকে যাত্রা শুরু করার জন্য, নতুন কাজ শুরু করার জন্য, বিবাহ ইত্যাদির জন্য শুভ এবং অন্যগুলিকে অশুভ বলে মনে করা হয়েছিল। আরবদেরও এই ধরনের কুসংস্কারের অংশ ছিল। তাই, কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই কুসংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের এমনভাবে উত্তর দিয়ে তাদের মনোভাব সংশোধন করেছিলেন যা তাদের মনকে এমনভাবে প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ করেছিল যা উভয় জগতের সুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

“তারা আপনাকে (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এগুলি মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময়ের পরিমাপ।"..."

সমগ্র আরব আগে থেকেই অবগত ছিল যে চাঁদের পর্যায়গুলি সময় গণনা করার জন্য, অর্থ, মাসের দিনগুলি এবং বিশেষ করে তীর্থযাত্রার মরসুম নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে এবং ইসলামের আগমনের আগে থেকে এখনও তীর্থযাত্রার প্রচলন ছিল কিন্তু মানুষ এর প্রথা নষ্ট করে ফেলেছিল। মহান আল্লাহ তাদের স্বজ্ঞাত মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন, যা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের জন্য উপকারী হয়েছে, কুসংস্কারের মতো অর্থহীন জিনিসগুলিতে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে। এটি মূল আয়াতের শেষ দ্বারা আরও সমর্থিত যেখানে মহান আল্লাহ সরাসরি একটি কুসংস্কারের সমালোচনা করেছেন যা সাধারণত দেখা যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"... আর পেছন থেকে ঘরে প্রবেশ করা ধার্মিকতা নয়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মূল আয়াতের প্রথম অংশটি ইঙ্গিত করে যে একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াবে না, যার মধ্যে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শিক্ষায়। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদেরকে ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট বিষয় যেমন কুসংস্কারের বিষয়ে প্রশ্ন করা না হয়, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"তারা আপনাকে (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এগুলি মানুষের জন্য সময়ের পরিমাপ..."

আলোচ্য মূল আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু এই পৃথিবীতে মানুষের সময় খুবই সীমিত, তাই তাদের অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করতে হবে যা তাদের উভয় জগতের জন্য উপকারী হবে, যেমন উপকারী বিষয় নিয়ে গবেষণা করা। যে ব্যক্তি সময়ের গতিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় সে এর সঠিক ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে এবং তারা বরং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বিলম্ব করার অভ্যাস গ্রহণ করবে। এটি শুধুমাত্র তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"তারা আপনাকে (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এগুলি মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময়ের পরিমাপ।"..."

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের মনকে কোমলভাবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার গুরুত্ব বোঝার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি অন্যদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়ার

গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি কঠোরভাবে করা প্রায়ই একজনকে ভাল উপদেশ পালন করা থেকে বিরত রাখতে পারে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম অন্যদের কাছে ইসলামিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করে কিন্তু তা কঠোরভাবে করে, যা আল্লাহ, মহান ও মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক করে এবং ফলস্বরূপ তারা কেবল মানুষকে আরও ঠেলে দেয়। সঠিকভাবে ইসলাম চর্চা থেকে দূরে। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে, একজনকে অবশ্যই খাঁটি ইসলামী জ্ঞানের সাথে কোমল আচরণকে একত্রিত করতে হবে কারণ অন্যদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য উভয়েরই প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ অতঃপর নির্দেশনার দুটি উৎসের শিক্ষাকে কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করেন: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, কুসংস্কার বা অন্যান্য উত্স অনুসরণ না করে। ধর্মীয় জ্ঞান, যেহেতু এই সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করাই ধার্মিকতার সারাংশ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"...আর গৃহে পিছন দিক থেকে প্রবেশ করা ধার্মিকতা নয়, বরং ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করে। এবং তাদের দরজা থেকে ঘরে প্রবেশ কর..."

লোকেরা যখন তীর্থযাত্রীর রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তারা সামনের দরজা থেকে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করা এড়িয়ে চলত কারণ তারা এটিকে একটি অশুভ লক্ষণ

হিসাবে দেখেছিল। বরং তারা পেছন দিক থেকে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে। এটি সহীহ বুখারী, 1803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

189 নম্বর আয়াতের শেষে নির্দেশিত হিসাবে, নির্দেশনার দুটি উৎসকে মেনে চলা নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সত্য হল যে, একজন ব্যক্তি যত বেশি অন্যান্য অভ্যাস অনুসরণ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্স অনুসরণ করবে, এর ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"...আর গৃহে পিছন দিক থেকে প্রবেশ করা ধার্মিকতা নয়, বরং ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করে। এবং তাদের দরজা থেকে ঘরে প্রবেশ কর..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কুসংস্কারমূলক অভ্যাস এবং বিশ্বাসগুলিকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তারা এমন জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে, যেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। এই মনোভাবের মধ্যে কেউ যত গভীরে ডুব দেবে ততই তারা তাদের বিশ্বাস হারানোর কাছাকাছি আসবে, কারণ তারা আচার-অনুষ্ঠান করতে এবং এমন কিছু বিশ্বাস করতে উত্সাহিত হবে যা কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট অবিশ্বাসের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোন বস্তুর উপর অধিক আস্থা রাখবে, তার চেয়ে মহান আল্লাহ। তারা ধরে নেবে যে বস্তুটি তাদের সুরক্ষার উত্স এবং এটি ছাড়া তারা খারাপ জিনিস থেকে রক্ষা পাবে না। এমনকি যদি একজন মুসলিম মৌখিকভাবে এই ধারণার বিরোধিতা করে তবুও তাদের আচরণ স্পষ্টভাবে দেখাবে যে তারা এতে বিশ্বাসী। এই এবং অনুরূপ জিনিসগুলি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয় এবং তারা এটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে, এমনকি তারা বুঝতেও পারে না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাস এবং বিশ্বাস এমনকি একজনকে অন্যের প্রতি চরম বিকারগ্রস্ত হতে উৎসাহিত করে, যা শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের

অধিকার পূরণে বাধা দেয়। তদ্ব্যতীত, এই আচরণটি এমন শিল্পীদের জন্য দরজা খুলে দেয় যারা আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী হওয়ার ভান করে যারা পারিশ্রমিকের জন্য তাদের সমস্যার সমাধান করার দাবি করে। তাদের উপদেশের উপর কাজ করা শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে, যা উভয় জগতে আরও চাপ ও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়।

এই এবং অন্যান্য নেতিবাচক বিষয়গুলি এড়াতে একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং আমল করতে হবে, যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে কুসংস্কার ও বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সে বোঝে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মহাবিশ্বের মধ্যে কিছুই ঘটে না এবং তিনি যদি একজনকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করার জন্য বেছে নেন, তবে কিছুই বা কেউ তাকে সেই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। উপরন্তু, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র জড়িত প্রত্যেকের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ফলস্বরূপ, তারা প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। তাঁর উপর শান্তি ও

আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যা তাদেরকে উভয় জগতে অগণিত পুরস্কার এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং c hapter 39 Az Zumar, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

কিন্তু কেউ কেবলমাত্র কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস এবং তাদের নেতিবাচক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং আলোচিত সুবিধাগুলি অর্জন করতে পারে যখন তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

“... আর পিছন দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করা ধার্মিকতা নয়, বরং ধার্মিকতা তার মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করে। এবং তাদের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই শ্লোকটি অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় একজন ব্যক্তি প্রতারণামূলক আচরণ করার পরিবর্তে ধূর্ততার সাথে আচরণ করার পরিবর্তে, সোজা সামনে, পরিষ্কার এবং সৎ উপায়ে পরিস্থিতিতে প্রবেশের গুরুত্বকে নির্দেশ করতে পারে। পিছনের দরজাটি প্রায়শই এমন কাউকে বর্ণনা করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় যে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্যদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণ করে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই একটি সরল, স্পষ্ট এবং সৎ আচরণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হয়, যেভাবে প্রতারণামূলক আচরণ করে সে বাস্তবে। শুধুমাত্র নিজেদেরকে প্রতারণা করা, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ তারা নিঃসন্দেহে উভয় জগতে তাদের আচরণের পরিণতির মুখোমুখি হবে , কারণ তারা ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে পারবে না মহান আল্লাহর। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 189:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতের চূড়ান্ত বিবৃতিটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রকৃত সাফল্য, যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি লাভের সাথে জড়িত। এটি মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা আশীর্বাদ ব্যবহার করার অন্তর্ভুক্ত। এটা বুঝতে একটি প্রতিভা লাগে না যে সমস্ত ধরণের পার্থিব সাফল্য সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে যায় এবং তারা প্রায়শই এর বাহকের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। এটা খুবই সুস্পষ্ট যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং কিভাবে জাগতিক জিনিসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা দুঃখজনক জীবনযাপন করে যা মানসিক শান্তি সম্পূর্ণরূপে শূন্য। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, এবং সেইজন্য, তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং গ অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মানসিক প্রশান্তি লাভের শর্তটি সহজ এবং এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যদি কেউ মনের শান্তি পাওয়ার জন্য সেট করা এই সাধারণ শর্তটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে পারে তবে সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন মানসিক ব্যাধিতে পূর্ণ হবে, যেমন উদ্বেগ, চাপ এবং বিষণ্নতা। আবার, এটা স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে দেখেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 190-194

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

এবং তাদেরকে [যুদ্ধে] হত্যা কর যেখানেই তুমি তাদের পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাকে বহিষ্কার করেছে এবং ফিতনা [অত্যাচার] হত্যার চেয়েও জঘন্য। আর মসজিদুল হারামে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তাদেরকে হত্যা কর। কাফেরদের প্রতিদান এমনই।

আর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাদের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না [আর] ফিতনা [নিপীড়ন] না হয় এবং [যতক্ষণ না] দ্বীন [অর্থাৎ, উপাসনা] আল্লাহর জন্য [স্বীকৃত] হয়। কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোন আগ্রাসন [আক্রমণ] হবে না।

পবিত্র মাসে [যুদ্ধ] পবিত্র মাসে [আগ্রাসনের] জন্য এবং [সমস্ত] লঙ্ঘনের জন্য আইনী প্রতিশোধ। কাজেই যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে, তাকেও সেভাবে আঘাত কর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে।"

আমাকে পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থান দিতে হবে। অর্থ, কোনো আয়াত বা হাদিস যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে বা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে কারো কর্মকে সমর্থন করার জন্য নেওয়া যাবে না। আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষাপটকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের আলোকে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস কি বা কাদের নির্দেশ করে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উপরন্তু, মুসলমানরা কেবলমাত্র একজন বৈধ শাসকের পতাকায় বহিরাগত আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এবং যখন এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী করা হয়। যারা লড়াই করে তাদের অবশ্যই এই সীমা ও নিয়মগুলি অতিক্রম করার জন্য সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না।*"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 194:

“… সুতরাং যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাকেও সেভাবে আক্রমণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর..."

এই ধরনের একটি নিয়ম হল যুদ্ধের অবলম্বন করা যখন একজনকে আক্রমণ করা হয়, যেমনটি আলোচনা করা প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে..."*

অতএব, শান্তির অবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক আগ্রাসন দেখানো হারাম। আরেকটি নিয়ম হল, শত্রু যখন আগ্রাসন থেকে বিরত থাকে তখন মুসলমানদেরও অবশ্যই বিরত হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

"...কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া কোন আগ্রাসন [অর্থাৎ আক্রমণ] হবে না।"

শত্রু যদি চায় শান্তি এটা মঞ্জুর করা আবশ্যক. অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 90:

"...সুতরাং তারা যদি আপনার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং আপনার সাথে যুদ্ধ না করে এবং আপনাকে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য [যুদ্ধের] কারণ তৈরি করেননি।"

তৃতীয় নিয়ম হল বেসামরিকদের ক্ষতি করা যাবে না। এটি সীমালঙঘনকারী বলে আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বারবার যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের পাশাপাশি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ, 2614 নম্বর এবং মুসনাদে আহমদ, 2728 নম্বরে পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ফলধারী গাছ কাটা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33121 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কৃষকের মতো অ-সৈনিকদের ক্ষতি করবেন না। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33120 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সংঘাতের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা, সেক্ষেত্রে শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তা অবশ্যই তাদের দিতে হবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 60-61:

"এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়দৌড়ের প্রস্তুতি নাও যার দ্বারা আপনি আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রুকে ভয় দেখাতে পারেন... এবং যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে থাকে তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন..."

যারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তিকে সম্মান করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 12-13:

"এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথমবার তোমার উপর আক্রমণ শুরু করেছে?

যারা তাদের চুক্তিকে সম্মান করে তাদের আক্রমণ করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 7:

"... তাই যতক্ষণ তারা আপনার দিকে সরল, তাদের দিকে সোজা থাকুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র মুখে ও কাজের মাধ্যমে নয়, অন্তর থেকেও গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকে তাদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করতে হবে। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 8-9:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে নিষেধ করেন না যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না- তাদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের থেকে তোমাদের নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ ধর্মের এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করবে..."

যুদ্ধ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ঘৃণ্য, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এতে বাধ্য করা উচিত যখন এটি কামনা না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণাজনক..."

আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা এটি আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে কারণ আল্লাহ, মহান, তাঁর দুটি ঐশ্বরিক গুণের উল্লেখ করেছেন যে দুটিই তাঁর করুণা ও শান্তির সাথে যুক্ত, যথা, ক্ষমাশীল এবং দয়াময়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 192:

"আর যদি তারা থেমে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই স্বর্গীয় গুণাবলীর পরিবর্তে তাঁর ক্ষমতা এবং শক্তির ঐশ্বরিক গুণাবলী উল্লেখ করতে বেছে নিয়েছিলেন যে শান্তি ও নিরাপত্তা মানবজাতির জন্য তিনি পছন্দ করেন।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদেরকে মহান

আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হলে তাদের অবিচল থাকতে হবে। এটি সহীহ বুখারী, 2966 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলির আসল উদ্দেশ্য হল জোর দেওয়া যে বলপ্রয়োগ করা উচিত তখনই যখন এর ব্যবহার অনিবার্য, কেবলমাত্র সেই পরিমাণে যা একেবারে প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের অধীনে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর

আগেই বলা হয়েছে, কে, কী এবং কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য একটি আয়াত বা হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা জরুরী। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, এভাবে যুদ্ধ করার বিষয়ে আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল একটি আয়াত যাকে তরবারি পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও পবিত্র কুরআনে "তলোয়ার" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙ্ঘনীয় মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং অতর্কিত অবস্থানে তাদের জন্য অপেক্ষা কর।

যেমনটি আগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমনকি যুদ্ধের এই বিবৃতিটি নির্দিষ্ট শর্ত এবং শান্তির ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি নয়। অর্থ, আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট দলকে বোঝায়।

তরবারি আয়াতের আশেপাশের আয়াতগুলি একাধিক অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র তারাই যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বারবার লঙ্ঘন করেছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসনের কাজে লিপ্ত ছিল। এবং তার মিত্ররা। উদাহরণস্বরূপ, তলোয়ার আয়াতের ঠিক আগের আয়াতটি, অর্থ, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 4, বলে:

"তারা ব্যতীত যাদের সাথে তুমি মুশরিকদের মধ্যে চুক্তি করেছিলে অতঃপর তারা তোমার প্রতি কোন ত্রুটি করেনি বা তোমার বিরুদ্ধে কাউকে সমর্থন করেনি; সুতরাং তাদের জন্য তাদের চুক্তি সম্পূর্ণ করুন যতক্ষণ না তাদের মেয়াদ শেষ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এটি একটি সম্পর্কিত আয়াতে আরেকটি আদেশ অনুসরণ করে, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 7:

“মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে চুক্তি কিভাবে হতে পারে, যাদের সাথে তোমরা আল-মসজিদ আল-হারামে চুক্তি করেছিলে? তাই যতক্ষণ তারা তোমার দিকে সোজা থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রতি সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এই মুশরিকদের অপরাধ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 8-10:

“কিভাবে [একটি চুক্তি হতে পারে] যখন তারা আপনার উপর আধিপত্য অর্জন করে তবে তারা আপনার সম্পর্কে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না? তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর [অনুগত্য] অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শন বিনিময় করেছে এবং [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা যা করত তা ছিল মন্দ। তারা একজন বিশ্বাসীর প্রতি আত্মীয়তার কোনো চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 12-13:

“এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে।

আপনি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা প্রথমবার আপনার উপর [আক্রমণ] শুরু করেছে?

থিসিস নির্দিষ্ট মুশরিকরা ক্রমাগত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সহায়তা করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, মক্কা ও মসজিদ আল হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে। উদ্ধৃত আয়াতে অন্তত আটবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায় 9 তওবাহ, আয়াত 12, যা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, "অবিশ্বাসের নেতাদের" সাথে লড়াই করার লক্ষ্য তাই তারা তাদের আগ্রাসন থেকে "বন্ধ" হয়ে যায়। এই আয়াতগুলি, বাকিদের মতো, যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট শর্তগুলি মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেমন শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করা যারা প্রথমে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

উপরন্তু, এই মুশরিকদের এখনও অনেক সতর্কতা এবং ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাদের চার মাসের অবকাশ ও শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 2:

"অতএব, [হে কাফেররা], চার মাস দেশে অবাধে ভ্রমণ কর, কিন্তু জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না..."

এবং অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙঘনীয় [চার] মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য অতর্কিত অবস্থানে বসে থাক..."

এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে এই মুশরিকদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যারা এটি অনুরোধ করেছিল যাতে তারা কোনও ভয় বা চাপ ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ পায় বা তারা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় ছাড়াই আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 6:

"এবং যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে [অর্থাৎ কুরআন]। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"

এই মুশরিকদের যুদ্ধ ও হত্যার তরবারি আয়াতের নির্দেশ তখনই কার্যকর হবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে চার মাসের অবকাশের পর আরব উপদ্বীপে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, অনেক মুশরিক এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অবকাশের কারণে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তরবারি আয়াতের কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন রক্তপাত হয়নি, কারণ এই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আরও রক্তপাত থেকে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করা অর্থ, হয় এই মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে বা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। .

উপসংহারে, আশেপাশের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন, তরবারি আয়াতটিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে রাখুন। অর্থ, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শত্রু মুশরিকদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তারা তাদের পরে অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“ *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলাম ভারসাম্যের ধর্ম হওয়ায় এটি আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করে না এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে

অত্যন্ত নম্র ও দুর্বল মনোভাবেরও পরামর্শ দেয় না। সকল মানুষেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে, তাদের পরিবার ও সম্পত্তির অধিকার আছে কিন্তু তা অবশ্যই সীমার মধ্যে হতে হবে। দুঃখজনকভাবে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যা অনেক সরকারই উপেক্ষা করে যারা আত্মরক্ষা এবং ন্যায্য প্রতিশোধের নামে নিরপরাধ মানুষকে লক্ষ্য করে। আগ্রাসীরা শুধুমাত্র এমনভাবে লক্ষ্যবস্তু হতে হবে যেভাবে তারা প্রাথমিকভাবে আক্রমণ করেছিল। আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, কেউ যদি ন্যায্য প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম করে, তবে তাকে অন্যায়কারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে। এই অন্যায়কারীরা ভালভাবে দেখতে পাবে যে বিচারের দিনে, যখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা তাদের ভাল কাজগুলি যাদের বিরুদ্ধে তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে। এবং যদি প্রয়োজন হয়, এই অন্যায়কারীরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের পাপ নিতে বাধ্য হবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 194:

"... *সুতরাং যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাকেও সেভাবে আক্রমণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর..."*

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

সীমালঙ্ঘনের আরেকটি দিক হল যখন কেউ ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জনের মতো ভুল কারণে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যেমন মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

" *তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না [আর] ফিতনা [নিপীড়ন] না হয় এবং [যতক্ষণ না] দ্বীন [অর্থাৎ ইবাদত] আল্লাহর জন্য [স্বীকৃত] হয়। কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনো আগ্রাসন [আক্রমণ] হবে না।*"

যেমনটি আজ সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা পার্থিব কারণে যুদ্ধ করে তারা প্রায়ই ন্যায্য প্রতিশোধের সীমা লঙ্ঘন করে, এমনকি যদি তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, কারণ তাদের একমাত্র স্বার্থ ক্ষমতা এবং সম্পদ অর্জন করা। যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছে, তারা কখনই ন্যায্য প্রতিশোধের সীমা লঙ্ঘন করেনি কারণ তারা জানত যে এই সীমা লঙ্ঘন করা মহান আল্লাহ কর্তৃক সমালোচিত হয়। ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা স্পষ্ট।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“ আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

এই আদেশের মধ্যে সেই সমস্ত শক্তির সাথে একজনের আধ্যাত্মিক লড়াইও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তাদের আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, যেমন শয়তান, তাদের ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য লোকেদের। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সংগ্রামই ইসলামের শত্রুদের সাথে শারীরিকভাবে লড়াই করার চেয়েও বড়, কারণ এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামটি শারীরিকভাবে লড়াইয়ের বিপরীতে অবিরামভাবে ঘটে। এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে। এতে আলোচনা করা সুস্পষ্ট প্রমাণ বোঝার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে তা নিশ্চিত করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে অন্যান্য জিনিসের বিরোধিতার মুখেও ইসলামি শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি তাদের মুখের বিরোধিতা দ্বারা পরাস্ত হবে এবং তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহারে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ হবে। যেহেতু আল্লাহ, মহান, একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কিন্তু আয়াত 190 এর শেষের দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে নির্দেশনার দুটি উত্সের শিক্ষা অনুসারে: পবিত্র

কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যদিও এটি ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই পদ্ধতিতে কাজ করা এক প্রকার সীমালংঘন, মহান আল্লাহ সমালোচনা করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

যথারীতি, মহান আল্লাহ সর্বদা আন্তরিক অনুতাপ ও সংস্কারের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখেন, এমনকি যারা সঠিক আচরণের সীমা লঙঘন করেছে তাদের জন্যও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 192:

" *এবং যদি তারা বিরত হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"*

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

" *তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না [আর] ফিতনা [নিপীড়ন] না হয় এবং [যতক্ষণ না] দ্বীন [অর্থাৎ ইবাদত] আল্লাহর জন্য [স্বীকৃত] হয়। কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনো আগ্রাসন [আক্রমণ] হবে না।*"

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যদিও নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট কারণে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তবুও মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর উপর এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, শত্রুরা বিরত থাকলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুন এবং যদি তারা শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে তবেই যুদ্ধ চালিয়ে যান। সুতরাং, যেহেতু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ হল একজন মুসলমানের সাধারণ আচরণ অবশ্যই শান্তির হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নং হাদিসে প্রাপ্ত উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন সেই

ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। . উপরন্তু, যদিও মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অনেক নৃশংসতা করেছে, তবুও তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা এবং তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা এবং তাঁর সাহাবীদের উপর নৃশংসতা চালানো, আল্লাহ খুশি হতে পারেন। যাদেরকে তাদের বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন করা হয়েছিল এমনকি হত্যা করা হয়েছিল, তখনও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও করুণা প্রসারিত করেছিলেন। এটি বিশ্বের সাথে ইসলামের আচরণবিধি। তাই শান্তি বা যুদ্ধের সময় সকল মুসলমানদের দ্বারা প্রদর্শিত আচরণ হতে হবে। তাই আচরণের সাধারণ মানদণ্ড থেকে চরম এবং বিরল পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যাবশ্যক কারণ বিপথগামী লোকেরা প্রায়শই ইসলামকে একটি সহিংস ধর্ম দেখানোর জন্য দুটিকে মিশ্রিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 191-193:

“ *এবং যেখানেই তাদের পাকড়াও [যুদ্ধে] তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাকে বহিষ্কার করেছে সেখান থেকে তাদের বের করে দাও এবং ফিতনা [অত্যাচার] হত্যার চেয়েও জঘন্য। আর মসজিদুল হারামে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তাদেরকে হত্যা কর। কাফেরদের প্রতিদান এমনই। আর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাদের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না [আর] ফিতনা [নিপীড়ন] না হয় এবং [যতক্ষণ না] দ্বীন [অর্থাৎ, উপাসনা] আল্লাহর জন্য [স্বীকৃত] হয়। কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনো আগ্রাসন [আক্রমণ] হবে না।"*

এই আয়াতগুলির দুর্নীতি ইসলামের শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট নিপীড়নের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবকে বোঝায়, অর্থাত্ মক্কার অমুসলিমরা। এই দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাদের বিপথগামী বিশ্বাস এবং তাদের গোত্রের প্রতি আনুগত্য, সম্পদ, সংস্কৃতি এবং মিথ্যা দেবতার প্রতি ভালবাসা। নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট দুর্নীতি আরও প্রমাণ করে যে, মক্কায় অমুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই আয়াতগুলো অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 217:

"... বলুন, "এতে যুদ্ধ করা মহা [পাপ], কিন্তু [মানুষকে] আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা এবং আল-মসজিদ আল-হারামে [প্রবেশে বাধা দেওয়া] এবং সেখান থেকে সেখানকার লোকদের বহিষ্কার করা আরও বড় [পাপ]।] আল্লাহর কাছে ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।"

অতএব, এই আয়াতে দুর্নীতি বলতে নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীকে হয়রানি এবং ভয় দেখানো হয়, কারণ তারা বর্তমানে ধারণকৃত ধারণাগুলির বিপরীত ধারণার একটি সেট গ্রহণ করেছে এবং যা প্রচার করে সমাজের বিদ্যমান শৃঙ্খলায় সংস্কার কার্যকর করার চেষ্টা করছে। ভাল এবং খারাপ কি নিষেধ. অতএব, এই দুর্নীতির দ্বারা নিরপরাধ মানুষের এই সুনির্দিষ্ট ক্ষতি রোধ করার একমাত্র উপায় ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যতক্ষণ না বিরোধিতা ছাড়াই ইসলামকে প্রকাশ্যে চর্চার অনুমতি দেওয়া হয় এবং অমুসলিমদের দ্বারা সমাজের ক্ষতিকারক ক্ষতি বন্ধ না হয়।

আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলিতে এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধবিরতি শব্দটি তাদের বিপথগামী ধর্ম থেকে বিরত না হওয়াকে বোঝায় কারণ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না কারণ এটি কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নয় হৃদয়ের বিষয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে রোমান ও পারস্যের মতো অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপক নিপীড়ন ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল। তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা দেশের মানুষের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করত। এই লোকদের সাথে লড়াই করার ফলে সৈন্যদের হত্যা হতে পারে, সৈন্যরা যারা যুদ্ধ করে মারা যাওয়ার জন্য সাইন আপ করেছিল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি নিরীহ নাগরিকদের উপর যে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল তা দূর করে। আর যদি ইসলামি শাসন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমনটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরবর্তী সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফাদের সময়, তাহলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়ন সৈন্য হত্যার চেয়েও জঘন্য, যদি তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 194:

“ [যুদ্ধ] পবিত্র মাসে [আগ্রাসন] পবিত্র মাসে, এবং [সমস্ত] লঙ্ঘনের জন্য আইনী প্রতিশোধ। কাজেই যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে, তাকেও সেভাবে আঘাত কর। আর আল্লাহকে ভয় কর..."

বছরের চারটি পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা ইসলামের আগমনের আগেও নিষিদ্ধ ছিল (এই মাসগুলি ছিল: যুল আল কাদাহ, যুল আল হিজ্জাহ, মহররম এবং রজব)। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে প্রয়োজন দেখা দিলে এটি কাউকে আত্মরক্ষা করতে বাধা দেবে না। এটি আবার ন্যায্য প্রতিশোধের সীমানার মধ্যে শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় লড়াইয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে। আইনি প্রতিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ন্যায্য ধারণা কারণ সমস্ত মানুষের অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। উপরন্তু, যদি আইনী প্রতিশোধ আইনানুগ না হয়, তাহলে অনেক অন্যায়কারী নিরপরাধ লোকদের সুবিধা নেবে, তাদের বিশ্বাস তাদের আত্মরক্ষা করতে বাধা দেয়। এর ফলে সমাজে আরও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে। আইনানুগ প্রতিশোধ ছাড়া, যারা তাদের প্রতি অন্যায় করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রতিশোধ নেওয়ার লোকদের দেখে যারা সাধারণত নিরুৎসাহিত হবে তারা নিরুৎসাহিত হবে না এবং পরিবর্তে সমাজে অন্য অন্যায়কারীদের সাথে যোগ দিতে উত্সাহিত হবে। এতে সমাজের অভ্যন্তরে দুর্নীতি বাড়বে। আইনি প্রতিশোধ ছাড়া, অনেক ভুক্তভোগী আইন নিজের হাতে তুলে নেবে কারণ তারা বিশ্বাস করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি আবার সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অপরাধের বিস্তার বাড়ায়। একজনকে কেবল সেই দেশগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা ধর্ষণ এবং হত্যার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে নরম আইন আরোপ করে এবং কীভাবে তাদের নরম আইন অন্যদের এই অপরাধগুলি থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ এই অপরাধগুলি তাদের সমাজ জুড়ে বাড়ছে। আইনী প্রতিশোধের লক্ষ্য হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আরও অপরাধের বিস্তার রোধ করা, অন্যথায় বিশ্বাস করা কেবল নির্বোধ।

কিন্তু এমনকি আইনি প্রতিশোধের ক্ষেত্রেও, মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ক্রমাগত ভয় করতে উত্সাহিত করা হয়েছে, যাতে তারা ন্যায্য প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম না করে এবং যাতে তারা দয়ালু অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত হয়। এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাশীল মনোভাব, যতক্ষণ না এটি তাদের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় বাড়াতে উত্সাহিত না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 194:

"… *সুতরাং যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাকেও সেভাবে আক্রমণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে।"*

যারা তাদের সামাজিক শক্তির মতো ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে থাকে, তারা মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনে ধন্য হবে। এই সমর্থন নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে, এমনকি যদি তারা অসুবিধা এবং নিপীড়নের মুহুর্তের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"… তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যেমন তাদের সামাজিক শক্তি, তারা দেখতে পাবে যে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন হারাবে। এটি কেবল উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী বলে মনে হয়, কারণ মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্বের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 42:

" আর কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি কেবল তাদের [অর্থাৎ তাদের হিসাব] সেই দিনের জন্য বিলম্বিত করেন যেদিন চোখ [ভয়ঙ্করে] তাকাবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 194:

"... *এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে।"*

এই বাস্তবতা বোঝার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে একজন ব্যক্তি ঈমানে দৃঢ় হয়। একজনের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তারা তত বেশি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এই মহান আল্লাহকে ভয় করার সারমর্ম এবং ন্যায়পরায়ণতা যা তাঁর সঙ্গ এবং অবিরাম সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 194:

"... *এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে।*"

অথচ ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতাই কেবল দুর্বল ঈমানকে গ্রহণ করে। দুর্বল বিশ্বাস একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, যার ফলে উভয় জগতে সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেয়, কারণ এই ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং তাদের জীবনের সমস্ত দিকের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"*সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।*"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপসংহারে বলা যায়, মূল আয়াতগুলোকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করা হলে সত্যটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ, মহান ও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশিত বিধি-বিধান মেনে আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার কিছু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই আয়াতগুলিকে কেন্দ্রবিন্দু এবং পবিত্র তীর্থযাত্রার পরিবর্তনের আলোচনা থেকে অনুসরণ করা হয়েছে, যা সবই মক্কার সাথে যুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 144:

"...সুতরাং তোমার মুখ [অর্থাৎ, নিজেকে] আল-মসজিদ আল-হারামের দিকে ঘুরিয়ে দাও। আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যেখানেই থাকো না কেন, তার দিকে [অর্থাৎ নিজেদের] মুখ ফিরিয়ে নাও [প্রার্থনায়]..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 189:

"তারা আপনাকে (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এগুলো হল...হজের জন্য সময়ের পরিমাপ।"..."

এছাড়াও, আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে, যে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মক্কার সাথে সম্পর্কিত এবং অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে বহিষ্কার করেছিলেন। তাদের সাথে, মক্কা থেকে। অতএব, এই আয়াতগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট কারণে আত্মরক্ষার জন্য এবং জমিতে দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিস্তার রোধ করার জন্য যুদ্ধকে নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা বর্ণিত নিয়মের সেট।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 195

"আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের [নিজের] হাতে [নিজেদের] ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আর ভালো কাজ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

যেহেতু এই আয়াতটি আত্মরক্ষার গুরুত্ব এবং সমাজের অভ্যন্তরে নিপীড়ন দূর করার বিষয়ে আলোচনা করার পরে এসেছে, এমনকি কঠোর নির্দেশনার অধীনে শারীরিক শক্তি দ্বারাও, মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি তাদের নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একজনকে তাদের প্রচেষ্টা, শক্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

" *এবং আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং [নিজেদের] নিজ হাতে [নিজেদের] ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।*

এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সমাজের মধ্যে থেকে নিপীড়ক উপাদানগুলিকে সক্রিয়ভাবে অপসারণে দৃঢ় থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মূল আয়াতটি মুসলমানদেরকে সর্বদা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এটি একাই উভয় জগতে তাদের জন্য ধ্বংস প্রতিরোধ করবে, যেমন তারা উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি পাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

" *এবং আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং [নিজেদের] নিজ হাতে [নিজেদের] ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।*

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে কাজ করতে হবে কারণ এটি তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে,

জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই রোগী যেভাবে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে যাতে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু একজন মূর্খ রোগী যেভাবে তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা উপদেশ উপেক্ষা করে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এই বাস্তবতা তখন সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ও প্রভাবশালীদের লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং এর ফলে কীভাবে তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ডুবে যায়, যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা , মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি তারা কিছু মুহূর্ত অনুভব করলেও মজা এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

" *এবং আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং [নিজেদের] নিজ হাতে [নিজেদের] ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।*

এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকেও দূর করে যার মাধ্যমে কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং তবুও আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতে আশীর্বাদ করবেন। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা, যেমনটি এই আয়াত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, যখন কেউ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে এবং তারপর উভয় জগতের আশীর্বাদ ও মুক্তির আশা করে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসেও এই পার্থক্যটি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, যা কল্যাণের সারাংশ এবং তাই ঐশ্বরিক ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

“… এবং ভালো কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।”

যেহেতু ভাল করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি, তাই এটি নির্দেশ করে যে প্রত্যেকের, যতই পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা নির্বিশেষে, সেই ভাল করার ক্ষমতা রয়েছে যা ঐশ্বরিক আনন্দের দিকে পরিচালিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু না কিছু দেওয়া হয়েছে, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি বা কথা বলার ক্ষমতা, যা তারা সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে পারে, এই আয়াতটি পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

“… এবং ভালো কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।”

যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক আনন্দ ও প্রেম লাভ করে, সে নিঃসন্দেহে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে, যদিও তারা তাদের জীবনে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে ঐশ্বরিক আনন্দ এবং ভালবাসার অর্থ এই নয় যে এই পৃথিবীতে একজনকে পরীক্ষা করা হবে না, কারণ এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরীক্ষা করা। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

সমস্ত অসুবিধা এবং পরীক্ষা থেকে মুক্তি শুধুমাত্র জান্নাতে পাওয়া যায়। ঐশ্বরিক আনন্দ এবং ভালবাসা পরিবর্তে নিশ্চিত করবে যে কেউ কঠিন সময়েও মানসিক শান্তি অনুভব করতে পারে, ঠিক যেমন পবিত্র নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর মতো, যিনি একটি মহান আগুনের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও মানসিক ও শরীরের শান্তি প্রদান করেছিলেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

"তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমার দেবতাদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

এটি ঠিক সেই রোগীর মতো যারা অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে একটি বেদনাদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যায় যাতে তারা কোনও ব্যথা অনুভব না করে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, কঠিন সময় হোক বা স্বাচ্ছন্দ্য, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। এই সাফল্যের মূল হল পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করার উপর অটল থাকা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

“… তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

“… এবং ভালো কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।”

এটি আরও প্রমাণ যে কেউ ভাল কাজ করে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত না করে ঐশ্বরিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। সুতরাং, এটি বিভ্রান্তিকর মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করে যেখানে কেউ বিশ্বাস করে যে মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় সে ঐশ্বরিক আনন্দ লাভ করবে না যার অর্থ তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে না। এটিই প্রধান কারণ যে লোকেরা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে কিন্তু তাদের কর্মে তা দেখাতে ব্যর্থ হয় তারা সবসময় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ডুবে থাকে, যেমন উদ্বেগ এবং হতাশা, কারণ তারা তাদের কর্মের সাথে মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, এমনকি যদি তারা তাদের

বিশ্বাসের ঘোষণার মাধ্যমে তাকে মৌখিকভাবে স্মরণ করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 196-203

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ
مَحِلَّهُۥ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ
فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى
ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ
يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ
عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

"আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি আপনাকে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে [অফার] কোরবানির পশু দিয়ে সহজে কী পাওয়া যায়। আর কোরবানির পশু যবেহ করার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবেন না। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা মাথার রোগ আছে সে [তিন দিন] রোযার মুক্তিপণ বা দান বা কুরবানী করবে। এবং যখন আপনি নিরাপদ থাকবেন, তখন যে ব্যক্তি [হজের মাসগুলিতে] ওমরাহ করবে এবং হজ্জ করবে [অফার করবে] সে কোরবানির পশুর সহজে যা পেতে পারে। এবং যে ব্যক্তি [অথবা এমন একটি প্রাণীর সামর্থ্য] খুঁজে পায় না - তাহলে হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন আপনি [বাড়ি] ফিরে আসবেন তখন সাত দিন। সেগুলি দশটি সম্পূর্ণ [দিন]। এটি তাদের জন্য যাদের পরিবার আল-মসজিদ আল-হারাম এলাকায় নেই। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

হজ হল সুপরিচিত মাস, সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে [ইহরাম অবস্থায় প্রবেশ করে] নিজের উপর হজ ফরজ করেছে, হজ্জের সময় তার জন্য কোন যৌন

সম্পর্ক নেই, কোন অবাধ্যতা এবং বিবাদ নেই। আর তুমি যে ভালো কাজ কর না কেন- আল্লাহ তা জানেন। আর রিযিক গ্রহণ কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা। হে বুদ্ধিমানগণ, আমাকে ভয় কর।

আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে [হজ্জের সময়] অনুগ্রহ চাওয়ায় আপনার কোন দোষ নেই। কিন্তু যখন তুমি আরাফাত থেকে বের হও, তখন আল-মাশআর-আল-হারামে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তাকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, কারণ এর আগে তুমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

অতঃপর যেখান থেকে [সকল] লোকেরা চলে যায় সেখান থেকে চলে যান এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আর যখন তোমরা তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্মরণ করত অথবা তার চেয়েও অধিক স্মরণ কর। আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, 'আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও' এবং আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই।

কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

তারা যা অর্জন করেছে তার অংশ পাবে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আর [নির্দিষ্ট] নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যে [তার প্রস্থান] ত্বরান্বিত করে, তার কোন পাপ নেই; এবং যে ব্যক্তি [তৃতীয় পর্যন্ত] বিলম্ব করে - তার জন্য কোন পাপ নেই - যে আল্লাহকে ভয় করে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।"

পবিত্র তীর্থযাত্রা বা জিয়ারত করার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করার জন্য লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এই আয়াতগুলি শুরু হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

" *আর আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাহ পূর্ণ কর...*"

এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পবিত্র যাত্রাগুলি সম্পাদন করা জড়িত, উদ্দেশ্য যে তারা অতীতে যে কোনো পাপ করে থাকে তার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হলে আরও ভাল পরিবর্তন করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কারণ এই পবিত্র যাত্রার উদ্দেশ্য হল একজন ব্যক্তিকে বিচার দিবসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেখানে সমগ্র মানবজাতি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ, সংযোগ এবং সম্পর্ক রেখে যাবে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের অপেক্ষায় একত্রিত হবে। এই অভিপ্রায়ের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি যখন বাড়িতে ফিরে আসবে তখন তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য আরও বেশি শক্তি ও সময় নিবেদন করবে, যাতে তারা আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে। তারা সঠিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে. এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারী, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, তারা অবশ্যই পর্যটনের স্বার্থে এই পবিত্র যাত্রাগুলি সম্পাদন করবে না, অন্যথায় তারা যে পুরস্কার পাওয়া উচিত তা তারা পাবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

" *আর আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাহ পূর্ণ কর...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে তাদের সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থ, তাদের কথাবার্তা বা কাজগুলো পার্থিব বিষয় যেমন হালাল সম্পদ উপার্জন বা নামাযের মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হোক না কেন, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের অবশ্যই কথা ও কাজ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সৎ নিয়ত অবলম্বন করে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে, ততক্ষণ তারা সওয়াব পাবে, যদিও তারা তাদের সন্তানদের লালন-পালনের মতো পার্থিব কাজ করে থাকে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে কেউ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের আশা বা আশা করে না। একটি ইতিবাচক অভিপ্রায় একজনকে উভয় জগতে পুরষ্কার অর্জন নিশ্চিত করে এবং মানুষের স্বার্থে অভিনয়ের সাথে যুক্ত তিক্ততা এড়িয়ে যায়, যারা অন্যের প্রচেষ্টায় কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এটা মনে রাখা অতীব জরুরী যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোনো কারণে কাজ করে, সে ইহকাল বা পরকালে কোনো পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ অতঃপর পবিত্র তীর্থযাত্রা ও জিয়ারত করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মের রূপরেখা দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

"... কিন্তু যদি আপনি বাধা দেন, তাহলে [অফার] কোরবানির পশু দিয়ে সহজে কী পাওয়া যায়। আর কোরবানির পশু যবেহ করার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবেন না। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা মাথার রোগ আছে সে [তিন দিন] রোযার মুক্তিপণ বা দান বা কুরবানী করবে। এবং যখন আপনি নিরাপদ থাকবেন, তখন যে ব্যক্তি [হজের মাসগুলিতে] ওমরাহ করবে এবং হজ্জ করবে [অফার করবে] সে কোরবানির পশুর সহজে যা পেতে পারে। এবং যে ব্যক্তি [অথবা এমন একটি প্রাণীর সামর্থ্য] খুঁজে পায় না - তাহলে হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন আপনি [বাড়ি] ফিরে আসবেন তখন সাত দিন। সেগুলি দশটি সম্পূর্ণ [দিন]। এটি তাদের জন্য যাদের পরিবার আল-মসজিদ আল-হারাম এলাকায় নেই..."

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে সন্ধি করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন, যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অনুগ্রহ করে বলে মনে হয়। মক্কার অমুসলিমরা। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট, চুক্তির অংশ ছিল (ওমরা) না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। দশ বছরের শান্তির এই চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে, যখনই মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে মিলিত হত তখন প্রায়শই এটি কোনও না কোনও যুদ্ধের দিকে

পরিচালিত করত কিন্তু যখনই এই লোকেরা মিলিত হত তখনই যুদ্ধ শেষ হয়। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আবির্ভাবের পর থেকে 18 বছরের কাছাকাছি সময়ে আগের সব বছরের তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে অনেক বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। এই সুস্পষ্ট বিজয় মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অধ্যায় 48 আল-ফাত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 231-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, যথারীতি, মহান আল্লাহ সর্বদাই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষকে ছাড় দিয়ে তাদের জন্য সহজ করে তোলার লক্ষ্য রাখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্য সহজ করতে চান তবে তিনি তাদের উপর কোন

বিধিনিষেধ আরোপ করবেন না এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে তাদের অনুমতি দেবেন। এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস কারণ মহান আল্লাহ জানেন একজন ব্যক্তির মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য কোনটি সর্বোত্তম এবং তাই তিনি সেই অনুযায়ী পরামর্শ দেন। যেমন একজন ভালো ডাক্তার তেতো ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা লিখে দেন যে এটি তাদের রোগীর জন্য সর্বোত্তম, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেন কারণ এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। ডাক্তাররা তাদের পরামর্শ দিয়ে ভুল করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ যেমন সব কিছু জানেন, তাঁর আদেশ ও নিষেধ সব ভুল থেকে মুক্ত। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্বাস করতে পারে যা প্রায়শই একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীত হয়, যেমন একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনার পরামর্শ দেওয়া, তবুও তারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না, যিনি সবকিছু জানেন।

যখনই মহান আল্লাহ, কোন আচরণবিধির রূপরেখা দেন, তিনি প্রায়শই লোকেদেরকে তাঁকে ভয় করতে এবং তাঁর অবাধ্যতার পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে এটি সমর্থন করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

"... এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

কারণ সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি বিস্তার নিশ্চিত করতে দুটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমটি হল একটি ভাল এবং নিরপেক্ষ আচরণবিধি, এমন কিছু যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে, কারণ মানবসৃষ্ট আইন সর্বদা অপূর্ণ থাকবে, জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণে, এবং তারা সর্বদা কোনো না কোনোভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবে। বা অন্য দ্বিতীয় বিষয় হল মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজের

কর্ম ও পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া। দ্বিতীয় উপাদানটি অত্যাবশ্যক কারণ যিনি মনে করেন যে তারা আইন থেকে পালাতে পারে, যেমন পুলিশ, আইন ভঙ্গ করতে প্রলুব্ধ ও উৎসাহিত হবে। অতএব, মহান আল্লাহর ভয় প্রয়োজন কারণ এটি এই ব্যক্তিকে আইন ভঙ্গ করা এবং অন্যদের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা সরকার থেকে পালাতে পারবে। যখন এই দুটি উপাদানের একটি বা উভয়টি অনুপস্থিত থাকে, তখন এটি সর্বদা একটি সমাজকে ন্যায়বিচার ও শান্তি অর্জনে বাধা দেয়। আজকের বিশ্বকে দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

"... এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহি করা। এটি কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

"... এবং জেনে রেখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

মহান আল্লাহকে অমান্য করার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। লোকেরা প্রায়শই প্রতারিত হয় যে তারা অবিলম্বে শাস্তি পায় না এবং এমনভাবে যা তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যখনই তারা মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়। এই দিনে এবং যুগে মহান আল্লাহর শাস্তিগুলি প্রায়শই খুব সূক্ষ্ম, যেমন অনেক পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্য। অতএব, অজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শই তাদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার এবং তারা এই পৃথিবীতে যে শাস্তির মুখোমুখি হয় তা জড়িত। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যা কিছু পাওয়া যায়, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এটিই প্রধান কারণ যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা প্রায়শই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ডুবে থাকে, যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা, পদার্থের অপব্যবহার এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, যদিও তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী এবং মজা ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে, তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, মানসিক শান্তির আবাস এবং তাদের শাস্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার গভীরে ডুবে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এই শাস্তিটি পুরানো জাতিদের শাস্তির চেয়েও খারাপ, যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কারণ এই ধরনের শাস্তি দ্রুত এবং সূক্ষ্মের তুলনায় এক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হয়। যা দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনের মতো। অতএব, মহান আল্লাহ তায়ালার সূক্ষ্ম শাস্তি বুঝতে ও এড়ানোর জন্য একজনকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 196:

"... এবং জেনে রেখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

মহান আল্লাহ, তারপর পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্বের রূপরেখা দেন যাতে তারা উভয় জগতেই এর থেকে উপকৃত হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

" *হজ্জ হল সুপরিচিত মাস, সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে [ইহরাম অবস্থায়] হজ ফরয করে ফেলেছে, হজ্জের সময় [তার জন্য] কোন যৌন সম্পর্ক নেই, কোন অবাধ্যতা এবং কোন বিবাদ নেই..*"

যে ব্যক্তি এই শর্তগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পবিত্র তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য পূরণ করবে না এবং তাই তার পূর্ববর্তী পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং ভবিষ্যতে নিজেদের সংশোধন করার সম্ভাবনা নেই যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। অতএব, পবিত্র তীর্থযাত্রা এবং সফরে যাওয়ার সময় মুসলমানদের জন্য সঠিক মনোভাব অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক, অন্যথায় তারা তাদের পবিত্র সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় আরও বেশি পাপী হয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারে। আয়াত 197-এ অবাধ্যতা এড়ানোর নির্দেশ , ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার উপর অবিচল থাকা নিশ্চিত করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

" *...এবং হজ্জের সময় কোন অবাধ্যতা এবং কোন বিতর্ক নেই..*"

অন্যদের সাথে বিবাদ করার নিষেধাজ্ঞার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ আত্মীয়দের মধ্যে একত্রে ভ্রমণে বিবাদ প্রায়ই ঘটে থাকে এবং অল্প জায়গায় জড়ো হওয়া লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রায়ই একে অপরের সাথে বিবাদের দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের কথাবার্তা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে, বিশেষ করে তাদের পবিত্র সফরের সময়, যাতে তাদের পুরস্কার নষ্ট না হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট পাঠ যার সাধারণ প্রভাব রয়েছে। অর্থ, একজনের এমন বিতর্কিত মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় যাতে তারা ক্রমাগত অন্যদের সাথে তর্ক করে। মুসলমানদের অবশ্যই একটি সহজ চলমান প্রকৃতি অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকে এবং ধর্মীয় বা পার্থিব উভয় বিষয়েই অন্যদের সাথে তর্ক বা বিতর্ক না করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্মানজনক এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরে খুশি হয়। যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শিক্ষক, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বহুবার আদেশ দেওয়া হয় যে তিনি মানুষের উপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচরণ করবেন না, যার ফলে তার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেবেন, তবে তাঁর পরে আর কেউ এই আচরণ করার চেষ্টা করবেন না। হয় অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

তাই সকল নবী (সা.)-এর ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে, তাদের মতামত নিয়ে জোরপূর্বক না হয়ে এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট ও সম্মানের সাথে উপস্থাপন করতে হবে, তা অন্যরা গ্রহণ করুক বা না করুক।

আল্লাহ, অতঃপর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা যা কিছু ভালো কাজ করে, যেমন অন্যদের সাথে বিবাদ এড়ানো, অন্যদের দ্বারা প্রশংসা করা বা লক্ষ্য করা নাও হতে পারে তবুও এটি মহান আল্লাহ জানেন এবং তাঁর দ্বারা পুরস্কৃত হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...এবং আপনি যা কিছু ভাল করবেন - আল্লাহ তা জানেন ..."

এটি মুসলমানদের সর্বদা একটি ভাল আন্তরিকতা অবলম্বন করার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কাজ করে, সে তার কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাবে না এবং তারা অন্যদের কাছ থেকে সম্মানের মতো প্রকৃত উপকারও পাবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করেন, তিনি উভয় জগতের প্রত্যেকটি ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত হবেন, যদিও তা অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা এবং উপেক্ষা করা হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...এবং আপনি যা কিছু ভাল করবেন - আল্লাহ তা জানেন ..."

এটি নির্দিষ্টগুলির পরে একটি সাধারণ বিবৃতিও। অর্থ, একজনকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। ভাল কাজ করা যাইহোক সীমাবদ্ধ নয়, ইসলামে উপদেশ দেওয়া ভাল কাজ থেকে কেউ নিজেকে অজুহাত দিতে পারে না।

যেহেতু কিছু লোক তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা বা সফরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এবং তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করবে, মহান আল্লাহ তাদের পবিত্র ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি সহীহ বুখারি, 1523 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 197:

"... *আর বিধান নাও...*"

উপরন্তু, ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে কেউ যদি নিজের এবং তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার বিধান না রাখে যে তারা বাড়িতে রেখে গেছে, তবে তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা বা সফরে যাওয়া উচিত নয়।

বিধান গ্রহণের এই আদেশ স্বাধীনতা গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজনকে অবশ্যই অলস মনোভাব অবলম্বন করা এড়াতে হবে যাতে তারা তাদের নিজস্ব

চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য তাদের প্রদত্ত সম্পদ যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার পরিবর্তে তাদের প্রয়োজনের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করে। যখন কেউ তাদের সম্পদ প্রথমে ব্যবহার করে তখন অন্য লোকেদের দিকে ফিরে যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই তবে এটি যতটা সম্ভব এড়ানো উচিত, কারণ যে অন্যের উপর নির্ভর করার অভ্যাস গ্রহণ করে সে অলস হয়ে যাবে এবং তারা আত্মসম্মান হারাবে। যে আত্মসম্মান হারায় তার পাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্যদের থেকে স্বাধীনতাও মহান আল্লাহর উপর একজনের আস্থাকে শক্তিশালী করবে। মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি হবে, ততই তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং তারা বিশ্বাস করবে যে তিনি তাদের জন্য সর্বোত্তম যা বেছে নেবেন। সব পরিস্থিতিতে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মানুষের উপর নির্ভরশীল সে মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থাকে দুর্বল করে দেবে এবং এর পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার উপায়ে কাজ করবে। এটি সর্বদা উভয় জগতে সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ স্বাধীন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন কারণ এটি তাঁর উপর আস্থার দিকে পরিচালিত করে। এই ঐশ্বরিক ভালবাসা একজনকে তাদের সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করবে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানসিক শান্তি পেতে পারে। তাই একজনকে অবশ্যই তাদের প্রদত্ত সমস্ত উপায়গুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে এবং কেবলমাত্র প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য অন্যদের দিকে ফিরে যেতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"... *আর বিধান নাও...*"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র তীর্থযাত্রা এবং সফরের জন্য একজনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তার আনুগত্য করা এবং রিজিক উপার্জন করা একটি গৌণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাদের ধর্মীয় যাত্রাকে গৌণ লক্ষ্য এবং রিজিক উপার্জনকে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব তাদের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে তেমন উপকারী হবে না। এই সেই ব্যক্তি যে কেবলমাত্র হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য পবিত্র যাত্রা করেন, অথচ সঠিক মানসিকতা হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং প্রয়োজনে হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য ধর্মীয় সফর করা উচিত। পথ যদি কেউ আগে থেকে রিজিক পেতে পারে যাতে তাদের এই ধর্মীয় ভ্রমণের সময় রিজিক অর্জনের প্রয়োজন না হয় তবে এটি আরও ভাল হবে কারণ এটি মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের অভিপ্রায়কে দৃঢ় করে তোলে। আলোচ্য মূল আয়াতে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"... *আর বিধান নাও...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ছোট বিবৃতিটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে ব্যাখ্যা করে, যথা, কিভাবে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা যায়। মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার সঠিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব সম্পদ যেমন, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বৈধ উপায়ে বৈধ ওষুধ ব্যবহার করা এবং তারপর তা মেনে নেওয়া যেই হোক না কেন আল্লাহ্‌, মহান, তাদের জন্য বেছে নেয়, যেমন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া বা না হওয়া, তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাই তারা

সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে। এটাই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতি। মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা, তাই আল্লাহ তায়ালা যে সম্পদ প্রদান করেছেন তা ব্যবহার ত্যাগ করা জড়িত নয়, যেমন হালাল ওষুধ, কারণ এটি সম্পদকে অকেজো করে দেয় এবং মহান আল্লাহ অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহ তায়ালার উপর আস্থা রাখা, যাকে প্রদত্ত সম্পদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা এবং ভুলে যাওয়া যে সব কিছুই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে এবং তিনি সর্বদা মানুষের জন্য সর্বোত্তম তা বেছে নেন, যদিও তা না হয়। তাদের কাছে স্পষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যে ব্যক্তি তাদের সম্পদের উপর অত্যধিক নির্ভর করে সে প্রায়শই আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং আকর্ষণের উপর বেশি আস্থা রাখে যা ইসলামী শিক্ষার মূলে নেই, যা তাদের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসকে আরও দুর্বল করে দেয় যে মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্বের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই মনোভাবের মধ্যে কেউ যত গভীরে প্রবেশ করবে, ততই তারা আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী হওয়ার ভান করে এমন শিল্পীদের দ্বারা প্রতারিত হবে যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে তবুও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের নির্দেশ দেয় যা প্রায়শই ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। এটি কেবল তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং আলোচিত দুটি চরম মনোভাব পরিহার করার জন্য সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

দুঃখের বিষয়, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, ইসলামকে সহজ ও সহজ করে তোলেন কিন্তু তাদের পরে অনেক মুসলমান আল্লাহর উপর ভরসা করার মত বিষয় নিয়ে কথা বলে ইসলামকে জটিল করে তোলে। , উচ্চতম, বিভ্রান্তিকর এবং বিস্তৃত উপায়ে, যদিও ধারণাটি খুব সহজ এবং সোজা। তাই মুসলমানদের জন্য নির্দেশনার দুটি উত্স শেখা এবং তার উপর কাজ করা কঠোরভাবে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, কারণ তারা ইসলামকে সহজ করে তোলে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে তোলে। . তাদের অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে অধ্যয়ন করা এবং কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তারা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য জিনিসগুলিকে জটিল করে তুলবে এবং তাদের বোঝাবে যে মহান আল্লাহর নৈকট্যের পথটি কেবলমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত লোকের জন্য, যদিও তাঁর দরজা খোলা রয়েছে। সব এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য। ইসলামকে জটিল করে তোলা তাদের একটি শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি করতে দেয় যার মাধ্যমে তারা সাধারণ জনগণকে বোঝায় যে মহান আল্লাহর নৈকট্য তখনই অর্জিত হয় যখন তারা বিশেষ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সেবা করে এবং অন্ধভাবে মেনে চলে যারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী। এই আধ্যাত্মিক লোকেরা সাধারণ জনগণের জন্য ইসলামকে আরও জটিল করে তোলে যাতে তারা তাদের সেবা করা, উপহার দিয়ে তাদের উপস্থাপন করা এবং সর্বদা অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করা নিশ্চিত করে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা ইসলামকে অন্য কারও চেয়ে ভাল বোঝেন। , একে অপরের সাথে এইভাবে আচরণ করেনি।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, তারা যেখানেই যান, সর্বোত্তম রিযিকটি তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারেন, তা হল মহান আল্লাহকে ভয় করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, 196:

"... তবে সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."

এর কারণ হল, মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করা নিশ্চিত করে যে একজন আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করতে ব্যর্থ হয়, সে অনিবার্যভাবে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, এই ব্যক্তি মানসিক শান্তি পাবেন না এবং এর পরিবর্তে তাদের কাছে থাকা খ্যাতি এবং সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদগুলি চাপ, দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে। এবং উভয় জগতে তাদের জন্য বিষণ্নতা, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

দুটি ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য একজনকে কেবল তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে

এবং তারা কীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। এবং কেউ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পারে যে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে তারা সামান্য কিছু পার্থিব জিনিসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে মানসিক শান্তি পায়। কিন্তু যারা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে তারাই এই বাস্তবতা বুঝতে পারবে এবং নিজেদের জন্য সঠিক পথ বেছে নেবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...আর হে বুদ্ধিমান, আমাকে ভয় কর।"

ইসলাম সর্বদা পার্থিব বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করার মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখে, যেমন হালাল সম্পদ উপার্জন এবং আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যখন কেউ পার্থিব কাজ করে, যেমন হালাল সম্পদ উপার্জন করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা, তখন সেগুলিকে ভাল কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় যা তাদের পরকালে তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য কার্যত প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 198:

"[হজ্জের সময়] আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ খোঁজার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই..."

এটি পবিত্র তীর্থযাত্রা এবং দর্শনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশের প্রশংসা করে, কারণ প্রায়শই এই দীর্ঘ এবং কঠিন ভ্রমণের সময় একজনকে আরও সম্পদ উপার্জন করতে হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...এবং বিধান নিন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে যদিও প্রত্যেক ব্যক্তি মহান আল্লাহর দিকে যাত্রা করছে এবং বিচার দিবসে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতা রয়েছে, তবুও তাদের এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অধ্যায় 84 আল ইনশিকাক, আয়াত 6:

"হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে [প্রচন্ড] পরিশ্রমের সাথে পরিশ্রম করছ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

যে ব্যক্তি জড়জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, তার জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করা কঠিন হবে, যেমন তাদের নির্ভরশীলদের জন্য ব্যবস্থা করা, এবং ফলস্বরূপ তাদের মনোভাব পরকালের দিকে তাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে এবং তাদের সমস্ত সম্পদ জাগতিক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, বিচারের দিন তাদের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এই মনোভাব তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যার ফলে

উভয় জগতেই অসুবিধা, চাপ এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন ইসলাম শেখায়, যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে প্রদত্ত পার্থিব সম্পদ ব্যবহার করে যাতে তারা অধিকার পূরণ করে। মহান আল্লাহর, মানুষের অধিকার এবং তাদের নিজস্ব অধিকার। এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করবে যে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পাবে এবং বিচারের দিনে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহির জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 198:

"[হজ্জের সময়] আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ খোঁজার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই..."

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা যে পার্থিব জিনিষ প্রাপ্ত করেছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, এমনকি সম্পদ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রচেষ্টাও। এই সত্যটি মনে রাখা একজন ব্যক্তিকে তাই জাগতিক জিনিসগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হিসাবে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। অথচ যে ব্যক্তি এটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয় সে মনে করবে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত তাদেরই এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি এমন একটি ফাঁদ যা একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করে যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ, দুঃখ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মনে করিয়ে দেন যেন তারা খালিভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান না করে যার মাধ্যমে তারা শারীরিক ক্রিয়াকলাপ করে কিন্তু আচারের সারমর্ম ও উদ্দেশ্য পূরণ করে না, যা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে। তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ড জুড়ে, উন্নত. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 198:

"...তবে যখন তুমি আরাফাত থেকে বের হবে, তখন আল-মাশআর আল-হারামে আল্লাহকে স্মরণ করবে..."

যদিও তীর্থযাত্রী শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে স্মরণ ও উপাসনা করার জন্য আরাফাতে থাকেন, তবুও তাদেরকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর অর্থ হল একজনের উচিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে, যেমন বাধ্যতামূলক প্রার্থনাকে, নিষ্প্রাণ কাজ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয় যা তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের উপর কোন প্রভাব বা প্রভাব ফেলে না। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করেনি, যদিও তারা কার্যত সেগুলি পালন করে। পবিত্র তীর্থযাত্রার মতো প্রতিটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা এবং তাদের সারা দিন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে তারা সম্মুখীন হতে হয়, মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করা। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটিই মহান আল্লাহর আসল স্মরণ, যা দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণে আল্লাহর নাম, বা তাঁর ঐশী গুণাবলী পাঠের চেয়ে অনেক বেশি। আয়াতের পরবর্তী অংশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 198:

"...এবং তাঁকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন..."

এটি নির্দেশনার দুটি উত্সের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেহেতু কেউ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। . উল্লেখ্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় এবং ইসলামের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে লোকেরা পবিত্র হজ্জ পালন করত , তথাপি সময়ের সাথে সাথে এর প্রথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে শিরক প্রবর্তিত হয়েছিল। এই লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করছে এবং উপাসনা করছে, কিন্তু তারা পবিত্র ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা অনুসরণ করেনি, কঠোরভাবে এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করেছে, তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, এবং ফলস্বরূপ বিপথগামী হয়. আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 198:

"...এবং তাঁকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন, কারণ এর আগে তুমি পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলে।"

আয়াতের এই অংশটির অর্থ হতে পারে যে একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য দেখাতে হবে, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এটির একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা ক্ষতিপূরণ আশা করে না বা আশা করে না। যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানোর অন্তর্ভুক্ত যা ভালো তা বলা বা চুপ থাকা। এবং নিজের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে সে উভয় জগতে অধিক সওয়াব, বরকত ও মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, সে বিপথগামী থাকবে কারণ তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার সৃষ্টি হবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ তাদের বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ তারপর একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 199:

"তারপর সেই জায়গা থেকে চলে যাও যেখান থেকে [সকল] লোকেরা চলে যায়..."

মক্কার বাসিন্দারা নিজেদেরকে সবার উপরে মনে করত এবং তাই ভিন্নভাবে পবিত্র তীর্থযাত্রা পালন করত। মহান আল্লাহ এই ভ্রান্ত মনোভাব সংশোধন করেছেন এবং মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র একক মান যা একজন ব্যক্তিকে অন্যের চেয়ে ভালো করে তোলে তা হল তারা কতটা ধার্মিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

একজন ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যেমন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারা তত বেশি ধার্মিক। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনের উদ্দেশ্য লুকানো থাকায় তারা দাবি করতে পারে না যে লোকেরা তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে অন্যদের চেয়ে ভাল। এটি সমস্ত পার্থিব বাধা দূর করে যা লোকেদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে যা শ্রেষ্ঠত্বকে সংজ্ঞায়িত করে, যেমন সম্পদ, খ্যাতি, জাতিসত্তা, রক্তরেখা এবং লিঙ্গ। যে মুসলিম বিশ্বাস করে যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কিছুতে নিহিত রয়েছে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাসের একটি বড় সমস্যা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 199:

"অতঃপর সেই স্থান থেকে চলে যাও যেখান থেকে [সকল] লোকেরা চলে যায় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর..."

এটি এও ইঙ্গিত করে যে সকল মানুষ মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণার জন্য সমানভাবে মরিয়া, তারা যেই হোক না কেন, তারা কতটা পার্থিব সম্পদের মালিক বা কতটা ধার্মিক তারা বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি সহীহ বুখারি, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, কেউ, এমনকি নিজেও নয়, শুধুমাত্র তাদের কর্মের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পরিবর্তে, এটি মহান আল্লাহর রহমত, যা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এর কারণ এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাঁর রহমতের প্রয়োজন, কারণ মহান আল্লাহকে মান্য করার অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা, সুযোগ এবং জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে আসে। অতএব, একজনকে কখনই তাদের ভাল কাজ বা কিছু পার্থিব মর্যাদা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত নয় এবং ধরে নেওয়া উচিত যে উভয় জগতে তাদের জন্য ক্ষমা ও করুণা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে,

একজনকে অবশ্যই সর্বদা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার সন্ধান করতে হবে, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে এবং যখনই তারা পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, যেমন কেউ নিখুঁত নয়। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করবে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি ও সাফল্য আসবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 199:

"তারপর সেই জায়গা থেকে চলে যাও যেখান থেকে [সকল] লোকেরা চলে যায়..."

এটি মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে, সময়ের সাথে সাথে মুসলিম জাতি দুর্বল হওয়ার একটি বড় কারণ হল ঐক্যের অভাব। মুসলমানরা যদি সাহাবায়ে কেরামের একই ঐক্য কামনা করে , আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, যা তাদের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়, তাহলে তাদের অবশ্যই তাদের আচরণ অনুসরণ করতে হবে। তারা তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে তাদের জীবনকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের চারপাশে ঢালাই করে। উপরন্তু, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে

হবে, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় যাতে তারা নেতৃত্ব লাভ করে। এর পরিবর্তে মুসলমানদের অবশ্যই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমর্থন করতে হবে যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত উত্স এড়িয়ে চলে যা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সম্প্রদায় সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যও তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ কেবল সেই বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম তাদের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্যদের সমর্থন করে, এমনকি তারা এমন কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। অথবা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করতে অস্বীকার করে, কারণ আয়োজকদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। যখন মুসলমানরা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য মুসলমানদের সমর্থন করে, তখন এটি তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনকে শক্তিশালী করবে, যা তাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 199:

"... এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেমন ক্ষমাশীল, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাঁর ক্ষমা পেতে পারে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

স্পষ্ট করার জন্য, এর অর্থ হল অন্যদের দ্বারা আরও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে নিজেকে এবং অন্যদের যেমন তাদের নির্ভরশীলদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং তারপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যায়কারীকে ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ না নিয়ে অন্যকে ক্ষমা করা ইসলাম সমর্থন করে না।

একইভাবে, মহান আল্লাহ যেমন দয়াময়, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমগ্র সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শনের চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই তাঁর রহমত লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন

না। অন্যদের প্রতি করুণা দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হ'ল লোকেদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন অন্যের সাথে আচরণ করতে চায়। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 13 নম্বর হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর মনোভাব। এর মধ্যে অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন অন্তর্ভুক্ত।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ইসলাম মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে খালিভাবে এড়াতে শেখায় যার ফলে আচার-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে থাকে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"আর যখন তোমরা তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর..."

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল তারা একজনকে তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ জুড়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ ও আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে। এই স্মরণের সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত শারীরিক কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এটি একটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলিম যারা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার পালন করে, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তবুও তারা মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা তাদের বাধ্যবাধকতার মধ্যে মহান আল্লাহকে মেনে চলার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। প্রার্থনা

মহান আল্লাহ, তারপর একটি নির্দিষ্ট একটি সাধারণ পাঠ শেখান. অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"এবং যখন তোমরা তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্মরণ করত অথবা [অনেক বেশি] স্মরণ কর..."

আরবদের অভ্যাস ছিল পবিত্র তীর্থযাত্রা শেষ করার পর তাদের গোত্র ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার জন্য একত্রিত হওয়ার। তাফসীর ইবনে কাথির, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 567-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে এই মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করেছেন, কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ যে জাগতিক মান নিয়ে গর্ব করে, সে অনুযায়ী তাদের শ্রেষ্ঠ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় না, যেমন সম্পদের অধিকারী। উপরন্তু, এটি উভয় জগতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অন্যের ভালো কাজের উপর নির্ভর না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের আত্মীয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের আত্মীয়, তারা যতই ধার্মিক হোক না কেন, তাদের জবাবদিহি থেকে তাদের রক্ষা করবে না। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোনো পিতা তার পুত্রের কোনো উপকারে আসবে না এবং পুত্র তার পিতার কোনো কাজে আসবে না..."

এবং অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

যদিও বিচারের দিন সুপারিশ একটি সত্য, কোন অংশে কম নয়, এটি তখনই সাহায্য করবে যখন তারা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা করবে। পবিত্র কুরআন জুড়ে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 8:

"হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানের বাগানে দাখিল করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের সাথে দিয়েছেন এবং তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ছিল..."

যদি কেউ একটি অলস মনোভাব গ্রহণ করে যাতে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করাকে উপেক্ষা করে এবং বিচারের দিনে অন্য কেউ তাদের রক্ষা করার আশা করে, তবে তারা হতাশ হবে, কারণ এই মনোভাব সুপারিশের ধারণাকে উপহাস করে এবং তাই অত্যন্ত অসম্মানজনক।

অতএব, একজনকে অবশ্যই এমন অলস মনোভাব অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করে এবং পরিবর্তে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটাই ছিল সাহাবাদের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তাদের কাছে তাদের সেরা ব্যক্তি ছিল যাকে তারা আশা করেছিল যে বিচার দিবসে তাদের জন্য সুপারিশ করবে, অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"এবং যখন তোমরা তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্মরণ করত অথবা [অনেক বেশি] স্মরণ কর..."

মহান আল্লাহ তারপর ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন, একজন মুসলমানের উদ্দেশ্য যখন তারা কোনো ধর্মীয় আচার পালন করে, যেমন ফরজ নামাজ। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"...আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই পৃথিবীতে দান করুন,"..."

দুঃখজনকভাবে, মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার অভ্যাস আছে, বিশেষ করে, অন্যান্য লোকদের দ্বারা উপদেশ দেওয়া আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা পবিত্র কুরআন বা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয় না, বস্তুগত জগতের সাথে সংযুক্ত কিছু লাভ করার জন্য। , যেমন একটি পত্নী, একটি শিশু বা একটি ভিসা. যদিও জাগতিক জিনিস চাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ নয় তবুও যখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পার্থিব লাভের উপর ভিত্তি করে থাকে বা উভয় জগতের মানসিক শান্তির মতো ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তখন এটি তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। উভয় জগতে, বিশেষ করে, পরকালে, যেহেতু তারা তাদের ইচ্ছায় পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়নি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"...আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।"

উপরন্তু, এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, যখন কেউ পার্থিব জিনিসের জন্য জিজ্ঞাসা করে, তারা তাদের জন্য ভাল কিনা তা না জেনেই তা করে, কারণ এটি নির্ধারণ করার জন্য তাদের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। অতএব, তারা যে জিনিসটি চাইছে তা দুনিয়াতে তাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে এবং আখিরাতে তাদের অসুবিধার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি নম্রতা অবলম্বন করা এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার অভাবকে মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যকীয়, যেন তারা জানে যে তাদের জন্য কোনটি ভাল।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200:

"...আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।"

উপরন্তু, ইসলামের প্রতি পার্থিব মনোভাব অবলম্বন করা অপছন্দের কারণ একজনের পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং উভয় জগতের মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা করা উচিত। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব ছিল এইরূপ। মহান আল্লাহ তাদের এই পৃথিবীতে যা কিছু দান করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, জেনে রাখা উচিত যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, এবং পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তা ব্যবহারে অবিচল থাকা উচিত। কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। এটি একাই মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে এবং তাই তাদের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাকালীন নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসের দাবি করার চেয়ে অনেক ভাল। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 201:

"কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলমান কীভাবে একজন ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিতে পারে যা তারা বিশেষভাবে চায়নি যখন তারা তাদের ডাক্তারকে তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দিয়েছে, তবুও, তারা আল্লাহর উপর এই স্তরের আস্থা রাখে না, মহিমান্বিত, যেহেতু তারা তাঁর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু দাবি করে বিশ্বাস করে যে তারা জানে যে তার পছন্দ এবং সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে তাদের জন্য কী সেরা। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই

তাদের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবকে মেনে নিতে হবে এবং দুনিয়া ও পরকালের সাধারণ ভালো জিনিসের জন্য জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং মহান আল্লাহর কাছে সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে হবে, কারণ তিনি জানেন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কী ভাল। এই কারণেই আয়াত 201 এ উল্লিখিত ভাল সাধারণ এবং নির্দিষ্ট নয়। আয়াত 201-এ উল্লিখিত ভাল কিছু যা একজন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটিই উভয় জগতের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। নিরর্থক বা পাপপূর্ণ উপায়ে অপব্যবহার করা যেকোনো কিছু একজন ব্যক্তির জন্য কখনই মঙ্গলজনক হবে না এবং এটি উভয় জগতের জন্য শুধুমাত্র চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার উত্স হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, যেমন মহান আল্লাহ। , তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ তাদের বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 201:

"কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পরকালের কল্যাণ চাওয়ার একটি অংশ হলেও আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়নি তার পরকালে কোনো কল্যাণ নেই। উপরন্তু, যেহেতু এই সঠিক নির্দেশিত প্রার্থনায় পরকালের কথা দুবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং জড়জগতের কথা এক বার উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তিকে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন এবং উপভোগ করার চেয়ে আখেরাতের বিষয়ে বেশি চিন্তিত হতে হবে, যদিও সেগুলি বৈধ হয়। . অতএব, তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে পরকালে মানসিক শান্তি অর্জনকে প্রাধান্য দিতে হবে পার্থিব জিনিস

অর্জন ও উপভোগ করার চেয়ে, যদিও সেগুলি বৈধ হয়। কারণ এই পৃথিবী সবসময়ই অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী হবে যেখানে পরকাল সর্বদা স্থায়ী এবং নিখুঁত হবে। তাই একজনকে অবশ্যই অপূর্ণ ক্ষণস্থায়ীকে উপভোগ করার চেয়ে নিখুঁত শাশ্বত বাসস্থানের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200-201:

"আর যখন তোমরা তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্মরণ করত অথবা [অনেক বেশি] স্মরণ কর। আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, 'আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও' এবং আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই। তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও [যা] কল্যাণ করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, এই প্রার্থনাটি আনুগত্যের একটি কাজের সাথে মিলিত হয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র তীর্থযাত্রা করা। একইভাবে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত রেওয়ায়েতের প্রতিটি দোয়াই আনুগত্যের সাথে জড়িত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি প্রার্থনা এমন একজনের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল যিনি আনুগত্যের কাজে নিবেদিত ছিলেন। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার জন্য তারা সারা জীবন চেষ্টা করেছে। এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রার্থনাগুলি তখনই কার্যকর হয় যখন সেগুলি বাধ্যতামূলক কাজের সাথে মিলিত হয়। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম একটি অলস মনোভাব গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা প্রার্থনা করতে

ভাল কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহকে মান্য করবে না। এর কারণ হল, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য ন্যূনতম শক্তি, সময় এবং সম্পদের মতো অন্য কোনো সম্পদের প্রয়োজন হয় না। ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন থেকে এটা স্পষ্ট যে, দো'আগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য আনুগত্যের কাজ দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই স্পষ্টভাবে দেখায় যে কিভাবে তারা দৈহিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করেছিল, তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। সঠিকভাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কাজ করতে অস্বীকার করে তারা কখনই কেবল স্বস্তি বা বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেনি। জামি আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে দিনের মধ্যে দু'টি বিশেষ সময়, মহান আল্লাহ ইতিবাচকভাবে সাড়া দেন, উভয়ই আনুগত্যের সাথে যুক্ত। প্রথম সময়টি সরাসরি ফরজ নামাজের পরে এবং দ্বিতীয়টি রাতের শেষ অংশে, যখন একজনের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা উচিত। উপরন্তু, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে পূর্ণ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য প্রার্থনাগুলি বাধ্যতামূলক কাজের দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"... তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ তা উন্নীত করে..."

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রার্থনাকে সমর্থন করতে হবে তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়া, মুসলমানদের অবস্থা ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন না হওয়ার একটি প্রধান কারণ, কারণ সৃষ্টি করার জন্য একজনকে তাদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং কর্ম পরিবর্তন করতে হবে। তাদের জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

উপরন্তু, তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের কাছে উপলব্ধ সম্পদগুলি, যেমন তাদের শক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং তারা কেবল প্রার্থনার উপর নির্ভর করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাকে অবশ্যই সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সাহায্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সাথে এটি সংযুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনার উপর নির্ভর করে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা সমাধানের জন্য কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ এড়িয়ে তারা অলসভাবে আচরণ করতে পারে না। যেমনটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই নিষ্ক্রিয় এবং ভুল মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200-201:

"... আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

এই দু'টি মিনতি এ কথাও স্পষ্ট করে দেয় যে একজনের উদ্দেশ্য এমন চরম মনোভাব পোষণ করা নয় যাতে তারা হয় সম্পূর্ণভাবে পার্থিব জিনিসে নিমগ্ন হয়ে পরকালকে অবহেলা করে এবং এর জন্য প্রস্তুতি নেয়। অথবা তারা পরকালের জন্য বস্তুগত জগতকে পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে নয়। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলিকে বৈধ উপায়ে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে তাদের দেওয়া জাগতিক জিনিসগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করে। এটাই ইসলামের শেখানো সুষম পন্থা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

আলোচ্য মূল আয়াতে তিনটি পথ স্পষ্ট করা হয়েছে। দুটি চরম পথ যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির অভাবের দিকে নিয়ে যায় এবং একক সঠিক পথ। এটি এখন মানুষের উপর নির্ভর করে যে তারা কোন পথে যেতে চায়, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি উভয় জগতে তাদের পছন্দ এবং কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 202:

"তারা যা অর্জন করেছে তার অংশ তাদের জন্য রয়েছে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা একবার পরকালে পৌঁছে গেলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ সংশোধন করার দ্বিতীয় সুযোগ থাকবে না। যদি কেউ এই পৃথিবীতে সঠিক পথ বেছে নিতে ব্যর্থ হয় তবে তারা এই পৃথিবীতে একটি চাপযুক্ত জীবন যাপন করবে এবং তারা পরকালে খালি হাতে থাকবে এবং আফসোসে ভরা থাকবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 202:

"তারা যা অর্জন করেছে তার অংশ তাদের জন্য রয়েছে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ঈমানের মৌখিক ঘোষণার ইসলামে খুব কম মূল্য রয়েছে, কারণ বিচার দিবসে মানুষ তাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে বিচার করা হবে এবং এই কর্মগুলি বিশ্বাসের সাথে যুক্ত ছিল কি না। বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করে এমন ভাল কাজগুলি হল মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"...এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

বিশ্বাস হল একটি ফলের গাছের মতো যা কেবলমাত্র তখনই ফল দেয় যখন এটি পুষ্টি পায়, যেমন সূর্যের আলো। যদি উদ্ভিদ পুষ্টি প্রাপ্ত করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি ফল তৈরি করবে না যা এটি দরকারী করে তোলে। একইভাবে, কর্মগুলি একজন ব্যক্তির ঈমানের ফল এবং তা ছাড়া একজন ব্যক্তির ঈমানের ইসলামে খুব কম মূল্য রয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলামের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস জড়িত

যা আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। ভালো কাজ ছাড়া ঈমান বা ঈমান ছাড়া ভালো কাজ ইসলাম নয়, অজ্ঞ লোকেরা যাই দাবি করুক না কেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

"আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 202:

"তারা যা অর্জন করেছে তার অংশ তাদের জন্য রয়েছে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকেও মনে করিয়ে দেয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী উভয় জগতে রহমত ও মানসিক শান্তি লাভ করবে। অর্থ, যদি কোনো ব্যক্তি অলস মনোভাব অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর ন্যূনতম আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। কিন্তু যারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামতকে ব্যবহার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তারা উভয় জগতেই অগণিত পরিমাণ খোদায়ী সমর্থন, আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে,

মুসলিমরা যেভাবে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সমর্থন কামনা করে, তবুও তারা যে সমর্থন কামনা করে তার আনুগত্যের জন্য কঠোর চেষ্টা করে চুক্তির পক্ষ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা তাদের প্রচেষ্টার ফলে উভয় জগতেই কল্যাণ লাভ করবে। যদি তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, তবে তাদের কাছ থেকে খুব বেশি লাভের আশা করা উচিত নয়। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

মহান আল্লাহ, তারপর মুসলমানদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আকারে হয়, যেমন ফরজ নামাজ, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সঠিক মানসিকতা অবলম্বন করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 203:

"এবং [নির্দিষ্ট] গণনাকৃত দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর..."

যখন কেউ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পালন করে, তখন তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান না করলেও, তাদের দিন-রাত্রি জুড়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করবে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত

আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ অতঃপর একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতির রূপরেখা দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 203:

"...অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যে [তার প্রস্থান] ত্বরান্বিত করে - তার কোন পাপ নেই; এবং যে ব্যক্তি [তৃতীয় পর্যন্ত] বিলম্ব করে - তার জন্য কোন পাপ নেই - যে আল্লাহকে ভয় করে..."

বিশেষভাবে, এই আয়াতটি পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি অতিরিক্ত দিন থাকার কথা উল্লেখ করে। কিন্তু সাধারণত , এটি ইঙ্গিত করে যে এটি মহান আল্লাহকে ভয় করা, যার সারমর্ম হল তাকে সন্তুষ্ট করার একটি ভাল উদ্দেশ্য, ইসলামে ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করার পরে যা প্রয়োজন। অর্থ, অনেক স্বেচ্ছাসেবী ইবাদত করার পরিবর্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য মেনে চলা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না মুসলমানের হাতে রয়েছে। সঠিক নিয়ত, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। ইসলাম স্বেচ্ছামূলক ধর্মীয় কাজের জন্য নিজেকে অতিরিক্ত বোঝার বিষয়ে নয় বরং এটি ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার বিষয়ে, যে আশীর্বাদগুলি একজনকে দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে ব্যবহার করার

মাধ্যমে যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। ন্যূনতম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও মহান আল্লাহকে এভাবেই ভয় করে।

তখন একজন মুসলিমকে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একটি ভাল উদ্দেশ্য বজায় রাখতে এবং আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় কারণ তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য এবং কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 203:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।"

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহর ভয়কে ধরে রাখে, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা হিসাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পাবে এবং তাদের চূড়ান্ত জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। পরকালে বিচার। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 203:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।"

পবিত্র তীর্থযাত্রা নিয়ে আলোচনা করা আয়াতের শেষে মহান আল্লাহকে ভয় করার আদেশ একজনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখার গুরুত্ব এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও কাজগুলি এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় তারা যে পুরস্কার পেয়েছে তা নষ্ট করে। একজন ব্যক্তি পরকালে বিচার দিবসে নিয়ে যাওয়া ভাল কাজের অনুসারে পুরস্কৃত হবে, তার জীবনে করা ভাল কাজগুলি নয়, কারণ একজন ব্যক্তি অহংকার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে সহজেই একটি ভাল কাজের পুরস্কার নষ্ট করতে পারে, অথবা পাপের মাধ্যমে পুরস্কার নষ্ট করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

যে সব ভালো কাজের সওয়াব নষ্ট করতে পারে সেসব বিষয় এড়িয়ে চলার জন্য ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের দিনের কিছু সময়

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য উত্সর্গ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 203:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।"

যেহেতু আয়াতের এই অংশটি মানুষকে তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তা জানতে আদেশ করে, এটি বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলামের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, আল্লাহর একত্ব, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসের অনিবার্যতা নিয়ে আলোচনা করা ইসলামী শিক্ষাগুলো যখন কেউ শেখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তখন নিশ্চিত বিশ্বাস পাওয়া যায়। যার ঈমান যত মজবুত হবে, তত বেশি তারা পরকালে তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে প্রস্তুত হবে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মহান আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি তাদের ঈমান কতটা দৃঢ়। একজনের বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে একে শক্তিশালী করার জন্য একজনকে ক্রমাগত এই পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বাসের মূল্যায়ন করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

“…তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

যেখানে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহানের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস রাখে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার অধিকারী সে মাঝে মাঝে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, কিন্তু তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম জুড়ে তাঁর আনুগত্য করতে সংগ্রাম করবে। তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। তারা অনেক সময় কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই মানসিক চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 204-206

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

"এবং মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে খুশি করে এবং সে তার অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষ্য দেয়, অথচ সে সবচেয়ে প্রচণ্ড বিরোধী।

এবং যখন সে চলে যায়, তখন সে সারা দেশে বিপর্যয় ঘটাতে এবং ফসল ও পশুপাখি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ দুর্নীতি পছন্দ করেন না।

আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন পাপের অহংকার তাকে আঁকড়ে ধরে। তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

আল্লাহ, মহান, দুই মুখের কৃত্রিম ব্যক্তির সমালোচনা করেন যার লক্ষ্য কেবলমাত্র মানুষকে সন্তুষ্ট করা পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ, উপহার এবং নেতৃত্ব অর্জনের জন্য। একজন দ্বিমুখী ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজ পরিবর্তন করবে যাতে তারা যাদের সাথে কথা বলে তাদের খুশি করার জন্য। এই মনোভাব সবসময় অন্যদের পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়াতে যার দুটি জিহবা আছে তার পরকালে আগুনের দুটি জিহবা থাকবে। উপরন্তু, দুই মুখের ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ দ্বারা উন্মোচিত হওয়ার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার এবং তারপর তারা তাদের মনোভাবের সাথে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে প্রত্যেকের দ্বারা তুচ্ছ হয়ে উঠবে। উপরন্তু, এই ব্যক্তিটি পার্থিব জিনিসগুলিকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী, যেমন সম্পদ উপার্জন, এবং তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা শেখার, কথা বলা এবং পার্থিব লাভের জন্য প্রচেষ্টার জন্য উত্সর্গ করে এবং তারা অন্যদেরকে শুধুমাত্র লাভের অভিপ্রায়ে এটি করতে উত্সাহিত করে। নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে না. অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

" *এবং মানুষের মধ্যে এমন একজনও যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে খুশি করে...*"

যদিও এটি অন্যদের সাথে দরকারী পার্থিব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বৈধ তবুও এটি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে একজন ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বা এমন ব্যক্তির সঙ্গী হয়, সে কখনো চিন্তা করবে, চিন্তা করবে এবং জড় জগতের জন্য চেষ্টা করবে এবং তারা আখেরাতের দিকে খুব কম মনোযোগ দেবে এবং বাস্তবে এর জন্য প্রস্তুতি নিবে, কারণ তাদের পার্থিব মনোভাব তাদেরকে অনুগ্রহের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি সেই ব্যক্তি যার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি অর্জন করা। পক্ষান্তরে, যে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় সে আখেরাতের

লক্ষ্য রাখে এবং কার্যত তার জন্য প্রস্তুতি নেয়। একমাত্র এটিই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়, কারণ পরকালের জন্য প্রস্তুতি একজনকে অনুপ্রাণিত করবে যে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

" *এবং মানুষের মধ্যে এমন একজনও যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে খুশি করে..."*

এটি সেই ব্যক্তিকেও বর্ণনা করে যিনি দরকারী পার্থিব জিনিস সম্পর্কে কথা বলতে ভাল কিন্তু কর্মের সাথে তাদের কথাকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হন। ইসলামে কর্মবিহীন কথার যেমন খুব কম মূল্য আছে, তেমনি পার্থিব বিষয়েও তাদের মূল্য নেই। যে ব্যক্তি কথা বলে কিন্তু কর্মের মাধ্যমে তা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় সে পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারবে না এবং অন্যদেরও তা অর্জনে সাহায্য করবে না। এটি এমন একজন

শিক্ষার্থীর মতো যে তাদের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নের কথা বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পড়াশোনা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাই ব্যর্থ হয়। একজনকে এই মনোভাব পরিহার করা উচিত কারণ এটি ভাল কিছুর দিকে পরিচালিত করে না এবং অন্যদের তাদের প্রতি সম্মান হারায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

" *এবং মানুষের মধ্যে এমন একজনও যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে খুশি করে..."*

এটি সেই ব্যক্তিরও বর্ণনা করে যার জ্ঞান শুধুমাত্র জাগতিক জ্ঞান নিয়ে গঠিত এবং তারা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদিও, উপকারী পার্থিব জ্ঞান শেখা প্রশংসনীয়, কম নয়, প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, কারণ শুধুমাত্র এটিই একজনকে শেখাতে পারে যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পার্থিব জ্ঞান, যতই লাভ করুক না কেন, কখনই কাউকে শেখাতে পারে না কিভাবে তাকে দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, কারণ তাদের ইসলামী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করে, কারণ তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসের উপর মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে একজনকে এই পরিণতি এড়াতে হবে।

দুই মুখের কৃত্রিম ব্যক্তির আরেকটি লক্ষণ হল যে তারা প্রায়শই শপথ নেয় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপে তা প্রদর্শন না করেই অন্য লোকেদের প্রতি কতটা আন্তরিক। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

"এবং মানুষের মধ্যে এমন একজনও আছে যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে সন্তুষ্ট করে এবং সে তার অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষ্য দেয়..."

একজন সত্যিকারের আন্তরিক ব্যক্তি কেবল কথা নয়, কাজের মাধ্যমে অন্যদের কাছে তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে। যে ব্যক্তি তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে ব্যর্থ হয় সে অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা রাখে না এবং মানুষকে বোঝানোর জন্য অন্যথায় তারা প্রায়শই শপথ নেয় যে তারা কতটা আন্তরিক এবং সৎ। তাই একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে হবে। তাদের এমন লোকদের সঙ্গও এড়িয়ে চলা উচিত যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে, যাদের কেবল তাদের আন্তরিকতা এবং সততাকে বোঝানোর জন্য ছোট ছোট বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভ্যাস রয়েছে। আসল বিষয়টি হল যে একজন সৎ ব্যক্তিকে তাদের আন্তরিকতা এবং সত্যতা সম্পর্কে অন্যদের বোঝানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বা শপথ নেওয়ার দরকার নেই।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

"এবং মানুষের মধ্যে এমন একজনও আছে যার কথা পার্থিব জীবনে তোমাকে সন্তুষ্ট করে এবং সে তার অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষ্য দেয়..."

এটি সেই ব্যক্তিকেও বর্ণনা করে যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তবুও ঘোষণা করে যে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় শুদ্ধ। এটি একটি মূর্খ মনোভাব কারণ একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং কাজগুলি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে যা আছে তা প্রতিফলিত করে। যদি একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয় নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দ্বারা কলুষিত হয়, যেমন অহংকার, হিংসা এবং লোভ, তবে এই প্রদর্শনটি সূক্ষ্ম হলেও এটি তাদের কথাবার্তা এবং কর্মে প্রতিফলিত হবে। পক্ষান্তরে, যার আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র, কারণ তারা আন্তরিকতা, উদারতা এবং কৃতজ্ঞতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছে, তাদের কথাবার্তা ও কর্মে এই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হবে। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের কথাবার্তা এবং কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা একটি কলুষিত আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী না বিশুদ্ধ এবং প্রয়োজনে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামি জ্ঞান শেখার মাধ্যমে এবং এতে উল্লেখিত ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করা এবং এতে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিহার করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়।

যদিও এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি এবং শপথের মাধ্যমে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে তারা তাদের প্রতি সৎ এবং আন্তরিক তবুও তারা কেবল তখনই তাদের কথা পূর্ণ করে যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়। যদি তাদের প্রতিশ্রুতি এবং শপথ

তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করে তবে তারা সম্পূর্ণরূপে অন্যদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের জন্য কী উপকারী। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

"...এবং সে তার অন্তরে যা আছে তার জন্য আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকে, তথাপি সে সবচেয়ে প্রচণ্ড বিরোধী।"

এই মনোভাব ইঙ্গিত করে যে তারা অন্যদের প্রতি কতটা নির্দোষ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তাদের উপায় অনুসারে, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

যে অন্যদের প্রতি নির্দোষ সে কখনো নিজের জন্য আনন্দদায়ক উপায়ে কাজ করবে। এটি তাদের তাদের সামাজিক প্রভাব এবং সম্পদের মতো তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। এটি শুধুমাত্র সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটায় এবং মানুষের উপকার করে এমন জিনিসের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন কেউ দেখেন যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ

রাজনীতিবিদ এবং তাদের অকৃত্রিমতা কীভাবে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের সমাজের মানুষের উপকারে বাধা দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 205:

"এবং যখন সে চলে যায়, তখন সে সারা দেশে দুর্নীতি করতে এবং ফসল ও পশুদের ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করে..."

এই কারণেই একজনের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যের প্রতি আন্তরিক হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ মুসলিমের 196 নম্বর হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যদের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়াই ইসলামের সংজ্ঞা। তাই একজনকে অবশ্যই অন্যের সাথে অসৎ আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ এটি শুধুমাত্র সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে, যা উভয় জগতে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে আকৃষ্ট করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 205:

"... আর আল্লাহ দুর্নীতি পছন্দ করেন না।"

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে আকর্ষণ করে, সে মনের শান্তি বা সাফল্য পাবে না, কারণ তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, অসুবিধা এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

"...এবং সে তার অন্তরে যা আছে তার জন্য আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকে, তথাপি সে সবচেয়ে প্রচণ্ড বিরোধী।"

এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে যুক্ত। এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তির একটি ভাল উদ্দেশ্য থাকে, যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কিন্তু ভাল কাজ দিয়ে তা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, তারা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী, যেমন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মতো অন্যদের কাজ করে এবং শেখায়। যেহেতু তারা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতাকে তাদের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের মনের শান্তি পেতে এবং অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের জন্য ইসলামে প্রয়োজনীয় ভাল কাজটি নিশ্চিত করার জন্য তাদের ভাল উদ্দেশ্য যথেষ্ট নয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে একজনকে অবশ্যই একটি ভাল উদ্দেশ্য অবলম্বন করতে হবে, যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং এটিকে ভাল কাজের সাথে যুক্ত করা উচিত, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে জাহান্নামের পথটি ভাল উদ্দেশ্যের সাথে রেখাযুক্ত। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব পরিহার করতে হবে একটি ভাল নিয়ত অবলম্বন করে এবং তাদের সকল কাজে সৎ কর্মের সাথে সমর্থন করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 204:

"... তবুও তিনি বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন।"

এটি অত্যন্ত ঝগড়াটে ব্যক্তিকেও বর্ণনা করে যে অন্যদের সাথে তর্ক করবে যখনই তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং মতামতকে চ্যালেঞ্জ করা হবে, এমনকি যদি তারা নিশ্চিত হয় যে তারা যার সাথে তর্ক করছে তার মতামতই সঠিক দৃষ্টিকোণ। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই নম্রভাবে ইসলামিক জ্ঞান অনুসারে অন্যদেরকে তাদের ভালো পরামর্শ ও মতামত প্রদান করা। তাদের

দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের পরে অন্যদের সাথে তর্ক বা বিতর্ক করা উচিত নয়। তারা লোকেদের তাদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না কারণ লোকেরা তাদের নিজের পছন্দ করতে স্বাধীন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শিক্ষক তথাপি তিনি অন্যদের কাছে সত্যকে সদয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু কখনই অন্য লোকেদের উপর তার মতামত জোর করবেন না। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং মনে করিয়ে দিন আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 205:

"এবং যখন সে চলে যায়, তখন সে সারা দেশে দুর্নীতি করতে এবং ফসল ও পশুদের ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করে..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম সর্বদা মুসলমানদেরকে সমাজের মধ্যে ভাল ছড়িয়ে দিতে শেখায়, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দান করা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, যেমন তাদের সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব। তারা যদি সমাজের মধ্যে ভালো কিছু ছড়াতে না পারে, তাহলে অন্যদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে খুশি হয়, তারা সর্বনিম্ন যা করতে পারে তা হল সমাজের মধ্যে ভালোর প্রতিবন্ধকতা এড়ানো।

দুঃখজনকভাবে, তারা মুসলিম যারা সমাজের মধ্যে ভালোকে ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং যারা সমাজের মধ্যে ভাল ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের প্রতি তাদের ঈর্ষার কারণে। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসার ঘটাতে হবে যখনই তারা তা করার সুযোগ পাবে এবং অন্ততপক্ষে তাদের অবশ্যই এতে বাধা এড়াতে হবে, কারণ এর চেয়ে নিরপেক্ষ থাকাই উত্তম।

মহান আল্লাহ অতঃপর এই বিপথগামী ব্যক্তির অহংকার তুলে ধরেন যে ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 206:

"এবং যখন তাকে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় কর, তখন পাপের অহংকার তাকে আঁকড়ে ধরে..."

যে সৎ উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সে কখনই সঠিক পথনির্দেশ পাবে না এবং ফলস্বরূপ তারা সেই পথে হাঁটবে যা উভয় জগতে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যার অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জাহান্নামে যাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 206:

"আর যখন তাকে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় কর" তখন পাপের অহংকার তাকে আঁকড়ে ধরে। তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

তাই অহংকার পরিহার করা অত্যাবশ্যক কারণ এটি একজনকে নিজেদের উন্নতির জন্য সংস্কার করতে বাধা দেয় যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে পারে, যা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের পথ। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"… তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 205-206:

" এবং যখন সে চলে যায়, তখন সে সারা দেশে বিপর্যয় ঘটাতে এবং ফসল ও পশুপাখি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ দুর্নীতি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর'…

এটি এও ইঙ্গিত করে যে, সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার রোধকারী প্রধান জিনিসটি হল মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং বিচার দিবসে জবাবদিহি করা। সমাজের অভ্যন্তরে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করার আরেকটি প্রধান বিষয় হল আইন। কিন্তু যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা দেশের আইন থেকে পালাতে পারে তখন একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়ই তাদের দুর্নীতির বিস্তার থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ যেমন সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাবের অপব্যবহার করা। ইসলামি জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভয়কে শক্তিশালী করা হয় যাতে কেউ দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারে যে তারা ইসলামি শিক্ষার মধ্যে আলোচিত অনেক উদাহরণ ও স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এই দুনিয়ায় বা পরকালে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না। এই আয়াতগুলি থেকে, কেউ নির্ণয় করতে পারে যে তারা সত্যই কতটা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতাকে যত বেশি তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তত কম তারা আল্লাহকে ভয় করে, এবং তাদের জবাবদিহিতাকে বিচারের দিন। অতঃপর

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 207

“এবং মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

এই আয়াতে মহান আল্লাহ উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ করেছেন। এই পথের মধ্যে একজনকে দেওয়া আশীর্বাদ, অভ্যন্তরীণ আশীর্বাদ, যেমন একজনের শারীরিক শক্তি এবং বাহ্যিক আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং এর ঐতিহ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 207:

" *আর মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়..."*

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করা উভয় জগতেই মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে কারণ মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ মহাবিশ্বের বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস। অতএব, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে আর কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

দ্বিতীয়ত, মানসিক শান্তি যেমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মাধ্যমে পাওয়া যায়, মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মানুষ যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তারা কখনই একটি নিখুঁত গঠনের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে না। আচরণবিধি যা তাদের একটি পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পেতে দেয় যা ফলস্বরূপ মানসিক এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এটি কেবল সম্ভব নয়, কারণ মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং তাদের দূরদর্শিতার অভাবের কারণে তারা তাদের পছন্দের ভবিষ্যত পরিণতি জানে না। এই সমস্ত এবং আরও বেশি কিছু যিনি জানেন একমাত্র তিনিই মহান আল্লাহ। অতএব, তিনি একাই সর্বোত্তম অবস্থানে আছেন মানুষের জন্য একটি আচরণবিধির পরামর্শ দেওয়ার জন্য, যা তিনি তৈরি করেছেন, যা অনুসরণ করার জন্য যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 14:

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্ম, সচেতন?"

অতএব, একমাত্র আচরণবিধি যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, তা হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধি, যা ইসলাম। এই আচরণবিধি মূল আয়াতের শেষে উল্লিখিত দয়ার একটি অংশ। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 207:

"...আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কাজ করেন, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের আচরণবিধি উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার পরিবর্তে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাহলে তারা ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে, যা তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তারা যদি কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে হবে, যদি তারা উভয় জগতে একটি হতাশাগ্রস্ত জীবন এড়াতে চায়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 207:

" *আর মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়..."*

প্রত্যেকেই নিজেকে বিক্রি করে, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, কোন না কোন উপায়ে। যেমন আলোচনা করা হয়েছে, মনের শান্তির চাবিকাঠি হল আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার গুরুত্বও নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে বা অন্যের সাথে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এই দুনিয়াতে বা পরকালে কোন পুরস্কার পাবে না, যেমন মহান আল্লাহ

পুরস্কার দেন। যারা শুধুমাত্র তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালো কাজ করে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"... সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে তাদের সন্তানদের লালন-পালনের মতো ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর সম্মতি চাওয়া উচিত। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে কেউ কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার প্রত্যাশা বা আশা করে না। অথচ যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে তার জানা উচিত, তারা কখনই মানুষকে পুরোপুরি খুশি করতে পারবে না, কারণ তারা স্বভাবগতভাবে চঞ্চল এবং অন্যদের প্রতি সহজেই অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং অকৃত্রিম ব্যক্তি মহান আল্লাহকেও খুশি করতে পারে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখেন, তিনি সহজেই তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন, কারণ তিনি যা চান তা করা সহজ এবং কর্মকারীর সম্পূর্ণ উপকার হয়। এবং মহান আল্লাহ, আন্তরিক ব্যক্তিকে মানুষের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যারা তাঁর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের আরেকটি কাজ এটি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 207:

"... আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

উপসংহারে, এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভের জন্য ইসলামের ন্যূনতম দৈনিক এবং বার্ষিক বাধ্যবাধকতার চেয়েও বেশি কিছু জড়িত, যেমন পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ। যদিও এই ন্যূনতমটি নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু মনের শান্তি তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হওয়া একটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলিম যারা ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে তাদের মানসিক শান্তি পেতে সংগ্রাম করে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 208-209

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে [এবং পরিপূর্ণভাবে] প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

অতঃপর যদি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তোমরা বিচ্যুত হয়ে যাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 208:

" *হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে [এবং পরিপূর্ণভাবে] প্রবেশ কর..."*

এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের উভয় অংশকে একত্রিত করতে হবে, যার অর্থ বাহ্যিক কর্ম দ্বারা সমর্থিত অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলো দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এই কর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অতএব, এমন কোন মুসলিম নেই যে ইসলাম চর্চা করে না, কারণ ইসলামের অনুশীলনে ব্যর্থ হওয়া মুসলিম শব্দের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। মূল আয়াতটি মুসলমানদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ইসলামের কোন দিকগুলি অনুসরণ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে এমন মনোভাব এড়িয়ে চলার বিষয়ে সতর্ক করে। এই সেই ব্যক্তি যে ইসলামকে একটি আবরণের মতো মনে করে এবং তাই যখনই ইচ্ছা তা পরে এবং খুলে ফেলে। এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য বা উপাসনা করে না, বরং তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার আনুগত্য করে এবং উপাসনা করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের কোন অংশগুলি অনুসরণ করা এবং উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়া এবং বেছে নেওয়াকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের কিছু অংশে অবিশ্বাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও একজন মুসলিম সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করার দাবি করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 84-85:

"আর [স্মরণ করুন] যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, [বলেছিলাম], "তোমাদের [অর্থাৎ, একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" অতঃপর আপনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করলেন। অতঃপর, তোমরাই সেই [একই ব্যক্তি যারা] একে অপরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের একটি দলকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করছ। এবং যদি তারা আপনার কাছে বন্দী হয়ে আসে, তবে আপনি তাদের মুক্তিপণ দিয়ে থাকেন, যদিও তাদের উচ্ছেদ আপনার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করেন এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করেন? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী আছে? এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইসলামী শিক্ষার অনুসরণীয় বিষয়গুলি বেছে নেয় এবং বেছে নেয়, সে কেবল উভয় জগতে নিজের জন্য অপমানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার সাথে আপস করে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপ, দুঃখ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। এবং তাদের মনোভাব যেমন তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, এটি উভয় জগতে তাদের কষ্ট, চাপ এবং অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দেবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যে ব্যক্তি বাছাই করে এবং বেছে নেয় কোন ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করবে বা উপেক্ষা করবে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সে তাদের শপথকৃত শত্রু শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, কারণ সে প্রথম ব্যক্তি যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল, যখন সে আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল, মহানবী হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 208:

"হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে [এবং পরিপূর্ণভাবে] প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে কখনোই ইহকাল বা পরকালে মানসিক শান্তি ও সাফল্য পাবে না।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের আরেকটি দিক হল যখন কেউ ধর্মীয় উদ্ভাবনের উপর কাজ করে যা নির্দেশনার দুটি উত্সের মধ্যে নিহিত নয়: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, এমনকি যদি তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর কাজ করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। . প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল আয়াতটি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন একদল সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা পূর্বে ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন, তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের শিক্ষার উপর আমল করতে চেয়েছিলেন যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী নয়। তাফসির আল কুরতুবী, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 531-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা

হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই ধাপে ধাপে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। উদাহরণ স্বরূপ, সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিকে কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সের উপর কাজ করার অভ্যাস রয়েছে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়বে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহান এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান হেদায়েতের দুটি উত্স ছাড়া অন্য থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর কিছু অভ্যাস এবং বিশ্বাস স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...এটি সলোমন ছিলেন না যিনি অবিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদু শেখায় এবং যা ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেন না যতক্ষণ না তারা বলেন, "আমরা একটি পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না।"..."

তাই একজন মুসলিম তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে এমনকি এটি উপলব্ধি না করেও, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এ কারণেই হিদায়াতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় এমন ধর্মীয় উদ্ভাবনের উপর কাজ করা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 208:

“হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে [এবং পরিপূর্ণভাবে] প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

209 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়ানোর চাবিকাঠি হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা। এটি যত বেশি করবে, তত বেশি তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে। এটি শয়তান থেকে সুরক্ষা এবং উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 42:

"নিশ্চয়ই আমার বান্দারা, তাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, তারা ছাড়া যারা তোমার অনুসরণ করে পথভ্রষ্টদের।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

এবং সি অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 209:

" *কিন্তু যদি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরেও তোমরা পিছলে [বিচ্যুত] হও...*"

অতএব, কোন ব্যক্তিকে কোন অজুহাত বাকি নেই, যেহেতু পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে এবং এই দিনে ও যুগে সহজলভ্য। অধিকাংশ মানুষের কাছে। যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার শিক্ষা ও আমলকে উপেক্ষা করে, সে মহান আল্লাহর ক্ষমতা থেকে রেহাই পাবে না এবং তারা উভয় জগতে তাদের পছন্দ ও কর্মের পরিণতি ভোগ করবে। এটি একটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলমান মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া

আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তারা কখনই মনের শান্তি পাবেন না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 209:

"কিন্তু যদি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তোমরা পিছলে [অর্থাৎ বিচ্যুত] হও, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী..."

কিন্তু মহান আল্লাহ যেমন সর্বজ্ঞানী, তিনি একাই শয়তান এবং তার অনেক ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যাতে মানুষ মানসিক শান্তি পেতে পারে। এই আচরণবিধি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। অতএব, একজনকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, কারণ তারা জানে যে এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, একজন মানব ডাক্তার ভুল করতে পারেন যেখানে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, এবং তিনি যা নির্দেশ

করেছেন তা মেনে নেওয়া এবং কাজ করা কেবলমাত্র উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 209:

"কিন্তু যদি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তোমরা পিছলে [অর্থাৎ বিচ্যুত] হও, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

এবং অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 57:

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 210-212

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

“তারা কি এ অপেক্ষা করে যে, আল্লাহ মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ তাদের কাছে আসবেন এবং বিষয়টি [অতঃপর] ফয়সালা করা হবে? আর আল্লাহর কাছে [সকল] বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

“বনি ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদের কত প্রমাণ দিয়েছি। আর যে আল্লাহর নেয়ামত তার কাছে আসার পর তা বিনিময় করে, তাহলে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তারা উপহাস করে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কেয়ামতের দিন তাদের উপরে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন বিনা হিসাব।"

মহান আল্লাহ, যখন তাকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার কথা আসে তখন তিনি বিলম্বের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও বরকত। তার উপর অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 210:

" *তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ তাদের কাছে মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ [এছাড়াও] আসবেন এবং বিষয়টি [তারপর] সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে? আর আল্লাহর কাছে [সকল] বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।"*

শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল মানুষকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি এবং তাদের জবাবদিহিতা করতে বিলম্ব করতে উত্সাহিত করা। তিনি তাদের উত্সাহিত করেন বস্তুগত জগত অর্জন এবং সুন্দর করার দিকে মনোনিবেশ করতে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং সম্পদ তাদের জাগতিক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে। এই মনোভাব সর্বদা একজনকে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ জিনিসগুলির জন্য দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। অতএব, শয়তান মানুষকে ইহকাল এবং পরকালের মানসিক শান্তি বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য অর্জন করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পড়া এড়াতে এবং একজনের অবশ্যম্ভাবী জবাবদিহিতার জন্য, তাদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে। যখন কেউ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত অগণিত নিদর্শন এবং স্পষ্ট প্রমাণগুলি অধ্যয়ন করে যা স্পষ্টভাবে এই পৃথিবীতে জীবনের অস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করে, তখন তারা আখেরাতের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুত হতে দেরি না করার জন্য উত্সাহিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ এমন একটি বাস্তবতার ইঙ্গিত দেন যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা এমন হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ব্যতীত [জগতে] অবস্থান করেনি..."

একজন ব্যক্তির বয়স নির্বিশেষে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার করবে যে তাদের জীবন এতদূর এক মুহুর্তের মধ্যে চলে গেছে। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে আরও কত বছর রেখে যাক না কেন, এটি কেবল একটি মুহূর্ত হবে। এটি একটি বাস্তবতা যা প্রায়শই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, ইসলামী শিক্ষা সত্যিই কাউকে বিশ্বাস করবে যে এই দুনিয়ার বিপরীতে, পরকালে দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 35:

"এটা এজন্য যে, তুমি আল্লাহর আয়াতকে উপহাস করে নিয়েছ এবং পার্থিব জীবন তোমাকে প্রতারিত করেছিল।" সুতরাং সেদিন তাদেরকে তা থেকে সরানো হবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 210:

" *তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ তাদের কাছে মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ আসবেন এবং বিষয়টি [অতঃপর] ফয়সালা করা হবে?...*"

এই পৃথিবীতে, কোনও আকারে বা আকারে, একজন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সুযোগ পান। উদাহরণস্বরূপ, একজন তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য কারো সাথে পুনরায় বিবাহ করতে পারেন এবং ফলস্বরূপ বিবাহের দ্বিতীয় সুযোগ পান। এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় সুযোগের এই বাস্তবতা মানুষকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করে যে কোনো না কোনোভাবে তাদের পরকালেও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু যারা ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে এবং তার উপর আমল করে তারা এই সত্যের উপর দৃঢ় হয়ে যায় যে পরকালে দ্বিতীয় কোন সম্ভাবনা নেই এবং তাই তাদেরকে বাস্তবিকভাবে দুনিয়াতে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখবে এবং তার উপর আমল করবে সে নিশ্চিত হয়ে উঠবে যে তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ এই দুনিয়ায় এবং পরকালে তাদের মঙ্গলকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে, কারণ সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। ইহকাল ও পরকালের বিচার। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 210:

"... *এবং আল্লাহর কাছে [সকল] বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।*"

এই ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে যে তারা যদি উভয় জগতের মানসিক শান্তি চায়, যা সমস্ত মানুষ চায়, তবে তা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে, কারণ তিনি একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ মহাবিশ্বের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। , মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এই আনুগত্যের মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এই মনোভাব একাই নিশ্চিত করবে যে একজন উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের অনিবার্য জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুত হতে দেরি করতে থাকে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে এবং তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও আফসোস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং c hapter 20 Taha, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

তাই একজন ব্যক্তিকে আখেরাতে তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে দেরি করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তাদের মৃত্যুর সময় অজানা এবং তারা যতদিন বেঁচে থাকুক না কেন, তাদের জীবন এক মুহুর্তের মধ্যে চলে যাবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি বয়স্ক হওয়ার পর ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তার জানা উচিত যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি প্রায়শই তাদের অভ্যাস এবং আচরণে একগুঁয়ে হয়ে ওঠেন এবং ইসলামিক শিক্ষাগুলো শেখার ও আমল করার চেষ্টা করলেও তাদের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করা অনেক কঠিন মনে হয়। . পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই তাদের পার্থিব চাহিদা এবং দায়িত্বগুলি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে পূরণ করতে হবে, কারণ এটি একটি ভাল কাজ যা তাদের বিচার দিবসে সাহায্য করবে, তবে ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার জন্য কিছু সময় উত্সর্গ করবে যাতে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমন তাদের সম্পদ, সময় এবং শক্তি, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যাতে তারা ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি লাভ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 210:

" *তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ তাদের কাছে মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ [এছাড়াও] আসবেন এবং বিষয়টি [তারপর] সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে? আর আল্লাহর কাছে [সকল] বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।"*

এই আয়াতটি তাদেরও সমালোচনা করে যারা দাবি করে যে তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করবে না এবং কাজ করবে না যতক্ষণ না সমস্ত বিষয়, যেমন ফেরেশতাদের মতো অদৃশ্য বিষয়গুলি তাদের কাছে দৃশ্যমান এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি একটি মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব কারণ ঈমানের প্রকৃত মূল্য রয়েছে যখন এটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবন না করে কিছু অদৃশ্য বাস্তবে বিশ্বাস করে,

যেমন মহান আল্লাহকে দেখা। কিন্তু তারপরও, এই অদেখা উপাদানগুলি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অনেক প্রমাণ এবং সূচক দ্বারা সমর্থিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি চিত্রকর্মের উপস্থিতি একজন চিত্রশিল্পীকে নির্দেশ করে। সৃষ্টির উপস্থিতি একজন স্রষ্টাকে নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন সৃষ্টি নিখুঁতভাবে সৃষ্টি হয়। এছাড়াও, এমন অসংখ্য পার্থিব জিনিস রয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তবুও তারা অভিযোগ ছাড়াই সেগুলি ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, অগণিত মানুষ ওষুধটি মানবদেহে কীভাবে কাজ করে তা না বুঝে বা না বুঝেই ওষুধ খান। যদিও ইসলামের মাধ্যমে মানবজাতিকে দেওয়া আচরণবিধি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, তবুও ইসলামের কিছু অন্যান্য দিক অদৃশ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, কারণ এটি বিশ্বাসকে মূল্য দেয়। এ কারণে যে ব্যক্তি অদৃশ্য উপাদান যেমন ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করে, তার ঈমানের দাবি মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, কারণ এসব অদেখা বিষয়ের সাক্ষী হয়ে গেলে বিশ্বাস করা বিশেষ কিছু নয়।

মানুষের পরীক্ষা নিহিত যে তারা বাস্তবতাকে স্বীকার করে কিনা যদিও তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে না এবং তা গ্রহণ করার পর তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও তাদের অবাধ্য হওয়ার শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। মহানবী (সাঃ) প্রেরণের ক্ষেত্রে এবং আসমানী কিতাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সর্বদাই মানুষের বিচার ক্ষমতা এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করার সুযোগ রেখে দিয়েছেন। তিনি কখনোই বাস্তবতাকে এমন মাত্রায় প্রকাশ করেননি যে, মানুষ অনিবার্যভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হবে। কারণ তা করা হলে কিছুই পরীক্ষা করা বাকি থাকবে না এবং মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার ধারণাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অতএব, এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, মানুষ যেন আল্লাহ, মহান এবং তাঁর ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে। যদি তা ঘটত তবে এটি সবকিছুর সমাপ্তি চিহ্নিত করবে এবং লোকেদের কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না। মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা কেবল ততক্ষণ মূল্যবান, যতক্ষণ না বাস্তবতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে তার প্রত্যাখ্যান সম্ভব হয়। সত্য যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হত এবং মানুষ যদি মহাবিশ্ব ও পরকালের অদৃশ্য উপাদানগুলি দেখতে পেত তবে তাদের বিশ্বাস ও

আনুগত্যের খুব বেশি মূল্য থাকত না। যদি এই সমস্ত জিনিস শারীরিকভাবে পরিলক্ষিত হয়, এমনকি সবচেয়ে একগুঁয়ে অবিশ্বাসী এবং সবচেয়ে খারাপ পাপীরাও অবিশ্বাস বা অমান্য করবে না। বিশ্বাস এবং আনুগত্য গ্রহণের মূল্য তখনই থাকে যতক্ষণ না বাস্তবতার উপর আবরণ থাকে। যে মুহূর্তটি বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে তা লোকেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এবং তাদের পরীক্ষার সময়কালের সমাপ্তি চিহ্নিত করবে। এই মুহূর্তটি বিচারের দিন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 210:

" *তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ তাদের কাছে মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ [এছাড়াও] আসবেন এবং বিষয়টি [তারপর] সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে? আর আল্লাহর কাছে [সকল] বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।"*

এই আয়াতটি স্পষ্টতই বিচার দিবস এবং এর অনিবার্য প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজনকে অবশ্যই এর বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে এবং এর জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতে হবে। তারা অবশ্যই এই আয়াতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি, যেমন বিচার দিবসে মহান আল্লাহর আগমন, কারণ তার সত্তাকে কোনো প্রাণীর দ্বারা অনুমান করা যায় না। এই বিষয়ে আলোচনা বা ব্যাখ্যা করার যেকোন প্রচেষ্টা কখনই মহান আল্লাহর সাথে ন্যায়বিচার করবে না এবং তাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত। উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বা অনুরূপ বিষয়গুলি বিচার দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, সেহেতু বিচার দিবসে যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, যেমন তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা উচিত। এবং দায়িত্ব। দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত মুসলিমরা তাদের সময়কে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য উৎসর্গ করেন, মহান আল্লাহ তারা কি চান তাতে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে। এই আয়াতের ব্যাপারে, মহান আল্লাহ চান না যে

মানুষ বিচারের দিন ঠিক কীভাবে আসবেন তার প্রতি মানুষের কর্মের বিচার করার জন্য, বরং তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করুন। মহান আল্লাহ, এই আয়াতে বিচার দিবসের গাম্ভীর্যকে মহিমান্বিত করার জন্য নিজেকে উল্লেখ করেছেন, যাতে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে এবং বিচার দিবসে তাঁর আগমন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সূক্ষ্ম বিবরণে অধ্যয়ন করে না।

বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণটি তখন কিতাবের লোকদের প্রতি নির্দেশিত হয় কারণ তাদের পূর্বপুরুষ, ইসরায়েলের সন্তানদেরকে অগণিত অলৌকিক নিদর্শন দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের কাছে বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করার কোন কারণ ছিল না। তারা সম্পর্কে জানত এবং গর্বিত ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 210-211:

“তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ তাদের কাছে মেঘের আবরণে এবং ফেরেশতাগণ আসবেন এবং বিষয়টি [অতঃপর] ফয়সালা হয়ে যাবে? এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর আমরা তাদের কত প্রমাণ দিয়েছি..."

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে অনেক নিদর্শন দিয়েছেন যা নির্দেশ করে যে জীবন কোন গতিতে চলে যায় এবং তাই দেরী না করে বাস্তবিকভাবে বিচার দিবসের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

উপরন্তু, বইয়ের লোকেরা আরও এগিয়ে গিয়েছিল কারণ তাদের অনেক আলেম প্রকাশ্যে ইসলামকে অস্বীকার করেছিলেন যদিও তারা পবিত্র কুরআনকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআন উভয়ই তাদের ঐশী কিতাবের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানকে সম্পাদনা, অপব্যাখ্যা এবং লুকিয়ে রেখেছিল যা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, কারণ ইসলাম সরাসরি তাদের জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাদের আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয়। পার্থিব লাভের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব। উপরন্তু, যেহেতু তাদের বিশ্বাস বংশের গভীরে প্রোথিত ছিল, বিশেষ করে ইহুদি বিশ্বাস, তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারেনি, কারণ তিনি তাদের বংশধর, ইস্রায়েলের সন্তান নন। তাকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করলে

তারা মহানবী ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর হওয়ায় তাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার মিথ্যা দাবীটি ধ্বংস হয়ে যেত। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

তাই তারা তাদের প্রদত্ত সুস্পষ্ট নিদর্শন বিনিময় করেছে যা তাদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত ছিল এবং তাই কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারা পরিবর্তে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করা বেছে নিয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 211:

"বনি ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদের কত প্রমাণ দিয়েছি। আর যে আল্লাহর অনুগ্রহ তার কাছে আসার পর তা বিনিময় করে, তাহলে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা বা উপেক্ষা করে কিতাবধারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা পার্থিব লাভের জন্য তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে পারে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে পারবে না , যদিও এই পৃথিবীতে তাদের কাছে এটি স্পষ্ট নয়। তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, যেমন সম্পদ, খ্যাতি এবং নেতৃত্ব, উভয় জগতেই চাপ, দুঃখ এবং অসুবিধার উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারে না। মহান আল্লাহর। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

উপরন্তু, তাদের পার্থিব শাস্তি তখনই বাড়বে যখন তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জন্য তাদের জীবনের মধ্যে ভুল লোক এবং জিনিসগুলিকে দোষারোপ করতে শুরু করবে, যেমন বিষণ্নতা। ফলস্বরূপ, তারা এই ভাল মানুষ এবং জিনিসগুলিকে তাদের জীবন থেকে কেটে ফেলবে, যেমন তাদের জীবনসঙ্গী, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তুলবে যতক্ষণ না তারা হতাশা, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় হারিয়ে যায়। এই ফলাফলটি বেশ সুস্পষ্ট যখন কেউ ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার এই ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এবং পরকালে যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা আরও কঠিন, যদি না কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 211:

"... *আর যে আল্লাহর অনুগ্রহ তার কাছে আসার পর তা বিনিময় করে, তাহলে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"*

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অনেক মানুষ এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্য পতিত হয় এবং ফলস্বরূপ তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত..."

যদিও এই আয়াতে অমুসলিমদের কথা বলা হয়েছে, তবুও এটি একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যখন তারা অমুসলিমদের মনোভাব ও চরিত্র অবলম্বন করে। অতএব, ইসলামী শিক্ষা যদি একজন ব্যক্তির পার্থিব ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করে, তবুও তাদের নিজের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য তা মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। কিন্তু এই রোগী যেমন ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করলে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়বে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং বাস্তবে সেগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয় সেও হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত..."

আয়াতের এই অংশটি নিষ্ক্রিয় আকারে থাকায়, যিনি জড়জগতকে সুন্দর করেছেন তার কথা বলা হয়নি। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যিনি তাদের পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মানবজাতির জন্য বস্তুগত জগতকে সুন্দর করেছেন। পরীক্ষা হচ্ছে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদগুলোকে প্রদত্ত তা সঠিকভাবে ব্যবহার করবে কি না, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7:

"নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম।"

বস্তুগত জগতকেও শয়তান এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান দ্বারা সুশোভিত করা হয়, কারণ তারা একত্রে কাজ করে যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা উভয় জগতেই চাপ এবং দুর্দশা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 208:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে [এবং পরিপূর্ণভাবে] ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

বস্তুগত জগতটি অন্যান্য মানুষ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি দ্বারাও সুশোভিত। এই জিনিসগুলি অন্যায়ভাবে লোকেদের শেখাবে যে প্রকৃত সাফল্য এবং মানসিক শান্তি একজনের পার্থিব ইচ্ছা পূরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করা। অতএব, পরীক্ষা হল যে কেউ সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণগুলি অনুসরণ করবে, যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে বা তারা এই পার্থিব জিনিসগুলি অনুসরণ করে এবং তাই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে কিনা। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত..."

একজন মুসলমান বস্তুজগতের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করতে পারে যা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, যার মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং আমল করা জড়িত। এটি তাদের এই বিশ্বের প্রকৃত প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বুঝতে অনুমতি দেবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7:

" নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম।"

যিনি এই জগতের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বোঝেন তিনি এর মধ্যে সঠিকভাবে কাজ করার সম্ভাবনা বেশি। তারা জড়জগতকে পরিত্যাগ করবে না এবং এর মধ্যে থাকা নেয়ামতের অপব্যবহারও করবে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদ ব্যবহার করবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হবে, সে দুনিয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ, তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে।

দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে জাগতিক আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার ইতিবাচক পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ এবং বুঝতে দেয়। অথচ যার ঈমান দুর্বল সে তাদের দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার নেতিবাচক পরিণতি লক্ষ্য করতে পারবে না। যার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং এই পৃথিবীতে দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী তাদের মধ্যে পার্থক্য দুটি লোকের মতো যাদেরকে বিষ মেশানো খাবার দেওয়া হয় যা সুস্বাদু দেখায়, যেমন চকোলেট কেক। জ্ঞানে যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সে বিষকে চিনবে এবং তাই ভোজন পরিহার করবে। যেখানে দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী সে বিষ

চিনতে ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের পছন্দের পরিণতি চিনতে ব্যর্থ হয়ে আনন্দের সাথে খাবার খাবে। যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে জানে যে এই পৃথিবীতে তাদের কী উপকার হবে এবং কী তাদের বিষাক্ত করবে, যদিও এটি সুন্দর দেখায়। ফলে তারা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে দুনিয়ার উপকার করবে। অথচ যে দুর্বল ঈমানের অধিকারী সে পার্থিব জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবে যা তাদের ক্ষতি করে এমন জিনিস থেকে তাদের উপকার করে। ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতে তাদের নিজস্ব মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার ক্ষতি করবে। দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিকেও সমালোচনা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে তারা কিছু পার্থিব জিনিস থেকে বিরত থাকার জন্য এবং জাগতিক জিনিসগুলিকে তাদের নিজের ইচ্ছা পূরণের পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার জন্য বোকা। . তাদের সমালোচনার মূলে রয়েছে এই জগতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে তারা উপহাস করে..."

মুসলমানরা যখন অমুসলিমদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে, তখন তারাও তাদের কর্মের মাধ্যমে যারা সত্যিকারের ইসলামে বিশ্বাসী তাদের প্রতি এমন আচরণ করে। দুঃখজনকভাবে, এই সমালোচনা প্রায়ই একজনের আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে যখনই একজন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার জন্য তাদের উত্সর্গে অটল থাকতে হবে কারণ মহান আল্লাহ, তারা অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমর্থনের অভাবকে এমনভাবে পূরণ করবেন যা অকল্পনীয়। মহান আল্লাহর সমর্থনের মাধ্যমে, এই মুসলিম অন্য সকলের থেকে স্বাধীন হয়ে উঠবে, বিশেষ করে যারা ইসলামের প্রতি তাদের উৎসর্গের জন্য তাদের সমালোচনা করেছিল এবং তাদের মানসিক শান্তি দেওয়া হবে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি এমন একজন রোগীর মতো যে তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী এবং পরিবর্তে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করতে থাকে। স্বল্পমেয়াদে তারা কিছু মজা এবং বিনোদনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তারা মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভুগবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি তাই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা কেবলমাত্র উভয় জগতেই চাপ, সমস্যা এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যাবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে সেই জ্ঞানী রোগীর মত যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, জেনেও যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদেরকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে এবং এর মাধ্যমে তাদের দেওয়া নেয়ামতগুলোকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে, কারণ এটি উভয় জগতে তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম। ফলে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তারা উপহাস করে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কেয়ামতের দিন তাদের উপরে..."

উপরন্তু, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনেক পার্থিব জিনিস দান করা বা পার্থিব জিনিস কম থাকা এই লক্ষণ নয় যে, মহান আল্লাহ কাউকে ভালবাসেন বা অপছন্দ করেন। যেখানে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা ধরে নেবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছে প্রিয়, যখন তাদেরকে পার্থিব জিনিস, যেমন ধন-সম্পদ প্রদান করা হবে এবং ফলস্বরূপ, এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস তাদেরকে কেবল তাদের অনুগ্রহের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। মঞ্জুর এটি পরিবর্তে উভয় জগতে তাদের চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা বাড়িয়ে তুলবে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।"

পার্থিব আশীর্বাদ শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা হিসাবে মঞ্জুর বা আটকানো হয়. পরীক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কি না, ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। অথবা তারা কি কঠিন সময়ে ধৈর্য প্রদর্শন করবে, যার মধ্যে একজনের কথা বা কর্মের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, জেনে রাখা যে তিনি মানুষের জন্য সর্বোত্তম কোনটি বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী কেবলমাত্র এই বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে এবং তাই সহজ ও অসুবিধা উভয় সময়েই সঠিক আচরণ করবে, যার ফলে উভয় জগতেই বরকত ও করুণা আসে। এটি সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 212:

"... আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন বিনা হিসেব।"

তাই আলোচ্য উপকারিতা পেতে এবং আলোচিত বিপদ-আপদ এড়াতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান অর্জন করতে হবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 213-214

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

“মানবজাতি [তাদের বিচ্যুতির আগে] এক ধর্ম ছিল; অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতানৈক্য করে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। আর কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করেনি ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল - তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর - নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। আর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছিলেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, তাঁর অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

অথবা আপনি কি মনে করেন যে, আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন অথচ এমন [পরীক্ষা] এখনও আপনার কাছে আসেনি যা আপনার পূর্ববর্তীদের উপর এসেছে? তারা দারিদ্র্য ও দুর্দশা দ্বারা ছুঁয়ে গেল এবং কেঁপে উঠল যতক্ষণ না [এমনকি তাদের] রসূল এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন? নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"

মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে ইসলামের সামগ্রিক বাণী নতুন কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি প্রাচীন বার্তা ছিল যা মানবজাতিকে একটি নিখুঁত আচরণবিধি প্রদানের লক্ষ্যে ইতিহাস জুড়ে বহুবার বিতরণ করা হয়েছিল যাতে তারা উভয় জগতে ঐক্য, ন্যায়বিচার, মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

" *মানবজাতি [তাদের বিচ্যুতির আগে] এক ধর্ম ছিল; অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতানৈক্য করে তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারে..."*

একতা, ন্যায়বিচার, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য ঐশী আচরণ ব্যতীত অর্জন করা যায় না। এর কারণ হল এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং ভবিষ্যত ঘটনা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান না থাকায় তারা একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের উপর যে আচরণবিধি তৈরি করে তার পরিণতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। যেমন, আজ পর্যন্ত মানবজাতি মানুষের মন ও দেহের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি, তাহলে তারা কীভাবে এমন আচরণবিধির পরামর্শ দেবে যা মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য অর্জন করবে যা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়? একমাত্র যিনি এই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানুষের প্রকৃতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা নিরবধি, তিনিই তিনি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে এবং অন্য সব কিছু সম্পর্কে জানেন, যথা, মহান আল্লাহ। এটি একটি বাস্তবতা যা ইতিহাস জুড়ে প্রমাণিত। ইতিহাসের বেশিরভাগই এমন সমাজে পূর্ণ যা ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছিল এবং এটি স্পষ্ট যে কীভাবে সেই সমাজগুলি প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হলেও তারা কখনই মানসিক শান্তি এবং ন্যায়বিচার পায়নি। অথচ, ইতিহাসের কয়েকটি সমাজ যারা ঐশ্বরিক শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন

করেছে তারা ন্যায়বিচার, ঐক্য ও মানসিক শান্তি অর্জন করেছে। সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং ঐক্যের ক্ষেত্রে, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একটি আচরণবিধি সর্বদা পক্ষপাতমূলক হবে এবং একদল লোককে অন্যের উপর পক্ষপাতী করবে, যেমন ধনীদের অন্য সকলের উপর পক্ষপাতী করা। উপরন্তু, সমাজের মধ্যে মানবসৃষ্ট আইন তৈরি এবং বাস্তবায়নের ভবিষ্যত পরিণতি মানুষের অদূরদর্শিতার কারণে অজানা, এমনকি যদি সমাজে নতুন আইনের প্রভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। একমাত্র যিনি একটি নিরপেক্ষ আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যেখানে প্রতিটি আইন বৃহত্তর সমাজের উপকারের নিশ্চয়তা দেয়, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, তিনি হলেন মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

"... *আর কেউই এ নিয়ে মতভেদ করেনি [অর্থাৎ, কিতাব] ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল - তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে - নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে...*"

যখনই মানুষ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছে, যেমন সম্পদ অর্জন এবং নেতৃত্ব, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিন্ন, চ্যালেঞ্জ এবং ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছে। এটি অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করে এবং সমাজের বাকি অংশকে সঠিক ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর কাজ করতে বাধা দেয়, কারণ প্রতিটি ঈর্ষান্বিত পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে স্বর্গীয় শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের নিজস্ব দল তৈরি করার জন্য, যাতে তারা নেতৃত্ব পেতে পারে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ এটি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সুনানে

ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 52-53:

"এবং অবশ্যই, এটি, তোমাদের ধর্ম, একটি ধর্ম এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, সুতরাং আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা [অর্থাৎ জনগণ] তাদের মধ্যে তাদের ধর্মকে ভাগে ভাগ করেছে [অর্থাৎ, দলাদলি] - প্রতিটি দল, যা আছে তাতে আনন্দ করছে।"

পূর্ববর্তী জাতিগুলি ধর্মের মধ্যে একটি শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যাতে তারা নেতৃত্ব এবং সম্পদ পেতে পারে। তারা আল্লাহ, পরাক্রমশালী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে দ্বাররক্ষক হিসাবে আচরণ করেছিল এবং এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তারা অন্ধভাবে অনুসরণ ও খুশি করার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। মুসলিম জাতিও এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল যখন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বিভেদে না পড়ে এবং পরিবর্তে আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করার জন্য যা তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 105:

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর বিভক্ত ও মতভেদ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

মূল আয়াতে যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, মহানবীগণ, শান্তি তাঁদের উপর, যেখানে পথপ্রদর্শকরা সঠিক পথ দেখিয়েছেন যা উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্যের

দিকে নিয়ে যায়। তারা দারোয়ানের মতো আচরণ করেনি যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য মানুষকে খুশি করার জন্য দাবি করেছিল। একজন মুসলমানকে ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখতে ও তার ওপর আমল করার জন্য এমন শিক্ষক খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই ধরনের পণ্ডিতদের এড়িয়ে চলতে হবে যারা তাদের নিজেদের দলগুলোর প্রচার করে এবং লোকেদের তাদের সাথে যোগ দিতে উৎসাহিত করে এবং তাদের আচরণবিধি অন্ধভাবে অনুসরণ করে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সঠিক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা ঐক্যের দিকে নিয়ে যায়। সমাজের মধ্যে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

"...আর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, তাঁর অনুমতিক্রমে..."

কিন্তু এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে খোলা মন নিয়ে ইসলামিক শিক্ষাগুলি শেখার এবং তার উপর কাজ করার চেষ্টা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

"... আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।"

এবং অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

"... *আর কেউই এ নিয়ে মতভেদ করেনি [অর্থাৎ, কিতাব] ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল - তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে - নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ...*"

ঈর্ষা যা অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায় তা এড়ানো যায় যখন মানুষ, বিশেষ করে আলেম ও সমাজের নেতারা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করে। এর অর্থ হল, তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যেমন সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এতে সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার ও ঐক্যের বিস্তার নিশ্চিত হবে। এবং এই একমাত্র উপায় তারা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা

তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাহলে তারা যা কিছু পাবে তা উভয় জগতে তাদের জন্য কেবল চাপ, দুঃখ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারে না এবং তাদের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে। পছন্দ অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের মনোভাব মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছে, কারণ তিনি একাই মানুষের জন্য পার্থিব আশীর্বাদ বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি তাই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা অন্য কাউকে তা প্রদান করার পরিবর্তে একটি বিশেষ আশীর্বাদ

প্রদানে ভুল করেছেন। এ কারণেই হিংসা মহাপাপ। একজন মুসলমানকে বরং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, জেনে রাখা উচিত যে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং অন্য লোকেদের যা দেওয়া হয়েছে তা তাদের জন্য সর্বোত্তম। এটি তাদের ঈর্ষার অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে, যেমন মানসিক চাপ এবং উভয় জগতের শাস্তি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 213:

"...এবং এ বিষয়ে [অর্থাৎ, কিতাব] কেউই মতভেদ করেনি তারা ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল - তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে - নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। আর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, তাঁর অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।"

নবী-রাসুল (সাঃ) এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রতিটি প্রজন্মের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যখন এটি ঘটেছিল, তখন তাদের মধ্যে ঘর্ষণ এবং সংঘাত অনিবার্য ছিল তাই, মহান আল্লাহ, এই সংঘাতের সময় মুসলমানদেরকে দৃঢ় থাকার জন্য উত্সাহিত করেন, কারণ এটি বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে একটি প্রাচীন পুরানো যুদ্ধ যা অনিবার্যভাবে প্রতিটি প্রজন্মে ঘটে।
অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 214:

" *অথবা আপনি কি মনে করেন যে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন যখন এমন [পরীক্ষা] এখনও আপনার কাছে আসেনি যা আপনার পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল? ..."*

অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো, ইসলাম এমন ভান করে না যে এর অনুসারীদেরকে পৃথিবীতে জান্নাত এবং পরকালে জান্নাত দেওয়া হবে। পরিবর্তে, এটি স্পষ্ট করে যে বিশ্বাস গ্রহণ করা পরীক্ষার সাথে আসে, কারণ এই পরীক্ষাগুলিই প্রমাণ করার একমাত্র উপায় যে কে সত্যিকারের বিশ্বাসের অধিকারী এবং কে নেই। ঠিক যেমন পরীক্ষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় যে কোন শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষে স্নাতক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী এবং কোন ছাত্রদের নেই। যদিও মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই জানেন কে একজন প্রকৃত ঈমানদার, তবুও তিনি তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের বিচার করেন তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মের ভিত্তিতে। অতএব, একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কর্মকে প্রকাশ করার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন । অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 179:

"আল্লাহ মুমিনদেরকে আপনি [বর্তমানে] যে অবস্থায় আছেন সেখানে ছেড়ে দেবেন না যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে পৃথক করেন..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 214:

" *অথবা আপনি কি মনে করেন যে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন যখন এমন [পরীক্ষা] এখনও আপনার কাছে আসেনি যা আপনার পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল? ...*"

উপরন্তু, পরীক্ষা ছাড়া, এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"*[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম...*"

পরীক্ষা একজনকে জীবনের উভয় দিকই অনুভব করতে দেয়: স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এবং অসুবিধার সময়। পরীক্ষা হল কেউ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং অসুবিধার সময় ধৈর্য্য প্রদর্শন করে কি না। কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে তা আন্তরিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করা, কারণ মানুষের জন্য কাজ করা মহান আল্লাহ দ্বারা পুরস্কৃত হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতার মধ্যে ভালো কথা বলা বা চুপ থাকাও অন্তর্ভুক্ত। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথা বা কর্মের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, জেনে রাখা যে তিনি সর্বোত্তম কোনটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া মুসলমানদের জন্য অনন্য নয় এবং এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি প্রজন্মের প্রত্যেক ব্যক্তি মুখোমুখি হয়েছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 214:

"অথবা আপনি কি মনে করেন যে, আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন অথচ এমন [পরীক্ষা] এখনও আপনার কাছে আসেনি যা আপনার পূর্ববর্তীদের উপর এসেছে? তারা দারিদ্র্য ও কষ্টের দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছিল এবং তারা কেঁপে উঠেছিল যতক্ষণ না [এমনকি তাদের] রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন?" ..."

এই বাস্তবতা বোঝা এই পৃথিবীতে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া সহজ করে তোলে, কারণ সমগ্র মানবজাতি কোনো না কোনো আকারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন মনোভাব পরিহার করতে হবে যাতে তারা এমন আচরণ করে যেন তারাই কেবল সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের দিকেও তাকাতে হবে, যাতে সকল মানুষকে, বিশেষ করে যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের চেয়েও বেশি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এটি একজনকে ধৈর্য্য

ধরে রাখতে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা তাদের আরও বেশি কষ্টের সাথে পরীক্ষা না করে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের সামর্থ্যের বাইরে পরীক্ষা করেন না, তাই ধৈর্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়ার কোন অজুহাত নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

জীবনের পরীক্ষা নিয়তি হওয়ায় এরা কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

অতএব, একজন ব্যক্তি হয় অসুবিধার সময় অধৈর্য দেখাতে পারে এবং একটি অগণিত পুরস্কার হারাতে পারে অথবা তারা ধৈর্যের সাথে অসুবিধা অনুভব করতে পারে এবং একটি অগণিত পুরস্কার পেতে পারে। যেভাবেই হোক, তারা অনিবার্য অসুবিধার মুখোমুখি হবে তাই এটির সাথে একটি অগণিত পুরষ্কার পাওয়া বোধগম্য। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ সকল মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা নিকটবর্তী, বিশেষ করে যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করার চেষ্টা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 214:

"... যতক্ষণ না [তাদের] রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন? নিঃসন্দেহে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অনুসারে হয়ে থাকে। অতএব, তাঁর সাহায্য সর্বোত্তম সময়ে এবং জড়িতদের জন্য সর্বোত্তম উপায়ে আসে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ঐশ্বরিক সাহায্য একজন ব্যক্তি যেভাবে প্রত্যাশা করে সেভাবে আসে না, কারণ তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কী সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং প্রায়শই ভাগ্য এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে সমর্থনের অভাবের সমালোচনা করে, যখন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সাহায্য তাদের কাছে আসে না। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং গ্রহণ করা নিজেই একটি পরীক্ষা যা মুসলমানদের অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা বজায় রাখতে চায়, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 215

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তারা কি ব্যয় করবে? বল, "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

মূল আয়াতের শুরুতে ইসলামী ও পার্থিব জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে…"*

ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে বিষয়গুলিকে অবশ্যই গবেষণা ও অধ্যয়ন করতে হবে তা হল সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি যা মহান আল্লাহ বিচার দিবসে মানুষকে প্রশ্ন করবেন, যেমন একজন প্রতিবেশীর সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং কেবল একজন ব্যক্তির সময় নষ্ট করে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে তাদের শক্তি উৎসর্গ করার অবস্থানে থাকা একমাত্র তারাই যারা ইতিমধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে কাজ করেছেন। যেহেতু এটি করা কার্যত অসম্ভব, তাই মানুষকে অবশ্যই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, সময় এবং শক্তিকে ধর্মীয় জ্ঞানের সেই শাখাগুলির উপর গবেষণা এবং কাজ করার জন্য কেন্দ্রীভূত করতে হবে যেগুলিকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে এবং বাকি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এবং একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উদাহরণ তারপর মূল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে..."*

এই ক্ষেত্রে ব্যয় করা বোঝায় যে কীভাবে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে এবং সেইজন্য অন্যান্য জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সময় এবং শক্তি, শুধু সম্পদ নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তারা কি ব্যয় করবে? বল, "তোমরা যা কিছু ভালো ব্যয় কর..."*

উত্তম অর্থ ব্যয় বলতে বোঝায় যে আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করাকে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ভালো খরচ করা এবং আশীর্বাদ ব্যবহার করা অন্য কোনো মান দ্বারা বিচার করা হয় না, যেমন ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা কারো ইচ্ছা। অন্যথায়, যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা অপব্যবহার করা হবে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে এমনকি যদি একজন ব্যক্তি মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অথচ, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, তিনি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভ করবেন, যিনি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তি, তারা এটি প্রাপ্ত নিশ্চিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তার নিজের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের

জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই জ্ঞানী রোগী যেমন সুস্থ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, তেমনি ইসলামের উপদেশ গ্রহণকারী ও আমলকারী ব্যক্তিও লাভ করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তারা কি ব্যয় করবে? বল, "তোমরা যা কিছু ভালো ব্যয় কর..."*

ভাল জিনিস খরচ করা হালাল জিনিস প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করাও নির্দেশ করে। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল জিনিস প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যদি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের ভিত্তি কলুষিত হয় তবে তারা যা কিছু করবে তা কলুষিত হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে, এমনকি যদি সেগুলি ভাল কাজ হিসাবে দেখা যায়। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই হারাম জিনিসগুলি এড়িয়ে চলতে হবে মনে রাখবেন যে মহান আল্লাহ, তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিজিক বরাদ্দ করেছিলেন এবং এটিকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

" এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি তার বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সব একটি পরিষ্কার রেজিস্টারে আছে. "

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের অর্ধেক পূরণ করতে হবে তাদের প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যেমন তাদের শক্তি, হালাল রিযিক লাভ করার জন্য এবং আস্থা অর্জন করতে হবে যে মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছেন যে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন তারা তাদের হালাল রিজিক পাবে। বিশ্ব

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... *বলুন, "তোমরা যা কিছু ভালো কিছু ব্যয় কর তা পিতামাতার জন্য..."*

সর্বাগ্রে মঙ্গলতা অবশ্যই একজনের পিতামাতাকে তাদের লালন-পালনের জন্য কৃতজ্ঞতার একটি কাজ হিসাবে দেখাতে হবে। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 14:

"...আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; আমার কাছে [চূড়ান্ত] গন্তব্য।"

যদিও সমস্ত আশীর্বাদের উৎস মহান আল্লাহ, তবুও তিনি প্রায়শই অন্য লোকদের ব্যবহার করেন মানুষের কাছে তাঁর আশীর্বাদ জানাতে, যেমন একজনের পিতামাতা। অতএব, অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি দিক। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। পিতামাতার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে, একজনকে অবশ্যই তাদের সর্বদা সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতে হবে এবং তাদের সাথে তাদের আচরণ করার লক্ষ্য রাখতে হবে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সম্ভাব্যতা অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য। বাচ্চাদের তাদের পিতামাতার সাথে অসম্মতি জানানোর অনুমতি রয়েছে, তবে এটি অবশ্যই সম্মান এবং শিষ্টাচারের সাথে করা উচিত। ইসলামে পিতা-মাতা বা অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য করার মতো কিছু নেই। তাদের কখনই তাদের পিতামাতার আনুগত্য করা উচিত নয় যদি এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং এর পরিবর্তে তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার জন্য মৃদুভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন শিশুকে অবশ্যই তাদের পিতামাতার অধিকারগুলো ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পূরণ করতে হবে, সংস্কৃতি, ফ্যাশন, সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী নয়। প্রায়শই মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মান বিরোধী। লোকেরা, এমনকি তাদের পিতামাতার কাছ থেকে তারা যে সমালোচনা পাবে তা নিয়ে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না তারা তাদের পিতামাতার অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানগুলি মেনে চলে। একজন মুসলিমের সবসময় তাদের পিতামাতার আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই, এমনকি বৈধ বিষয়েও, যদি এর অর্থ তাদের পিতামাতাকে খুশি করার জন্য তাদের নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়া হয়, যতক্ষণ না তারা আদব এবং সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। সর্বদা অন্য লোকেদের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়া প্রায়শই তিক্ততা এবং দুঃখের দিকে নিয়ে যায়। একটি শিশুকে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করতে হবে, তারা যা কিছু করে তার জন্য তাদের পিতামাতা বা অন্য

লোকেদের নয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার পাবে, কারণ আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের পিতামাতার জন্য কাজ করে সে দেখতে পাবে যে লোকেরা সাধারণত অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা যে প্রশংসা এবং স্বীকৃতি তাদের প্রাপ্য এবং আশা করে তা পায় না। এটি তাদের তিক্ত করে তুলবে, বিশেষ করে যদি তারা তাদের পিতামাতার সুখের জন্য তাদের সুখ বিসর্জন দেয়। তিক্ততা মানুষকে মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেয়, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... *বলুন, "তোমরা যা কিছু কল্যাণ ব্যয় করবে তা পিতামাতা এবং আত্মীয়দের জন্য..."*

মহান আল্লাহ সর্বদা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বব্যাপী উপদেশ প্রদান করেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে একজনের আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণের আহ্বান জানান, কারণ শুধুমাত্র এই একক উপদেশের উপর কাজ করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সদয় আচরণ করে, তাহলে বাইরের কোনো উৎস থেকে অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ করা হবে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দেরকে ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোন বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং দোষারোপ করার যোগ্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয়, আজকে অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসটি তাদের সাহায্য করছে তা ভাল বা খারাপ তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিম্নলিখিত আয়াতে উপদেশ দেওয়া ক্রম মেনে চলতে হবে এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দেরকে সাহায্য করতে হবে যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে যুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, 83:

"... *আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং আত্মীয়দের সাথে..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যরা

তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। লোকেদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি ভাল আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানকে বিরোধী করে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আত্মীয়দের অধিকার পূরণ করতে হবে, তারা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ভাল আত্মীয় হিসাবে বিবেচিত হোক বা না হোক। পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কখনই পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পার্থিব কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। উপরন্তু, যদিও একজন মুসলমান ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবে কোন অংশে কম নয়, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ভাল জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করা এবং খারাপ বিষয়ে সতর্ক করা। তাদের আত্মীয়কে তাদের বিপথগামী থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... *বলুন, "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য..."*

এতিমদের প্রায়ই ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা প্রায়শই তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের সাহায্য করবে।

এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই দিন এবং যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে সেট আপ করতে পারে। এবং স্পনসরশিপের পরিমাণ প্রায়ই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম হয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য পাবে। সহীহ বুখারী, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, যেমন একজন বিধবার যত্ন নেয়, তাকে সারা রাত নামাজ পড়া এবং প্রতিদিন রোজা রাখার সমান সওয়াব দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী 6006 নং হাদিসে এটির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাতের নামায ও স্বেচ্ছায় রোযার মতো স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করা কঠিন মনে করে, তাকে এই সওয়াব অর্জনের জন্য এই হাদীসের উপর আমল করা উচিত। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাদের কাছে যা কিছু আছে যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল মনোভাব অবলম্বন করে তাদের পুরস্কার নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা একজন ব্যক্তির যে কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা রয়েছে। অতএব, কোন মুসলমান, যতই স্বল্প সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, এই আয়াতের উপর আমল করা থেকে নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... *বলুন, "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য..."*

পথিক হল সেই আগন্তুক যে ভিনদেশে আটকে আছে। আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের তাদের প্রয়োজন হলে তাদের ভ্রমণে সাহায্য করার জন্য তাদের সম্পদের কিছু তাদের দিতে উত্সাহিত করেন। যার কাছে সম্পদ আছে তার উচিত এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের যে কোন উপায়ে সাহায্য করা, যদিও তা তাদের খাদ্য বা পরিবহনের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের ভ্রমণের সময় তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন কোনো অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... *বলুন, "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য..."*

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, উভয় জাহানে পুরস্কার লাভের জন্য মানুষকে সন্তুষ্ট না করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করতে হবে। লোকেরা যখন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তখন তিক্ততা এড়াতে একটি ভাল উদ্দেশ্য প্রয়োজন। তিক্ততা সবসময় মানুষকে মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেয় যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হয়। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের একটি ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে, যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান চাওয়া, এমনকি অন্য লোকেরা তাদের ভাল কাজটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হলেও। আলোচ্য মূল আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... আর তোমরা যা কিছু ভালো কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

এটি কোন অজুহাতকেও সরিয়ে দেয় যা একজন ব্যক্তি ভাল কাজ এড়াতে দিতে পারেন কারণ এটি কোনভাবেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, এবং তাই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে কিছু না কিছু পার্থিব জিনিস থাকা সত্ত্বেও তা যে কেউ করতে পারে। , এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র তাদের নিজের শরীর হয়. তাই একজনকে

অবশ্যই একটি অলস মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যার মাধ্যমে তারা তাদের যা মঞ্জুর করা হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা এড়িয়ে যায় যখন তারা দাবি করে যে তারা পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদের অধিকারী নয়, ভাল করার জন্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"... আর তোমরা যা কিছু ভালো কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ জানেন এবং উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে মনের শান্তি এবং সাফল্যের সাথে পুরস্কৃত করবেন তারা যা কিছু করেন তার জন্য। তাই একজন ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যে তারা উভয় জগতে বেশি মানসিক শান্তি চায় নাকি কম চায় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। প্রতিটি ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সে অনুযায়ী তারা পাবে। এটা আশ্চর্যজনক যে লোকেরা কীভাবে মনের শান্তি কামনা করে তবুও তাদের চুক্তির শেষটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে লোকেরা কীভাবে বোঝে যে পার্থিব বিষয়ে একজন ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা অনুসারে প্রাপ্ত হয় তবুও তারা আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই তাদের মানসিক শান্তি দান করবেন এবং তাকে খুশি করার জন্য ন্যূনতম বা কোন প্রচেষ্টাই করবেন না। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে তবে তার মহান আল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি ফেরত আশা করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিমের 2376 নম্বর একটি হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া পার্থিব নিয়ামত সঞ্চয় করে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর রহমতকে আটকে রেখেছেন। তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 216-218

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن
تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ
وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن
دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ
وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢١٨

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণ্য। কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা এবং তা আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।

তারা আপনাকে পবিত্র মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে - এতে যুদ্ধ সম্পর্কে। বলুন, সেখানে যুদ্ধ করা মহা [পাপ], কিন্তু [লোককে] আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা এবং মসজিদুল হারামে [প্রবেশে বাধা দেওয়া] এবং সেখান থেকে সেখানকার লোকদের বহিষ্কার করা আরও বড় [পাপ]। আর আল্লাহর দৃষ্টি হত্যার চেয়েও বড়। এবং তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা সক্ষম হলে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়। আর তোমাদের

মধ্যে যে তার ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

" *তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণ্য..."*

পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থান দিতে হবে। অর্থ, কোনো আয়াত বা হাদিস যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে বা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে কারো কর্মকে সমর্থন করার জন্য নেওয়া যাবে না। আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষাপটকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের আলোকে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস কি বা কাদের নির্দেশ করে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উপরন্তু, মুসলমানরা কেবলমাত্র একজন বৈধ শাসকের পতাকায় বহিরাগত আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এবং যখন এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী করা হয়। যারা লড়াই করে তাদের অবশ্যই এই সীমা ও নিয়মগুলি অতিক্রম করার জন্য সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“ *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 194:

“... *সুতরাং যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাকেও সেভাবে আক্রমণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর...*"

এই ধরনের একটি নিয়ম হল যুদ্ধের অবলম্বন করা যখন একজনকে আক্রমণ করা হয়, যেমনটি আলোচনা করা প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে...*"

অতএব, শান্তির অবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক আগ্রাসন দেখানো হারাম। আরেকটি নিয়ম হল, শত্রু যখন আগ্রাসন থেকে বিরত থাকে তখন মুসলমানদেরও অবশ্যই বিরত হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

"...কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া কোন আগ্রাসন [অর্থাৎ আক্রমণ] হবে না।"

শত্রু যদি চায় শান্তি এটা মঞ্জুর করা আবশ্যক. অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 90:

"...সুতরাং তারা যদি আপনার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং আপনার সাথে যুদ্ধ না করে এবং আপনাকে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য [যুদ্ধের] কারণ তৈরি করেননি।"

তৃতীয় নিয়ম হল বেসামরিকদের ক্ষতি করা যাবে না। এটি সীমালঙ্ঘনকারী বলে আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বারবার যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের পাশাপাশি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ, 2614 নম্বর এবং মুসনাদে আহমদ, 2728 নম্বরে পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ফলধারী গাছ কাটা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33121 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কৃষকের মতো অ-সৈনিকদের ক্ষতি করবেন না। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33120 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সংঘাতের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা, সেক্ষেত্রে শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তা অবশ্যই তাদের দিতে হবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 60-61:

"এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়দৌড়ের প্রস্তুতি নাও যার দ্বারা আপনি আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রুকে ভয় দেখাতে পারেন... এবং যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে থাকে তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন..."

যারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তিকে সম্মান করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 12-13:

“এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে

এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথমবার তোমার উপর আক্রমণ শুরু করেছে?

যারা তাদের চুক্তিকে সম্মান করে তাদের আক্রমণ করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 7:

"... তাই যতক্ষণ তারা আপনার দিকে সরল, তাদের দিকে সোজা থাকুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র মুখে ও কাজের মাধ্যমে নয়, অন্তর থেকেও গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকে তাদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করতে হবে। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 8-9:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে নিষেধ করেন না যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না- তাদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের থেকে তোমাদের নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ ধর্মের এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করবে..."

যুদ্ধ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ঘৃণ্য, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এতে বাধ্য করা উচিত যখন এটি কামনা না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণাজনক..."

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদেরকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হলে তাদের অবিচল থাকতে হবে। এটি সহীহ বুখারী, 2966 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের আসল উদ্দেশ্য হল জোর দেওয়া যে বলপ্রয়োগ করা উচিত তখনই যখন এর ব্যবহার অনিবার্য, কেবলমাত্র সেই পরিমাণে যা একেবারে প্রয়োজনীয় এবং

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্যের অধীনে। তার উপর হতে

আগেই বলা হয়েছে, কে, কী এবং কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য একটি আয়াত বা হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা জরুরী। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, এভাবে যুদ্ধ করার বিষয়ে আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল একটি আয়াত যাকে তরবারি পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও পবিত্র কুরআনে "তলোয়ার" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙ্ঘনীয় মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং অতর্কিত অবস্থানে তাদের জন্য অপেক্ষা কর।

যেমনটি আগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমনকি যুদ্ধের এই বিবৃতিটি নির্দিষ্ট শর্ত এবং শান্তির ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি নয়। অর্থ, আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট দলকে বোঝায়।

তরবারি আয়াতের আশেপাশের আয়াতগুলি একাধিক অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র তারাই যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বারবার লঙঘন করেছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসনের কাজে লিপ্ত ছিল। এবং তার মিত্ররা। উদাহরণস্বরূপ, তলোয়ার আয়াতের ঠিক আগের আয়াতটি, অর্থ, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 4, বলে:

"তারা ব্যতীত যাদের সাথে তুমি মুশরিকদের মধ্যে চুক্তি করেছিলে অতঃপর তারা তোমার প্রতি কোন ত্রুটি করেনি বা তোমার বিরুদ্ধে কাউকে সমর্থন করেনি; সুতরাং তাদের জন্য তাদের চুক্তি সম্পূর্ণ করুন যতক্ষণ না তাদের মেয়াদ শেষ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এটি একটি সম্পর্কিত আয়াতে আরেকটি আদেশ অনুসরণ করে, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 7:

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে চুক্তি কিভাবে হতে পারে, যাদের সাথে তোমরা আল-মসজিদ আল-হারামে চুক্তি করেছিলে? তাই যতক্ষণ তারা তোমার দিকে সোজা থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রতি সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এই মুশরিকদের অপরাধ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 8-10:

"কিভাবে [একটি চুক্তি হতে পারে] যখন তারা আপনার উপর আধিপত্য অর্জন করে তবে তারা আপনার সম্পর্কে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না? তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর [অনুগত্য] অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শন বিনিময় করেছে এবং [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা যা করত তা ছিল মন্দ। তারা একজন বিশ্বাসীর প্রতি আত্মীয়তার কোনো চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 12-13:

"এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। আপনি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা প্রথমবার আপনার উপর [আক্রমণ] শুরু করেছে?

থিসিস নির্দিষ্ট মুশরিকরা ক্রমাগত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সহায়তা করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, মক্কা ও মসজিদ আল হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে। উদ্ধৃত আয়াতে অন্তত আটবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায় 9 তওবাহ, আয়াত 12, যা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, "অবিশ্বাসের নেতাদের" সাথে লড়াই করার লক্ষ্য তাই তারা তাদের আগ্রাসন থেকে "বন্ধ" হয়ে যায়। এই আয়াতগুলি, বাকিদের মতো, যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট শর্তগুলি মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেমন শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করা যারা প্রথমে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

উপরন্তু, এই মুশরিকদের এখনও অনেক সতর্কতা এবং ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাদের চার মাসের অবকাশ ও শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 2:

"অতএব, [হে কাফেররা], চার মাস দেশে অবাধে ভ্রমণ কর, কিন্তু জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না..."

এবং অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙঘনীয় [চার] মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য অতর্কিত অবস্থানে বসে থাক..."

এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে এই মুশরিকদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যারা এটি অনুরোধ করেছিল যাতে তারা কোনও ভয় বা চাপ ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ পায় বা তারা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় ছাড়াই আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 6:

"এবং যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে [অর্থাৎ কুরআন]। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"

এই মুশরিকদের যুদ্ধ ও হত্যার তরবারি আয়াতের নির্দেশ তখনই কার্যকর হবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে চার মাসের অবকাশের পর আরব উপদ্বীপে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, অনেক মুশরিক এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অবকাশের কারণে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তরবারি আয়াতের কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন রক্তপাত হয়নি, কারণ এই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আরও রক্তপাত থেকে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করা অর্থ, হয় এই মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে বা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। .

উপসংহারে, আশেপাশের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন, তরবারি আয়াতটিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে রাখুন। অর্থ, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শত্রু মুশরিকদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তারা তাদের পরে অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

" *তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণ্য ...*"

এই সংগ্রামের মধ্যে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, একজনের ভিতরের শয়তান এবং সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিস্তৃত মন্দ, যা সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, যেমন মদ এবং জুয়া দ্বারা ইন্ধন দেওয়া হয় যা পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জিনিসগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ব্যবহার করার পরিবর্তে। একজনের ইচ্ছা বা অন্যের ইচ্ছা। এই সংগ্রামটি তর্কাতীতভাবে মহান আল্লাহর পথে লড়াইয়ের চেয়েও কঠিন, কারণ এটি একটি অবিরাম যুদ্ধ যা শুধুমাত্র একজন মারা গেলেই শেষ হয়। যদিও এই আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য এই সংগ্রামটি প্রায়শই একজনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তবে তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদের উপর কাজ

করা সর্বোত্তম যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"... *কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কাজ করেন, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, সেভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু একজন বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করবে সেও দুর্বল হবে। এটি এই কারণে যে কেউ তাদের

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না, মনের শান্তির আবাস, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। এই কারণেই ধনী ব্যক্তিরা অনেক পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে শেষ হয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, আয়াত 216 এর শেষে নির্দেশিত হিসাবে, ইসলামিক শিক্ষাগুলি মানুষের প্রকৃতির সাথে মানানসই করে ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষ যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তাদের জ্ঞান সর্বদাই সীমিত থাকবে, তাই তারা মানুষকে জীবনযাপনের জন্য একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রদান করতে পারে না যার দ্বারা মানসিক ও শরীরের শান্তি হয়। এবং লোকেরা অত্যন্ত অদূরদর্শী হওয়ায় তারা জীবনযাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি বেছে নেওয়ার ভবিষ্যত পরিণতিগুলিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। একমাত্র যিনি সর্বোত্তম আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ, তিনি সবকিছু জানেন। যেভাবে একজন ব্যক্তি তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে যেহেতু তারা জ্ঞানের অধিকারী, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর পরামর্শকে বিশ্বাস করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি সবকিছু জানেন এবং কোন ভুল করতে পারেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"... কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও ইসলামী শিক্ষাগুলি 1400 বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল তা এখনও সময়ের শেষ অবধি প্রযোজ্য হবে কারণ এটি মানুষের প্রকৃতিকে সম্বোধন করে, এমন কিছু যা নিজের মধ্যে চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

" তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণ্য। কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা এবং তা আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।

এর মধ্যে মহান আল্লাহর পছন্দ ও আদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা পছন্দ করেছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তার পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। একজন ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং অন্যান্য জিনিসগুলিকে তারা খারাপ বলে মনে করেছিল যখন তারা আসলে তাদের জন্য ভাল ছিল। নিজের জীবনের অতীতের এই ঘটনাগুলো মনে রাখা মহান আল্লাহর পছন্দ ও আদেশের উপর আস্থা রাখার এবং কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যের সাথে প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। কৃতজ্ঞতা বলতে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদের সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথা বা কর্মের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, জেনে রাখা যে তিনি মানুষের জন্য সর্বোত্তম কোনটি বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"... *আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

এই জোরালো বিবৃতি মানুষকে নম্র থাকতে এবং তাদের জ্ঞানের অভাব এবং সমস্ত বিষয়ে তাদের চরম অদূরদর্শীতাকে মেনে নিতে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে ভুলে যায় সে সহজেই এমন আচরণ করবে যেমন তারা জানে যে কোনটি সর্বোত্তম এবং এটি তাদেরকে আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসের দাবি করতে উত্সাহিত করতে পারে, যেন তারা নিশ্চিত যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যেন তারা আল্লাহর চেয়ে ভাল জানে। , মহান, তাদের জন্য কি ভাল. এই ধরণের ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি অভদ্র আচরণ করা সহজ, যেখানে কেউ তাকে এবং তার কোষাগারকে একটি দোকান হিসাবে বিবেচনা করে যখন তারা এমন গ্রাহক হয় যারা সর্বদা সঠিক এবং জানে কোনটি সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব বোঝে, সে মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসের দাবি করবে না এবং বরং ইসলামী শিক্ষা দ্বারা নির্দেশিত সাধারণ ভালো জিনিসের জন্য চাইবে এবং বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ যা-ই হোক না কেন, তাদের জন্য বেছে নেওয়া সেরা, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200-201:

"... আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ

দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

ইসলামের আগমনের আগেও আরবদের মধ্যে বছরের চার মাসের বিশেষ মূল্য ছিল এবং তারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ এড়িয়ে চলত। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই পবিত্র মাসের একটির মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে পবিত্র মাস এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের এই ত্রুটি থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মক্কার অমুসলিমদের অন্যায় আচরণ, নিপীড়ন ও সহিংসতা, যেমন মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়া, যখন তাদের বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। চারটি পবিত্র মাসে যুদ্ধের চেয়েও খারাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 217:

"তারা আপনাকে পবিত্র মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে - সেখানে যুদ্ধ সম্পর্কে। বলুন, সেখানে যুদ্ধ করা মহা [পাপ], কিন্তু [লোককে] আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা এবং মসজিদুল হারামে [প্রবেশে বাধা দেওয়া] এবং সেখান থেকে সেখানকার লোকদের বহিষ্কার করা আরও বড় [পাপ]। আর ফিতনা (দুর্নীতি) হত্যার চেয়েও বড়।"

কিন্তু তারপরও আরবের অমুসলিমরা এই সাধারণ নিয়মকেও মেনে চলে না এবং প্রায়শই বার্ষিক ক্যালেন্ডারের মধ্যে মাসগুলি ঘুরে বেড়াত যাতে তারা তাদের মধ্যে লড়াইকে সমর্থন করতে পারে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 36-37:

“নিশ্চয়ই, যেদিন থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকে আল্লাহর নথিতে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারোটি [চন্দ্রের] মাস; এর মধ্যে চারটি পবিত্র। এটাই সঠিক দ্বীন [অর্থাৎ, পথ], সুতরাং তাদের সময় নিজেদের উপর জুলুম করো না। আর কাফেরদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন [যারা তাকে ভয় করে]। প্রকৃতপক্ষে, [পবিত্র মাসের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার] স্থগিত করা হল কুফর বৃদ্ধি যা দ্বারা যারা অবিশ্বাস করেছে তারা [আরও] পথভ্রষ্ট হয়..."

মক্কার অমুসলিমরা এই ঘটনাকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার হিসাবে ব্যবহার করেছিল, তাঁর সাহাবীগণ দাবি করে যে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, পবিত্র মাসের মধ্যে যুদ্ধ করে তাদের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পূর্বে তেরো বছর ধরে অবিরাম তাদের মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের অকথ্য অন্যায়ের অধীন করে রেখেছিল, কেবলমাত্র তারা মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করেছিল। তাই তারা পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধে আপত্তি করার যোগ্য ছিল না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে শুধুমাত্র তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়নি, মক্কার মসজিদুল হারামের পথও তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, একটি বার যা হাজার বছর ধরে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। দুর্নীতির এই রেকর্ডের সাথে প্রয়োজনে পবিত্র মাসগুলিতে লড়াই করতে আপত্তি তোলা তাদের বা অন্য কারও পক্ষে ছিল না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের মধ্যে অপছন্দনীয় অভ্যাসগুলি বা যে বিষয়গুলি বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত এড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর

হয়ে নিজেদেরকে আরও ভাল বোধ করার এই মনোভাবকে এড়িয়ে চলতে হবে যদিও তারা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাগুলিতে স্থির থাকে যা এড়ানো সহজ। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ তাদের প্রার্থনার সময় তাদের হাত কোথায় রাখা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক এবং তর্ক করে, যদিও এটি ইসলামের মধ্যে একটি গৌণ বিষয় এবং এটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের সাথে সংযুক্ত নয়। তবুও একই সময়ে এই ব্যক্তি অন্যদের গীবত করতে থাকবে, যা ইসলামে একটি বড় পাপ। ইসলামের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে তাদের কঠোরতা তাদের মনে করে যে তারা ভাল মুসলিম যদিও তারা পাপের উপর অবিচল থাকে যা তাদের করা উচিত নয়। ঠিক যেমন মক্কার অমুসলিমরা বড় ধরনের দুর্নীতি ও অন্যায়ের উপর অবিচল ছিল তবুও পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ করা মুসলিমদের সম্পর্কে অভিযোগ করে।

আয়াত 217 এ উল্লিখিত দুর্নীতিটি ইসলামের শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট নিপীড়নের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবকে বোঝায়, অর্থাৎ মক্কার অমুসলিমরা। এই দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাদের বিপথগামী বিশ্বাস এবং তাদের গোত্রের প্রতি আনুগত্য, সম্পদ, সংস্কৃতি এবং মিথ্যা দেবতার প্রতি ভালবাসা। মূল আয়াতে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট দুর্নীতি আরও প্রমাণ করে যে মক্কায় অমুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই আয়াতগুলি অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 217:

"... বলুন, "এতে যুদ্ধ করা মহা [পাপ], কিন্তু [মানুষকে] আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা এবং আল-মসজিদ আল-হারামে [প্রবেশে বাধা দেওয়া] এবং সেখান থেকে সেখানকার লোকদের বহিষ্কার করা আরও বড় [পাপ]।] আল্লাহর কাছে ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।"

অতএব, এই আয়াতে দুর্নীতি বলতে নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীকে হয়রানি এবং ভয় দেখানো হয়, কারণ তারা বর্তমানে ধারণকৃত ধারণাগুলির বিপরীত ধারণার একটি সেট গ্রহণ করেছে এবং যা প্রচার করে সমাজের বিদ্যমান শৃঙ্খলায় সংস্কার কার্যকর করার চেষ্টা করছে। ভাল এবং খারাপ কি নিষেধ. অতএব, এই দুর্নীতির দ্বারা নিরপরাধ মানুষের এই সুনির্দিষ্ট ক্ষতি রোধ করার একমাত্র উপায় ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যতক্ষণ না বিরোধিতা ছাড়াই ইসলামকে প্রকাশ্যে চর্চার অনুমতি দেওয়া হয় এবং অমুসলিমদের দ্বারা সমাজের ক্ষতিকারক ক্ষতি বন্ধ না হয়।

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে রোমান ও পারস্যের মতো অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপক নিপীড়ন ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল। তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা দেশের মানুষের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করত। এই লোকদের সাথে লড়াই করার ফলে সৈন্যদের হত্যা হতে পারে, সৈন্যরা যারা যুদ্ধ করে মারা যাওয়ার জন্য সাইন আপ করেছিল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি নিরীহ নাগরিকদের উপর যে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল তা দূর করে। আর যদি ইসলামি শাসন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমনটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরবর্তী সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফাদের সময়, তাহলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়ন সৈন্য হত্যার চেয়েও জঘন্য যদি তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 217:

"... এবং তারা আপনার সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা সক্ষম হলে আপনাকে আপনার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের দুশমন, শয়তান ও বিপথগামী লোকেরা যারা অন্যদেরকে পশুর মতো আচরণ করতে তাদের অনুসরণ করতে চায় যাতে তারা উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন না করে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করে, তারা সর্বদা মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করবে যাতে তারা তাদের ত্যাগ স্বীকার করে। মূল্যবোধ এবং জীবনের উপায়। এই অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি হল মুসলমানদেরকে বোঝানো যে ইসলামের উপর বিশ্বাসের দাবি চালিয়ে যেতে এবং এর উপর অনুশীলন করা ছেড়ে দেওয়া। দুঃখজনকভাবে, এটি একটি ব্যাপক বিষয় হয়ে উঠেছে যদিও মুসলিম শব্দের অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অতএব, ইসলাম পালন করে না এমন মুসলমান বলে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 217:

“...এবং তারা আপনার সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা সক্ষম হলে আপনাকে আপনার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। আর তোমাদের মধ্যে যে তার ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি উদ্ভিদের মত যা জীবিত ও শক্তিশালী থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও মরতে পারে যদি

তারা আনুগত্যের সাথে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটিই একমাত্র উপায় যা একজন মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য পেতে পারে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঈমান পরিত্যাগ করে বা ঈমানের মৌখিক ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়, সে দেখতে পাবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছে সেগুলোর অপব্যবহার করছে। এবং আলোচনার মূল আয়াতে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, শক্তি এবং সম্পদ বৃথা যাবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অর্থ, তাদের প্রচেষ্টা উভয় জগতে মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে না যদিও তারা অনেক পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং খ্যাতির অধিকারী হয় এবং এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। এর কারণ হল তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসের উপর থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 217:

"...এবং তারা আপনার সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা সক্ষম হলে আপনাকে আপনার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। আর তোমাদের মধ্যে যে তার ধর্ম

থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও তার নিজের স্বার্থে আমল করতে হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 218:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে..."*

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের নিজেদের স্বার্থে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাদের ঈমানকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাকে এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করার বৃহত্তর সংস্করণ, কারণ এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কিন্তু 218 নং আয়াতের শেষে যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ কারো কাছে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না। তিনি শুধুমাত্র আশা করেন যে তারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে

একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত পাবে, যার ফলে উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তি ও সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 218:

"... আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 218:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে..."*

এই আয়াতে চেষ্টা করার অর্থ হল কিছু অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এটি যুদ্ধের সমতুল্য নয়, যার জন্য আরবি শব্দ কিতাল। সংগ্রামের একটি বিস্তৃত অর্থ রয়েছে এবং মহান আল্লাহর পথে সকল প্রকার সংগ্রামকে আলিঙ্গন করে। যিনি মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যে তাদের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে নিবেদিত, যে তাদের মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিফলিত করে যে তারা কীভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তারা কথায় ও কলমে ইসলাম প্রচার করে। তারা তাদের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য। তারা ইসলামের প্রচারের জন্য তাদের ক্ষমতার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে এবং তাদের

পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন যেকোনো শক্তির মোকাবেলায় তারা তাদের আদেশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এবং যখনই প্রয়োজন তখনই তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পলায়ন করে না। এ সবই মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম। তারা একান্তভাবে মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য, তাঁর দ্বীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাঁর বাণীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 218:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে...*"

এই শ্লোকটি ইচ্ছাপূরণের ধারণাকেও দূর করে। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং এখনও উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে। এটা ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা পোষণ করেন, তিনিই আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করেন, তাদেরকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং যখনই তারা কোন পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ জানেন এবং উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে মনের শান্তি এবং সাফল্যের সাথে পুরস্কৃত করবেন তারা যা কিছু করেন তার জন্য। তাই একজন ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যে তারা উভয় জগতে বেশি মানসিক শান্তি চায় নাকি কম চায় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, সে অনুযায়ী ইসলামি শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে পাবে। এটা আশ্চর্যজনক যে লোকেরা কীভাবে মনের শান্তি কামনা করে তবুও তাদের চুক্তির শেষটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে লোকেরা কীভাবে বোঝে যে পার্থিব বিষয়ে একজন ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা অনুসারে প্রাপ্ত হয় তবুও তারা আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই তাদের মানসিক শান্তি দান করবেন এবং তাকে খুশি করার জন্য ন্যূনতম বা কোন প্রচেষ্টাই করবেন না। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে তবে তার মহান আল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি ফেরত আশা করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিমের 2376 নম্বর একটি হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া পার্থিব নিয়ামত সঞ্চয় করে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর রহমতকে আটকে রেখেছেন। তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ। গ অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 218:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে...*"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে বৃহত্তর ত্যাগের কথা এবং তাদের পূর্বে যারা এসেছেন, যারা মহান আল্লাহর কাছে নিজের চেয়েও প্রিয় ছিলেন, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। এই অনুস্মারক তাদের অসুবিধার সময় ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে, ঠিক যেমন তাদের পূর্বের লোকেরা ধৈর্যশীল ছিল। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথা বা কাজের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখা, জেনে রাখা যে তিনি তাদের জন্য কোনটি সর্বোত্তম, তা তাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। প্রকৃতপক্ষে, এই অনুস্মারকটি তাদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে, কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে পরীক্ষা ও অসুবিধার শিকার হয়েছিল তার শিকার না হওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা দেখানো হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা একজনকে প্রতিটি অসুবিধা এবং পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে যাতে তারা উভয় জগতেই একটি অগণিত পুরস্কার এবং মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 219-220

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ
أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।" এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কি ব্যয় করবে? বল, "অতিরিক্ত [প্রয়োজনের বাইরে]।" এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

ইহকাল ও পরকালের প্রতি। আর তারা তোমাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের জন্য উন্নতিই সর্বোত্তম। আর যদি তুমি তোমার বিষয়গুলোকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, তবে তারা তোমার ভাই। আর আল্লাহ্ জানেন সংশোধনকারী থেকে দুর্নীতিকারীকে। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাকে কষ্ট দিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

মূল আয়াতের শুরুতে ইসলামী ও পার্থিব জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে…"*

ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে বিষয়গুলিকে অবশ্যই গবেষণা ও অধ্যয়ন করতে হবে তা হল সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি যা মহান আল্লাহ বিচার দিবসে মানুষকে প্রশ্ন করবেন, যেমন একজন প্রতিবেশীর সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং কেবল একজন ব্যক্তির সময় নষ্ট করে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে তাদের শক্তি উৎসর্গ করার অবস্থানে থাকা একমাত্র তারাই যারা ইতিমধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে কাজ করেছেন। যেহেতু এটি করা কার্যত অসম্ভব, তাই মানুষকে অবশ্যই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, সময় এবং শক্তিকে ধর্মীয় জ্ঞানের সেই শাখাগুলির উপর গবেষণা এবং কাজ করার জন্য কেন্দ্রীভূত করতে হবে যেগুলিকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে এবং বাকি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উদাহরণগুলি তারপর মূল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

" *তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."*

এই দুটি জিনিস ইসলামে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল না কারণ এগুলো আরব সমাজে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল। একজন বিজ্ঞ ডাক্তার যেমন ধীরে ধীরে রোগীর

চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য রোগীকে দেওয়া ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে দেন, মহান আল্লাহ তায়ালা মদ ও জুয়ার মতো কিছু আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রেও তাই করেছেন। একজন ব্যক্তির জন্য একজন অমুসলিম থেকে শক্তিশালী মুসলিমে রূপান্তর সহজ করার জন্য তিনি এই কৌশলটি ব্যবহার করেছিলেন। যদি সমস্ত চূড়ান্ত আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি একযোগে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয় তবে এই প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

“তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।"..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 43:

"হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তুমি বুঝতে পারো তুমি কি বলছ..."

এবং পরিশেষে অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা শুরু থেকেই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন যা সেই সময়ে কোনো বিশেষ জিনিস নিষিদ্ধ না হলেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

" *তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।"..."*

ইসলামের নীতি হল যে যখন কোন জিনিসের ক্ষতি তার অনুভূত সুবিধার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন তা বাতিল করা উচিত যদিও ইসলামের মধ্যে এটিকে বিশেষভাবে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়নি। একজন ব্যক্তির এই কোড দ্বারা বেঁচে থাকা উচিত কারণ এটি উভয় জগতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। উপরন্তু, ইসলাম একটি সরল অগ্রগামী এবং সৎ ধর্ম এবং তাই এটি অস্বীকার করে না যে বেআইনি জিনিসগুলিতে কিছু অনুভূত সুবিধা রয়েছে, যেমন ভোগ। কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এই অনুভূত ক্ষুদ্র এবং স্বল্পস্থায়ী সুবিধাগুলি উপেক্ষা করবেন যদি সামগ্রিক ক্ষতি তাদের এবং তাদের পরিবারের মতো অন্যদের জন্য বেশি হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

“ তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।"..."

এই আধুনিক যুগে মানুষের মন এবং শরীরের উপর অ্যালকোহলের নেতিবাচক প্রভাবগুলি ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যদিও এটি অল্প পরিমাণে পান করা হয়। এছাড়াও, অ্যালকোহল দ্বারা সৃষ্ট সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলিও সুপরিচিত, কারণ এটি অন্যান্য অনেক অপরাধের দিকে পরিচালিত করে, যেমন আক্রমণ , যেহেতু একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এটি নেতিবাচকভাবে একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাওবা না করে নিয়মিত মদ পান করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পবিত্র কুরআনে শিরকবাদের সাথে জড়িত এমন কিছুর পাশে মদ ও জুয়াকে স্থান দেওয়া হয়েছে, এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুতরতা নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

জুয়া একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে ধ্বংস করে দেয়, তার কাজ, স্বাস্থ্য, আর্থিক এবং পারিবারিক জীবন সহ। এটি অন্যান্য অগণিত পাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির সাথে যুক্ত, যেমন মদ্যপান, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। আয়াত 219 দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, একজন ব্যক্তি জুয়া খেলার মাধ্যমে কিছু অর্থ জিততে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তারা কেবল হেরে যাবে। এটি সুস্পষ্ট, এমনকি সফল জুয়াড়িদের ক্ষেত্রেও কারণ তাদের সম্পদের প্রতি লোভ কেবলমাত্র বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তারা জুয়া খেলার মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করেছে তা দিয়ে তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়। উপরন্তু, যেহেতু জুয়া খেলা হারাম, তাই তারা যে সম্পদ অর্জন করবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলোও অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তাওবাহে 9তম অধ্যায়, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে, তার নিজের স্বার্থে, অ্যালকোহল এবং জুয়া উভয়ই এড়িয়ে চলতে হবে এবং অন্য যে কোনও জিনিস যেখানে এর ক্ষতি তার অনুভূত সুবিধার চেয়ে বেশি।

মহান আল্লাহ তখন বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 219:

“ *তারা তোমাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।" এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কি ব্যয় করবে? বলুন, "অতিরিক্ত [প্রয়োজনের বাইরে]।"..."*

একটি সমাজ কেবলমাত্র এমন জিনিসগুলিতে নিমগ্ন হয় যা উপকারের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়, যখন সেই সমাজের সদস্যরা বেশি সম্পদ অর্জন করে তখন তাদের মৌলিক চাহিদা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে হয়। যে ব্যক্তি তাদের মৌলিক চাহিদা এবং দায়িত্বগুলি কভার করার জন্য যথেষ্ট উপার্জন করে তার সমাজের মধ্যে নেতিবাচক বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম, যেমন ক্লাব এবং ক্যাসিনো, এর মধ্যে এই ব্যবসাগুলি খোলা বা গ্রাহক হিসাবে তাদের পরিদর্শন করা জড়িত। এ কারণেই মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কি ব্যয় করবে? বল, "তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সর্বপ্রথম তাদের ধন-সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ, যেমন তাদের সময় ও শক্তির অপব্যবহারের প্রলোভন এড়ানোর জন্য তাদের মৌলিক চাহিদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী উপার্জন করা। যদি তারা আরও বেশি সম্পদ উপার্জন করে, যা বেশিরভাগ মুসলিমরা করে, তাহলে তাদের অবশ্যই তা ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া অন্যান্য সম্পদ যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

কিন্তু যদি তারা এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশকে উপেক্ষা করে এবং তার পরিবর্তে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ বিষয়গুলির উপর তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তবে এটি কেবল তাদের মনের শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখেন যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত, কারণ তারা প্রায়শই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ডুবে থাকে যদিও তাদের কাছে পার্থিব বিলাসিতা রয়েছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ, তারপর মানবজাতিকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করেন, যেমন এই আয়াতে এখন পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে, যাতে তারা সত্যকে চিনতে পারে, তা গ্রহণ করতে পারে এবং তারপরে তার উপর কাজ করতে পারে যাতে তারা মনের শান্তি পায়। উভয় জগত অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 219-220:

"... এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতগুলো সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য..."

অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিপরীতে যা মানুষকে এর শিক্ষা ও নীতির প্রতিফলন এড়াতে উৎসাহিত করে এবং পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতারা যা পরামর্শ দেয় তা অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করে, ইসলাম মানুষকে তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে এবং এর শিক্ষা, উপদেশ এবং এর ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতা বিচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রমাণ অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

"বলুন, "আমি তোমাকে শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - যে তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও, জোড়ায় এবং এককভাবে, তারপর চিন্তা করো।"..."

দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম ভুল মনোভাব গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা ইসলামের শিক্ষাগুলি বোঝার চেষ্টা না করে একজন ধর্মীয় পণ্ডিতকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এই মনোভাব অবলম্বনের একটি বড় সমস্যা হল এই মুসলিমরা কখনই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না কারণ তারা এটি অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী নয়। ফলে যতবারই তারা সমস্যার সম্মুখীন হবে ততবারই তাদের দুর্বল ঈমান কাটিয়ে উঠবে এবং সে সময় তারা ধৈর্য্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হবে। এবং যখনই তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হবে, তারা তাদের দুর্বল বিশ্বাসের কারণে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হবে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে একজনের কথাবার্তা এবং কাজের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং সর্বোত্তম আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখা এবং জেনে রাখা যে তিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী চয়ন করেন। কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে তা আন্তরিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। প্রকৃত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা কেবলমাত্র তারাই দেখাতে পারে এবং বজায় রাখতে পারে যারা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী, যার মূল রয়েছে ইসলামী জ্ঞান, যেখানে ইসলামে অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করা কেবল দুর্বল বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলামী শিক্ষা না বুঝে ধর্মীয় পণ্ডিতদের অন্ধ অনুকরণের আরেকটি বড় সমস্যা হল যে পরবর্তী প্রজন্মের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে যাদেরকে সমাজ তাদের সাধারণ জ্ঞান ও প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় ব্যবহার করার জন্য যথাযথভাবে উৎসাহিত করে। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়া শুধুমাত্র তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা ত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে, এমনকি তারা মৌখিকভাবে বিশ্বাস করার দাবি করলেও। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে ইসলাম সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একজন ধর্মীয় পণ্ডিতের কাছে নিয়ে গেলে প্রায়শই পছন্দসই ফলাফল পাওয়া যায় না, কারণ শিশুরা অপরিচিত ব্যক্তিদের বিশ্বাস করে না এবং তারা ভালভাবে অনুভব করতে পারে যে তারা বিশ্বাস করতে এবং কিছু অনুসরণ করার জন্য প্রতারিত হচ্ছে। যা তাদের সুখের বিরোধিতা করবে। এটি একই রকম যখন একজন ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা একটি ধর্মকে অনুসরণ করার জন্য প্রতারিত হয়। শিশুরা কেবলমাত্র তাদের পিতামাতার মতো যাদের বিশ্বাস করে তাদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু যদি তাদের পিতামাতার কাছে উত্তর না থাকে, কারণ তারা নিজেরাই ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহলে এটি শুধুমাত্র ইসলামের প্রতি সন্তানের আসক্তিকে দুর্বল করবে। তাই এটি কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন পিতামাতা এবং পরিবারের বড়রা পবিত্র কুরআনের আদেশ ও উপদেশ অনুসরণ করে এর শিক্ষাগুলি শিখতে এবং চিন্তা করার জন্য যাতে তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং তাই পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলাম কেন শেখানোর অবস্থানে থাকে। সত্য এবং কিভাবে এটি উভয় জগতের মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 219-220:

“… এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতগুলো সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য..."

জীবন এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলন একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্যকে চিনতে অনুমতি দেবে, যা শেষ পর্যন্ত পরকালের দিকে নিয়ে যায়। এই স্বীকৃতি ছাড়া একজন ব্যক্তি একটি খালি জীবন যাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করে। এই বাস্তবতা বেশ সুস্পষ্ট কারণ বেশিরভাগ লোক যারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করে তারা প্রায়শই তাদের জীবনের মধ্যে একটি শূন্যতা অনুভব করে। এই শূন্যতা তখনই পূরণ হতে পারে যখন কেউ এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই উদ্দেশ্যটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। উভয় জগত তাই, কারও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়া তাদের মনের শান্তি পেতে বাধা দেবে। এটা আবার খুব স্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে যারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কীভাবে তারা এখনও মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন যে কোনো উদ্ভাবনকে ব্যর্থতা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে যখন এটি তার সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি এটি অনেক ইতিবাচক গৌণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, একজন মানুষ যে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তার মানসিক শান্তি অর্জনের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। উভয় জগতেও। অতএব, একজনকে অবশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য, তাদের চারপাশের লোকদের দ্বারা করা পছন্দগুলি এবং এই পছন্দগুলির ফলাফল, ইতিহাস

এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্যকে চিনতে পারে এবং তা পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে পারে যাতে তারা মানসিক শান্তি পায়। উভয় জগতে।

মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে মানুষের অধিকার পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করেন কারণ এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রায়শই লোকেরা উপেক্ষা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 220:

“... *এবং তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের জন্য উন্নতিই সর্বোত্তম..."*"

দুঃখজনকভাবে, মুসলিমরা প্রায়শই মহান আল্লাহর অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করে, তবুও মানুষের অধিকারকে অবহেলা করে, যদিও উভয়ই সফলতা অর্জন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজনকে অন্যের প্রতি অন্যায় করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি একজন নির্যাতক তাদের নিপীড়ককে ক্ষমা না করে, তাহলে নির্যাতক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতক তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচারের দিনে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 220:

“... *এবং তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের জন্য উন্নতিই সর্বোত্তম। আর যদি তুমি তোমার বিষয়গুলোকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, তবে তারা তোমার ভাই। এবং আল্লাহ সংশোধনকারী থেকে বিপর্যয়কারীকে জানেন। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তোমাকে কষ্ট দিতে পারতেন..."*

সুনানে আন নাসায়ী, 3699 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা সর্বদা এতিমদের যত্ন নিতেন, এতিমের সম্পদ তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে ভয় পেতেন। তারা ভীত ছিল যে, তারা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে এতিমের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে দেবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 10:

“নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের পেটের আগুনে ভক্ষণ করে। এবং তাদেরকে আগুনে [অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে] দগ্ধ করা হবে।”

এ কারণে তারা এতিমের বিষয়গুলোকে তাদের নিজস্ব বিষয় থেকে যেমন আলাদাভাবে খাবার রান্না করার চেষ্টা করে নিজেদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল। এটি কঠিন ছিল কারণ অধিকাংশ সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, দরিদ্র ছিলেন এবং এইভাবে জীবনযাপন করার উপায় তাদের ছিল না। মহান আল্লাহ স্পষ্ট

করে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এতিমের সম্পদকে তাদের লালন-পালনে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের কোনো অনিচ্ছাকৃত মিশ্রণকে উপেক্ষা করা হবে এবং ক্ষমা করা হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির অভিপ্রায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তিনি এ বিষয়ে তাদের বিচার করবেন। সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজের উদ্দেশ্য সংশোধনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রতিটি কাজেই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখা উচিত, যা তাকে সঠিক পথে কথা বলতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণে প্রচেষ্টা নিশ্চিত করবে। পক্ষান্তরে, যে ভুল নিয়ত অবলম্বন করবে সে সঠিকভাবে কথা বলতে ও আচরণ করতে ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ তারা আল্লাহ, মহান বা মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হবে। উপরন্তু, তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে, তারা যে কয়েকটি ভাল কাজ করে তার জন্য তারা কোন পুরষ্কার পাবে না, যেমন মহান আল্লাহ মানুষকে পুরস্কৃত করেন যখন তারা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ, এতিমদেরকে সাধারণ জনগণের ভাই বলে অভিহিত করেছেন যাতে একজন ব্যক্তিকে অন্য লোকদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তার নিজের পরিবারের সাথে আচরণ করুক। প্রত্যেকে অন্যের সাথে এভাবে আচরণ করলে সমাজে ন্যায়বিচার, সম্মান ও শান্তি ছড়িয়ে পড়বে এবং সকল মানুষের অধিকার পূর্ণ হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 220:

“... এবং তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের জন্য উন্নতিই সর্বোত্তম। আর যদি তুমি তোমার বিষয়গুলোকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, তবে তারা তোমার ভাই। এবং আল্লাহ সংশোধনকারী থেকে বিপর্যয়কারীকে জানেন। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তোমাকে কষ্ট দিতে পারতেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামী শিক্ষায় এতিমদের প্রায়শই উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে প্রায়শই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের সাহায্য করবে। এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই দিন এবং যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে সেট আপ করতে পারে। এবং স্পনসরশিপের পরিমাণ প্রায়ই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম হয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য পাবে। সহীহ বুখারী, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, যেমন একজন বিধবার যত্ন নেয়, তাকে সারা রাত নামাজ পড়া এবং প্রতিদিন রোজা রাখার সমান সওয়াব দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী 6006 নং হাদিসে এটির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাতের নামায ও স্বেচ্ছায় রোযার মতো স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করা কঠিন মনে করে, তাকে এই সওয়াব অর্জনের জন্য এই হাদীসের উপর আমল করা উচিত। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাদের কাছে যা কিছু আছে যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল মনোভাব অবলম্বন করে তাদের পুরস্কার নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা একজন ব্যক্তির যে কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা রয়েছে। অতএব, কোন মুসলমান, তাদের কাছে যত কম সম্পদই থাকুক না কেন, অভাবীকে সাহায্য করা থেকে নিজেকে অজুহাত দিতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 220:

"... আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে পারতেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ, মানুষের উপকার করার জন্য ইসলামিক আচরণবিধি তৈরি করেছেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। জ্ঞানের অভাবের কারণে, বিশেষ করে মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার বিষয়ে, এবং লোকেরা অত্যন্ত অদূরদর্শী হওয়ায় তারা তাদের পছন্দের পরিণতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না বলে এই ফলাফলটি কোনও মানবসৃষ্ট আচরণবিধি দ্বারা অর্জন করা যায় না। উপরন্তু, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং একদল লোককে অন্য গোষ্ঠীর উপর উপকৃত করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ, নিরপেক্ষ, প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞ, তিনিই একমাত্র তিনিই এমন একটি আচরণবিধি তৈরি করতে পারেন যা সমাজের মধ্যে মানসিক শান্তি এবং ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইসলামী আচরণবিধি অনুসরণ করবে, ততক্ষণ তারা এই ফলাফল পাবে, এমনকি যদি মহান আল্লাহ তাদের জন্য আসমান ও জমিন স্থানান্তর করতে চান, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 220:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামী আচরণবিধি যখন সমাজে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন সেই সমাজ শান্তি, ন্যায় ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে তা মেনে চলতে হবে যদিও তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ

করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, সেভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী আচরণবিধি মেনে নেবে এবং আমল করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেখানে মূর্খ রোগী যেমন তাদের ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নিতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয় তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের আচরণবিধি মেনে নিতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি সে যদি কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারে না। এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তাওবাহে 9তম অধ্যায়, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কেউ যদি আধ্যাত্মিক সত্যটি পালন করে যে মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং তাই তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে যারা তাঁর অবাধ্যতা করে তাদের মানসিক শান্তি দেবেন না। অথবা যদি কেউ এই সত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, বুঝতে পারে যে নিখুঁত ইসলামী আচরণবিধি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়া যা বিশেষভাবে মানুষের প্রকৃতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় , তবে তা কেবল একজনকে বাধা দেবে। মানসিক শান্তি প্রাপ্তি। উভয় জগতেই মনের শান্তি লাভের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয় যেভাবেই হোক না কেন।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 221

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে [তোমাদের নারীদের] বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি তাঁর আয়াতসমূহ [অর্থাৎ, বিধানাবলী] লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

একটি সমাজের জন্য স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি অর্জনের জন্য, এর ভিত্তি ইউনিট, পরিবারের ঘর, প্রথমে এই জিনিসগুলি অর্জন করতে হবে। এবং যেহেতু স্থিতিশীল পারিবারিক ঘরগুলি বিবাহ দিয়ে শুরু হয়, মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিবাহের বিভিন্ন দিক যেমন বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে সম্বোধন করেন। নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে বিবাহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এই প্রথম আয়াতটি একটি উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজার ধারণা দিয়ে শুরু হয়েছে, যা একটি স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ পারিবারিক গৃহ অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

"আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে সঠিক জীবনসঙ্গী বেছে নিতে উৎসাহিত করে কারণ এটি পারিবারিক ইউনিটে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। সঠিক জীবনসঙ্গী তাদের আশেপাশের লোকেদেরকে উৎসাহিত করবে, যেমন তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটি ফলস্বরূপ পরিবারকে মনের শান্তি অর্জন নিশ্চিত করবে, এমনকি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হলেও। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহানে বিশ্বাস করে না বা তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করে না সে কেবল তাদের আশেপাশের লোকদের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, যেমন তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের অনুগ্রহের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে এবং প্রভাবিত করবে। তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি ফলস্বরূপ পরিবারকে মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করবে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, কারণ তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসের উপর মহান আল্লাহর ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারে না। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ এমন পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, এমনকি তাদের কাছে পার্থিব বিলাসিতা থাকা সত্ত্বেও। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এই পরিণতি অনিবার্য কারণ মহান আল্লাহ একাই জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অধিকারী যা মানুষের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য একটি আচরণবিধি প্রদান করার জন্য, যা ফলস্বরূপ মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু মানুষ যদি মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে, তবে তারা কখনই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে না, কারণ এই আচরণবিধিগুলিতে জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে যা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বাধা দেয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে, বিবাহ এবং পরিবারের মধ্যে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য সঠিক জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেন এবং অন্যদেরও এটি করতে উত্সাহিত করেন। সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে লোকেরা চারটি কারণের ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী বেছে নেয়: সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা স্বার্থের জন্য। তাদের ধার্মিকতা। তারপর তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে একজন মুসলমানের উচিত এমন একজন জীবনসঙ্গী বাছাই করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যার মধ্যে ধার্মিকতা আছে অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাকওয়া হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যদিও অন্য তিনটি কারণ: সম্পদ, বংশ এবং সৌন্দর্য, বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে তবে সেগুলি বিবাহের মূল কারণ হওয়া উচিত নয়। মূল আয়াতেও এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

“আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে [তোমাদের নারীদের] বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে..."

যাদের ইসলামিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তাদের জন্য ধার্মিকতা একটি জীবনসঙ্গীর সন্ধানের জন্য একটি পছন্দসই গুণ নাও হতে পারে তবে এটিই একমাত্র গুণ যা নিশ্চিত করবে যে তাদের জীবনসঙ্গী তাদের অধিকার এবং তাদের সন্তানদের মতো অন্যান্য মানুষের অধিকার পূরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে তাদের স্ত্রীকে মৌখিকভাবে এবং বিশেষ করে শারীরিকভাবে ক্ষতি করবে না। পক্ষান্তরে, যার মধ্যে তাকওয়া নেই সে সহজেই অন্যের বিরুদ্ধে এমনকি তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বিরুদ্ধেও বাড়াবাড়ি করবে। মুসলিম বিবাহের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হল ধার্মিকতা নেই এমন লোকদের বিয়ে করা। উপরন্তু, ভুল জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ফলে একজন ব্যক্তির মানসিক চাপ বাড়বে কারণ ভুল পত্নী তাদের সন্তানদের জন্য একজন ভালো বাবা-মা হওয়ার

সম্ভাবনা কম। ভুলভাবে বাচ্চাদের লালন-পালন করা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা বাড়াবে। যার অনুপযুক্ত পত্নী আছে এবং ভুলভাবে সন্তান লালন-পালন করেছে, তাই তাদের বাড়িতে মানসিক শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলি: সম্পদ, সৌন্দর্য এবং বংশ, কাউকে খুশি করতে পারে তবে তারা সৌন্দর্যের বাহ্যিক রূপ, তাই তারা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে না, যার একটি দিক পূরণ করা। একজনের পরিবারের অধিকার। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য একটি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের তুলনায় একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের অনুরূপ। অস্বাস্থ্যকর খাবার সবসময় একজন ব্যক্তির কাছে বেশি আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক হয় কিন্তু তারা শুধুমাত্র মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। যদিও, স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি মানুষের কাছে এতটা আকর্ষণীয় বা আনন্দদায়ক নাও হতে পারে তবুও তারা ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে, যা মানসিক শান্তি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

"আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে [তোমাদের নারীদের] বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে..."

এই আয়াতটি পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা বিচার করা এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলাম মানুষকে একটি একক মাপকাঠির ভিত্তিতে বিচার করে: তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচার করার অন্যান্য সমস্ত মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলিমদের দ্বারা উপেক্ষা করা উচিত অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনের উদ্দেশ্য যেহেতু অন্য লোকেদের থেকে লুকানো থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মের ভিত্তিতে অন্যকে অন্য লোকের চেয়ে ভাল বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্য লোকেদের বা নিজের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যেমন মহান আল্লাহ। , একাই সমস্ত মানুষের নিয়ত, কথা ও কাজ জানেন। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"... সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

“আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে [তোমাদের নারীদের] বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে..."

এই আয়াতের বাণী থেকে বোঝা যায় যে একজন নারীর পরিবারকে একজন স্বামীর সন্ধানে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়া উচিত। কারণ একজন নারী ভুল স্বামীকে বিয়ে করলে তার নেতিবাচক পরিণতি তার জন্য একজন পুরুষের ভুল নারীকে বিয়ে করার চেয়ে বেশি গুরুতর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, স্বামীর দ্বারা স্ত্রী এবং সন্তানদের মৌখিক এবং শারীরিক নির্যাতন করা হয়। মহিলার পুরুষ আত্মীয়রা, কিছু ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য স্বামীর কাছ থেকে এমন কিছু জিনিস সনাক্ত করতে সক্ষম হবে যা এমনকি মহিলাও সনাক্ত করতে পারে না, যেমন পুরুষরা অন্য পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে ভালভাবে চিনতে পারে, ঠিক যেমন মহিলারা অন্য মহিলাদেরকে পুরুষদের চেয়ে ভাল চিনতে পারে। অতএব, একজন মহিলা ভুল স্বামী বেছে নেওয়া একজন পুরুষের ভুল স্ত্রী বেছে নেওয়ার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। একজন মহিলার ভুল স্বামীকে বিয়ে করার সম্ভাবনা কমানোর জন্য, তার পরিবারকে অবশ্যই একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে তাকে সাহায্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উত্সাহিত করবেন, যার একটি দিক হল নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করা।

মহান আল্লাহ তারপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার ইঙ্গিত দেন যা প্রায়শই মানুষ উপেক্ষা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

" *আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। তারা জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেয়, কিন্তু আল্লাহ তার অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান।*

কেউ যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, বা কাজের সাথে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করে না, তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে এমন একটি জীবন যাপন করবে যেখানে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহকে অমান্য করবে। ফলস্বরূপ, তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের চারপাশের লোকদের একই কাজ করতে উত্সাহিত করবে, কারণ একজন ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ গ্রহণ করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ ধূমপান করেন না এমন লোকেদের সাথে যান, তখন তাদের চোখে ধূমপান স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা তাদেরও ধূমপান শুরু করার প্রথম ধাপ। উপরন্তু, যেহেতু অমুসলিমদের জীবন-যাপন পদ্ধতি মুসলিমদের আচরণবিধি থেকে একেবারেই আলাদা, তাই একজন অমুসলিমদের জন্য যা করা গ্রহণযোগ্য, যেমন মদ্যপান, তাদের সাথে আসা একজন মুসলিমের কাছেও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

থাকা উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামের একটি দিক। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের সাথে তাদের এতটা ভীতিপ্রদর্শন হওয়া উচিত নয় যাতে তারা তাদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ গ্রহণ করে, বিশেষ করে যেগুলো ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের সঙ্গী এবং বিশেষ করে তাদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে হবে, কারণ তারা তাদের আচরণ ও পরামর্শের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হবে, দুনিয়াতে কষ্ট ও চাপের আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন বা শান্তির দিকে। দুনিয়াতে মনের এবং পরকালে জান্নাতের বাগান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

" *আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। তারা জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেয়, কিন্তু আল্লাহ তার অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান।*

উপরন্তু, বিবাহ একটি সম্পর্ক যার গভীর সামাজিক, নৈতিক এবং মানসিক প্রভাব রয়েছে। একজন মুসলিম এবং একজন মুশরিকের মধ্যে বিবাহের অনেক সম্ভাব্য ফলাফল রয়েছে। একদিকে, এটা সম্ভব যে মুসলিম পত্নীর প্রভাবের কারণে, অন্য অংশীদার, পরিবার এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম ইসলামী আকীদা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, এটাও সম্ভব যে, যে পত্নী একজন মুশরিক, সে বিশ্বাসী পত্নী, পরিবার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে। তাছাড়া এই সম্পর্ক সেই পরিবারে

ধর্মের মিশ্রন ও মিশ্রনকে উন্নীত করতে পারে। অমুসলিমদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামের কাছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো সত্যিকারের মুসলমান এই ঝুঁকি নিতে পারে না যে, নাস্তিকতা ও বহুদেবতার সাথে জৈবভাবে জড়িত ধারণা এবং জীবনধারা তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে বা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের কিছু দিক তাদের দ্বারা প্রভাবিত ভুল বিশ্বাস ও অনুশীলন দ্বারা দূষিত হতে পারে। মুশরিক পত্নী। আজকে যদি কেউ মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করেন তবে তারা দেখতে পাবেন যে তাদের অনেকেই তাদের অমুসলিম বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা অমুসলিম রীতি ও বিশ্বাস গ্রহণে প্রভাবিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে এমনটা ঘটলে একজন মুশরিক পত্নীর প্রভাব কি কল্পনা করা যায়?

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

" *আর মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন ক্রীতদাসী একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। আর মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন বান্দা মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাকে খুশি করতে পারে। তারা জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেয়, কিন্তু আল্লাহ তার অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান।*

উপসংহারে, তার ছোট আয়াতটি পরিবারের বাড়িতে মানসিক শান্তি অর্জনের দিকে একটি বড় পদক্ষেপকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার ফলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই ফলাফল তখনই পাওয়া যাবে যখন লোকেরা এই উপদেশের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং কাজ করে, এমনকি যদি তারা তাদের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি

পালন করতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই সমস্ত কিছুর জ্ঞান রাখেন এবং সমস্ত ক্রিয়া ও পছন্দের ফলাফল জানেন, তাই তিনি একাই মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম উপায়ে পরিচালিত করতে পারেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে পারে, এমনকি যদি কারও ইচ্ছা বিরোধী হয়। . তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কাজ করেন, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে একটি সুস্থ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, সেভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 221:

"...এবং তিনি লোকদের জন্য তাঁর আয়াতগুলি [অর্থাৎ, নিয়মাবলী] স্পষ্ট করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 222-223

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

"এবং তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটা কষ্টের বিষয়, তাই ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো। এবং তাদের কাছে যেও না যতক্ষণ না তারা শুদ্ধ হয়। এবং যখন তারা নিজেদেরকে পবিত্র করবে, তখন তাদের কাছে এসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা ক্রমাগত অনুতপ্ত হয় এবং যারা নিজেদেরকে শুদ্ধ করে তাদের ভালোবাসে।

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য চাষাবাদের জায়গা [অর্থাৎ, বীজ বপন], সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা চাষের জায়গায় আস এবং নিজেদের জন্য [ধার্মিকতা] প্রকাশ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"

মূল আয়াতের শুরুতে ইসলামী ও জাগতিক জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

" *তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে...*"

ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে বিষয়গুলিকে অবশ্যই গবেষণা ও অধ্যয়ন করতে হবে তা হল সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি যা মহান আল্লাহ বিচার দিবসে মানুষকে প্রশ্ন করবেন, যেমন একজন প্রতিবেশীর সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং কেবল একজন ব্যক্তির সময় নষ্ট করে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে তাদের শক্তি উৎসর্গ করার অবস্থানে থাকা একমাত্র তারাই যারা ইতিমধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে কাজ করেছেন। যেহেতু এটি করা কার্যত অসম্ভব, তাই মানুষকে অবশ্যই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, সময় এবং শক্তিকে ধর্মীয় জ্ঞানের সেই শাখাগুলির উপর গবেষণা এবং কাজ করার জন্য কেন্দ্রীভূত করতে হবে যেগুলিকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে এবং বাকি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এবং একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি উদাহরণ তারপর মূল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 222:

" *এবং তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটা কষ্টের বিষয়, তাই ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকুন। এবং যতক্ষণ না তারা পবিত্র না হয় তাদের কাছে যেও না। এবং যখন তারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, তখন তাদের কাছে এসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।*

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও আধুনিক বিশ্বের লোকেরা তাদের মাসিক চক্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছে, মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি ইঙ্গিত করেছিলেন। আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র মানুষকে জানিয়েছিলেন যে একজন মহিলার মাসিক চক্রটি বেদনাদায়ক হয় যাতে তারা এই সময়ে তাদের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন, সম্মান এবং ধৈর্য দেখায়। যদিও উদ্‌ধৃত আয়াতের আভিধানিক অর্থ হল স্বামীকে তার মাসিক চক্রের সময় তার স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতার নির্দিষ্ট কাজ করার অনুমতি নেই, কারণ এটি তাদের উভয়ের ক্ষতি করবে , এর অন্য অর্থ হল এই কঠিন সময়ে নারীদের অহেতুক দাবি করে তাদের মানসিকভাবে দমবন্ধ করার পরিবর্তে অতিরিক্ত স্থান দিন। এটা আসলে স্বামীর বাইরেও প্রসারিত। অর্থ, সব পুরুষের উচিত নারীদের প্রতি তাদের ভালো ব্যবহার উন্নত করা। এমনকি নিয়োগকর্তাদের তাদের মহিলা কর্মচারীদের প্রতি অতিরিক্ত বিবেচ্য হওয়া উচিত এবং তাদের জন্য কাজগুলি সহজ করার জন্য কাজের সময় এবং বাড়ি থেকে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে নমনীয় হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

এটা আশ্চর্যজনক যে এই যুগে কতজনই নারীর অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সমালোচনা করে তবুও এই এবং অন্যান্য শিক্ষাগুলিকে উপেক্ষা করে, যা তারা আজ যে ধারণাগুলি তৈরি করছে তার কয়েক শতাব্দী আগে দেওয়া হয়েছিল।

উপরন্তু, এমনকি যদি বিজ্ঞান এখনও তার মাসিক পিরিয়ডের সময় একজনের স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে সৃষ্ট নির্দিষ্ট ক্ষতিগুলি প্রমাণ করে না, তবে এর অর্থ এই নয় যে ক্ষতি নেই। বিজ্ঞান যেমন মদ্যপান এবং শূকরের মাংস খাওয়ার মতো ইসলামের দ্বারা নিষিদ্ধ অন্যান্য জিনিসের ক্ষতির কিছু প্রকাশ করেছে, তেমনি বিজ্ঞান এই ক্ষতিগুলির কিছু প্রকাশ করার আগে এটি সময়ের ব্যাপার।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 222:

" *এবং তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটা কষ্টের বিষয়, তাই ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকুন। এবং যতক্ষণ না তারা পবিত্র না হয় তাদের কাছে যেও না। এবং যখন তারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, তখন তাদের কাছে এসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।*

ইসলামের আগের যুগে যেসব নারী তাদের মাসিক চক্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হিসেবে দেখা হতো। এমনকি কিতাবের পুরুষরাও তাদের বাড়িতে মাসিক চক্রের সময় তাদের স্ত্রীদের সাথে খেতে বা মিশতেন না। সুনানে আন নাসায়ী, ২৮৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ, এই মূর্খ মানসিকতা দূর করেছেন কারণ তিনি এমনও বলেননি যে এই মাসিক চক্রটি তাদের বিশ্বাসের পথে কোনভাবে অপবিত্র করে তোলে। আল্লাহ, মহান, মানুষকে জানিয়ে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন যে এই চক্রটি যেহেতু একটি বেদনাদায়ক তাই মানুষের উচিত তাদের যত্ন এবং সম্মানের উন্নতি করা, যেমন একজন ব্যক্তি নিজেকে আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাঁর স্ত্রীদের প্রতি এই ভালবাসা এবং যত্ন প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তার স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা রেখেছিলেন এবং তার মাসিক চক্রে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এটি সহীহ বুখারী, 297 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তার মাসিক চক্রের সময় তার স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একই পেয়ালা থেকে পান করতেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একই অংশে তার ঠোঁট রাখতেন। পান করার সময় কাপটি সে তার রাখবে। সুনানে আন নাসায়ী, 280 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে একজনের স্ত্রীর কাছে আসা, মুসলমানদের শেখায় যে ইসলামের অনুমোদিত উপায়ে তাদের স্ত্রীর সাথে শারীরিকভাবে ভয় দেখাতে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 222:

"... *আর যখন তারা নিজেদেরকে পবিত্র করবে, তখন তাদের কাছে আসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা অবিরাম অনুতপ্ত হয় এবং যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তাদের ভালোবাসেন..."*

আল্লাহ, মহান, এই আয়াতে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার সাথে দৈহিক বিশুদ্ধতাকে একত্রিত করেছেন যার ফলে একজন মুসলিমের জীবনে উভয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। শারীরিক পরিশুদ্ধি শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক হৃদয়ের স্বাস্থ্যের জন্য আধ্যাত্মিক পবিত্রতা গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক হৃদয়ের

বিশুদ্ধতার সাথে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন উদারতা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করা এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, শত্রুতা এবং অহংকার পরিত্যাগ করা জড়িত। যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তখন তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা একজনের উদ্দেশ্য, কথা ও কর্মের বিশুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাবে। যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা উভয়ই একত্রিত হয়, তখন এটি মানসিক এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয় সে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে, যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্য অর্জন করতে পারে না এবং তারা মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। , তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর আছে, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং c hapter 20 Taha, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, আধ্যাত্মিক হৃদয়কে শুদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পেতে বাধা দেবে, যার ফলস্বরূপ, তারা মনের শান্তি পেতে বাধা দেবে। যেহেতু মহান আল্লাহই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মতো সব কিছু জানেন, তাই তিনি একাই আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার সঠিক পদ্ধতি প্রদান করতে পারেন যা পরবর্তীতে মনের শান্তির দিকে নিয়ে

যায়। অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যসৃষ্ট পদ্ধতি কখনই এই ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে না কারণ তাদের কাছে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা নেই।

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা আশা করেন না, তিনি যখনই তারা পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 222:

"...অবশ্যই, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা অবিরত অনুতপ্ত হয় এবং যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তাদের ভালোবাসেন।"

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙঘন করা হয়েছে। কাজেই, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয়, তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করে। পরিবর্তে, তিনি আশা করেন যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের দেহ এবং আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে, এমন কিছু করার ক্ষমতা সব মানুষেরই আছে, কারণ তিনি মানুষের উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না এবং যখন তারা পাপ করে। আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 223:

" *তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য চাষাবাদের জায়গা [অর্থাৎ, বীজ বপনের], সুতরাং আপনি যেভাবে চান চাষের জায়গায় আসুন..."*

এই শ্লোকটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত এবং জনসমক্ষে উভয় সময়ে স্ত্রীর প্রতি দয়া, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দেখানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন কৃষক যে তাদের জমি চাষ করে সে একইভাবে তার প্রতি খুব যত্ন এবং মনোযোগ দেখায়, একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর প্রতি একই কাজ করতে হবে: তার সন্তানের মা। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম অপরিচিতদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করতে ভাল কিন্তু প্রায়শই তাদের নিজের আত্মীয়দের সাথে সম্মান এবং দয়ার সাথে আচরণ করাকে উপেক্ষা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তির আত্মীয়দের ভালবাসা, সম্মান এবং দয়ার সাথে অন্য কারো সাথে আচরণ করার অধিকার রয়েছে, যদিও সমস্ত মানুষ এই আচরণের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু। . একজনের পত্নীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করার জন্য, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রিয়জনের জীবনসঙ্গীকে তাদের প্রিয়জনের সাথে আচরণ করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষের তার

স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে সে তার জামাইকে তার মেয়ের সাথে আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, একজনের সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মনোভাব গ্রহণ করা সত্য বিশ্বাসের লক্ষণ। সহীহ বুখারী, ১৩ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই আয়াতটি পরোক্ষভাবে এমন একজন ব্যক্তিকে বিয়ে করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে তাদের জীবনসঙ্গীর অধিকার পূরণ করবে, যার মধ্যে তাদের যত্ন, সম্মান এবং ভালবাসার সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। এটা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ একজন ধার্মিকতার অধিকারী জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে, কারণ তারা জানে যে এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য যা বিচার দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে। পক্ষান্তরে, যে মহান আল্লাহর ভয়ের অধিকারী নয়, সে সহজেই অন্য লোকদের যেমন তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি জুলুম করবে, কারণ তারা তাদের আচরণের পরিণতিকে ভয় পায় না। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, লোকেদের অবশ্যই এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার মধ্যে তাকওয়া আছে, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 223:

" *তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য চাষাবাদের জায়গা [অর্থাৎ, বীজ বপনের], সুতরাং আপনি যেভাবে চান চাষের জায়গায় আসুন এবং নিজেদের জন্য [ধার্মিকতা] প্রকাশ করুন..."*

এটি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সন্তান ধারণ করা এবং তাদের লালন-পালনকে বোঝায়। যে এটি অর্জন করবে সে তাদের সন্তানকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের জন্য শান্তির উত্স করে তুলবে। সি অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 74:

" আর যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের প্রশান্তি দান করুন..."

কিন্তু এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ তার সন্তানের অধিকার পূরণ করে। এর মধ্যে তাদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই সফল হওয়ার হাতিয়ার প্রদান করা জড়িত। দুঃখের বিষয়, মুসলিম পিতামাতারা তাদের সন্তানদের পার্থিব শিক্ষা প্রদানে ভালো কিন্তু প্রায়ই তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে, যদিও পরবর্তীটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। নিজের সন্তানকে এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা শেখানো যা তারা বোঝে না এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করা তাদের সন্তানের অধিকার পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। একজন পিতামাতাকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলিকে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে, যাতে শিশুটি শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের জন্য নয়, প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহকে মানতে শেখে। ফরজ নামাজের সময়, পিতা-মাতার কারণে ইসলাম অনুসরণ না করে সত্য বলে দৃঢ়প্রত্যয়ী। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা মঞ্জুর করা হয়েছে তা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি করতে ব্যর্থ হলে শুধুমাত্র একজনের সন্তান ইসলামের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস গ্রহণ করবে, যার ফলস্বরূপ তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে মানতে বাধা দেবে। যে শিশুটি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে এবং তাই উভয় জগতে তাদের পিতামাতার জন্য চাপের কারণ হয়ে উঠবে, এমনকি যদি শিশুটি পার্থিব সাফল্য অর্জন করে। শুধুমাত্র যখন একজন অভিভাবক এই

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তখনই তারা দোষ থেকে রেহাই পাবেন, এমনকি যদি তারা শিশু ইসলামিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করা বেছে নেয়।

যেহেতু একজনের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করা এবং তাদের সন্তানকে লালন-পালন করা প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য, তাই তাদের অবশ্যই এই দায়িত্বগুলি ব্যর্থ করার পরিণতি সম্পর্কে ভয় করতে হবে যাতে তারা সেগুলি পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 223:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে..."

আয়াত 223 এর শেষ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, যারা সত্যই বিশ্বাস করে যে তারা বিচারের দিনে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহির মুখোমুখি হবে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যেমন তাদের স্ত্রী এবং সন্তান। এই মনোভাব তখন উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 223:

"... আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ, যে ব্যক্তি বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হয়, সে প্রমাণ করে যে তারা এতে বিশ্বাস করে না যেভাবে সফলতা অর্জন করতে হবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা তাদের আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার যেমন তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের পূরণ করতে বাধা দেয়। এটি উভয় জগতেই মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, কারণ তারা মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্য অর্জন করতে পারে না এবং তারা মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। , তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর আছে, মনের শান্তির আবাস। এটা খুবই সুস্পষ্ট যখন কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ্] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 223:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে..."

মনে রাখার নির্দেশ যে আখেরাতে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে তা দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। ঈমানের নিশ্চিততা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণাদি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহ শিখে এবং তার উপর আমল করে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করবে সে পরকালে তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে। এর মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলি তারা মঞ্জুর করা হয়েছে তা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার

উপায়ে ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে, যে দুর্বল ঈমানের অধিকারী, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতা, সে সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে এবং ফলস্বরূপ তারা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 224-225

وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٢٤﴾

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴿٢٢٥﴾

“এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য [আপনার শপথ] অজুহাত বানাবেন না। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ আপনার অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আপনাকে দোষারোপ করেন না, তবে আপনার অন্তর যা অর্জন করেছেন তার জন্য তিনি আপনাকে দোষারোপ করেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

ইসলামের শিক্ষার মধ্যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন উপায়ে একজনের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি হল পাপপূর্ণ বক্তৃতা এবং সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে , কারণ এই পৃথিবীতে নিজের প্রতি সমস্যা এবং চাপ আকর্ষণ করার প্রধান কারণ হল শব্দের মাধ্যমে, বিশেষ করে পাপপূর্ণ কথা। উপরন্তু, কথিত খারাপ শব্দ বিচারের দিন জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের কথা হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা। যদিও এটি একটি পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবুও এটি এড়ানো উচিত নয় কারণ অনর্থক কথাবার্তা প্রায়শই পাপপূর্ণ কথার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক কথাবার্তা প্রায়ই অন্যদের সম্পর্কে গীবত এবং পরচর্চার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি সময় এবং শক্তির অপচয় যা প্রায়শই এই পৃথিবীতে চাপ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায় এবং বিচার দিবসে এটি একজন ব্যক্তির জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময় এবং শক্তিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে দেখেছে। এবং ফলস্বরূপ তারা পুরষ্কার পায়। তৃতীয় প্রকারের বক্তৃতা হল উত্তম ও উপকারী কথা এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই কথা বলা উচিত। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের জীবন থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বক্তব্য মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

মহান আল্লাহ প্রধান আয়াতে একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব শেখান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য [আপনার শপথ] অজুহাত বানান না"।*

এই পরিস্থিতিতে লোকেরা তাদের শব্দের অপব্যবহার করার প্রধান কারণ হল রাগ। ইসলাম মানুষকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় যাতে তারা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে অমান্য করে পাপ না করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন রাগান্বিত ব্যক্তির নীরব থাকা উচিত এবং তাদের রাগ ছেড়ে যাওয়ার পরেই কথা বলা উচিত। একজন ব্যক্তির রাগান্বিত অবস্থায় সে যে পরিস্থিতির সাথে জড়িত তা ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং শান্ত হলেই ফিরে আসা উচিত। শব্দগুলি প্রায়শই ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হতে পারে, তাই একজনের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, বিশেষত যখন তারা রাগান্বিত হয়। তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নিতে হবে। অর্থ দাঁড়ানো থাকলে বসতে হবে এবং বসে থাকলে শুয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না তারা শান্ত হয়। সুনানে আবু দাউদ নম্বর 4782-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তির উচিত প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যেমন ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার মাধ্যমে ক্রোধের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করা, যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করা উচিত। ইসলামী শিক্ষার মধ্যে, যেমন অশ্লীল কথাবার্তা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং [তোমার শপথ] আল্লাহকে ধার্মিক হওয়ার অজুহাত বানাবেন না...*"

ধার্মিক হওয়ার মধ্যে অন্যদের প্রতি সব ধরনের ভালো কাজ করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা। এইভাবে অন্যদের সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রায়ই ঘটে যখন কেউ অন্য কারোর বিরুদ্ধে রাগান্বিত হয়, যেমন তাদের আত্মীয়। একটি উদাহরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করা চালিয়ে যাবেন না যিনি তাঁর কন্যা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াতে অংশ নিয়েছিলেন। তার ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাকে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য এবং তার পরিবর্তে তার আত্মীয়কে তার ভুল থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার কারণে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করতে এবং তার আত্মীয়কে সাহায্য করা চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করে নিম্নলিখিত আয়াতটি নাজিল করেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও সম্পদশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের [সাহায্য] না করার শপথ না করে এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

জামে আত তিরমিযী, ৩১৮০ নং হাদিসে এ ঘটনাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই অন্যদের ভাল জিনিসগুলিতে সাহায্য করা এড়াতে এবং মানুষের খারাপ আচরণকে উপেক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়াতে হবে এবং এর পরিবর্তে অন্য লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর ক্ষতি যেমন শারীরিক বা

মৌখিক ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার চাইতে হবে। ক্ষতি

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়ার এবং আল্লাহকে ভয় করার অজুহাত বানাবেন না...*"

একজন ব্যক্তির কথাবার্তা তাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে বাধা দেবে না। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করে যাতে এটি তাকে এমন কাজ করতে সাহায্য করে যা তাকওয়ায় নিহিত থাকে। ধার্মিকতার অন্তর্ভুক্ত যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যিনি মহান আল্লাহর ভয়ে তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি তাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা বেশি, যেমনটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করা কঠিন। এই কারণেই জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন কারো কথাবার্তা সঠিক ও ন্যায়পরায়ণ হবে, তখন তার কাজও সঠিক ও ন্যায়পরায়ণ হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য [আপনার শপথ] অজুহাত বানান না*"।

এই আয়াতে উল্লিখিত লোকদের মধ্যে মিলন অন্য লোকেদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ দুজনের মধ্যে কিছু সমস্যার কারণে অন্য লোকেদের সাথে কথা না বলার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কারণ একজন ব্যক্তিকে পার্থিব কারণে কঠোর সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1909 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পরিবর্তে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সমস্ত মানুষের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের ভাল জিনিসগুলিতে সাহায্য করা এবং খারাপ জিনিসগুলির বিরুদ্ধে সতর্ক করা। অন্যদের কাছ থেকে গুরুতর ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যও তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার চাওয়া উচিত। যদিও ধর্মীয় কারণে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা গ্রহনযোগ্য, তবুও কম নয়, একজনের এই মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত এবং পরিবর্তে অন্যদের ভাল জিনিসগুলিতে সাহায্য করা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এই ধরনের আচরণ তাদের জন্য তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য [আপনার শপথ] অজুহাত বানান না"।*

এই আয়াতে উল্লিখিত নেতিবাচক বিষয়গুলি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি মানুষের স্বার্থে অন্যদের প্রতি ভাল কাজ করে সে প্রায়শই দেখতে পাবে যে লোকেরা কৃতজ্ঞ না হওয়ায় এটি তিক্ততার দিকে নিয়ে যায় যা তাদের মধ্যে সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সঠিক নিয়ত অবলম্বন করে, সে কেবল তাঁর কাছেই পুরস্কার চাইবে এবং তাই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবে। 224 এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করা চালিয়ে যান, তাদের সাধারণ খারাপ আচরণ নির্বিশেষে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যদি অন্যের খারাপ আচরণ গুরুতর হয়, যেমন মৌখিক এবং শারীরিক নির্যাতন, তাহলে একজনকে তাদের জীবনে পরিবর্তন করা উচিত যাতে তারা ভাল কাজ করবে না এমন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

আয়াত 224 এর শেষ দ্বারা নির্দেশিত, যেহেতু মহান আল্লাহ সব শ্রবণকারী, তিনি সমস্ত মানুষের কথা শোনেন, তাই তাদের অবশ্যই তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তাদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করতে হবে যাতে তারা আয়াত 224 এ উল্লিখিত নেতিবাচক বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে তাদের নিজের স্বার্থে অন্যদের ভাল করা চালিয়ে যায়, কারণ এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

"... আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জানেন।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 224:

" *এবং আল্লাহকে ধার্মিক হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য [আপনার শপথ] অজুহাত বানান না"।*

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর নাম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি এটিকে ছোট করে। একজন মুসলিমকে তার ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলী শেখার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে তাদের সম্মান এবং ভয় বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ একজন ব্যক্তি যাকে ভয় বা সম্মান করতে পারে না তাকে সে জানে না। যে এটি করবে সেও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ

করবে কারণ তারা তাদের নিজস্ব সৃষ্ট স্তর অনুসারে মহান আল্লাহর ঐশী নাম ও গুণাবলীর উপর কাজ করতে উত্সাহিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহর অসীম রহমত সম্পর্কে শিখেছেন, তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অন্যদের সাথে করুণাপূর্ণ আচরণ করতে শিখবেন। এই কারণেই ঐশী নাম শেখা এবং আমল করা জান্নাতে নিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এমন ক্ষেত্রে যেখানে একজন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ইচ্ছা করে না কিন্তু এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা এটিকে প্রকাশ করে, যেমন আরবিভাষী ব্যক্তিরা যাদের বক্তৃতায় মহান আল্লাহর নামে শপথ করার অভ্যাস আছে, আল্লাহ তায়ালা তা করবেন। এটি উপেক্ষা করুন এবং ক্ষমা করুন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

" *তোমাদের অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দোষারোপ করেন না, তবে তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছেন তার জন্য তিনি তোমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেন...*"

কিন্তু আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, মূল আয়াতগুলি একজনকে তাদের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা সর্বদা সরলভাবে কথা বলে, যা তাদের অনিচ্ছাকৃত বক্তব্য থেকে রক্ষা করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

" ...*কিন্তু তিনি আপনার অন্তর যা অর্জন করেছেন তার জন্য তিনি আপনার উপর দোষ চাপিয়েছেন...*"

এটি সর্বদা নিজের উদ্দেশ্য সংশোধন করার একটি সতর্কবাণী যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথা বলে এবং কাজ করে। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল একজনের উদ্দেশ্য। কারও ভিত্তি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তবে তারা যা করবে তা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার মতো ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত অবলম্বন করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের কথাবার্তা এবং কাজ সঠিক আছে যা ফলস্বরূপ উভয় জগতে তাদের জন্য পুরস্কার এবং আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে কেউ অন্য লোকেদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশা করে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

" ...*কিন্তু তিনি আপনার অন্তর যা অর্জন করেছেন তার জন্য তিনি আপনার উপর দোষ চাপিয়েছেন...*"

এটি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে শুদ্ধ করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি ভাল উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের দিকে পরিচালিত করে, যা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এটি ফলস্বরূপ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামি শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতা শেখে এবং গ্রহণ করে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, অহংকার এবং লোভ ত্যাগ করে।

যেহেতু মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে করা কথা ও কাজ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করার সংকল্প করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

"... *এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল...*"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ সহনশীল, একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা অবিলম্বে বা স্পষ্টভাবে শাস্তি না পাওয়ার কারণে তাদের ভুল উদ্দেশ্য এবং খারাপ কথাবার্তা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে না। মহান আল্লাহর শাস্তি অনেক সময় অতি সূক্ষ্ম। উদাহরণস্বরূপ, পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং খ্যাতি, একটি মঞ্জুর করা হয়েছে প্রায়ই তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে।

একজন ব্যক্তির অবিলম্বে শাস্তি না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাকে মোটেও শাস্তি দেওয়া হবে না। বিলম্বিত শাস্তি কোন শাস্তির মত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ ধৈর্যশীল, তিনি মানুষকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করার অবকাশ দেন এবং তাই এই অবকাশের সময়কে অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজকে সংশোধন করে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

"... আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

উপরন্তু, এই দুটি ঐশ্বরিক নাম মুসলমানদের অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করতে উৎসাহিত করে যখনই তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, আশা করে যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিদানে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এবং লোকেদের অবশ্যই খারাপ আচরণের মুখে সহনশীলতা অবলম্বন করতে হবে এবং জিনিসগুলি ছেড়ে দিতে শিখতে হবে, কারণ লোকেরা ফেরেশতা নয় এবং তাই ভুল করতে পারে। একজন ব্যক্তি যেমন আল্লাহ, মহান এবং অন্যান্য লোকেদের সাথে সহনশীল ও ক্ষমাশীল হতে চায়, তাদেরও অন্য লোকদের সাথে এই আচরণ করা উচিত। কিন্তু আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে অন্যের শারীরিক এবং মৌখিক নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া

উচিত নয়। তাদের উচিত এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে শেখে। তবে ছোটখাটো পরিস্থিতিতে সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করা উচিত।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 226-233

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا
وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم
بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময়, কিন্তু তারা যদি [স্বাভাবিক সম্পর্কে] ফিরে আসে - তবে অবশ্যই, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়- তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে [পুনরায় বিয়ে করবে না] এবং তাদের জন্য বৈধ নয় যে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে। এবং তাদের স্বামীদের এই [সময়ে] তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি অধিকার আছে যদি তারা পুনর্মিলন চায়। এবং তাদের কারণে [অর্থাৎ, স্ত্রীরা] তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, যুক্তিসঙ্গত অনুসারে। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে] একটি ডিগ্রি রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তালাক হয় দুইবার। অতঃপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্য উপায়ে রাখ বা [তাকে] উত্তমরূপে ছেড়ে দাও চিকিত্সা আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যদি না উভয়েই ভয় করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু যদি আপনি আশঙ্কা করেন যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করবে না, তাহলে সে যা দিয়ে মুক্তিপণ দিয়েছে তাতে তাদের উভয়েরই কোন দোষ নেই। এগুলো আল্লাহর সীমা, সুতরাং এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, তারাই জালেম।

আর যদি সে তাকে [তৃতীয়বার] তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। এবং যদি সে [অর্থাৎ, পরবর্তী স্বামী] তাকে তালাক দেয় [বা মারা যায়] তবে তাদের [অর্থাৎ, মহিলা এবং তার পূর্বের স্বামী] একে অপরের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন দোষ নেই যদি তারা মনে করে যে তারা [সীমার মধ্যে] রাখতে পারবে। আল্লাহর। এগুলো আল্লাহর সীমা, যা তিনি এমন লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেন যারা জানে [বুঝে]।

আর যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা [প্রায়] তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন হয় তাদের গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী রেখে দাও অথবা গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী তাদের ছেড়ে দাও এবং [তাদের বিরুদ্ধে] সীমালঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতি করার ইচ্ছা করে তাদের রাখো না। আর যে এটা করে সে অবশ্যই নিজের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা করো না। আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা যা নাযিল করা হয়েছে, যার দ্বারা তিনি তোমাকে নির্দেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

আর যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে বাধা দিও না যদি তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে তাকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্রতর এবং আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

যে কেউ নার্সিং [পিরিয়ড] সম্পূর্ণ করতে চায় মায়েরা তাদের সন্তানদের সম্পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াতে পারেন। পিতার উপর তাদের [অর্থাৎ মায়েদের] রিযিক এবং তাদের পোশাক গ্রহণযোগ্য অনুযায়ী। কোনো ব্যক্তিকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি চার্জ করা হয় না। কোন মা তার সন্তানের দ্বারা এবং কোন পিতা তার সন্তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়. এবং [পিতার] উত্তরাধিকারীর উপর [পিতার] অনুরূপ [কর্তব্য]। আর যদি তারা উভয়েই উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায় তবে উভয়ের কোন দোষ নেই। এবং যদি আপনি আপনার সন্তানদের বিকল্প দ্বারা লালন-পালন করতে চান, তবে আপনার জন্য কোন দোষ নেই যতক্ষণ না আপনি গ্রহণযোগ্য অনুযায়ী অর্থ প্রদান করেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

অপছন্দনীয় শপথ করা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মূল আয়াতের শুরুতে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 226:

" *যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্পর্ক না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময়...*"

এটি আবার উভয় জগতের সমস্যা থেকে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করার জন্য একজনের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি হল পাপপূর্ণ বক্তৃতা এবং সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এই পৃথিবীতে নিজের প্রতি সমস্যা এবং চাপ আকর্ষণ করার প্রধান কারণ হল শব্দের মাধ্যমে, বিশেষ করে পাপপূর্ণ কথা। উপরন্তু, কথিত খারাপ শব্দ বিচারের দিন জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের কথা হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা। যদিও এটি একটি পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবুও এটি এড়ানো উচিত নয় কারণ অনর্থক কথাবার্তা প্রায়শই পাপপূর্ণ কথার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক কথাবার্তা প্রায়ই অন্যদের সম্পর্কে গীবত এবং পরচর্চার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি সময় এবং শক্তির অপচয় যা প্রায়শই এই পৃথিবীতে চাপ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায় এবং বিচার দিবসে এটি একজন ব্যক্তির জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময় এবং শক্তিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে দেখেছে। এবং ফলস্বরূপ তারা পুরষ্কার পায়। তৃতীয় প্রকারের বক্তৃতা হল উত্তম ও উপকারী কথা এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই কথা বলা উচিত। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের জীবন থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বক্তব্য মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 226:

" *যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্পর্ক না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময়..."*

ইসলামের পূর্বের সময়ে, একজন রাগান্বিত স্বামী এই শপথ গ্রহণ করতেন তবে এটির জন্য একটি সময় সীমাবদ্ধ করতেন না। ইমাম আল ওয়াহিদীর আসবাব আল নুযুল, ২:২২৬ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তার স্ত্রীর প্রতি একটি স্পষ্ট অবিচার ছিল কারণ তাকে তালাক দেওয়া হয়নি যাতে তিনি পুনরায় বিয়ে করতে পারেন বা তিনি তার স্বামীর সাথে সত্যিকারের বিবাহে বসবাস করছেন না। মহান আল্লাহ এই বিচ্ছেদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে এই মূর্খতা ও অন্যায় প্রথার অবসান ঘটান।

বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে চার মাস অপেক্ষার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের আবেগকে শান্ত করার জন্য যাতে তারা বিবাহিত থাকা বা বিবাহবিচ্ছেদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে স্পষ্ট, নিরপেক্ষ এবং নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। অত্যধিক আবেগপূর্ণ মন যাতে তারা একটি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা তারা পরে অনুশোচনা করবে না। যাইহোক, অবিলম্বে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে এই জ্ঞাত সিদ্ধান্তটি অর্জিত হয় না এবং লোকেরা প্রায়ই

আত্মসম্মান এবং লজ্জার কারণে তাদের মন পরিবর্তন করতে চায় না, যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির অনুশোচনায় আরও চাপ সৃষ্টি করে। উপরন্তু, এই সময়টি একটি গর্ভাবস্থাকে নিজেকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয় এবং স্ত্রীর দ্বারা গোপন করা উচিত নয়, কারণ স্বামীর তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জানার অধিকার আছে বা না। অবশেষে, একটি অপেক্ষার সময় দম্পতিদেরকে বাধা দেয় যারা বিবাহবিচ্ছেদ বেছে নেয় অন্য বিয়েতে আবেগগতভাবে তাড়াহুড়ো থেকে, যা তাদের জন্য আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

যদি একজন স্বামী তার ব্রত ভঙ্গ করে যখন বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে এবং পরিবর্তে তার স্ত্রীর সাথে থাকতে চায়, তাহলে সে দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ তাকে তার তাড়াহুড়োর জন্য শাস্তি দেন না। পরিবর্তে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করবেন, তবে স্বামীকে তাদের ভগ্ন শপথের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমনটি ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 226:

" যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময়, কিন্তু তারা যদি [স্বাভাবিক সম্পর্কে] ফিরে আসে - তবে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

ক্ষমা এবং করুণার ঐশ্বরিক গুণাবলী বিবাহিত দম্পতিদের একে অপরের প্রতি করুণা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ এই দুটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা তাদের এমন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধা দেবে যা প্রায়শই তর্কের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে এমন সমস্যাগুলির জন্য যা বিবাহবিচ্ছেদের পরিণতি ছাড়াই সহজেই সমাধান করা যায়। . যদিও এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে

শারীরিক নির্যাতনের মতো গুরুতর পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, কারণ ইসলাম কখনই মানুষকে এটি সহ্য করতে উত্সাহিত করেনি। অপব্যবহারের প্রকার। শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করার পরে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, একজন ব্যক্তির উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করার চেষ্টা করা এবং তারপরে তাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দাম্পত্য সমস্যা মোকাবেলায় বাইরের সাহায্যের গুরুত্ব নির্দেশ করেন যা দম্পতি দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 227:

"এবং যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়..."

দ্বৈত আরবি শব্দের পরিবর্তে বহুবচন শব্দ, যা দুইজনের বেশি লোককে নির্দেশ করে। একজন বিবাহিত দম্পতিকে প্রথমে তাদের মধ্যে সমস্যাগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের পক্ষপাত ও আবেগকে একপাশে রেখে ইসলামের নির্দেশনায় বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিকভাবে সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার সময়, দম্পতিকে অবশ্যই একে অপরের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, কারণ এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী এটি করতে ব্যর্থ হন। তাদের অবশ্যই একে অপরের সাথে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী দ্বারা আচরণ করতে চায়। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই তাদের জীবনসঙ্গীর প্রতি ঋণী অধিকার এবং তাদের পত্নীর কাছে যে অধিকারগুলো পাওনা তা শিখে

সমস্যার সম্ভাবনা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। বিবাহের সমস্যা এবং বিবাহবিচ্ছেদের একটি প্রধান কারণ হল যখন একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছ থেকে এমন কিছু দাবি করে যা তারা পাওয়ার অধিকারী নয়। এই সমস্ত কিছুই তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে, যা হল ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে বিয়ে করা। সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, এমনকি যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত থাকবে এবং তারা আল্লাহকে জেনে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে। উন্নত, তাদের জবাবদিহি করা হবে. পক্ষান্তরে, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে না, সে তাদের সঙ্গীর সাথে সহজে দুর্ব্যবহার করবে এবং তারা তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে না, যদিও তারা তাদের ভালবাসার দাবি করে।

যদি বিবাহিত দম্পতি নিজেরাই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের উচিত বাইরের সাহায্যের দিকে যাওয়া, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বিবাহের পরামর্শ দেওয়া। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

"আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিস পাঠাও। যদি তারা উভয়েই সমঝোতা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদা সর্বজ্ঞ ও সচেতন।"

কিন্তু এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই অভিজ্ঞতা, ইসলামী জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মহান আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। শুধুমাত্র যখন তারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করবে তখনই তারা সৎ

এবং আন্তরিকভাবে আচরণ করবে যা বিবাহিত দম্পতিকে সাহায্য করে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম সঠিক লোকেদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। যে ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে না সে কেবল তাদের পক্ষে সঠিক এবং অন্য দিকটি ভুল প্রমাণ করার বিষয়ে চিন্তা করবে। অথবা তাদের অধিকারের জ্ঞান থাকবে না স্বামী / স্ত্রী একে অপরকে ঘৃণা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা যে সমস্ত বিষয়ে তর্ক করবে তা সৎ ও ন্যায্য হওয়ার পরিবর্তে তাদের পক্ষে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 227:

"এবং যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় ..."

এই আয়াতে সিদ্ধান্তের আরবি শব্দের অর্থ দৃঢ় সংকল্প। অতএব, যখন এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তখন অন্য পক্ষের দ্বারা এর বিরোধিতা করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবলমাত্র উভয় পক্ষের মধ্যে আরও সমস্যা ও শত্রুতার দিকে নিয়ে যায় এবং মানসিক চাপকে দীর্ঘায়িত করে। এই ক্ষেত্রে, বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার সাথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং তারপর জীবনের সাথে এগিয়ে যাওয়া ভাল।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 227:

"এবং যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

একটি দম্পতি একসাথে থাকার বা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুক না কেন, তারা এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের অবশ্যই একে অপরের প্রতি ভালো ব্যবহার বজায় রাখতে হবে, যেমনটি ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ শোনেন এবং জানেন, তাই তিনি উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। উপরন্তু, যদি একটি দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের একটি শান্তিপূর্ণ জীবন পেতে সাহায্য করবেন, কারণ তিনি তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি নিশ্চিত করে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 130:

"কিন্তু যদি তারা [তালাকের মাধ্যমে] পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ [তাদের প্রত্যেককে] তাঁর প্রাচুর্য থেকে সমৃদ্ধ করবেন। আর আল্লাহ সর্বদা পরিব্যাপ্ত ও প্রজ্ঞাময়।"

যখন বিবাহবিচ্ছেদ জারি করা হয়, তখন বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে মহিলাকে অবশ্যই তিন মাসিক পিরিয়ড চক্রের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপরে তিনি পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে [অর্থাৎ, পুনরায় বিয়ে করবে না]..."

আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে এই অপেক্ষার সময়টি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের আবেগকে শান্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তারা বিবাহিত থাকা বা বিবাহবিচ্ছেদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে স্পষ্ট, নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। এবং অত্যধিক আবেগপূর্ণ মন যাতে তারা একটি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা তারা পরে অনুশোচনা করবে না। এই কারণেই একজন মহিলাকে তার ইদ্দতের সময় তার স্বামীর বাড়িতে থাকতে হবে যাতে তাদের আবেগ শান্ত হওয়ার পরে তারা একে অপরের প্রশংসা করে। নিম্নোক্ত আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 65 তালাকে, আয়াত 1:

“হে নবী, যখন তোমরা (মুসলিমরা) নারীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা কর এবং তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের [স্বামীদের] ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারা [নিজেদের] [সেই সময়কালে] বের হওয়া উচিত নয় যদি না তারা স্পষ্ট অনৈতিক কাজ করে থাকে। আর সেগুলিই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে অবশ্যই নিজের প্রতি জুলুম করেছে। তুমি জানো না; সম্ভবত আল্লাহ এর পরে একটি [ভিন্ন] বিষয় ঘটাবেন।

যাইহোক, অবিলম্বে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে এই জ্ঞাত সিদ্ধান্তটি অর্জিত হয় না এবং লোকেরা প্রায়ই আত্মসম্মান এবং লজ্জার কারণে তাদের মন পরিবর্তন করতে চায় না, যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির অনুশোচনায় চাপ বাড়ায়। উপরন্তু, একটি অপেক্ষার সময়কাল এমন দম্পতিদেরকে বাধা দেয় যারা বিবাহবিচ্ছেদ বেছে নেয় অন্য বিয়েতে আবেগগতভাবে তাড়াহুড়ো থেকে, যা তাদের জন্য আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে। অবশেষে, এই সময়টি গর্ভাবস্থাকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয় এবং স্ত্রীর দ্বারা তা গোপন করা উচিত নয় কারণ স্বামীর তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জানার অধিকার রয়েছে। একটি সন্তানের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিষয়ে স্বামীর চিন্তা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে বা না করবে। এই বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ এটিকে নিজের এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"...এবং আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয় যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে..."

আবারও, মহান আল্লাহ তায়ালা এটা স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক যেমন বিবাহিত দম্পতি সরাসরি তাঁর আনুগত্য বা অবাধ্যতার সাথে যুক্ত। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহর অধিকারকে মানুষের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে এবং বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ মানুষের অধিকার নিয়ে চিন্তিত নন। ফলস্বরূপ, এই মুসলমানরা ফরজ নামাজের মতো মহান আল্লাহর অধিকার পূরণে ভাল, কিন্তু মানুষের অধিকার পূরণে ভয়ানক এবং প্রায়শই তাদের উপর অন্যায় করে। এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের

উপর জুলুম করেছে সে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে অন্যায়কারী তাদের শিকারের গুনাহ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া জরুরী। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে, এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা নিজেরাই মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

মহান আল্লাহ তালাক প্রদান বা তা প্রত্যাহার করার দায়িত্ব স্বামীর হাতে অর্পণ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"...এবং তাদের স্বামীদের এই [সময়ে] তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি অধিকার আছে যদি তারা পুনর্মিলন চায়..."

এর কারণ হল, সাধারণত বলতে গেলে, পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় কম আবেগপ্রবণ এবং তাই আবেগের উপর ভিত্তি করে তাদের পত্নীকে বিবাহবিচ্ছেদ জারি করার সম্ভাবনা কম। উপরন্তু, যেহেতু স্ত্রী ও সন্তানসহ পরিবারের সকল আর্থিক দায়িত্ব স্বামীর উপর, তাই তালাক প্রদান বা তা প্রত্যাহার করার অধিকার শুধুমাত্র তারই রয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শুধুমাত্র ইদ্দতের সময় ফিরিয়ে নিতে পারে যদি তারা মিলন চায়। তিনি তার স্ত্রীর ক্ষতি করার জন্য এটি করতে পারেন না, যেমন তার জীবন কঠিন করার জন্য বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা। পরবর্তী আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 229:

“তালাক দুইবার হয়। অতঃপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্য উপায়ে রাখুন অথবা [তাকে] ভালো ব্যবহার করে ছেড়ে দিন..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 228:

“...এবং তাদের স্বামীদের এই [সময়ের] মধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি অধিকার আছে যদি তারা পুনর্মিলন চায়। এবং তাদের কারণে [অর্থাৎ, স্ত্রীরা] তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, যুক্তিসঙ্গত অনুসারে ..."

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, মহান আল্লাহ বিবাহের মধ্যে পুরুষের অধিকার উল্লেখ করার আগে নারীর অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, যে স্বামী মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে তার স্ত্রীর হক আদায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, যদিও সে মাঝে মাঝে তার অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের কখনই এতটা আত্মমগ্ন হওয়া উচিত নয় যে তারা কেবল তাদের অধিকারের কথা চিন্তা করে। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী অন্যের হক আদায় করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ বিচার দিবসে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, বরং তিনি সেই

ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, তাদের উচিত মানুষের অধিকার পূরণের বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া, তারপর কেবলমাত্র মানুষের পাওনা অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া। উপরন্তু, অন্যের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করাও তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক এবং যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে তাদের অধিকারের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সমর্থন পাবে।

উপরন্তু, এমন একটি সময়ে যখন সারা বিশ্বে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না, 1400 বছর আগে মহান আল্লাহ তাদের অধিকার দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে, যেমন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনো দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা চূড়ান্ত সুখ, একজন নারীর পায়ের নিচে, অর্থাৎ একজনের মায়ের। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3106 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3895 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তার সাথে আচরণ করে। সবচেয়ে ভালো উপায়ে স্ত্রী। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে, মহান আল্লাহ মহিলাদের মাসিক মাসিকের সময় আরও যত্ন ও সম্মান দেখানোর গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন কারণ এটি তাদের ব্যথার কারণ হয়। এই অতিরিক্ত যত্ন এবং সম্মান কার্যত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীদের প্রতি, এবং অনুকরণ করা আবশ্যক। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 222:

" এবং তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "এটা ব্যথা,..."

ইসলামের আগে, জাহেলিয়াতের যুগে, মহিলাদের জন্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সাথে সমতুল্য হওয়া সাধারণ অভ্যাস ছিল। গবাদি পশুর মতো কেনা-বেচা হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মহিলার কোন অধিকার ছিল না। তার আত্মীয়দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের কিছু অংশের অধিকারী হওয়া থেকে দূরে, তিনি নিজেও অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসের মতো উত্তরাধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হন। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন কিছু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যখন তাকে কিছুই করার অনুমতি ছিল না। এবং তিনি শুধুমাত্র একজন পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। অন্যদিকে, পুরুষটি তার ইচ্ছানুযায়ী মজুরির মতো যে কোনও সম্পদ তার সম্পত্তি ব্যয় করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীকে মানুষ নয় বলে মনে করে এবং তাকে পশুর সমতুল্য করে। ধর্মে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। তারা পূজার অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি নারীদের আত্মা নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা অল্পবয়সী কন্যাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ তারা পরিবারের জন্য লজ্জা হিসাবে দেখা হত। কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করেছিলেন যে একজন মহিলাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকেও হত্যা করেছিল কারণ তাকে ছাড়া বাঁচার মতো উপযুক্ত দেখা যায়নি। কেউ কেউ এমনকি ঘোষণা করেছিলেন যে নারীদের উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষকে সকল মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বিধান করেছেন এবং পুরুষদের তাদের উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমানভাবে নারীর অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। . নারীকে স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। তিনি পুরুষদের মতোই তার নিজের জীবন এবং সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কোন পুরুষ কোন নারীকে জোর করে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয় তাহলে বিয়ে চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ হয়ে যায়। তার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া তার যা আছে তা থেকে কোনো কিছু ব্যয় করার অধিকার কোনো পুরুষের নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে

স্বাধীন হয়ে যায় এবং তাকে কেউ কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পান। মহিলাদের জন্য ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও বেশি কিছু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নারীদের দিয়েছেন। এটা আশ্চর্যজনক যে আজ যারা নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়িয়েছে তারা কিভাবে ইসলামের সমালোচনা করছে যদিও ইসলাম নারীদের অধিকার দিয়েছে বহু শতাব্দী আগে।

আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলিতে, মহান আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরেছেন যে, স্ত্রীর অধিকার স্বামীর সমান এবং উভয়কেই একে অপরের অধিকার পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"...এবং তাদের কারণে [অর্থাৎ, স্ত্রীরা] তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, যুক্তিসঙ্গত অনুসারে। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপরে [দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে] একটি ডিগ্রি রয়েছে..."

স্বামীকে দেওয়া পরিবারের মধ্যে উচ্চ পদ তাদের উচ্চ দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত। স্ত্রী, সন্তান এবং সংসারের খরচের জন্য আর্থিকভাবে জোগান দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই। আসলে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিয়ের আগেও তার কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই, কারণ তার বাবা তার জন্য দায়ী ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে, দায়িত্বটি তার সন্তানদের উপর পড়ে, যদি সে একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হয়। এই উচ্চ স্তরের দায়িত্ব উদযাপন বা গর্ব করার মতো কিছু নয় কারণ এর অর্থ বিচারের দিনে একজন মানুষের আরও বেশি কিছুর জন্য উত্তর দেওয়ার আছে। আর যার আমলের বিচার হবে বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া

হবে। সহীহ বুখারী, 103 নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেবলমাত্র একজন মূর্খই আরও বেশি দায়িত্ব কামনা করে যার জন্য তারা মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। নারীদের তাই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে তারা এই দায়িত্ব থেকে মাফ করে এ নিয়ে হাহাকার না করে। উপরন্তু, সাহাবী, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কথিতভাবে বলেছেন যে এই ডিগ্রিটি পুরুষদের জন্য উত্তম আচরণ করতে এবং তাদের স্ত্রীদের জন্য তাদের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য উত্সাহ দেয় কারণ পছন্দকারীকে অবশ্যই ভাল গ্রহণ করার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হবে। চরিত্র তাফসির আল কুরতুবী, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 580-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু যদিও স্বামীদেরকে তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে পরিবারে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবস্থানের অপব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করেছেন, কারণ তিনি তাদের উভয় জগতেই এর জন্য জবাবদিহি করবেন, কারণ কেউ তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। পারে অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"...কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে] একটি ডিগ্রি রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী..."

মহান আল্লাহ, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আয়াত 228 শেষ করেন কারণ তিনি একাই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, যেমন মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং কীভাবে পরিবারকে সংগঠিত করতে হয়, তিনি একাই মানুষকে দান করার সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন। তাদের পরিবারের মধ্যে মানসিক

শান্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় আচরণবিধি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"... আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 228:

"...এবং তাদের কারণে [অর্থাৎ, স্ত্রীরা] তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, যুক্তিসঙ্গত অনুসারে। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপরে [দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে] একটি ডিগ্রি রয়েছে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেমন মহান আল্লাহ একটি একক মান নির্ধারণ করেছেন যা একজনকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে, মুসলমানদের অবশ্যই এই একক মান পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং অন্য সমস্ত জাগতিক মানগুলিকে ত্যাগ করতে হবে যা মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে, যেমন লিঙ্গ, জাতিগত এবং সামাজিক অবস্থান। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

ন্যায়পরায়ণতার অন্তর্ভুক্ত যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধার্মিক, তারা তত ভাল। অন্যান্য সমস্ত মান যা মানুষকে আলাদা করে, যেমন লিঙ্গ, অবশ্যই উপেক্ষা করা উচিত কারণ ইসলামে তাদের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য লুকানো থাকায়, লোকেদের তাদের বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তি করে নিজেকে বা অন্যকে অন্য লোকেদের চেয়ে ভাল বলে বিচার করা উচিত নয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"...সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

মহান আল্লাহ তখন স্ত্রীর কষ্ট ও কষ্টের জন্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাক-ইসলামে, আরবদের কোন সীমা ছিল না যে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তার ইদ্দতের সময় কতবার ফিরিয়ে নিতে পারে এবং ফলস্বরূপ, একজন স্ত্রী তার বিবাহের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে থাকবে। মহান আল্লাহ, এটি সংশোধন করেছেন এবং স্ত্রীকে তার ইদ্দতের সময় ফিরিয়ে নেওয়ার সীমা দুইবার নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন যে তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় বা বিবাহিত থাকে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 229:

“তালাক দুইবার হয়। অতঃপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্য উপায়ে রাখুন অথবা [তাকে] ভালো ব্যবহার করে ছেড়ে দিন..."

আবার স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ স্বামীর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে স্ত্রীর স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব, একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক আচরণ করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে এই দিন এবং যুগে, স্ত্রীরা প্রায়শই তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তাদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেমন বিবাহের পরামর্শের মতো বাইরের সাহায্য চাইতে উৎসাহের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করে, যদিও মহান আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে স্বামীর আরও বেশি হওয়া উচিত। বিবাহের সমস্যাগুলি সমাধান করতে আগ্রহী, এমনকি যদি এর অর্থ বহিরাগতদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়।

উপরন্তু, ভাল আচরণ বজায় রাখা, কেউ তাদের সঙ্গীকে তালাক দেয় বা তাদের সাথে থাকে, যখন কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে এমনভাবে আচরণ করে যখন তারা তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী দ্বারা আচরণ করতে চায় তখন তা অর্জন করা যায়।

যে সময়ে নারীকে গৃহস্থালির বস্তু হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং পুরুষদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ছিল, মহান আল্লাহ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে স্ত্রীকে দেওয়া যৌতুক এবং তাকে দেওয়া অন্য কোনো উপহার তার

কাছ থেকে জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। স্বামী বা তার পরিবারের দ্বারা, এটি চুরি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 229:

"...এবং আপনি তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু নেওয়া আপনার পক্ষে বৈধ নয়..."

একজন স্ত্রী স্বেচ্ছায় উপহারগুলি তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি এটি তাকে তার কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তবে এই ক্ষেত্রেও, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তার বা স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য বাইরের লোকদের জড়িত করা উচিত। যে ব্যক্তিদের মধ্যে অভিজ্ঞতা, ইসলামী জ্ঞান এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা, এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি উভয় পক্ষের প্রতি আন্তরিক ও সৎ হবেন। বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা শব্দটিতে নির্দেশিত হয়েছে, কারণ দ্বৈত রূপের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র স্বামী এবং স্ত্রীকে নির্দেশ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 229:

"...এবং আপনি তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ নয় যদি না উভয়েই ভয় না করে যে তারা আল্লাহর সীমাবদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যদি আপনি ভয় পান যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করবে না, তাহলে সে যে দ্বারা নিজেকে মুক্তি দেয় তাতে তাদের উভয়েরই কোন দোষ নেই..."

স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে উত্তম আচরণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পর, বিশেষ করে বিবাহের অসুবিধার সময়, আল্লাহ এই বাস্তবতাকে শক্তিশালী করেন যে একে অপরের সাথে দুর্ব্যবহার করা তাঁর সীমা লঙ্ঘন, যদিও একটি বিবাহ এবং এর সমস্যাগুলি দুই ব্যক্তির মধ্যে হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 229:

"...এগুলো আল্লাহর সীমা, সুতরাং এগুলো লঙ্ঘন করো না..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার ইসলামে সংযুক্ত এবং আলাদা করা যায় না। অতএব, মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়কেই পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়ালার অধিকার পূর্ণ করার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি একজনকে মানুষের অধিকার পূরণে সহায়তা করবে, কারণ এতে অন্যের প্রতি একজনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরাই সাধারণ জনগণের দ্বারা আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, যে অন্যদের জন্য পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে তা হল মুমিনের সংজ্ঞা। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমা লঙঘন করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, যা তাদের মনের শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং কীভাবে তারা মানসিক রোগে জর্জরিত হয়, কারণ তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ফলে সৃষ্ট চাপটি বইয়ের একটি বিশাল গ্রন্থাগারের মতো যা কোনও ক্রমে সাজানো হয়নি। ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি

নির্দিষ্ট বই খুঁজছেন, এটি খুঁজে পেতে প্রচুর চাপের সম্মুখীন হবেন। অন্যদিকে, যিনি একটি সুসংগঠিত লাইব্রেরির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বই খোঁজেন তিনি সহজেই ন্যূনতম চাপের সাথে এটি খুঁজে পাবেন। এটি সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ একজনকে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনের মানুষগুলি, তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে সংগঠিত হয়েছে। , ঠিক যেমন বইয়ের সুসংগঠিত লাইব্রেরি।

আর মহান আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করলে একজন অন্যের উপর জুলুম করবে। এই অন্যায়কারী উভয় জগতেই বিচারের মুখোমুখি হবে, বিশেষ করে বিচার দিবসে। অন্যায়কারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন বিবাহিত দম্পতির তালাকের তৃতীয় ঘোষণায় পৌঁছানো উচিত নয়, কারণ এটি ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত বিবাহবিচ্ছেদের পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু যদি তারা তা করে, তাহলে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতির অপব্যবহারের শাস্তি কার্যকর করা হয়। তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি আর পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না, যদি না স্ত্রী অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং তার বিয়ে সম্পন্ন করে এবং তারপর তার দ্বিতীয় স্বামীকে তালাক দেয় বা সে মারা যায়। কোন মহিলাকে তালাক দেওয়ার নিয়তে বিয়ে করা যাতে সে তার প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। সুনান আবু দাউদ, 2076 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 230:

"এবং যদি সে তাকে [তৃতীয়বার] তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে বিয়ে করে..."

দুঃখজনকভাবে, অনেক অজ্ঞ মুসলিম আছে যারা বিশ্বাস করে যে শব্দের মাধ্যমে তালাক দেওয়া উচিত নয় কারণ তারা দাবি করে যে কেউ রাগের মুহুর্তে এটি বলতে পারে যদিও তারা এটি সম্পূর্ণরূপে বোঝায় না। সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কেউ যদি পবিত্র কুরআনের উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে তবে তারা কখনই এক সাথে তিন তালাক উচ্চারণ করবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই আচরণকে পবিত্র কুরআনকে উপহাস বলে অভিহিত করেছেন। এটি সুনানে আন নাসাই, 3430 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে এমনটি করে সে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিশেষ করে, এই ধরনের গুরুতর ক্ষেত্রে, তাই তারা প্রথমে বিয়ে করার মতো পরিপক্ক নয়। দ্বিতীয়ত, কেউ যদি ইসলামের দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করে এবং পৃথক অনুষ্ঠানে মৌখিকভাবে তালাক দেয়, তাহলে এটি তাদের আবেগকে শান্ত করার অনুমতি দেয় যাতে তারা পরবর্তী তালাক দেওয়ার আগে কিছু চিন্তা করতে পারে। অবশেষে, এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলমান কীভাবে মেনে নেয় যে একজন ব্যক্তি যে বিয়ের আগে তাদের জন্য হালাল ছিল শব্দের মাধ্যমে তাদের জন্য হালাল হতে পারে কিন্তু শব্দের মাধ্যমে বিয়ে শেষ করার ধারণাকে আপত্তি করে। এই আপত্তি শুধুমাত্র একজনের অজ্ঞতা এবং ইচ্ছা দ্বারা ইন্ধন দেওয়া হয়. কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদে আপত্তি থাকলে কথার মাধ্যমে বিয়েতেও আপত্তি করা উচিত। এছাড়া আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও ইসলামের অপছন্দনীয় বিষয়। এটি পূর্ববর্তী আয়াত, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 229 দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে:

“তালাক দুইবার হয়। অতঃপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্য উপায়ে রাখ বা [তাকে] উত্তমরূপে ছেড়ে দাও চিকিৎসা..."

এর পরিবর্তে একজনকে এক তালাক দেওয়া উচিত এবং তাদের স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া উচিত কারণ এর ফলে বিবাহ শেষ হবে বা সর্বাধিক দুটি পৃথক তালাক দেবে এবং তারপর ইদ্দত শেষ হতে দেবে। যদি এটি ঘটে থাকে তবে স্ত্রীর আগে অন্য কাউকে বিয়ে করার প্রয়োজন ছাড়াই দম্পতি একটি নতুন বিবাহ চুক্তির সাথে পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু যদি তারা পুনরায় বিয়ে করে তবে বিবাহবিচ্ছেদের একটি উচ্চারণ স্থায়ীভাবে দুজনকে আলাদা করে দেবে, কারণ তাদের প্রথম বিয়েতে দুটি উচ্চারণ ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ একটি অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বা উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের পরামর্শ দেওয়া কৌশল মেনে চলতে হবে যাতে তারা তাড়াহুড়ো করে এমন আচরণ করা এড়াতে পারে যার জন্য তারা পরে অনুতপ্ত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 230:

"এবং যদি সে তাকে [তৃতীয়বার] তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে বিয়ে করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলিমদেরকে সতর্ক করে যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করে বা কখন সেগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে তা বেছে নিয়ে এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সেগুলিকে উপেক্ষা করে ইসলামিক শিক্ষাকে উপহাস না করার জন্য। এই উপহাস এমন কিছু যা তারা উভয় জগতের জন্য উত্তর দেবে, কারণ এটি শুধুমাত্র অসম্মানজনক নয় বরং বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। যেমন একজন রাষ্ট্রদূত যখন তাদের জাতিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তখন তাদের পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়, একইভাবে যে মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, সেভাবে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনুভূতির পরিবর্তন হয় এবং লোকেরা ভুল করতে পারে বলে তারা পরে অনুশোচনা করতে পারে, মহান আল্লাহ, দ্বিতীয় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে বা তিনি মারা গেলে একটি দম্পতিকে পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি দেন। কিন্তু এই পুনর্বিবাহ কেবল তখনই করা উচিত যদি দম্পতি তাদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, যার মধ্যে ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী একে অপরের অধিকার পূরণ করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 230:

“...এবং যদি সে [অর্থাৎ, পরবর্তী স্বামী] তাকে তালাক দেয় [বা মারা যায়] তবে তাদের [অর্থাৎ, মহিলা এবং তার পূর্বের স্বামী] একে অপরের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন দোষ নেই যদি তারা মনে করে যে তারা [ভিতরে] রাখতে পারবে। আল্লাহর সীমা..."

মহান আল্লাহ তায়ালা আবারও স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার পূরণের সম্পর্ক সরাসরি তাঁর আনুগত্যের সাথে জড়িত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করা এবং তাই সর্বদা এড়ানো উচিত। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে আচরণ করার চেষ্টা করে যেভাবে তারা নিজেরা অন্য লোকেদের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

মহান আল্লাহ একাই মানুষের জন্য জীবনযাপনের জন্য একটি আচরণবিধি প্রদান করার অবস্থানে আছেন, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আচরণবিধি, কারণ তিনি একাই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, বিভিন্ন সমস্যা যা বিবাহের মধ্যে ঘটতে পারে এবং কিভাবে তাদের সংশোধন করা যায়। অন্য যেকোনো আচরণবিধি সবসময়ই অসম্পূর্ণ থাকবে কারণ জ্ঞানের অভাব এবং বিবাহের সমস্যা এবং স্বামী-স্ত্রীর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণার অভাব, এমনকি এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিবাহ পরামর্শদাতা , তাদের অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে, স্বামী/স্ত্রীর মানসিক অবস্থার প্রতিটি দিক এবং দম্পতিদের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা যা মানুষের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, বিশেষ করে বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে তা জানতে পারবেন না। এই সমস্ত জ্ঞান মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহই এই এবং অন্যান্য সকল প্রকার জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করেছেন। অতএব, যদি কেউ বিবাহ বা জীবনের অন্য কোনো বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা কামনা করে, তাহলে তাদের অবশ্যই একটি সফল বিবাহ এবং একটি আরামদায়ক পারিবারিক ঘর অর্জনের জন্য ইসলামের শিক্ষার উপর নির্ভর করতে হবে, যা মানসিক শান্তি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যারা ইসলামিক জ্ঞানের অধিকারী তারাই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 230:

"...এগুলি আল্লাহর সীমা, যা তিনি এমন লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেন যারা জানে [বোঝে]।"

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ বারবার স্বামীকে সতর্ক করেছেন যে তারা যদি বিয়ে বা তালাক চালিয়ে যেতে চান তবে তার স্ত্রীকে কষ্ট না দেওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"এবং যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের [প্রায়] তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন তাদের গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী রেখে দাও অথবা গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী তাদের ছেড়ে দাও, এবং [তাদের বিরুদ্ধে] সীমালঙঘন করার উদ্দেশ্যে, ক্ষতির উদ্দেশ্যে তাদের রাখো না..."

মহান আল্লাহ, তারপর একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন নীতি ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

“এবং যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা [প্রায়] তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন হয় তাদের গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী রেখে দাও অথবা গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী তাদের ছেড়ে দাও, এবং [তাদের বিরুদ্ধে] সীমালঙঘন করার জন্য ক্ষতির উদ্দেশ্যে তাদের রাখো না। আর যে এটা করে সে অবশ্যই নিজের প্রতি জুলুম করেছে..."

যে অন্যদের ক্ষতি করে সে বাস্তবে নিজের ক্ষতি করে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে পারে না এবং তাই উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই পৃথিবীতে, তাদের কাছে থাকা জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপ এবং দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। পরকালে, মহান আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন যার ফলে অন্যায়কারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করবে এবং প্রয়োজনে অন্যায়কারী তাদের শিকারের গুনাহ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, নিজের স্বার্থে অন্যের প্রতি অন্যায় করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা যে ক্ষতি করে তা কেবল নিজের দিকেই ফিরে আসবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই মৌখিকভাবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু বাস্তবিকভাবে এর উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"...এবং আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা করো না..."

এই উপহাস তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ এটি একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক চাপ, দুর্দশা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি কেউ মজার মুহূর্ত অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, এই উপহাস একজন মুসলিমকে বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা এ থেকে দূরে সরে যাবে। এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য প্রতিটি মুসলমান উত্তর দেবে, কারণ তারা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করার মুহুর্তে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের আকারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, সেগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে। তারা রূপরেখা দেয় যে একজন ব্যক্তির কীভাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা উচিত, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে, যা ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার এবং বৃহত্তর উভয় জগতের জন্য মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সমাজ অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"... আর তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা যা নাযিল করা হয়েছে, যার দ্বারা তিনি তোমাকে নির্দেশ দেন..."

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একাই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, বিশেষ করে মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজ যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তার সমাধান কিভাবে করতে হয়, তিনি একাই মানবজাতিকে নির্দেশ দিতে পারেন। মনের শান্তি পাওয়ার জন্য বেঁচে থাকুন। সমস্ত মনুষ্যসৃষ্ট নির্দেশাবলী জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না।

231 শ্লোকে প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটি একজনকে শেখায় যে কীভাবে তাদের দেওয়া জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে এটি তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে। ইসলামী জ্ঞান একজনকে প্রজ্ঞা দ্বারা সজ্জিত করে যাতে তারা তাদের সমস্ত জাগতিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে যা নিশ্চিত করে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে

ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে মানসিক শান্তি হয়। প্রজ্ঞা ছাড়া, একজন ব্যক্তি সহজেই তার কাছে থাকা জ্ঞানের অপব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিপজ্জনক জিনিসগুলিকে তৈরি করতে পারে, যেমন একটি অস্ত্র, যদি প্রজ্ঞা প্রয়োগ না করা হয়। অন্যদিকে, যার প্রজ্ঞা আছে সে তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ওষুধের মতো দরকারী জিনিস তৈরি করতে ব্যবহার করবে। এই প্রজ্ঞা অর্জন করা হয় ইসলামী শিক্ষার উপর শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ, তারপর মুসলিমদেরকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়, এমনকি তা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির পরামর্শের বিপরীত হলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন।"

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কাজ করেন, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই জ্ঞানী রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি ইসলামের উপদেশ গ্রহণকারী ও আমলকারী ব্যক্তিও লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যে রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, সে দুর্বল মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করবে এবং একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করবে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। একজন ডাক্তার ভুল করতে পারেন কিন্তু মহান আল্লাহ যেমন সব কিছু জানেন, তিনি

মানবজাতিকে যে আচরণবিধি দিয়েছেন তা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির জন্য নিশ্চিত।

একজন ব্যক্তি যে পথই বেছে নিন না কেন তারা উভয় জগতেই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান থেকে পালাতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 232:

"এবং যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন তাদের স্বামীদের সাথে পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিও না যদি তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে সম্মত হয়..."

এর অর্থ হতে পারে যে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য লোকেদের সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয় যা তাদের অন্য কারো সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়। দুঃখজনকভাবে, এটি প্রায়শই মুসলিমদের মধ্যে ঘটে, যার ফলে প্রাক্তন স্বামীর পরিবার তার প্রাক্তন স্ত্রী সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে দেয় যাতে তার অন্য স্বামী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। এটাকে

অবলম্বন করা একটি মন্দ বৈশিষ্ট্য যেহেতু কেউই তাদের মেয়ের সাথে এমন আচরণ করতে চায় না, তাহলে একজন মুসলিম অন্যের মেয়ের সাথে এইভাবে আচরণ করবে কিভাবে? ইসলাম এটা স্পষ্ট করে যে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে সে চায় তার প্রিয়জনের সাথে অন্য লোকেরা আচরণ করুক। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিস অনুসারে এটি একজন সত্যিকারের মুমিনের চিহ্ন। অন্যের সুনাম নষ্ট করা একটি গুরুতর পাপ যা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ। , এবং অন্য কেউ। যখন কেউ এই ধরনের গুরুতর পাপ করে, তখন তা প্রায়শই উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 232:

"এবং যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন তাদের স্বামীদের সাথে পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিও না যদি তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে সম্মত হয়..."

এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, উভয় পক্ষের আত্মীয়রা যেন তালাকপ্রাপ্ত দম্পতিকে একে অপরকে বিয়ে করতে বাধা না দেয়, যতক্ষণ না তারা উভয়েই তাদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভবিষ্যতে একে অপরের অধিকার পূরণ করার সংকল্প করে। . এই ব্যাখ্যাটি জামি আত তিরমিযী, 2981 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়, একজন ভাই প্রথমে তার বোনকে তার স্বামীকে একবার তালাক দেওয়ার পরে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিয়েছিল। অপেক্ষার সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি আন্তরিকভাবে মহান

আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাদের পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি দিলেন।

মহান আল্লাহ হালাল করেছেন । এটি এমন একটি গুরুতর বিষয় যে এটি একজন ব্যক্তির আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করার দাবিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 232:

"...তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে..."

দুঃখজনকভাবে, এইভাবে আচরণ করা যাতে কেউ হারাম বলে মনে করে যখন আল্লাহ, মহান, এটিকে হালাল করেছেন, যা প্রায়শই মুসলমানদের মধ্যে ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের বৈধ বিয়ে থেকে বিরত রাখবে অনৈসলামিক কারণে, যেমন স্বামী/স্ত্রী অন্য দেশের নাগরিক। এটি একটি গুরুতর বিষয় কারণ কারোরই তাদের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসগুলিকে হালাল বা হারাম করার অধিকার নেই কারণ এটি সরাসরি মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। তাই যে কোন মূল্যে এটি এড়ানো উচিত। যেহেতু অজ্ঞতা এই আচরণের প্রধান কারণ, তাই এটি এড়াতে একজনকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে।

উপরন্তু, আয়াত 232 এ নির্দেশিত হিসাবে, একটি বৈধ বিবাহকে অবরুদ্ধ করার ফলে প্রায়শই উভয়ের মধ্যে একটি বেআইনি সম্পর্কের কারণ হতে পারে, যা শুধুমাত্র জড়িত প্রত্যেকের জন্য উভয় জগতেই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 232:

"...এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্রতর..."

যে কারণেই দুই পরিবারকে বিয়ে হতে বাধা দিতে পারে তা ভবিষ্যতের জ্ঞানের অভাবের উপর ভিত্তি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের পছন্দ আবেগের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ নয়। অতএব, তারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থানে নেই, একমাত্র মহান আল্লাহই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কারণ তিনি সবকিছু জানেন। এবং মহান আল্লাহ যেমন বিবাহকে হালাল করেছেন, অন্যরা তা হারাম করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 232:

"... আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।"

বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে এমন দাম্পত্য সমস্যা এড়াতে বিবাহিত মুসলমানদের জন্য নিম্নে কিছু সাধারণ পরামর্শ দেওয়া হল।

আগেই বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে হবে। সহীহ বুখারি, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে যেমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে , একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এমন একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিতে হবে যার মধ্যে তাকওয়া আছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনসঙ্গীর অধিকার পূরণ করবে এবং তাদের উপর অন্যায় করা এড়াবে, এমনকি তারা যখন রাগান্বিত থাকে, কারণ তারা তাদের কর্মের পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার ভয় পায়। পক্ষান্তরে, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে না, সে তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে না এবং তারা সহজেই তাদের উপর জুলুম করবে, কারণ তারা তাদের পছন্দ ও কর্মের পরিণতিকে ভয় পায় না।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান পৃথিবীর মত আচরণ করে এবং তাদের জীবনসঙ্গীকে সর্বদা সমর্থন করে, তবে তাদের পত্নী তাদের ক্ষতি থেকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য আকাশ হয়ে উঠবে। একজন মুসলমান যদি তাদের স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিক শান্তি দেয়, তবে বিনিময়ে তারা তাদের জন্য আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সমর্থনের স্তম্ভ হয়ে উঠবে। যদি একজন মুসলমান ইসলামের আইনের মধ্যে তাদের স্ত্রীকে খুশি রাখার চেষ্টা করে তবে তারা দেখতে পাবে যে তাদের স্ত্রীও একই কাজ করে। যদি তারা তাদের পত্নীকে সম্মান করে এবং সম্মান করে তবে তারা তা পাবে। অর্থ, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে।

একজন মুসলমানকে বিনয়ী হওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র এমনভাবে কথা বলা এবং কাজ করা উচিত যা আল্লাহ, মহান এবং তাদের স্ত্রীকে খুশি করে। তাদের বিবাহ এবং তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কারণ এটিই সত্যিকারের সমৃদ্ধি এবং সুখ। এটা বেশ স্পষ্ট যে কেউ যদি মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে যে খ্যাতি এবং ভাগ্য সুখ নিয়ে আসে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সেলিব্রিটি তাদের খ্যাতি এবং ভাগ্য সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদ করে। একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের জীবনসঙ্গীর জন্য নিজেদেরকে সাজিয়ে তুলবে এবং অযথা অযথা ও অপচয়

এড়াবে কারণ এটি তাদের ভালবাসা বজায় রাখার একটি দিক। একজনের সর্বদা তাদের স্ত্রীর মেজাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং যথাযথভাবে কথা বলা এবং কাজ করা উচিত, কারণ অনুপযুক্ত সময়ে সঠিক কথা বলা হলেও তর্ক হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত থাকে। একজন মুসলমানের উচিত অর্থের মূল্যকে উপলব্ধি করা এবং এটিকে অপচয় না করা কারণ এটি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এবং মহান আল্লাহকে ভয় করেন এমন স্ত্রীর কাছে এটি অপছন্দ। বিবাহিত দম্পতিদের উচিত নিজেদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত করা এবং তাদের সন্তানদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই ভালো শিক্ষা লাভ করা নিশ্চিত করা। এই শিক্ষা তাদের মধ্যকার বন্ধনকে মজবুত করবে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত অনুরোধগুলি পূরণ করার চেষ্টা করা যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর আদেশকে চ্যালেঞ্জ না করে, কারণ ক্রমাগত নিজের স্ত্রীকে অস্বীকার করা রাগ এবং তর্কের কারণ হতে পারে। তাদের মধ্যে যা ঘটে তা গোপন রাখা উচিত কারণ গোপনীয়তা প্রকাশ করা বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন একজন অন্যের পরামর্শ চায় কিন্তু তারপরও এটি একটি সর্বজনীন বিষয় হয়ে উঠবে না এবং অনেক লোকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের, সীমার মধ্যে, তাদের সঙ্গীর আবেগকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, তাদের জীবনসঙ্গী দুঃখিত হলে তাদের খোলাখুলিভাবে খুশি হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের জীবনসঙ্গী তাদের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল নয়। একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের সীমার মধ্যে তাদের স্ত্রীর জন্য ত্যাগ এবং আপস করতে শেখা কারণ এটি তাদের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এই সব মনে রাখার একটি ভাল উপায় হল যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের স্ত্রীর সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা পছন্দ করে যে তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী ব্যবহার করুক। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে সে চায় তার জামাই তার মেয়ের সাথে আচরণ করুক। অথবা একজন স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে সে চায় তার পুত্রবধূ তার ছেলের সাথে আচরণ করুক। শুধুমাত্র এই মানসিকতা অবলম্বন করা দাম্পত্য জীবনের অগণিত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবে।

মহান আল্লাহ তালাকের পর সন্তানদের যত্ন নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

“যে কেউ স্তন্যপান [পিরিয়ড] সম্পূর্ণ করতে চায় মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাতে পারেন। পিতার উপর তাদের [অর্থাৎ, মায়েদের] রিযিক এবং তাদের পোশাক যা গ্রহণযোগ্য সে অনুযায়ী...”

তাদের সন্তান লালন-পালনের আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর এবং প্রাক্তন স্ত্রীর আর্থিক চাহিদার ভার বর্তায় তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়ও তার প্রাক্তন স্বামীর উপর। যেহেতু এই দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন, একজন মানুষের এটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ তারা উভয় জগতেই এর জন্য দায়ী থাকবে।

আল্লাহ সুস্পষ্ট করে দেন যে ইসলামের মধ্যে প্রতিটি কর্তব্য মানুষ পালন করতে পারে, কারণ তিনি এমন কোন ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্ব দেন না যা তারা সম্পূর্ণ করতে পারে না এবং তিনি এমন পরিস্থিতির আদেশ দেন না যা একজন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য বজায় রেখে মুখোমুখি হতে পারে না। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"...কোন ব্যক্তিকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি চার্জ করা হয় না..."

যেহেতু এটি পবিত্র কুরআন জুড়ে বারবার বলা হয়েছে, এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মানুষের কাছে কোন অজুহাত নেই। দুঃখজনকভাবে, অনেক লোক দাবি করে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিন্তু সেগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যদি তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে তবে তারা তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে কারণ এটি মহান আল্লাহ দ্বারা গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, তাই তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে না। মানুষকে অলসতা ত্যাগ করতে হবে কারণ গরীব অজুহাত মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, কারণ তিনিই ভালো জানেন মানুষ কী করতে সক্ষম এবং সে অনুযায়ী তাদের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন।

মহান আল্লাহ, তারপর মুসলমানদের সতর্ক করেন যে তারা তাদের সন্তানদেরকে তাদের প্রাক্তন পত্নীর উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবর্তে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরিবারের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"...কোন মাকে তার সন্তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয় এবং তার সন্তানের মাধ্যমে কোন পিতার ক্ষতি করা উচিত নয়..."

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, সন্তানের মাধ্যমে বাবার ক্ষতি করার আগে মায়ের ক্ষতি করার কথা বলা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে পিতার উচিত আরও সংবেদনশীল এবং

মহান আল্লাহর এই সীমা অতিক্রম করার এবং তাদের সন্তানের মাধ্যমে তার পূর্বের স্ত্রীর ক্ষতি করার বিষয়ে ভীত হওয়া। পিতা বা মা তাদের সন্তানের সামনে একে অপরকে অবজ্ঞা বা অসম্মান করবেন না যার ফলে তাদের পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা হ্রাস করার লক্ষ্য থাকবে। এটি একটি দুষ্ট শয়তান মানসিকতা কারণ একজন মুসলমানের ভূমিকা হল শিশুদের হৃদয়ে অন্যের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জাগানো। যদি তারা বিপরীত করে তবে শিশুটি কাউকে সম্মান বা ভালবাসা না করে বড় হবে এবং এটি তাদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

উপরন্তু, এইভাবে অন্যদের ক্ষতি করা প্রায়শই মুসলিম বিবাহের মধ্যে ঘটে, যার ফলে একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে তাদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে যাতে তারা যা চায় তা পেতে, যেমন তাদের স্ত্রীর আত্মীয়দের থেকে দূরে অন্য বাড়িতে চলে যাওয়া। পবিত্র কোরআনে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে বলে এ ধরনের আচরণ করা কোনো ছোট বিষয় নয়। এবং এই পদ্ধতিতে আচরণ করা শুধুমাত্র একটি দম্পতির মধ্যে আরও উত্তেজনা এবং সমস্যা সৃষ্টি করে, তা বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছেদই হোক না কেন, যা শুধুমাত্র জড়িত প্রত্যেকের জন্য, বিশেষ করে শিশুদের জন্য আরও তর্ক এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা পিতার পরিবারকে তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার সন্তান ও সাবেক স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"...এবং [পিতার] উত্তরাধিকারীর উপর [পিতার] অনুরূপ [দায়িত্ব]..."

আবার, অনেক মুসলিম পরিবার এই নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের মৃত আত্মীয়ের প্রাক্তন স্ত্রী এবং সন্তানদের পরিত্যাগ করতে দ্রুত হয়, যদিও তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সাহায্য করতে হবে। একটি পরিবারকে অবশ্যই তার সন্তানদের জীবনে তাদের মৃত আত্মীয়ের রেখে যাওয়া শূন্যতা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সঠিক উপায়ে বেড়ে ওঠে এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। পরিবারগুলি তাদের মৃত আত্মীয়ের সন্তানদের এভাবে পরিত্যাগ করা এই শিশুদের বিপথগামী হওয়ার একটি বড় কারণ, যা প্রায়শই তাদের অপরাধ এবং কারাগারের জীবন নিয়ে যায়।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা জানেন মানুষ একে অপরকে যে খারাপ আচরণ দেখাতে পারে, তাই তিনি উভয় পক্ষ সম্মত হলে শিশুটিকে লালন-পালনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন। কিন্তু শিশুদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই পারস্পরিক পরামর্শ ও চুক্তি হতে হবে। মা এবং বাবা উভয়েরই তাদের সন্তানের বিষয়ে নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্তে জড়িত থাকার অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"...এবং যদি তারা উভয়েই তাদের উভয়ের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাদের উভয়েরই কোন দোষ নেই। এবং যদি আপনি আপনার সন্তানদের বিকল্প দ্বারা লালন-পালন করতে চান, তবে আপনার জন্য কোন দোষ নেই যতক্ষণ না আপনি গ্রহণযোগ্য অনুযায়ী অর্থ প্রদান করেন..."

আল্লাহ তারপর পিতামাতা উভয়কে তাদের সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থে আচরণ করার জন্য এবং একে অপরের প্রতি কোন নেতিবাচক অনুভূতিকে এতে বাধা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেন কারণ আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ জানেন এবং উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনে তাদের সন্তানদের সফল হওয়ার জন্য হাতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকার পূরণের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। দুঃখজনকভাবে, অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের পৃথিবীতে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিকাশে একই প্রচেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়, যদিও পরবর্তীটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। তারা বুঝতে পারে না এমন ভাষায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে শেখার জন্য একটি শিশুকে মসজিদে পাঠানো যথেষ্ট ভাল নয়। প্রত্যেক পিতা-মাতাকে অবশ্যই তাদের সন্তানকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখাতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের সন্তান ইসলামিক জ্ঞান গ্রহণ করে এবং এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তার উপর কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। তাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা তাদের পথভ্রষ্টতার একটি প্রধান কারণ, যা প্রত্যেক পিতা-মাতা উভয় জগতের উত্তর দেবেন। এই পৃথিবীতে, তাদের সন্তান তাদের জন্য মানসিক চাপ এবং দুঃখের উত্স হয়ে উঠবে এবং পরকালে যা আসবে তা আরও খারাপ হবে। একজন পিতা-মাতা তখনই এই মানসিক চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন যদি তারা মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সন্তানদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হন। অর্থ, তাদের সন্তানদের কাছ থেকে কোনো প্রশংসা এবং প্রতিদান চাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি শুধুমাত্র তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে, যখন তাদের সন্তানরা তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। এবং যেহেতু তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সন্তানদের লালন-পালন করেনি , তারাও তার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 234-235

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা, [স্ত্রীগণ] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে। এবং যখন তারা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের সাথে গ্রহণযোগ্যভাবে যা করে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

আপনি [পরোক্ষভাবে] নারীদের প্রতি প্রস্তাবের বিষয়ে বা নিজের মধ্যে যা গোপন করেন তার জন্য আপনার কোন দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে আপনি তাদের মনে রাখবেন। তবে সঠিক কথা বলা ছাড়া গোপনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিবেন না। এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ জানেন যা আছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে, তাই তাঁর থেকে সাবধান হও। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেন যে, একজন বিধবাকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর যে প্রক্রিয়াটি মেনে চলতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 234:

" *এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা, [স্ত্রীগণ] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে...*"

এই অপেক্ষার সময় বিধবা তার মৃত স্বামীর বাড়িতে থাকার অধিকারী এবং তার সম্পদ দ্বারা আর্থিকভাবে সমর্থন করা হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 240:

"*এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায় - তাদের স্ত্রীদের জন্য একটি অসিয়ত: [তাদেরকে] বহিষ্কার না করে এক বছরের জন্য খোরপোষ...*"

দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম পরিবার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাদের মৃত আত্মীয়ের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, যদিও পবিত্র কোরআনে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

বিধবার জন্য অপেক্ষার সময় গর্ভাবস্থা নিজেকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়, যা স্পষ্টতই তার ভবিষ্যতের পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করবে। উপরন্তু, ইদ্দতকাল স্ত্রীকে তার মৃত স্বামীর জন্য শোক করার অনুমতি দেয়, ইসলামের শেখানো সীমার মধ্যে,

ভবিষ্যতের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করে, যা সে পরে অনুশোচনা করতে পারে, যেমন অন্য কারো সাথে বিবাহ। ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, বিধবা অবিবাহিত থাকতে বা পুনরায় বিয়ে করতে স্বাধীন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 234:

"...এবং যখন তারা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের সাথে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে যা করে তাতে আপনার কোন দোষ নেই.."

যেহেতু এই আয়াতে বহুবচন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটি বিধবার আত্মীয়দের তার অপেক্ষার সময় এবং তার ভবিষ্যত পছন্দ যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বিধবাদের সমর্থন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা একটি কঠিন মানসিক অবস্থায় থাকে এবং তাই ভুল পছন্দ করার জন্য বেশি সংবেদনশীল। ইসলামের মধ্যে বিধবাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবশ্যই একজনের উপায় অনুযায়ী সমর্থন করা উচিত, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা, বিশেষ করে তার আত্মীয়দের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 6006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন রোজা রাখে এবং প্রতি রাতে স্বেচ্ছায় নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে। যদি তারা একটি বিধবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতটি বিধবার ভবিষ্যত পছন্দগুলিও তার হাতে তুলে দেয়, তাই, তার আত্মীয়স্বজন এবং তার মৃত স্বামীর আত্মীয়রা তাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবেন না, যেমন অবিবাহিত থাকা, যদি সে আবার বিয়ে করতে চায়। . আত্মীয়দের ভূমিকা হল বিধবাকে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে

সমর্থন করা, তাকে কিছু পছন্দ করতে বাধ্য করা নয় যা তাদের খুশি করে। উপরন্তু, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর, বিধবার মনে হওয়া উচিত নয় যে তাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যা তার আত্মীয়স্বজন বা তার মৃত স্বামীর আত্মীয়দের খুশি করে। মহান আল্লাহ তার অনুভূতি স্বীকার করেছেন এবং তাকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তার নিজের পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাই তাকে কলঙ্ক, অন্যের অনুভূতি বা সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত দ্বারা প্রভাবিত করা উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ একজনের নিয়ত, কথা ও কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তাই বিধবা ও তার আত্মীয়-স্বজন উভয়কেই ইসলামের নির্দেশিত আচরণ করতে হবে কারণ উভয় জগতেই এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 234:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত।"

এটি আবারও বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, মানুষ এবং পার্থিব বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে জড়িত। অতএব, মহান আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সরাসরি সংযুক্ত এবং অবহেলা করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ, তারপর রূপরেখা দিয়েছেন যে একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তির প্রতি করা প্রস্তাব অবশ্যই সঠিক এবং সম্মানজনকভাবে করা উচিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 235:

“আপনি [পরোক্ষভাবে] নারীদের প্রতি প্রস্তাবের বিষয়ে বা নিজের মধ্যে যা গোপন করেন তার জন্য আপনার কোন দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে আপনি তাদের মনে রাখবেন। তবে সঠিক কথা বলা ছাড়া গোপনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিও না..."

বিধবাকে সরাসরি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরিবর্তে প্রস্তাবের বিষয়ে খোলামেলা হওয়া এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত করা একটি সঠিক কথার অন্তর্ভুক্ত। একজন পুরুষের উচিত বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বিধবার পরিবারের সাথে সম্মানজনকভাবে আলোচনা করা যাতে তার ভালো ও মহৎ উদ্দেশ্য সবার কাছে স্পষ্ট হয়। তাকে এমনভাবে আলোচনা করা উচিত যে সে চায় একজন পুরুষ তার মেয়ে বা বোনের সাথে বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করুক। যেহেতু একজন বিধবা একটি আবেগপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য উপযুক্ত নয় এমন কোনো গোপন প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে, যা শুধুমাত্র তার দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ বাড়াবে। যেখানে, বিধবার আত্মীয়-স্বজনদের সম্পৃক্ত করে এমন একটি প্রস্তাব প্রকাশ্যে আনা হলে তা সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে যাতে তাড়াহুড়ো করা সিদ্ধান্তগুলি এড়ানো যায়।

উপরন্তু, একটি নতুন বিবাহের চুক্তি গ্রহণ করার আগে অপেক্ষার সময়কাল অবশ্যই শেষ হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 235:

"... *এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেবেন না..."*

ইদ্দতের কিছু সুবিধা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে এড়াতে পারে যা পরবর্তীতে অনুশোচনা করা যায় এবং বিধবাকে সর্বোত্তম যত্ন প্রদান করা হয় যাতে সে আরও সহজে তার জীবন নিয়ে চলতে পারে। তার স্বামীর মৃত্যু। ইসলামের আদেশগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ তারা কেবল নিজের এবং অন্যদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, এমনকি যদি আদেশগুলি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেভাবে ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, সেভাবেই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণকারী ও আমলকারী ব্যক্তিও লাভ করবে। যে ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের পছন্দের পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ জানেন এবং উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 235:

"... *আর জেনে রেখো, আল্লাহ জানেন যা আছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে, তাই তার থেকে সাবধান হও...*"

কিন্তু ইসলাম ভারসাম্য ও রহমতের ধর্ম হওয়ায় তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, এমনকি তারা অতীতে মহান আল্লাহকে অমান্য করলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 235:

"... *এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অকপট অনুতাপে দোষী বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে না, একজনকে অবশ্যই একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করুন।

আয়াত 235-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট ঐশী গুণাবলী জানার নির্দেশ, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে একজন ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে বিচ্যুত বিশ্বাস অবলম্বন না করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে উৎসাহিত করা হয়। অসম্মানজনক এবং কিছু ক্ষেত্রে নিন্দাজনক। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারির ২৭৩৬ নম্বর হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপরন্তু, ঐশ্বরিক গুণাবলী শেখা একজনকে তাদের মানবিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানে, সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়াময়, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 235:

"... *এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।*"

বিধবা এবং তার আত্মীয়দের অবশ্যই এই দুটি ঐশী নামের উপর আমল করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করে। বিধবাকে তার মৃত স্বামীর যে কোনো ভুলের জন্য ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত এবং ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহর আদেশ মেনে নেওয়া উচিত, জেনে রাখা উচিত যে এটি জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তার পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি তার কাছ থেকে গোপন থাকে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এছাড়া বিধবার আত্মীয়-স্বজনদেরও উচিত তাদের আত্মীয়ের মৃত্যুর সময় সহনশীলতা প্রদর্শন করা এবং তাদের ও বিধবার মধ্যে যে কোনো পার্থক্য রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাকে সমর্থন করা।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 236-237

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ
قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن
يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ
ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

“তোমাদের কোন দোষ নেই যদি তুমি নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও যেগুলোকে তুমি স্পর্শ করেনি এবং তাদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও নির্দিষ্ট করে না। তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও - ধনীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং গরীবকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী - যা গ্রহণযোগ্য সে অনুযায়ী একটি বিধান, সৎকর্মশীলদের উপর একটি কর্তব্য।

আর যদি আপনি তাদের স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দেন এবং আপনি তাদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা আগেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তবে আপনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অর্ধেক [দেন] - যদি না তারা অধিকার ত্যাগ করে বা যার হাতে বিবাহের চুক্তি সে তা ত্যাগ করে। আর পরিত্যাগ করা ধার্মিকতার নিকটতর। এবং আপনার মধ্যে অনুগ্রহ ভুলবেন না. নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহান আল্লাহ, তারপর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনার দিকে অগ্রসর হন। এই আয়াতগুলিতে কোন ইদ্দতকাল নির্দিষ্ট করা নেই কারণ গর্ভধারণের কোন সম্ভাবনা নেই এবং দম্পতিকে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য করার কোন মানে নেই যদি তারা অনড় থাকে তবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিত জীবন শুরু করতে চায় না কারণ এটি হতে পারে অপ্রয়োজনীয় মানসিক আঘাত যা তাদের ভবিষ্যতের আবার বিয়ে করার পছন্দকে প্রভাবিত করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 236:

" *তোমাদের কোন দোষ নেই যদি তুমি এমন নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও যেগুলোকে তুমি স্পর্শ করেনি এবং তাদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও নির্দিষ্ট করেনি...*"

কিন্তু যে ক্ষেত্রে যৌতুক নির্ধারণ করা হয়নি, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে একজন চমৎকার মুসলিম তার পূর্ববর্তী স্ত্রীকে একটি ইতিবাচক নোটে শেষ করার জন্য একটি বিচ্ছেদ উপহার দেবেন। অযথা বাড়াবাড়ি পরিহার করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং সমাজের সামাজিক রীতি অনুযায়ী এই উপহার দেওয়া উচিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 236:

"*... তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও - ধনীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রদের তার সামর্থ্য অনুযায়ী - গ্রহণযোগ্য অনুসারে একটি বিধান, সৎকর্মশীলদের উপর একটি কর্তব্য।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সর্বদা ইসলামের নীতি ছিল। একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা কেবলমাত্র সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেগুলো তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রেখে মুখোমুখি হতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

অতএব, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থতার অজুহাত তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করার দাবি করে না বুঝেই যে তারা যদি প্রকৃতপক্ষে তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্ব পালন করবে, কারণ এটি মহান আল্লাহ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অলস মনোভাব অবলম্বন করা শুধুমাত্র একজনকে তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেয় এবং তাই এড়িয়ে চলতে হবে। প্রতিটি আদেশ, নিষেধ এবং পরীক্ষার একটি মুখ সফলভাবে পূরণ করা যেতে পারে যদি তারা সত্যই তাদের সেরা চেষ্টা করে। আর যখনই তারা কোন পাপ করে, তখনই তাদের জন্য আন্তরিক তওবার দরজা খোলা থাকে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাই পরিপূর্ণতা আশা করেন না, বরং তিনি আশা করেন মানুষ তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 236:

"... সৎকর্মশীলদের উপর একটি কর্তব্য।"

ইসলাম সর্বদা মুসলমানদেরকে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চেষ্টা করার পরামর্শ দেয়। এটা অর্জিত হয় যখন একজন আন্তরিকভাবে ইসলামিক শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার ওপর কাজ করে যাতে তারা প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এমন অলস মনোভাব অবলম্বন করে যাতে তারা ইসলামী জ্ঞান শেখার ও আমল করার চেষ্টা করে না, সে সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। ফলে তারা আল্লাহ, মহান ও মানুষের হক আদায়ে ব্যর্থ হবে। তাদের মনোভাব তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে বাধা দেবে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখেন যারা

তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও

অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 237:

" *এবং যদি আপনি তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে থাকেন এবং আপনি ইতিমধ্যে তাদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তবে আপনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অর্ধেক দিন ...*"

যদি বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং যৌতুক নির্ধারণ করা হয়, তাহলে পুরুষকে তার পূর্ববর্তী স্ত্রীকে তার অর্ধেক দিতে হবে। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম পুরুষ তাদের স্ত্রীদের যৌতুক দিতে ব্যর্থ হয় যে তারা বিবাহিত থাকে বা বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, যদিও এটি দেওয়া একটি কর্তব্য এবং বিবাহ চুক্তির একটি দিক। এটি একটি গুরুতর বিষয় যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে।

মহান আল্লাহ, তারপর প্রাক্তন স্ত্রী এবং তার আত্মীয়দের যৌতুক পরিত্যাগ করতে উত্সাহিত করেন যাতে তালাক ভাল শর্তে শেষ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 237:

" *এবং যদি আপনি তাদের স্পর্শ করার আগে তাদের তালাক দেন এবং আপনি ইতিমধ্যে তাদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তবে আপনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অর্ধেক [দেন] - যদি না তারা অধিকার ত্যাগ করে বা যার হাতে বিবাহের চুক্তি সে তা ত্যাগ করে। এবং বর্জন করা ধার্মিকতার কাছাকাছি ...*"

এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, প্রাক্তন স্বামীর উচিত তার প্রাক্তন স্ত্রীকে অর্ধেক সেট যৌতুক দেওয়ার আদেশটি ত্যাগ করা এবং পরিবর্তে তাকে দয়ার অঙ্গভঙ্গি হিসাবে পুরো জিনিসটি দেওয়া উচিত, কারণ বিবাহের চুক্তি তার হাতে রয়েছে। তাফসির ইবনে কাসীর, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 666-667 এ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আবার তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়দের মধ্যে সদয় আচরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

এই আয়াতটি স্বামী নির্বাচনের সিদ্ধান্তের সাথে মহিলার আত্মীয়দের জড়িত থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এর কারণ হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজন মহিলা ভুল স্বামী বেছে নেওয়ার পরিণতি তার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য বেশি গুরুতর, একজন পুরুষ ভুল স্ত্রী বেছে নেওয়ার চেয়ে। উদাহরণস্বরূপ, স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার চেয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা অনেক বেশি

সাধারণ। উপরন্তু, কিছু ক্ষেত্রে, তার পুরুষ আত্মীয়রা, যেমন তার ভাই, একজন সম্ভাব্য স্বামীর চরিত্রের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সহজে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করতে পারে, কারণ পুরুষরা অন্য পুরুষদেরকে মহিলাদের চেয়ে ভাল বোঝে। ঠিক যেমন নারীরা পুরুষদের চেয়ে অন্য নারীদের ভালো বোঝে।

উপরন্তু, প্রধান আয়াতগুলির মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়দের মধ্যে ভাল আচরণের গুরুত্বকে আবার নির্দেশ করেছেন এবং এটিকে ধার্মিকতার সাথে সংযুক্ত করেছেন, যা তাঁর আনুগত্যের সাথে যুক্ত। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম প্রায়ই মহান আল্লাহর প্রতি অধিকার ও কর্তব্যকে মানুষের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য থেকে পৃথক করে, যদিও ইসলাম তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। একজন ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা উভয় দিক পূর্ণ করে, কারণ তারা উভয় জগতে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যের জবাব দেবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 237:

“.... এবং আপনার মধ্যে অনুগ্রহ ভুলবেন না. নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে তারা যদি অন্যদের উপর অন্যায় করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। অন্যায়কারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নং হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ যেভাবে একজন ব্যক্তি

সমাজের দ্বারা আচরণ করতে চায় সেভাবে অন্যের সাথে আচরণ করে পূরণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য ভালবাসাই হল একজন প্রকৃত মুমিনের সংজ্ঞা যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 238-239

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

“তোমরা যত্ন সহকারে [ফরয] নামায এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং আনুগত্যের সাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও।

আর যদি তুমি [শত্রুকে ভয় কর, তাহলে পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে নামায পড়ো]। কিন্তু যখন তুমি নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না।"

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতে বিবাহের বিষয়গুলি যেমন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহ ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 238:

" *যত্ন সহকারে [ফরয] নামায রক্ষণাবেক্ষণ কর..."*

এর একটি কারণ হল যে, মহান আল্লাহ বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যায় জড়িত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেমন বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়স্বজন, তারা যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যের গুরুত্ব ভুলে যাবেন না। . মহান আল্লাহ তাদের বিবাহের অসুবিধার সময় যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন তা কমানোর জন্য তাদের নির্দেশনা দেন তবে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতেও উৎসাহিত করেন, যেমন ফরজ নামাজ। সর্বাবস্থায়, বিশেষ করে কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহর সাথে একজনের সংযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজনের উচিত পার্থিব চাপ, যেমন বিবাহের সমস্যা, তাদের অন্যান্য দায়িত্ব থেকে বাধা না দেওয়া, অন্যথায় তারা তাদের পার্থিব চাপকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় করুণা হারাবে।

এছাড়াও, যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ বিচার দিবসের একটি নিয়মিত অনুস্মারক, তাই এই নিয়মিত অনুস্মারক থেকে দুটি নির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যায় যারা বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রথমটি হল যে এটি তাকে উৎসাহিত করে যে বিবাহের সমস্যাগুলির পাশাপাশি অন্যান্য জাগতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিচার দিবসের আরও বড় এবং আরও গুরুতর বাস্তবতা সম্পর্কে। যেহেতু বিচার দিবসের চাপ এই পৃথিবীতে যে কোনও চাপের মুখোমুখি হতে পারে তার চেয়ে বেশি, এটি মনে রাখা পার্থিব চাপের গুরুতরতা হ্রাস করে। এটি একজনকে অভিভূত বোধ না করে

বিবাহের সমস্যাগুলি সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। এটি একটি বড় সমস্যা এবং চাপের সাথে তুলনা করার সময় একটি সমস্যাকে ছোট মনে করার মতো। বিচার দিবসকে নিয়মিত স্মরণ করার দ্বিতীয় উপকারিতা হল যে এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা উভয় জগতে তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবে। অতএব, যিনি বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা সঠিকভাবে কথা বলবেন এবং আচরণ করবেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তাদের প্রাক্তন পত্নী এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি, কারণ তারা জানেন যে তাদের কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। এই দুটি সুবিধাই একজনের জন্য সঠিকভাবে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য জাগতিক সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করার সময় এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং যাতে তারা বিচার দিবসের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয়, যা সকল মানুষের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে, যেমন মহান আল্লাহ তাদের বাধ্যতামূলক নামায কায়েম করেন, বিচার দিবসে জবাবদিহি করার ভয়ে তাদের স্ত্রীর সাথে সঠিক আচরণ করবেন, এটি এমন একজন জীবনসঙ্গী বাছাই করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যার কাছে এগুলো আছে। গুণাবলী যে ব্যক্তি এই গুণাবলীর অধিকারী কেবল তারাই তাদের স্ত্রীর সাথে সঠিক আচরণ করবে, এমনকি যখন তারা তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই গুণাবলীর অধিকারী নয় সে সহজেই তাদের স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করবে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়। সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 238:

" যত্ন সহকারে [ফরয] নামায রক্ষণাবেক্ষণ কর..."

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত ছড়িয়ে পড়ায়, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতির জন্য কাজ করে, কারণ ফরজ প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

" তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

"এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 238:

" *যত্ন সহকারে [ফরয] নামায এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামায..."*

মধ্যবর্তী সালাত হতে পারে বিকেলের নামায (আসর) বা ফজরের নামায (ফজর)। ইসলামি ক্যালেন্ডারে দিনের আগের রাতের অবস্থান। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে, দিনের প্রথম সালাত হবে সূর্যাস্তের সালাত (মাগরিব) এবং তাই মধ্যবর্তী সালাত ফজরের নামায (ফজর) হয়ে যায়। অথচ দিনের প্রথম নামাযকে যদি দিনের আলোকে বিবেচনা করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে প্রথম সালাত হবে ফজরের সালাত (ফজর)। এই পদ্ধতি অনুসারে মধ্যম নামাজ শেষ বিকেলের নামাজে পরিণত হয় (আসর)। অনেক আলেম মধ্যবর্তী নামায হিসেবে মধ্যাহ্নের নামাযকে (আসর) বেছে নিয়েছেন। এটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2983 নম্বরে পাওয়া একটি। যেভাবেই হোক উভয়েরই লক্ষ্য করা উচিত কারণ এটি বাকি ফরয নামায প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারী, 574 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি দুটি শীতল ফরজ সালাত কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুটি শীতল ফরজ নামাজ ফজরের নামায (ফজর) এবং শেষ বিকেলের নামাযকে (আসর) বোঝায়, কারণ এই সময়ে তাপমাত্রা শীতল হতে থাকে। যেহেতু এই দুটি ফরয নামায তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে কঠিন , যেহেতু এগুলি কঠিন সময়ে বা এমন সময়ে ঘটে যখন লোকেরা প্রায়শই অন্যান্য জিনিসের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, যে ব্যক্তি এগুলিকে কায়েম করবে সে অন্যান্য ফরয নামায প্রতিষ্ঠা করা সহজ করবে।

যে ব্যক্তি তাদের ফরয নামায কায়েম করে, তাকে সারাদিন এবং বিবাহের সমস্যাগুলির মতো তাদের মুখোমুখি হওয়া সমস্ত পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করতে উত্সাহিত করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 238:

"সতর্কতার সাথে [ফরজ] নামায এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং আনুগত্যের সাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও।"

এই আনুগত্যের মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই

যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 238:

"... আল্লাহর সামনে দাঁড়াও, ভক্তিভরে আনুগত্য।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 239:

"এবং যদি তুমি [শত্রুকে ভয় কর, তাহলে নামায পড়] পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে। কিন্তু যখন তুমি নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন ..."

আশেপাশের আয়াতগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত যা বিবাহের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, এই আয়াতটি বিবাহের সমস্যা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অসুবিধার সময়, মহান আল্লাহর সাথে একজনের সংযোগ বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর রহমত লাভের জন্য এবং মহান আল্লাহর

আনুগত্যের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখার জন্য এই সংযোগ বজায় রাখা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 239:

"এবং যদি তুমি [শত্রুকে ভয় কর, তাহলে নামায পড়] পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে। কিন্তু যখন তুমি নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন..."

এই আয়াতটিও ইসলামের সহজ প্রকৃতি নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ, মহান, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রকৃতি ও জীবনের জন্য কী উপযোগী তা তিনিই ভালো জানেন। একজন ডাক্তার যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, তেমনি মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন ডাক্তারকে

বিশ্বাস করতে পারেন, যিনি ভুল করার প্রবণতা রাখেন এবং যিনি খুব সীমিত জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির অধিকারী হন যখন রোগীরা জানেন না যে তাদের দেওয়া ওষুধগুলি কীভাবে মানবদেহে কাজ করে, তবুও তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়, মহিমান্বিত, যিনি সব কিছু জানেন এবং ভুল করতে পারেন না এবং তার পরিবর্তে সন্দেহ করেন যে তিনি যা উপদেশ দেন তার উপর কাজ করা মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা তখনই ঘটে যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর কাজ করে, যেমন মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যকারীদের সাহায্য করার এবং ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের ঘটনা যা সমর্থন করে। এই প্রতিশ্রুতি। এবং কীভাবে তাঁর অবাধ্যতা, একজনকে দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, উভয় জগতেই চাপ এবং সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের ঘটনা যা এই সতর্কবার্তাকে সমর্থন করে। এই সুস্পষ্ট প্রমাণগুলি একজনকে বিশ্বাসের দৃঢ়তা অবলম্বন করতে বাধ্য করবে, যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করবে, যে আশীর্বাদগুলি তারা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 239:

“এবং যদি তুমি [শত্রুকে ভয় কর, তাহলে নামায পড়] পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে। কিন্তু যখন তুমি নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন..."

এই আয়াতটি বোঝার গুরুত্বকেও ইঙ্গিত করে যে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে তাঁর নাম এবং ঐশী গুণাবলী উল্লেখ করার চেয়েও বেশি কিছু। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত স্মরণের মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে স্মরণ করা, নিজের ইচ্ছায়, যাতে তারা শুধুমাত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। যারা অন্যকে খুশি করার জন্য কাজ করে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে রয়েছে ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা। এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, একজনের কর্মের মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যখন মহান আল্লাহর স্মরণের সমস্ত দিক পরিপূর্ণ হয়, তখন এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজন ব্যক্তি তার জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আয়াত 239 এর শেষে নির্দেশিত, এই আচরণটি অবলম্বন করা হল কিভাবে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তিনি তাদের দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 239:

"...অতঃপর [নামাজে] আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তুমি [পূর্বে] জানতে না।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 240-242

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায় - তাদের স্ত্রীদের জন্য একটি অসিয়ত: [তাদেরকে] বহিষ্কার না করে এক বছরের জন্য ভরণপোষণ। কিন্তু যদি তারা [নিজের ইচ্ছায়] চলে যায়, তবে তারা নিজেদের সাথে গ্রহণযোগ্য উপায়ে যা করে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য গ্রহণযোগ্য অনুযায়ী একটি বিধান - ধার্মিকদের উপর একটি কর্তব্য।

এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা যুক্তি ব্যবহার করতে পারো।"

মহান আল্লাহ তারপর একজন বিধবার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 240:

" *এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায় - তাদের স্ত্রীদের জন্য একটি অসিয়ত: [তাদেরকে] বহিষ্কার না করে এক বছরের জন্য ভরণপোষণ দেওয়া হয়...* "

যেহেতু বিধবা অত্যন্ত আবেগময় সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই তাকে উপড়ে ফেলার পরিবর্তে স্বামীর বাড়িতে থাকা উচিত, যা কেবলমাত্র একজনের মানসিক চাপ বাড়ায়। উপরন্তু, বিধবাকে তার দুঃখ সামলাতে সাহায্য করার জন্য, তাকে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হবে বা তার আত্মীয়দের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। দুঃখজনকভাবে, এই দায়িত্বটি প্রায়ই মৃত স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় এবং তারা প্রায়ই বিধবাকে তার আত্মীয়দের কাছে ফেরত পাঠায়, যদিও পবিত্র কুরআন অনুসারে তাকে সাহায্য করা তাদের উপর একটি কর্তব্য। মহান আল্লাহ বিধবাকে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য এই নিয়মগুলি স্থাপন করেছেন এবং তাই মুসলমানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের মৃত আত্মীয়ের বিধবার সাথে আচরণ করতে হবে, তারা তাদের স্বামী মারা গেলে তাদের নিজের আত্মীয়ের সাথে কেমন আচরণ করতে চান।

একজন বিধবাকে তার মৃত স্বামীর বাড়িতে কতদিন থাকতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা বিভিন্ন আয়াতের সমন্বয় সাধনের জন্য, একজন বিধবাকে তার চার মাস দশ দিন ইদ্দতের সময় বাড়িতে থাকতে হবে এবং তারপর সে হয় বছরের বাকি সময় থাকতে পারে। অথবা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর চলে যান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 234:

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে- তারা, [স্ত্রীগণ] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে...।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 240:

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায়- তাদের স্ত্রীদের জন্য একটি অসিয়ত: [তাদেরকে] বহিষ্কার না করে এক বছরের জন্য ভরণপোষণ। কিন্তু যদি তারা [নিজের ইচ্ছায়] চলে যায়..."

উপরন্তু, এক বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ নিম্নলিখিত আয়াতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বা এই আয়াতে বিধবার জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার থেকে পৃথক বিবেচনা করা যেতে পারে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 12:

"...এবং তাদের জন্য [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] এক চতুর্থাংশ যদি আপনি কোন সন্তান না রাখেন। অতঃপর যদি তুমি কোন সন্তানকে রেখে যাও, তবে তাদের জন্য তুমি যা রেখে যাও তার অষ্টমাংশ, যে অসিয়ত তোমার করা [হতে পারে] পরে অথবা ঋণ..."

বিধবার জন্য অপেক্ষার সময় গর্ভাবস্থা নিজেকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়, যা স্পষ্টতই তার ভবিষ্যতের পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করবে। উপরন্তু, ইদ্দতকাল বিধবাকে তার মৃত স্বামীর জন্য শোক করার অনুমতি দেয়, ইসলামের সীমার মধ্যে, ভবিষ্যত পছন্দ এবং সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করে যার জন্য সে পরে অনুশোচনা করতে পারে, যেমন অন্য কারো সাথে বিবাহ। ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, বিধবা অবিবাহিত থাকতে বা পুনরায় বিয়ে করতে স্বাধীন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 240:

"...কিন্তু যদি তারা [নিজের ইচ্ছায়] চলে যায়, তবে তারা নিজেদের সাথে গ্রহণযোগ্য উপায়ে যা করে তার জন্য আপনার কোন দোষ নেই..."

যেহেতু এই আয়াতে বহুবচন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটি বিধবার আত্মীয়দের তার অপেক্ষার সময় এবং তার ভবিষ্যত পছন্দ যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বিধবাদের সমর্থন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা একটি কঠিন মানসিক অবস্থায় থাকে এবং তাই ভুল পছন্দ করার জন্য বেশি সংবেদনশীল। ইসলামের মধ্যে বিধবাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবশ্যই একজনের উপায় অনুযায়ী সমর্থন করা উচিত, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা, বিশেষ করে তার আত্মীয়দের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 6006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন রোজা রাখে এবং প্রতি রাতে স্বেচ্ছায় নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে। যদি তারা একটি বিধবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতটি বিধবার ভবিষ্যত পছন্দগুলিও তার হাতে তুলে দেয়, তাই, তার আত্মীয়স্বজন এবং তার মৃত স্বামীর আত্মীয়রা তাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবেন না, যেমন অবিবাহিত থাকা, যদি সে আবার বিয়ে করতে চায়। . আত্মীয়দের ভূমিকা হল বিধবাকে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, তাকে কিছু পছন্দ করতে বাধ্য করা নয় যা তাদের খুশি করে। উপরন্তু, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর, বিধবার মনে হওয়া উচিত নয় যে তাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যা তার আত্মীয়স্বজন বা তার মৃত স্বামীর আত্মীয়দের খুশি করে। মহান আল্লাহ তার অনুভূতি স্বীকার করেছেন এবং তাকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তার নিজের পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাই তাকে কলঙ্ক, অন্যের অনুভূতি বা সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত দ্বারা প্রভাবিত করা উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ একজনের নিয়ত, কথা ও কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তাই বিধবা এবং তার আত্মীয়-স্বজন উভয়কেই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি একাই সর্বোত্তম আচরণবিধি নির্ধারণ করতে পারেন যা মানুষের অনুসরণ করা উচিত, যেমন বিধবাদের, মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য। অতএব, লোকেদের মতামত যা তাঁর উপদেশের বিপরীতে উপেক্ষা করা উচিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 240:

"... আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

বিধবাদের প্রতি উত্তম আচরণের আলোচনার পর মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত নারীদের প্রতি সদাচরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে বিবাহের আলোচনা শেষ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 241:

"এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য গ্রহণযোগ্য অনুসারে একটি বিধান রয়েছে - ধার্মিকদের উপর একটি কর্তব্য।"

ইদ্দতের সময়, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের অবশ্যই তাদের প্রাক্তন স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং যখন তারা তাদের সন্তানকে লালন-পালন করছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 233:

"যে কেউ স্তন্যপান [পিরিয়ড] সম্পূর্ণ করতে চায় মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাতে পারেন। পিতার উপর তাদের [অর্থাৎ, মায়েদের] রিযিক এবং তাদের পোশাক যা গ্রহণযোগ্য সে অনুযায়ী..."

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা ধার্মিকদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করে যে, একজন ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা এই আচরণ করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে। এটি আবারও বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, মানুষ এবং পার্থিব বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে জড়িত। অতএব, মহান আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সরাসরি সংযুক্ত এবং অবহেলা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, এই আয়াতে তাকওয়া আছে এমন একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর কারণ হল তারাই একমাত্র যারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে, এমনকি যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত হয়।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী নয় সে তাদের স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের প্রতি রাগান্বিত হবে। তাদের ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইসলামী শিক্ষা জুড়ে, যেমন সহীহ বুখারি, ৫০৯০ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

আয়াতের এই এবং পূর্ববর্তী অংশের আলোচনা শুধুমাত্র তারাই গ্রহণ করবে এবং তার উপর কাজ করবে যারা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে এবং এর উপদেশ ও শিক্ষার ব্যাপক উপকারিতা চিহ্নিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 242:

"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা যুক্তি ব্যবহার করতে পার।"

এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে কোনো মানবসৃষ্ট আইন বা আচরণবিধি কখনই নিখুঁত হবে না কারণ এটি হবে পক্ষপাতদুষ্ট, অদূরদর্শী এবং জ্ঞান দ্বারা সীমিত। এটি মানুষকে তাদের জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে বাধা দেবে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। যেখানে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধি সর্বদা নিখুঁত হবে কারণ তিনি মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা সহ সমস্ত কিছু জানেন, এমন কিছু যা কোনো সমাজ কখনোই জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করতে পারে না এমনকি গবেষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে অতএব, মহান আল্লাহই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষকে এমন একটি আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে মানসিক শান্তি আসে। একজন ডাক্তার যেমন ওষুধের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, তেমনি মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি

একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরামর্শ দিতে পারেন। উপরন্তু, ইসলামের শিক্ষাগুলি যেমন মানুষের প্রকৃতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সেগুলি নিরবধি, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও নিরবধি। এবং ইসলামের শিক্ষা যে কেউ তার জ্ঞানের স্তর নির্বিশেষে আমল করতে পারে, কারণ সেগুলি বোঝা এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করা সহজ। যদিও, অনুপ্রেরণামূলক বক্তাদের মতো অন্যদের দ্বারা প্রদত্ত বেশিরভাগ উপদেশগুলি অবাস্তব, যদিও সেগুলি উত্তেজনাপূর্ণ শোনায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 242:

"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা যুক্তি ব্যবহার করতে পার।"

, তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির সন্তান এবং বিধবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে ।

যদিও এমন অনেক পার্থিব সমস্যা রয়েছে যা মানুষ মুখোমুখি হতে পারে তবুও পবিত্র কুরআনে সেগুলির সবগুলিকে সম্বোধন করা হয়নি। পবিত্র কুরআন শাখা সমস্যাগুলোর সমাধান না করে মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করে। একটি শাখার সমস্যা সমাধান করা শেষ পর্যন্ত অন্য শাখার সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে। যেখানে, মূল সমস্যাকে টার্গেট করা অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত শাখা সমস্যা দূর করে। এই ক্ষেত্রে, পবিত্র কুরআন একজন বিবাহিত দম্পতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেনি বরং এটি মূল সমস্যা এবং কীভাবে তাদের সাথে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছে। দাম্পত্য কাজের জন্য এবং উভয় স্ত্রীর অধিকার পূরণের জন্য দম্পতির মধ্যে উত্তম

চরিত্র এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা আবশ্যক। অসুখী বিবাহিত দম্পতিদের একসাথে থাকতে বাধ্য করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ তাদের একটি বৈধ পথ দিয়েছেন, তালাক। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে উত্তম চরিত্র এবং মহান আল্লাহর ভয়, তালাকের প্রক্রিয়া চলাকালীন অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, যা স্ত্রী, স্বামী এবং সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক চাপকে কমিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তালাকের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রত্যেক স্ত্রী ও স্বামীকে তালাকের সময় জড়িত সন্তানদের অধিকার পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই কৌশলটি আবার একটি মূল সমস্যার সমাধান করে যা অগণিত শাখা সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ দেখেন যে শিশুরা শিক্ষায় সফল হয় না এবং প্রায়শই ফৌজদারি দল, কিশোর আদালত, আটক কেন্দ্র এবং কারাগারে শেষ হয়, তবে তারা লক্ষ্য করবে যে তারা অসুখী বা ভাঙা পরিবার থেকে এসেছে যেখানে তাদের পিতামাতা, একসাথে বা বিবাহবিচ্ছেদ হোক না কেন, পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। একে অপরের অধিকার এবং সন্তানের অধিকার।

মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক হারাম করেন। একজন দম্পতি যখন একজন বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকারের নিবেদিত নয়, তখন তারা যে কোন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয় তা দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। একজনের জীবনে একাধিক সম্পর্কের আসা এবং বাইরে আসা নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যারা তাদের সঙ্গীদের থেকে আলাদা তারা প্রায়ই কাউন্সেলিং শেষ করে। যারা এই সম্পর্কগুলিকে এড়িয়ে চলে তাদের চেয়ে তারা বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। উপরন্তু, যারা একাধিক অংশীদার থাকার জন্য সমাজের মধ্যে পরিচিত তাদের অধিকার পূরণ করবে এমন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল যার জীবনে একাধিক অংশীদার রয়েছে সে একটি ঢিলেঢালা এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গ্রহণ করবে, যা বিয়ের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি খুঁজতে থাকা লোকেরা অপছন্দ করবে। এটি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য মানসিক চাপ বাড়াবে যার একাধিক অংশীদার রয়েছে। নৈমিত্তিক

সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে না। অর্থ, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের সঙ্গীর সাথে থিতু হওয়ার ইচ্ছা। অন্যদিকে, অন্যরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে না। যখন মনোভাবের এই পার্থক্যটি অবশেষে সামনে আসে তখন এটি প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে নিয়ে যায় যিনি সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন। যেখানে, প্রথম ধাপ থেকে একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। একটি বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিত থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক না কেন, যেমন সন্তান ধারণ করা। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঙ্গীকে পুরোপুরি জানে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের জীবনসঙ্গী পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন হয়নি। যে জিনিসগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল তা ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে নিয়ে যায় যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিল। এমনকি বিয়ের আগে একসঙ্গে বসবাস করলেও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোন গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের প্রতিটি দিককে কতটা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী শিক্ষা ছেড়ে দেয় কারণ তারা প্রতিদিন তাদের প্রাক্তন সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারে না। যেহেতু বিবাহ হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের ব্রেকআপ ওভার একই ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য তাদের ব্রেকআপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি বেআইনি সম্পর্কের বাহ্যিক চেহারাতে প্রতারিত করা উচিত নয় যে বিশ্বাস করে এতে দম্পতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত, অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং প্রায়শই

তাদের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে বিবাহের বাইরে সম্পর্ক থাকা ক্ষতিকারক নয় যেখানে তারা লুকানো বিষ দেখতে ব্যর্থ হয় যা তাদের এবং অন্যদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একটি বেআইনি সম্পর্কের একজন মুসলিম কেবলমাত্র সময়ের সাথে সাথে আরও পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের সঙ্গীর সাথে পাপ করতে উত্সাহিত হবে। যেহেতু আবেগ এবং অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং যেহেতু এই পাপগুলি, যেমন ব্যভিচার, বেশিরভাগ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, একজন অ-বিবাহিত দম্পতি সহজেই এই পাপের মধ্যে পড়তে পারে। এটি তাদের এবং সমাজের জন্য অগণিত অন্যান্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, যেমন অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এমনকি ইসলামের মধ্যে অন্যান্য বড় পাপকে ছোট করা। উপরন্তু, এমনকি যদি কেউ তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোন বড় পাপ না করে, যেমন ব্যভিচার, তবে তাদের অনুভূতি তাদের স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে ভালভাবে বিয়ে করতে পারে, বুঝতে না পেরে তারা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নয়। , এমনকি যদি তারা একটি ভাল অংশীদার বলে মনে হয়. যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন একজনের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করা, দম্পতির মধ্যে সম্পর্ককে পরিবর্তন করে, যা প্রায়শই বিবাহের সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। এই কারণে বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিল তারা প্রায়ই একে অপরকে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য অভিযুক্ত করে। উপরন্তু, একজন তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন, তারা কখনই তাদের চরিত্র জানতে পারবেন না যেমন একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরকে চেনেন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়ের পরে প্রকাশ পাবে, যা কেবলমাত্র বিবাহের আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একটি সত্য যা প্রায়ই একজন অবৈধ সম্পর্কের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় যে একজন ব্যক্তি যে একজন ভাল সঙ্গী তৈরি করে তার একটি ভাল পত্নী বা ভাল পিতামাতা হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। কারণ একজন ভালো সঙ্গী বানানোর তুলনায় একজন ভালো জীবনসঙ্গী এবং পিতামাতা তৈরি করতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করার জন্য বেছে নেওয়ার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে, কারণ তারাই একমাত্র যারা তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে এবং তাদের ক্ষতি করা এড়াবে, এমনকি তারা যখন রাগান্বিতও

হয়। . পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির তাকওয়া নেই, সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের প্রতি জুলুম করবে, বিশেষ করে যখন তারা রাগান্বিত হয়। যার একজন সঙ্গী আছে সে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে তাদের প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে বিয়ে করবে, যদিও তাদের মধ্যে তাকওয়া নেই। আবেগ, যেমন প্রেম, একজন ব্যক্তিকে তাদের প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্ধ এবং বধির করে তোলে। সুনানে আবু দাউদ, 5130 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্মগ্রহণকারী যে কোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়ই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায় না। এটি সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের উভয় পিতামাতার সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই প্রত্যেকের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এটা একটা স্পষ্ট সত্য যে, অপরাধ, গ্যাং-এর সাথে জড়িত অধিকাংশ যুবক এবং যারা যৌন শিকারীদের দ্বারা লালিত-পালিত এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার, তারা ভাঙ্গা পরিবার থেকে আসে। একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা যখন একজনের সন্তানের ইচ্ছা হয় তখন অত্যন্ত কঠিন, তাহলে একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালনের মানসিক চাপের কথা কি কল্পনা করতে পারেন যখন পিতামাতা প্রথমে সন্তানকে পেতে চাননি? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। এই চাপ প্রায়ই একক অভিভাবক সন্তানকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

বেআইনি সম্পর্কের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও নেতিবাচক জিনিসগুলিকে আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ কেউ প্রশংসা করতে পারে না, এমনকি যদি বেআইনি সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। বেআইনি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক এমন একটি খাবার খাওয়ার মতো যা প্রকৃতপক্ষে বিষাক্ত হলে সুস্বাদু বলে মনে হয়। যেহেতু এই বিষটি লুকিয়ে আছে, একজনকে অবশ্যই এমন একজনের উপর নির্ভর করতে হবে যিনি এই বিষ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের পরামর্শে বিশ্বাস রাখতে হবে যাতে সুস্বাদু দেখায় এমন খাবার খাওয়া এড়াতে, এমনকি যদি এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। যেহেতু মহান আল্লাহই সব কিছু জানেন, বিশেষ করে কিছু কাজ ও সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষের কথা, তার উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, যদিও তা কারো ইচ্ছার বিপরীত হয়। এটি একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জেনে কাজ করে, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি তখন সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে যারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং যারা পালন করে না।

আল্লাহ, মহান, এই অসংখ্য শাখা সমস্যা দূর করেছেন মূল সমস্যাটির অর্থ, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিয়েকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, যার মাধ্যমে একটি

দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

বিবাহ, তালাক, বিধবা ও সন্তানের ধারণার প্রতি সুরাহা করে মহান আল্লাহ একটি সফল সমাজের চাবিকাঠি দিয়েছেন। যখন পরিবারের সদস্যরা, একসাথে হোক বা বিবাহবিচ্ছেদ হোক, একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং শিশুদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও সুখী ঘর তৈরি করে, তখন এটি সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিপরীতভাবে, যখন একটি পরিবার অসুখী হয় এবং একে অপরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন এটি একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে যা সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন কিন্তু এই সমাধানগুলি লক্ষ্যবস্তু শাখার সমস্যা হিসাবে এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অথচ, মহান আল্লাহ এই পদ্ধতির মাধ্যমে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে, যা ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে, সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"... আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ..."

কিন্তু আয়াত 242 দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সঠিকভাবে প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করবে যারা মহান আল্লাহর আয়াতের গভীর জ্ঞান বুঝতে পারবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 242:

"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা যুক্তি ব্যবহার করতে পার।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 243-245

۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيَٰهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٤٤﴾

“আপনি কি ভেবে দেখেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার বাড়ি ছেড়েছে? আল্লাহ তাদেরকে বললেন, ‘মরো’; তারপর তিনি তাদের জীবন ফিরিয়ে আনলেন। আর আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মালিক, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

আয়াত 243 এর শুরুতে একটি আত্ম-শোষিত মনোভাব এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেখানে কেউ কেবল তাদের নিজের জীবন এবং বিশেষ করে তাদের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

" *আপনি কি সেগুলি বিবেচনা করেননি ...*"

যে এইভাবে আচরণ করে সে সাধারণ ইতিহাস, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং তাদের চারপাশের মানুষের অবস্থার মধ্যে পাওয়া পাঠগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। এই জিনিসগুলি থেকে শেখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি যা একজন ব্যক্তি তাদের আচরণকে উন্নত করতে পারে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারে যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি দেখেন যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তারা স্ট্রেস, মানসিক ব্যাধি, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় জর্জরিত হয়, যদিও তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করে এবং বিলাসিতা উপভোগ করে। এই জগতের, পর্যবেক্ষককে শেখাবে যে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। অথবা যখন একজন ব্যক্তি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন এটি তাদের নিজের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে এবং এটি হারানোর আগে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করা উচিত। তাই, ইসলাম নিয়মিতভাবে মুসলমানদেরকে এমন লোকদের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণকারী মানুষ হতে উৎসাহিত করে যারা তাদের নিজেদের বিষয়ে নিমগ্ন থাকে যে তারা অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয় না। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 10:

"*তারা কি দেশে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে?...*"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

" *আপনি কি ভেবে দেখেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার বাড়ি ছেড়েছে?..."*

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তিকে এই আয়াতের পিছনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ থেকে বিচ্যুত করা উচিত নয় যাতে তারা তাদের শক্তি এবং সময় নষ্ট করে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, যেমন এই গোষ্ঠীর লোকেদের পরিচয় নিয়ে গবেষণা করতে। যদি তাদের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হত, মহান আল্লাহ তা উল্লেখ করতেন। একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াবে না, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, যেহেতু ইসলাম মক্কার অমুসলিম এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রমণের শিকার ছিল, যেমন মুনাফিক এবং মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের লোকেরা, তাই সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে উত্সাহিত করেছিলেন। নিজেদের এবং ইসলামকে রক্ষা করতে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 39:

"যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের [যুদ্ধের] অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করতে সক্ষম।"

মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হল মৃত্যুভয় এবং যে সম্পদ দান করা হয়েছে তা হারানো বা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী উপায়ে ব্যবহার করা। এই দুটি বিষয়ই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

" *আপনি কি তাদের কথা বিবেচনা করেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার বাড়ি ছেড়েছে? আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'মরো'; তারপর তিনি তাদের জীবনে পুনরুদ্ধার করেছেন..."*

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং এড়ানো যাবে না। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 80:

"এবং তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান..."

এবং অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 11:

"কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

যেহেতু একজন ব্যক্তির মৃত্যু নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এড়ানো যায় না, তাহলে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা এড়ানোর কোন মানে হয় না, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। একজন ব্যক্তির আচরণ তাদের মৃত্যুর সময় পরিবর্তন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করা এবং তাদের অজানা থাকা তাদের আরও উত্সাহিত করা উচিত, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অন্য কথায়, একজন ব্যক্তি যেহেতু মৃত্যু থেকে পালাতে পারে না, তার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়াটা বোধগম্য। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না যখন কোন আত্মার সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

“ *আপনি কি তাদের কথা বিবেচনা করেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার বাড়ি ছেড়েছে? আল্লাহ তাদেরকে বললেন, ‘মরো'; তারপর তিনি তাদের জীবনে পুনরুদ্ধার করেছেন..."*

জীবন ও মৃত্যু যে মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে, এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এই পুনরুদ্ধার ঘটতে পারে, তাই মৃত্যুর ভয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে পলায়ন করা উচিত নয়। ইতিহাসে এই পৃথিবীতে কেয়ামত ঘটেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 72-73:

“আর [স্মরণ করুন] যখন তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে। অতঃপর আমরা বললাম, তাকে [অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে] এর কিছু অংশ দিয়ে আঘাত

কর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

অথবা এই পুনরুত্থান বিচার দিবসকে নির্দেশ করতে পারে যেখানে প্রত্যেককে পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে। এই ক্ষেত্রে, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, মৃত্যুকে ভয় করা বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে না। কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতিতে ব্যর্থ হওয়া মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং মারাত্মক বিপদের দিকে নিয়ে যায় তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি উভয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে যাতে তারা কিছু পার্থিব ভয় যেমন মৃত্যু বা দারিদ্র্যের কারণে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে পলায়ন না করে এবং যে তাদের জবাবদিহির ভয়ে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। বিচার দিবসে, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তিনি তাদের দান করা অসংখ্য নেয়ামতের জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

"...আর আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মালিক, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

আরও নির্দিষ্টভাবে, একজনের উদ্দেশ্যের কৃতজ্ঞতা বলতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা ক্ষতিপূরণ কামনা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব

থাকা জড়িত। এবং যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, একজনের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতা বলতে বোঝায় যে আশীর্বাদগুলিকে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

এই কৃতজ্ঞতা একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা নিশ্চিত করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, এইভাবে মনের শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করবে যে কেউ বেঁচে থাকুক, মৃত্যুবরণ করুক এবং বিচার দিবসে পৌঁছুক। অতএব, এই ফলাফলের দিকে পরিচালিত হওয়া স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

"... আর আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মালিক, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 52:

"বলুন, "আপনি কি আমাদের জন্য দুটি সর্বোত্তম জিনিস [অর্থাৎ শাহাদাত বা বিজয়] ছাড়া একটি অপেক্ষা করছেন..."

উভয় জগতের জীবন, মৃত্যু ও সাফল্যের বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার পর, মহান আল্লাহ, তারপর সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেন, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য এবং অপসারণের জন্য মহান আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য। আরব সমাজে নিপীড়ন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 244:

"আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর..."

এবং মহান আল্লাহ যেমন সব কিছু শোনেন এবং জানেন, তিনি যুদ্ধ করার জন্য মানুষের অভিপ্রায় সম্পর্কে বা যখন তারা তাঁর পথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অজুহাত পেশ করে তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন এবং তাই তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 244:

"...এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।"

মহান আল্লাহর এই দুটি স্বর্গীয় গুণাবলীকে জানার আদেশটি ইসলামী শিক্ষার শিক্ষা ও আমলের গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে একজন ব্যক্তি ঈমানের নিশ্চিততা গ্রহণ করে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে। এই আনুগত্যের মধ্যে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক

অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি, ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে, তারা যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, যেমন কঠিন সময়ে, সহজে অপব্যবহার করবে এবং ফলস্বরূপ তারা মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 244:

"...এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহর এই স্বর্গীয় গুণাবলী জানার নির্দেশ, তার ঐশ্বরিক গুণাবলী শেখার এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, যেহেতু আল্লাহ, পরম করুণাময়, মানুষের উচিত একে অপরের প্রতি করুণা করা যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করে। জামি আত তিরমিযী,

1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন কেউ সঠিকভাবে খোদায়ী গুণাবলী শিখতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করবে যা সত্য নয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটি অসম্মানজনক হতে পারে। এবং এমনকি তাদের অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারে, তবে তারা একটি অলস মনোভাব গ্রহণ করতে উত্সাহিত হবে যার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, যা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার সাথে জড়িত। , তারা বিশ্বাস করে উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে। এটা মহান আল্লাহর উপর আশা করা নয়, এটা নিছক ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। আশা সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের আশা করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা, ভাল কাজকারীর সাথে অন্যায়কারীর সমান আচরণ করবে, মহান আল্লাহর ন্যায় ও ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করে। যা অত্যন্ত অসম্মানজনক। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

তদুপরি, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহকে মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করতে পারে, ইহুদীদের মতই, অন্যদের উপর নির্দিষ্ট বংশের পক্ষপাতী হতে পারে, এবং ফলস্বরূপ তারা এটি অনুধাবন না করেই মহান আল্লাহর প্রতি বর্ণবাদকে দায়ী করে। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত থেকে মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী শেখা এবং তার

উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং সঠিক আচরণ অবলম্বন করুন যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 244:

"আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।"

পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থান দিতে হবে। অর্থ, কোনো আয়াত বা হাদিস যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে বা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে কারো কর্মকে সমর্থন করার জন্য নেওয়া যাবে না। আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষাপটকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের আলোকে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস কি বা কাদের নির্দেশ করে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উপরন্তু, মুসলমানরা কেবলমাত্র একজন বৈধ শাসকের পতাকায় বহিরাগত আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এবং যখন এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী করা হয়। যারা

লড়াই করে তাদের অবশ্যই এই সীমা ও নিয়মগুলি অতিক্রম করার জন্য সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 194:

"... *সুতরাং যে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, সে তোমাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাকেও সেভাবে আক্রমণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর..."*

এই ধরনের একটি নিয়ম হল যুদ্ধের অবলম্বন করা যখন একজনকে আক্রমণ করা হয়, যেমনটি আলোচনা করা প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

" *আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে..."*

অতএব, শান্তির অবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক আগ্রাসন দেখানো হারাম। আরেকটি নিয়ম হল, শত্রু যখন আগ্রাসন থেকে বিরত থাকে তখন মুসলমানদেরও অবশ্যই বিরত হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

"...কিন্তু যদি তারা থামে, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া কোন আগ্রাসন [অর্থাৎ আক্রমণ] হবে না।"

শত্রু যদি চায় শান্তি এটা মঞ্জুর করা আবশ্যক. অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 90:

"...সুতরাং তারা যদি আপনার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং আপনার সাথে যুদ্ধ না করে এবং আপনাকে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য [যুদ্ধের] কারণ তৈরি করেননি।"

তৃতীয় নিয়ম হল বেসামরিকদের ক্ষতি করা যাবে না। এটি সীমালঙ্ঘনকারী বলে আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বারবার যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের পাশাপাশি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ, 2614 নম্বর এবং মুসনাদে আহমদ, 2728 নম্বরে পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ফলধারী গাছ কাটা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33121 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কৃষকের মতো অ-সৈনিকদের ক্ষতি করবেন না। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33120 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সংঘাতের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা, সেক্ষেত্রে শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তা অবশ্যই তাদের দিতে হবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 60-61:

"এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়দৌড়ের প্রস্তুতি নাও যার দ্বারা আপনি আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রুকে ভয় দেখাতে পারেন... এবং যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে থাকে তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন..."

যারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তিকে সম্মান করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 12-13:

“এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথমবার তোমার উপর আক্রমণ শুরু করেছে?

যারা তাদের চুক্তিকে সম্মান করে তাদের আক্রমণ করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 7:

"... তাই যতক্ষণ তারা আপনার দিকে সরল, তাদের দিকে সোজা থাকুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র মুখে ও কাজের মাধ্যমে নয়, অন্তর থেকেও গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকে তাদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করতে হবে। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 8-9:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে নিষেধ করেন না যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না - তাদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের থেকে তোমাদের নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ ধর্মের এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করবে..."

যুদ্ধ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ঘৃণ্য, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এতে বাধ্য করা উচিত যখন এটি কামনা না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণাজনক..."

এটি পরবর্তী আয়াতগুলিতে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে কারণ আল্লাহ, মহান, তাঁর দুটি ঐশ্বরিক গুণের উল্লেখ করেছেন যেগুলি উভয়ই তাঁর করুণা ও শান্তির সাথে যুক্ত, যথা, ক্ষমাশীল এবং সমস্ত করুণাময়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 192:

"আর যদি তারা থেমে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই স্বর্গীয় গুণাবলীর পরিবর্তে তাঁর ক্ষমতা এবং শক্তির ঐশ্বরিক গুণাবলী উল্লেখ করতে বেছে নিয়েছিলেন যে শান্তি ও নিরাপত্তা মানবজাতির জন্য তিনি পছন্দ করেন।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদেরকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হলে তাদের অবিচল থাকতে হবে। এটি সহীহ বুখারী, 2966 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলির আসল উদ্দেশ্য হল জোর দেওয়া যে বলপ্রয়োগ করা উচিত তখনই যখন এর ব্যবহার অনিবার্য, কেবলমাত্র সেই পরিমাণে যা একেবারে প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের অধীনে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর

আগেই বলা হয়েছে, কে, কী এবং কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য একটি আয়াত বা হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা জরুরী। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, এভাবে যুদ্ধ করার বিষয়ে আয়াত ও হাদীসের

ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল একটি আয়াত যাকে তরবারি পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও পবিত্র কুরআনে "তলোয়ার" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙঘনীয় মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং অতর্কিত অবস্থানে তাদের জন্য অপেক্ষা কর।

যেমনটি আগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমনকি যুদ্ধের এই বিবৃতিটি নির্দিষ্ট শর্ত এবং শান্তির ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি নয়। অর্থ, আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট দলকে বোঝায়।

তরবারি আয়াতের আশেপাশের আয়াতগুলি একাধিক অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র তারাই যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বারবার লঙঘন করেছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসনের কাজে লিপ্ত ছিল। এবং তার মিত্ররা। উদাহরণস্বরূপ, তলোয়ার আয়াতের ঠিক আগের আয়াতটি, অর্থ, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 4, বলে:

“তারা ব্যতীত যাদের সাথে তুমি মুশরিকদের মধ্যে চুক্তি করেছিলে অতঃপর তারা তোমার প্রতি কোন ত্রুটি করেনি বা তোমার বিরুদ্ধে কাউকে সমর্থন করেনি; সুতরাং তাদের জন্য তাদের চুক্তি সম্পূর্ণ করুন যতক্ষণ না তাদের মেয়াদ শেষ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এটি একটি সম্পর্কিত আয়াতে আরেকটি আদেশ অনুসরণ করে, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 7:

“মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে চুক্তি কিভাবে হতে পারে, যাদের সাথে তোমরা আল-মসজিদ আল-হারামে চুক্তি করেছিলে? তাই যতক্ষণ তারা তোমার দিকে সোজা থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রতি সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এই মুশরিকদের অপরাধ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 8-10:

“কিভাবে [একটি চুক্তি হতে পারে] যখন তারা আপনার উপর আধিপত্য অর্জন করে তবে তারা আপনার সম্পর্কে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না? তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর [অনুগত্য] অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শন বিনিময় করেছে এবং [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা

যা করত তা ছিল মন্দ। তারা একজন বিশ্বাসীর প্রতি আত্মীয়তার কোনো চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 12-13:

“এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। আপনি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা প্রথমবার আপনার উপর [আক্রমণ] শুরু করেছে?

থিসিস নির্দিষ্ট মুশরিকরা ক্রমাগত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সহায়তা করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, মক্কা ও মসজিদ আল হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে। উদ্ধৃত আয়াতে অন্তত আটবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায় 9 তওবাহ, আয়াত 12, যা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, "অবিশ্বাসের নেতাদের" সাথে লড়াই করার লক্ষ্য তাই তারা তাদের আগ্রাসন থেকে "বন্ধ" হয়ে যায়। এই আয়াতগুলি, বাকিদের মতো, যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট শর্তগুলি মেনে চলার

গুরুত্ব নির্দেশ করে যেমন শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করা যারা প্রথমে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

উপরন্তু, এই মুশরিকদের এখনও অনেক সতর্কতা এবং ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাদের চার মাসের অবকাশ ও শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 2:

"অতএব, [হে কাফেররা], চার মাস দেশে অবাধে ভ্রমণ কর, কিন্তু জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না..."

এবং অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙ্ঘনীয় [চার] মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য অতর্কিত অবস্থানে বসে থাক..."

এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে এই মুশরিকদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যারা এটি অনুরোধ করেছিল যাতে তারা কোনও ভয়

বা চাপ ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ পায় বা তারা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় ছাড়াই আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 6:

"এবং যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে [অর্থাৎ কুরআন]। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"

এই মুশরিকদের যুদ্ধ ও হত্যার তরবারি আয়াতের নির্দেশ তখনই কার্যকর হবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে চার মাসের অবকাশের পর আরব উপদ্বীপে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, অনেক মুশরিক এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অবকাশের কারণে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তরবারি আয়াতের কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন রক্তপাত হয়নি , কারণ এই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আরও রক্তপাত থেকে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করা অর্থ, হয় এই মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে বা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। .

উপসংহারে, আশেপাশের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন, তরবারি আয়াতটিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে রাখুন। অর্থ, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শত্রু মুশরিকদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তারা তাদের পরে অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 244:

"আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা হল একটি অবিরাম সংগ্রাম এবং এতে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা নিশ্চিত করবে যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। এই সংগ্রাম মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করতে পারে তবে এটি মনের শান্তির দিকে নিয়ে যায়, তাই তাদের অবশ্যই এটি গ্রহণ করতে হবে এবং পূরণ করতে হবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা

মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

আগেই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হল মৃত্যুর ভয় এবং দ্বিতীয়টি হল দান করা আশীর্বাদগুলি হারানো, যেমন সম্পদ, অথবা এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। আয়াত 245-এ, মহান আল্লাহ বোঝার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন যে যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত সম্পদ, যেমন ধন-সম্পদের ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তারা যে সম্পদ ব্যবহার করেছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। প্রাপ্ত আশীর্বাদ এবং করুণা একজনকে দেওয়া সম্পদের চেয়ে বেশি, কারণ তারা প্রতিটি ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যায় যা মনের শান্তি। বাস্তবে, প্রত্যেক ব্যক্তি, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, মনের শান্তি পেতে চায় কিন্তু তা বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করে। কেউ এটি খ্যাতির জন্য, কেউ সম্পদে, কেউ কেউ কর্তৃত্বে এটি সন্ধান করে, কেউ পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা তাদের কর্মজীবনে এটি সন্ধান করে। কিন্তু এই জিনিসগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই একই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যথা, মনের শান্তি। ইসলাম এটা স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া সম্পদ উৎসর্গ করার মাধ্যমে যে আশীর্বাদ ও করুণা পাওয়া যায়, তা উভয় জগতের এই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে,

মহান আল্লাহ যেমন মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাসহ সব বিষয়েই জানেন, একজন মানুষ কীভাবে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে তা তিনিই জানেন। একজন ডাক্তার যেমন অন্যদের ওষুধের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, তেমনি মহান আল্লাহই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষকে কীভাবে মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জন করতে পারেন সে সম্পর্কে সঠিকভাবে পরামর্শ দিতে পারেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের কৃপণতা জানেন, তিনি আয়াতটি এমনভাবে উচ্চারণ করেছেন যাতে এটি একটি ব্যবসায়িক লেনদেনের মতো শোনায় যা লাভের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এটি বোঝে তার লজ্জা বোধ করা উচিত যে তাদের লোভের কারণে, মহান, মহান, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং মালিক আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা ব্যবহার করতে তাদের উত্সাহিত করার জন্য তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহৃত যে কোনও সম্পদ ফেরত দেবেন। সঠিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে, যদিও এটি শুধুমাত্র তাদের উপকার করে। এই লাজুকতা তাদের ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করা উচিত।

মহান আল্লাহ, তারপর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, যেমন সম্পদ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ দেয়নি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"...এবং আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন..."

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে পার্থিব জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তিনিই তাদের প্রকৃত মালিক। অতএব, মানুষের জন্য কেবলমাত্র তাদের জন্য ন্যায্য হবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাদের মালিক, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ পার্থিব জিনিস যেমন মানুষকে ঋণ দিয়ে দিয়েছেন, তাই তাদের এই ঋণ ফেরত দিতে হবে। এই ঋণ ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হল এগুলিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে, জান্নাতের নেয়ামত একটি উপহার, মানুষ তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"...এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

তাই একজন ব্যক্তিকে পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় যা জান্নাতের উপহারের সাথে ঋণ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"...এবং আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির দায়িত্ব মহান আল্লাহ কর্তৃক এই পৃথিবীতে যা বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর চাপ দেওয়া নয়, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে নির্ধারিত হয়েছিল। এবং পরিবর্তন করা যাবে না। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে, একজন ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে তার হালাল রিজিক পাওয়ার জন্য তাদের প্রদত্ত সম্পদ যেমন তার শারীরিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে যাই হোক না কেন। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বিধান এতদিন আগে তাদের কাছে পৌঁছাবে এবং কিছুই এর পরিবর্তন করতে পারবে না। এটি বোঝা তাদের বেআইনি উত্স থেকে বিধান পেতে বাধা দেবে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বরাদ্দ করেছেন, তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয় এবং তিনি অন্যদেরকে যা দেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম। অতএব, তাদেরকে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার দিকে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে তারা এই দুনিয়ায় তাদের বা অন্যদের জন্য কী কী পার্থিব জিনিস বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা না করে তারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। জাগতিক জিনিসগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই মনের শান্তি নিহিত, ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী হওয়ার মধ্যেই এটি মিথ্যা নয়। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের অনেক পার্থিব

সম্পদ এবং মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করা সত্ত্বেও প্রায়শই মনের শান্তি থেকে দূরে থাকে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন..."

যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা একাই সৃষ্টির রিযিক নির্ধারণ করেন, সেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্থিব জিনিস পাবে। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ যদি পার্থিব আশীর্বাদ পেতে চায় যা উভয় জগতে তাদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে ওঠে, তবে তাকে অবশ্যই শিক্ষা অনুসারে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামের, অন্যথায় তারা হয় তাদের প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ যেমন কর্তৃত্ব হারাবে, অথবা তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা ও ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে।

তাই এটা একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে চায় কি না, যেটি তারা যখন অর্জিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথবা একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বেছে নিতে পারেন, যা কেবলমাত্র উভয় জগতেই দুঃখ, সমস্যা এবং চাপের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পেতে বাধা দেবে যা মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যে বিকল্পটি বেছে নেবেন উভয় জগতেই তারা এর জন্য দায়বদ্ধ হবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"...এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

অতএব, তাদের নিজস্ব মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের স্বার্থে সঠিক বিকল্প এবং পথ বেছে নেওয়া বোধগম্য।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 246-251

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

“তুমি কি মূসার (আঃ) পরে বনী ইসরাঈলের সমাবেশের দিকে লক্ষ্য করনি যখন তারা তাদের একজন নবীকে বলেছিল, “আমাদের কাছে একজন রাজা পাঠাও, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব”? তিনি বললেন, "যদি তোমার জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হয় তাহলে তুমি কি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে?" তারা বলল, আর আমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না যখন আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তানদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি? অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হল, তখন তাদের কয়েকজন ব্যতীত তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।

আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের কাছে বাদশাহ হিসেবে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, কিভাবে সে আমাদের উপর রাজত্ব করবে অথচ আমরা তার চেয়ে বেশি রাজত্বের যোগ্য এবং তাকে কোন পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয়নি? তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাকে আপনার উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও মর্যাদায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার সার্বভৌমত্ব দান করেন। এবং আল্লাহ সর্বব্যাপী [অনুগ্রহে] এবং সর্বজ্ঞ।

এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই, তার রাজত্বের একটি নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই বুক আসবে যাতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা এবং মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গিয়েছিল, তার অবশিষ্টাংশ যা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

এবং যখন শৌল সৈন্যদের নিয়ে বের হলেন, তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে, সুতরাং যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, এবং যে তার স্বাদ গ্রহণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আমারই অন্তর্ভুক্ত, তবে যে গ্রহণ করে। তা থেকে] তার হাতের ফাঁকে।" অতঃপর তারা তা থেকে পান করেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া। অতঃপর যখন সে তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের সাথে তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, আজকে জালিয়াত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন শক্তি নেই। কিন্তু যারা নিশ্চিত ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে, তারা বলল, "আল্লাহর নির্দেশে কত ছোট কোম্পানি একটি বড় কোম্পানিকে জয় করেছে। এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।"

অতঃপর যখন তারা জালিয়াত ও তার সৈন্যদের সামনে গেল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করুন এবং আমাদের পা দৃঢ় করুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।

অতঃপর তারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের পরাজিত করে এবং দাউদ গলিয়াথকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা [অর্থাৎ নবুওয়াত] দান করেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন তা থেকে তাকে শিক্ষা দেন। আর যদি আল্লাহ অন্যদের দ্বারা

[কিছু] মানুষকে পরীক্ষা না করতেন, তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহের মালিক।"

আয়াত 246 এর শুরুতে একটি আত্ম-শোষিত মনোভাব এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেখানে কেউ কেবল তাদের নিজের জীবন এবং বিশেষ করে তাদের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 243:

" *তুমি কি ভেবে দেখনি..."*

যে এইভাবে আচরণ করে সে সাধারণ ইতিহাস, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং তাদের চারপাশের মানুষের অবস্থার মধ্যে পাওয়া পাঠগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। এই জিনিসগুলি থেকে শেখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি যা একজন ব্যক্তি তাদের আচরণকে উন্নত করতে পারে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারে যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি দেখেন যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তারা স্ট্রেস, মানসিক ব্যাধি, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় জর্জরিত হয়, যদিও তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করে এবং বিলাসিতা উপভোগ করে। এই বিশ্বের, পর্যবেক্ষককে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে শেখাবে এবং তারা নিশ্চিত হবে যে মনের শান্তি মিথ্যা নয়। অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী। অথবা যখন একজন ব্যক্তি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন এটি তাদের নিজের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে এবং এটি হারানোর আগে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করা উচিত। তাই, ইসলাম নিয়মিতভাবে মুসলমানদেরকে এমন লোকদের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণকারী মানুষ হতে উৎসাহিত করে যারা তাদের নিজেদের বিষয়ে নিমগ্ন থাকে যে তারা অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয় না। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 10:

"তারা কি দেশে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে?..."

যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কার অমুসলিমদের আগ্রাসন থেকে ইসলাম এবং নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছিল, মহান আল্লাহ আলোচনার মূল আয়াতগুলিতে যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কিছু উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতীতের ঘটনা। এই উদাহরণটি মদিনায় বসবাসকারী বইয়ের লোকদের অনেকের সমালোচনা হিসাবেও কাজ করেছিল যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা স্বীকার করেও জাগতিক লাভের জন্য ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উভয়ই তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 246:

" *তুমি কি মূসার (আঃ) পরে বনী ইসরাঈলের সমাবেশের দিকে লক্ষ্য করনি যখন তারা তাদের একজন নবীকে বলেছিল..."*

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আয়াতের পিছনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা থেকে একজন ব্যক্তিকে বিমুখ করা উচিত নয় যাতে তারা এই মহানবী (সা.)-এর পরিচয়ের মতো অপ্রাসঙ্গিক তথ্য গবেষণার জন্য তাদের শক্তি এবং সময় নষ্ট করে। যদি তার পরিচয় এই আয়াতের পাঠের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হত তবে মহান আল্লাহ তা উল্লেখ করতেন। একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াবে না, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 246:

" *তুমি কি মূসার (আঃ) পরে বনী ইসরাঈলের সমাবেশের কথা লক্ষ্য করনি যখন তারা তাদের একজন নবীকে বলেছিল, "আমাদের কাছে একজন রাজা পাঠাও..."*

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এই দলটিকে একজন মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত করা হয়েছিল, যিনি খোদায়ী নির্দেশিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন তথাপি তারা একজন পার্থিব রাজা পেতে চেয়েছিলেন। এটি ইঙ্গিত করে যে তারা এমন একজন নেতা পেতে আগ্রহী ছিল যিনি পার্থিব লাভের দিকে বেশি মনোযোগী হবেন, যেমন সম্পদ এবং ক্ষমতা, তারপর এমন একজন নেতা থাকতে হবে যিনি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সঠিক মানসিকতা আছে এমন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতা নির্বাচনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা করে সে সর্বদা তাদের মানুষের অধিকার পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে এবং তাদের সঠিক পথে চলতে উত্সাহিত করবে। এটি উভয় জগতের সকলের জন্য উপকৃত হবে। অথচ একজন পার্থিব ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনে আগ্রহী হবে এবং ফলস্বরূপ তারা জনগণের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হবে। বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদদের পর্যবেক্ষণ করলেই তা স্পষ্ট হয়।

একজন ব্যক্তি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করতে পারে বলেই মহান আল্লাহ তখন যুদ্ধ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 246:

" *তুমি কি মূসার (আঃ) পর বনী ইসরাঈলের সমাবেশের দিকে লক্ষ্য করনি যখন তারা তাদের একজন নবীকে বলেছিল, "আমাদের কাছে একজন রাজা পাঠাও,*

আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব"? তিনি বললেন, "যদি তোমার জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হয় তাহলে তুমি কি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে?" তারা বলল, আর আমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না যখন আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তানদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি? কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন তাদের কয়েকজন ছাড়া তারা মুখ ফিরিয়ে নিল...।"

অল্পবয়সী কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তারাও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তাই, মহান আল্লাহ তাদের কঠিন দায়িত্ব কামনা করার বিপদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 143:

"এবং আপনি অবশ্যই মৃত্যুর [অর্থাৎ শাহাদাতের] মুখোমুখি হওয়ার আগে কামনা করেছিলেন, এবং আপনি [এখন] এটি [আপনার সামনে] দেখতে পেয়েছিলেন।"

পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা এবং যদি তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের অবিচল থাকা উচিত। সহীহ বুখারী, 2966 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির নিজের এবং অন্যদের জন্য, বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জীবনকে কঠিন করে তোলা থেকে বিরত থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য যত বেশি চেষ্টা করবে, তত কম চাপের সম্মুখীন হবে। যদিও, যে এর চেয়ে বেশি চেষ্টা করে সে কেবল তাদের জীবনে চাপকে আমন্ত্রণ জানাবে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

উপরন্তু, এটি মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন ইসলামী আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে তা বেছে না নেওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে ইসলামকে একটি জামার মতো মনে করে, যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরতে এবং খুলে ফেলতে পারে। এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপাসনা করে, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে নিঃসন্দেহে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে, যদিও তারা মাঝে মাঝে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পেতে বাধা দেবে যার ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পরিবর্তে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 246:

"...কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তাদের কয়েকজন ছাড়া তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 247:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের কাছে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন।"...

যদিও বনী ইসরাঈলের এই দলটি তাদের নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বাদশাহ নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছিল, তখনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে হয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহই তালুতকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের রাজা হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একই আয়াতে এটিকে আবার পুনরুদ্ধার করেছেন, কারণ তিনি জানেন যে ইস্রায়েলের সন্তানরা তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি সম্মানের অভাব দেখায়। এই সম্মানের অভাব পবিত্র কুরআন জুড়ে তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 67:

"এবং [স্মরণ করুন] যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করেন? তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এবং অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 5:

"আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমার ক্ষতি করছ অথচ তোমরা নিশ্চিত জানো যে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল?"...

একজন মুসলমান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে পারে, যখন তারা মৌখিকভাবে তাকে ভালবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে, তবুও তারা তাঁর জীবন ও শিক্ষাগুলি শিখতে এবং আমল করতে ব্যর্থ হয়। কাউকে ভালবাসা এবং সম্মান করার দাবি করা তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে এবং তাদের বিরোধিতা করা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং এমন কিছু যা প্রতিটি মুসলিম উভয় জগতেই উত্তর দেবে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 63:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে রসূলের ডাককে একে অপরের ডাকের মতন করো না। আল্লাহ ইতিমধ্যেই জানেন যে তোমাদের মধ্যে যারা অন্যের দ্বারা লুকিয়ে চলে যায়। সুতরাং যারা তাঁর [অর্থাৎ, নবীর] আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সাবধান হওয়া উচিত, পাছে তাদের উপর কোন বিপর্যয় নেমে আসে বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না হয়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 247:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের কাছে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন।" তারা বললো, "তাঁর কি করে আমাদের উপর রাজত্ব থাকবে যখন আমরা তার চেয়ে বেশি রাজত্বের যোগ্য..."

তাদের উত্তরে একজন জাগতিক রাজা চাওয়ার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। তারা আশা করেছিল যে তাদের মধ্যে একজন, ইস্রায়েলের সন্তানদের সিনিয়র সদস্যদের তাদের রাজা হিসাবে নির্বাচিত করা হবে এবং তিনি কেবল রাজনীতিবিদদের মতো সাধারণ জনগণকে উপেক্ষা করে তাদের সমাজের অন্যান্য নেতাদের স্বার্থ বিবেচনা করবেন। আজকের

এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে নেতৃত্ব এবং অতিরিক্ত সম্পদ কামনা করা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে সহজেই ধ্বংস করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা মানুষের ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। ভেড়ার পাল মুক্ত করা হয় । এর কারণ এই যে যে এই জিনিসগুলি কামনা করে সে তাদের অর্জনের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করবে। তারা আল্লাহকে অমান্য করবে, তাদের পাওয়ার সময় এবং তাদের আঁকড়ে ধরে থাকবে, কারণ মহান আল্লাহকে অমান্য করা ছাড়া নেতৃত্ব এবং অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যায় না, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে। এই জিনিসগুলি যত বেশি কামনা করবে, তত বেশি সে মহান আল্লাহকে অমান্য করবে এবং অন্যদের উপর জুলুম করবে। এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন কেউ ইতিহাস দেখেন এবং নেতৃত্ব ও সম্পদ অর্জনের জন্য লোকেরা কতটা দীর্ঘ সময় গিয়েছিল, যেমন নিরপরাধ মানুষ হত্যা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব অনুযায়ী বৈধ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং যদি তারা নেতৃত্বে নিযুক্ত হন, তাহলে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তা ব্যবহার করতে হবে, যাতে এটি তাদের এবং উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে ওঠে। পৃথিবী অন্যথায়, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, সম্পদ এবং নেতৃত্বের অপব্যবহার শুধুমাত্র উভয় জগতের বাহকদের জন্য চাপ, সমস্যা এবং অসুবিধার নেতৃত্ব দেবে, যদিও এটি তাদের বা অন্যদের কাছে স্পষ্ট নয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 247:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের কাছে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন।" তারা বলল, "তার আমাদের উপর রাজত্ব কিভাবে হবে যখন আমরা তার চেয়ে বেশি রাজত্বের যোগ্য এবং তাকে কোন পরিমাপ ধন-সম্পদ দেওয়া হয়নি?"...

দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম একই মনোভাব গ্রহণ করেছে যেখানে তারা সম্পদের মতো পার্থিব মান অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা বিচার করে। ইসলাম মানুষের মর্যাদা একটি একক ফ্যাক্টর অনুযায়ী বিচার করে, যথা, তাকওয়া। অর্থ, পবিত্র কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা যত বেশি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, তার মর্যাদা তত বেশি হবে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য লুকানো থাকায়, তাদের বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তি করে নিজেকে বা অন্যকে শ্রেষ্ঠ বলে বিচার করা উচিত নয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"...সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া শুধুমাত্র মানুষের বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যান্য সমস্ত জাগতিক মান, যেমন লিঙ্গ, জাতিগত বা সামাজিক মর্যাদা উপেক্ষা করতে হবে এবং এর পরিবর্তে তাকওয়ার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উত্সাহিত করতে হবে। আলোচ্য প্রধান আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কারণ তাকওয়ার মূল হচ্ছে জ্ঞান। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"...শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 247:

"...তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও মর্যাদায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন..."

উচ্চতা তার উত্তম চরিত্রকে নির্দেশ করতে পারে, যা তাকওয়ার বাহ্যিক প্রকাশ। উত্তম চরিত্র অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞানে আলোচিত ভালো বৈশিষ্ট্য যেমন উদারতা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা শেখে এবং গ্রহণ করে এবং ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন লোভ, অহংকার এবং অকৃতজ্ঞতা পরিত্যাগ করে।

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং এর মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, মহান আল্লাহ তাকে উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, কারণ তিনি ভাল জানেন যে তারা এর প্রাপ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 247:

"...আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার সার্বভৌমত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী [অনুগ্রহে] এবং সর্বজ্ঞ।"

উপরন্তু, এটি মুসলমানদেরকে অন্য লোকেদের হিংসা এড়াতে স্মরণ করিয়ে দেয় যাদেরকে নির্দিষ্ট পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে। হিংসা একটি বড় পাপ যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি বড় পাপ কারণ হিংসাকারী সরাসরি মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ নিয়ামত দান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে মৌখিক এবং শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয় যার বিরুদ্ধে তারা হিংসা করে সে কেবল তাদের নিজের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ ঈর্ষা হল যখন কেউ অন্য কারো প্রতি অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যা তাকে দেওয়া হয়েছে তা না হারিয়ে। যদিও এই প্রকারটি বৈধ, তথাপি তা কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে দোষারোপযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম,

1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ এবং প্রশংসনীয় ঈর্ষার উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায় তাকে হিংসা করতে পারে। অন্য ব্যক্তি হিংসা করতে পারে সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে।

একজনকে অবশ্যই হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে যে এটি একটি বড় পাপ যা মহান আল্লাহর বন্টন পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এটি আরও আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করা কেবলমাত্র একজন মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যাওয়ার কারণ হবে, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যে মুসলমান ঈর্ষান্বিত হয় তাকে অবশ্যই তাদের হিংসাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র ইসলামের সীমার মধ্যে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের মধ্যে একজনের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা জড়িত, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এভাবেই কেউ তাদের হিংসা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অধ্যায় 113 আল ফালাক, আয়াত 1 এবং 5:

"বলুন, আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই... এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

মহান আল্লাহ তখন তাদেরকে তাদের ঈর্ষার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, যেমন মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন এবং মানুষের খুব সীমিত চিন্তাধারা অনুযায়ী নয়। .

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 247:

"...আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার সার্বভৌমত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী [অনুগ্রহে] এবং সর্বজ্ঞ।"

এটি তাদেরকেও সতর্ক করে যে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যেহেতু সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত, তাই যদি তারা তাদের দেওয়া নেতৃত্বের অপব্যবহার করতে চান তবে তিনি উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। অতএব, একজনকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। যদি তারা তাদের অপব্যবহার করতে পছন্দ করে, তাহলে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ এবং দুঃখের উৎস হয়ে উঠবে। এটা খুবই স্পষ্ট হয় যদি কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ যেমন নেতৃত্বের অপব্যবহার করেছে।

যদিও তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার লোকদের কাছে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল না যে সঠিক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেমন তাদের উচিত ছিল বিনা প্রশ্নে তার আনুগত্য করা, তবুও মহান আল্লাহ তাদের একটি নিদর্শন দিয়েছেন। তাদের বোঝাতে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য তাদের অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করতে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 248:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই, তার রাজত্বের একটি নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই বুক আসবে যাতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা এবং মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গিয়েছিল, তার একটি অবশিষ্টাংশ বহন করে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ, সমস্ত বিভিন্ন জাতিকে অনেক অলৌকিকতা দান করেছেন কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিকতা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, একজন মুসলমানের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে বিনোদনমূলক গল্প অনুসন্ধান করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা উচিত, যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিকতার লক্ষ্য ছিল। এটা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে ও অধ্যয়ন করে এবং তাতে আলোচিত সুস্পষ্ট প্রমাণের প্রশংসা করে। আয়াত 248 এর শেষে নির্দেশিত হিসাবে, এটি তাদের প্রকৃত এবং দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণে সহায়তা করবে। দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে যে দুর্বল ঈমান গ্রহণ করে, সে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না, যেমন কঠিন সময়ে, এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। মঞ্জুর করা হয়েছে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেয়।

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বিনোদনমূলক এবং অলৌকিক কাহিনী অনুসন্ধান করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার পরিবর্তে সমস্ত অলৌকিক কাজের লক্ষ্য অন্বেষণ করতে হবে যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা। যে ব্যক্তি এইভাবে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে, তাকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যকে আরও দৃঢ় করার জন্য অধ্যয়ন, শোনা বা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন হবে না। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার দৃঢ় বিশ্বাসের চেষ্টা করেছিলেন।

উপরন্তু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত যে কোন অলৌকিক ঘটনা সময়ের দ্বারা সীমিত ছিল। শুধুমাত্র যারা এটি প্রত্যক্ষ করেছে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে। পক্ষান্তরে, যারা তাদের সম্পর্কে গল্প শুনে তারা কেবল তাদের দ্বারা বিস্মিত হয় যখন এটি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায় না। অন্যদিকে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি হল চিরকালের অলৌকিক ঘটনা যা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে এবং তাই একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার সম্ভাবনা বেশি যাতে তারা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহর আনুগত্য, যখন কেউ এটি শিখে এবং খোলা মন নিয়ে কাজ করে।

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্‌ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 248:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই, তার রাজত্বের একটি নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই বুক আসবে যাতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা এবং মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গিয়েছিল, তার একটি অবশিষ্টাংশ বহন করে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরা প্রায়শই পবিত্র জিনিস, স্থান এবং দিনগুলিকে সম্মান করতে পারে তবে প্রায়শই অন্যান্য জিনিসগুলিকে উপেক্ষা করে যা মহান আল্লাহ পবিত্র করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 67 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান পবিত্র। এই হাদিসটি সর্বোত্তমভাবে পরিপূর্ণ হয় যখন কেউ অন্যদের এবং তাদের সম্পত্তির সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরাই অন্য লোকেদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। জামে আত তিরমিযী, 2032 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদের পবিত্রতাকে সম্মান করা আল্লাহর ঘর, মহান, কাবার পবিত্রতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত জিনিসকে সম্মান ও সম্মান করতে হবে। যাকে মহান আল্লাহ তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাছাই ও বেছে নেওয়ার পরিবর্তে পবিত্র করেছেন, কারণ তিনি তাদের মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করবেন এবং আচরণ

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 248:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই, তার রাজত্বের একটি নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই বুক আসবে যাতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা এবং মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গিয়েছিল, তার একটি অবশিষ্টাংশ বহন করে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞানের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি, যেমন এই বুকের ভিতরে ঠিক কী ছিল গবেষণায় নিজের শক্তি এবং সময় নষ্ট না করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা গুরুত্বপূর্ণ হলে মহান আল্লাহ তায়ালা আলোচনা করতেন। বিচার দিবসে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হবে সেসব বিষয়ের গবেষণা ও অধ্যয়ন করার জন্য একজন ব্যক্তিকে চেষ্টা করতে হবে যাতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং অন্য সব ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বিরত থাকে।

মহান আল্লাহ তারপর একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি সাধারণ নীতি নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 249:

"এবং যখন শৌল সৈন্যদের নিয়ে বের হলেন, তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে, সুতরাং যে কেউ তা থেকে পান করবে

সে আমার দলভুক্ত নয়, এবং যে পান করবে না সে প্রকৃতপক্ষে আমারই হবে, কেবলমাত্র একজন ছাড়া [এটা থেকে] তার হাতের ফাঁকে।" কিন্তু তারা তা থেকে পান করেছিল, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া..."

এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ঐশ্বরিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে কিনা। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

সঠিক উপায়ে কাজ করা প্রায়শই একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, যা জীবনের পরীক্ষাকে একটি বাস্তব পরীক্ষা করে তোলে, যেমন 249 নম্বর আয়াতে উল্লিখিত পরীক্ষা। এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। তাদের নিজেদের স্বার্থে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ যেমন মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মতো সবকিছুই জানেন, তিনি একাই মানবজাতির একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি সরবরাহ করতে পারেন, যা পালা উভয় জগতের মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, তাঁর পরামর্শ, আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, যেমন একজন ডাক্তারের খাদ্য উপদেশ এবং চিকিত্সা পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে যদি কেউ মানসিক ও দেহের শান্তি পেতে চায়। কিন্তু একজন রোগী যেমন তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে,

তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং এর ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যদিও সে মজা ও বিনোদনের মুহূর্তগুলো অনুভব করে। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 249:

"এবং যখন শৌল সৈন্যদের নিয়ে বের হলেন, তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে, সুতরাং যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, এবং যে পান করবে না সে প্রকৃতপক্ষে আমারই হবে, কেবলমাত্র একজন ছাড়া [এটা থেকে] তার হাতের ফাঁকে।" কিন্তু তারা তা থেকে পান করেছিল, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া..."

উপরন্তু, এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত একজন নেতার পদাঙ্কে আন্তরিকভাবে এবং কার্যত অনুসরণ করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এই যুগে এবং শেষ সময় পর্যন্ত এই নেতা হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা কিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসা ও সম্মান করার দাবি করে এবং পরকালে তাঁর সাথে যোগদান করতে চায়, তবুও তাঁর জীবন ও শিক্ষার উপর শিখতে এবং আমল করতে অস্বীকার করে। সত্য হল যে তাকে ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করে সে তাকে সম্মান বা ভালবাসে না এবং পরকালেও তার সাথে শেষ হবে না। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কার্যত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষেত্রে এত কঠোর ছিলেন যে তারা তাঁকে ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন এবং পরকালে তাঁর সাথেই থাকতে চেয়েছিলেন। সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিস দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানানো উচিত নয়, যেটি পরামর্শ দেয় যে তারা পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে। সত্যিকারের ভালোবাসা কথায় নয়, কাজে দেখানো হয়। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ সাহাবায়ে কেরামকে দেখেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তারা কিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করেছেন, বাস্তবিকভাবে অনুসরণ করে। উপরন্তু, এমনকি অন্যান্য জাতিও দাবি করে যে তারা তাদের নবী (সাঃ) কে ভালবাসে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা আখেরাতে তাদের সাথে যোগ দেবে না কারণ তারা বাস্তবে তাদের অনুসরণ করেনি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 249:

"... অতঃপর যখন তিনি তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের সাথে এটি অতিক্রম করলেন, তারা বলল, "আজকে গোলিয়াথ ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন শক্তি নেই।" কিন্তু যারা নিশ্চিত ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তারা

বলেছিল, "আল্লাহর নির্দেশে কত ছোট কোম্পানি একটি বড় কোম্পানিকে জয় করেছে..."

এটি ঈমানের নিশ্চিততার গুরুত্ব নির্দেশ করে। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যারা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। এই আনুগত্যের সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। ঈমানের নিশ্চিততা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামের সত্যতা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্বকে সমর্থনকারী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যেগুলো পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তার উপর হতে এই শিক্ষাগুলি স্পষ্ট করে যে, যিনি মহান আল্লাহকে মান্য করেন, তিনি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করবেন, কারণ তিনি একাই আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানসিক ও শারীরিক সম্পর্কে তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে এই ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস। একজন ডাক্তারের যেমন সুস্বাস্থ্যের জ্ঞান রয়েছে, তেমনি মহান আল্লাহ একাই জ্ঞানের অধিকারী যে একজন ব্যক্তিকে কীভাবে তাদের জীবনের সমস্ত দিকগুলিতে কাজ করতে হবে উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি অর্জনের জন্য। যেখানে, আয়াত 249 দ্বারা নির্দেশিত, যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী তারা সর্বাবস্থায়, বিশেষ করে কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে।

উপরন্তু, বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজনকে সর্বদা স্মরণ করতে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য এবং তাদের অনিবার্য জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুত করার অনুমতি দেয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 249:

"...কিন্তু যারা নিশ্চিত ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তারা বলেছিল, "আল্লাহর নির্দেশে কত ছোট কোম্পানি একটি বড় কোম্পানিকে জয় করেছে..."

বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজনকে বুঝতে উত্সাহিত করে যে সমস্ত কিছুর ফলাফল একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়। এবং যারা তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকে তাদের জন্য তিনি একটি সফল ফলাফলের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ কারও ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। মানুষের জন্য প্রদত্ত পথ হল তাঁর সময়সূচী, অসীম প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান, যা সর্বদা জড়িতদের সর্বোত্তম স্বার্থ অনুসারে হবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা ঈমানের দৃঢ়তার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা হল ধৈর্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 249:

"...কিন্তু যারা নিশ্চিত ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তারা বলল, "আল্লাহর নির্দেশে কত ছোট দল একটি বড় কোম্পানিকে জয় করেছে। এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।" অতঃপর যখন তারা জালিয়াত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করুন এবং আমাদের পা দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন।"

ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে যায় এবং তাদের অগ্নিপরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা। একজন ব্যক্তি যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, ততই তারা বুঝতে পারবে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার সবকিছুই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে প্রজ্ঞা। তাদের কাছ থেকে লুকানো। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী, যিনি তার ভাইদের দ্বারা অল্প বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্ধকার ও গভীর কূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, একটি শিশু ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা শিখতে দেয় যা তাকে মিশরের জনসংখ্যাকে একটি বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত

করে। তিনি যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সহ্য না করলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই প্রজ্ঞাগুলিতে বিশ্বাস করা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, তাই একজন ব্যক্তির ঈমানের অংশ। মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর প্রশংসা করা সহজ কিন্তু আসল পরীক্ষা হল যখন কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তারপরও তাঁর আনুগত্য করে এবং প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকে তাদের অসুবিধাগুলিকে অন্যান্য লোকেদের সাথে তুলনা করতে সাহায্য করে, যারা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং আরও বেশি অসুবিধা সহ্য করেছিল। এই তুলনা একজনকে তাদের নিজেদের অসুবিধাকে ছোট করতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্য লোকেদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ইসলামিক শিক্ষাগুলি একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব এবং কীভাবে তাদের জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হবে তা বোঝার অনুমতি দেয়, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক

বা অসুবিধা, অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু সম্পর্কে অভিযোগ করলে কোন উপকার হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত পুরষ্কারটি হারাবেন যা তারা অনাকাঙ্ক্ষিত অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে রেখে পেতে পারে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

একজন ব্যক্তির তাই ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং একটি অগণিত পুরষ্কার অর্জন বা অধৈর্যতার সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের প্রাপ্ত পুরস্কার হারানোর মধ্যে একটি বিকল্প রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে উপকার লাভ করা বোধগম্য। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকেও বুঝতে পারে যে তারা এই পৃথিবীতে যে জিনিসগুলি কামনা করে তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চায় যে এটি তাদের জন্য সেরা, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য খারাপ, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে তারা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম অধৈর্য হবেন যা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, কারণ তারা বোঝে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

এছাড়াও, তাপের মাধ্যমে সোনা যেমন বিশুদ্ধ হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে মানসিক শক্তি লাভ করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা প্রায়ই মানসম্মত এবং এমনকি ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় মানসিক ভাঙ্গন অনুভব করে, যেমন বিবাহের সমস্যা। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করে দেন যাতে তারা সহজেই ভবিষ্যতের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

ইসলাম যেমন শিক্ষা দিয়েছে, সব পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও ধৈর্যের প্রয়োজন। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে

যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যেমন সুস্বাস্থ্য বা তাদের বেতন বৃদ্ধি।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের অধ্যয়ন করা, শেখা এবং তাদের উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার লাভ করে। একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

ধৈর্যের মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যে তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামী থেকে আলাদা হওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ দেখানো যেভাবেই হোক ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যেমন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার দুঃখের জন্য এত বেশি কান্নাকাটি করেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরও মহান আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা করেননি। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 84:

" এবং তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গেলেন এবং বললেন, "ওহ, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ," এবং তার চোখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন একজন দমনকারী।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (আঃ) এর মৃত্যুর মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা দেখানো ধৈর্যের পরিপন্থী, এটি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্না করা এবং দুঃখ বোধ করা। .

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কষ্টের শুরু থেকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 1302 নং একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য প্রদর্শন করা প্রকৃত ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সবার সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে তাদের কথাবার্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় রাখে, কারণ অধৈর্যতা প্রদর্শন করে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে। লাইন

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 250:

" এবং যখন তারা জালিয়াত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করুন এবং আমাদের পা দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন।"

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ও দৃঢ় থাকার সাথে বিজয় আসে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

সাহাবায়ে কেরামের মত মুসলিমরা আজ বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে না থাকলে, এর কারণ হল প্রকৃত আকীদার শর্ত পূরণ হয়নি। তাই মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সংশোধন করা জড়িত, যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে। এর ফলে উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হয়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার

দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 251:

"অতএব তারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের পরাজিত করে এবং দাউদ গোলিয়াথকে হত্যা করে..."

যে সমস্ত মুসলিমরা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে তাদের বিজয় নিশ্চিত করা হবে, সময়সূচী অনুযায়ী হবে, মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতএব, কখনও কখনও, এই বিজয় মুসলমানদের কাছে বিলম্বিত হতে পারে বা স্পষ্ট নয়, এটি নিজেই আরেকটি পরীক্ষা যা মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 251:

“অতএব তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের পরাজিত করেছিল এবং ডেভিড গোলিয়াথকে হত্যা করেছিল এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেছিলেন তা থেকে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ...”

এটি ইঙ্গিত দেয় যে উভয় জগতে পুরস্কার ও আশীর্বাদ, যেমন উপকারী জ্ঞান, তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে। মানুষ যেমন সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে বস্তুজগতে সাফল্য অর্জন করে, তেমনি একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করতে পারে, যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়, যখন সে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, ঠিক তেমনি। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম করেছিলেন। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, কেউ যদি মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে সফলতা দান করেন তা থেকে উপকৃত হতে চাইলে তাদের অবশ্যই হযরত দাউদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের পার্থিব সাফল্য যেমন নেতৃত্ব ব্যবহার করতে হবে। , সঠিকভাবে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী। অন্যথায়, তাদেরকে যে পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটি সুস্পষ্ট যখন কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছে, যেমন নেতৃত্ব, এবং আয়াত 251 এর শেষ অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 251:

"...আর যদি আল্লাহ অন্যদের মাধ্যমে [কিছু] মানুষকে পরীক্ষা না করতেন, তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহের মালিক।"

যখন লোকেরা তাদের প্রদত্ত নিয়ামত যেমন কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে, তখন তারা দেশে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে এবং এর ফলে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে দেশ থেকে এই দুর্নীতি দূর করতে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মহান আল্লাহর আনুগত্য। তাদের অবশ্যই সামাজিক প্রভাব এবং সম্পদের মতো তাদের দেওয়া সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। উপরন্তু, এই আয়াতটি মানুষকে সতর্ক করে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তাদের দেওয়া হয়েছে, যেমন কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করার জন্য, অন্যথায় এই পার্থিব আশীর্বাদগুলি তাদের কাছ থেকে শীঘ্রই বা পরে মুছে ফেলা হবে। কিন্তু আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে এটি মোটেও ঘটবে না কারণ এটি অবিলম্বে এবং মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে না। যে শাস্তি বিলম্বিত হয় তা কোন শাস্তির সমান নয়। তাই একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশের সদ্ব্যবহার করতে হবে, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সংশোধন করার জন্য যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 45:

"এবং আমি তাদের সময় দেব। প্রকৃতপক্ষে, আমার পরিকল্পনা দৃঢ়।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অকপট অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 251:

"...আর যদি আল্লাহ অন্যদের মাধ্যমে [কিছু] মানুষকে পরীক্ষা না করতেন, তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহের মালিক।"

এটি মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মৃদুভাবে ভালোর আদেশ এবং মন্দকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব শেখায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

" তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার পূর্বে একজনকে অবশ্যই সঠিক চরিত্র অবলম্বন করতে হবে এবং সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে অন্যথায় তারা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তির অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি জিনিস প্রয়োজন যা ভালো মানুষদের কিছুই করার নেই। একটি পচা আপেল যেমন অন্য ভালো আপেলকে সংক্রমিত করবে, তেমনি মানুষের খারাপ আচরণও

বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করবে। এটি তখন ঘটে যখন সমাজের মধ্যে মন্দ স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং তারপরে বৃহত্তর সমাজ একই পাপ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে শুরু করে। যে সমাজ ভালোর নির্দেশ দিতে এবং মন্দকে নিষেধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এমন কোনো সমাজের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এটা খুবই স্পষ্ট। এমনকি যদি বৃহত্তর সমাজকে উপদেশ দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে, যেমন অন্যের ক্ষতির ভয়ে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের আশ্রিত ব্যক্তিদের ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে, কারণ এটি সুনানে আবু দাউদে পাওয়া হাদিস অনুসারে তাদের উপর একটি কর্তব্য। সংখ্যা 2928. শুধুমাত্র যখন কেউ ভাল আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে তখনই তারা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজগুলিকে উপেক্ষা করে, তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে। এটি সহীহ বুখারী, 2686 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। দুই স্তরের মানুষ পূর্ণ। নীচের ডেকের লোকেরা নীচের ডেকে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে তারা উপরের ডেকের লোকদের বিরক্ত না করে সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে

পারে। কিন্তু উপরের ডেকের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সবাই ডুবে যাবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 252-254

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমরা উদ্দেশ্য করে পাঠ করি, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], সত্যে। আর নিঃসন্দেহে তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

সেই রসূল-তাদের কাউকে আমি অন্যদেরকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকে তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাকে পবিত্র রূহ [জিব্রাইল] দ্বারা সমর্থন দিয়েছিলাম। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের পরবর্তী [প্রজন্ম] তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছিল এবং কেউ অবিশ্বাস করেছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না, কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এমন একটি দিন আসার আগে যেদিন কোন বিনিময় নেই এবং কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর কাফেররা - তারাই জালেম।"

মহান আল্লাহর আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতা যেন বুঝতে পারে এবং এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 252:

"এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমরা আপনার কাছে পাঠ করি, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উদ্দেশ্যমূলকভাবে..."

এবং গ অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে যে আশীর্বাদগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কি না তা এই পরীক্ষায় জড়িত। যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবেন, কারণ তারা প্রত্যেককে এবং তাদের জীবনের সমস্ত কিছুকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, সে ভারসাম্যপূর্ণ ও মানসিক অবস্থা লাভ করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ, তারা ইহকাল বা পরকাল উভয়েই মানসিক শান্তি পাবে না। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সব বিষয়েই জ্ঞান রাখেন, তাই তিনি একাই

মানবজাতিকে একটি আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, যেহেতু মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণে, মানবসৃষ্ট আচরণবিধি মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। একজন ডাক্তারের যেমন ওষুধ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকে, তেমনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহই একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরামর্শ দিতে পারেন যাতে তারা মানসিক শান্তি লাভ করে। তাই, মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনেও তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 252:

"এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমরা আপনার কাছে পাঠ করি, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উদ্দেশ্যমূলকভাবে..."

উপরন্তু, এটা স্পষ্ট যে, তারা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক পূরণ করতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার জন্য পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে না। প্রথমটি হল নিয়মিত এবং সঠিকভাবে এটি পাঠ করা, দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলি বোঝার চেষ্টা করা এবং শেষ দিকটি হল এর শিক্ষার উপর আমল করা, যাতে কেউ তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। দুঃখের বিষয়, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক পালনে ব্যর্থ হওয়া একটি প্রধান কারণ, যে মুসলমানরা ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা পালন করে, তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না, কারণ তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। তাই মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনকে বোঝা এবং তার উপর আমল করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে একই কাজ করতে শেখানো

এবং প্রথম দিক থেকে বিরত থাকা এড়ানো অত্যাবশ্যক, যেখানে তারা পবিত্র কুরআন এমন ভাষায় পাঠ করে যা তারা বোঝে না।

মহান আল্লাহ অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেন এবং একই সাথে মক্কার অমুসলিমদের এবং মদিনায় বসবাসকারী কিতাবের আলেমদের তাঁর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যানের জন্য সমালোচনা করেন, যদিও তারা উভয়ই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 252:

"...এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।"

মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত ঘোষণার ৪০ বছর আগে থেকে জানত এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে তিনি বিশ্বস্ত ও সৎ ছাড়া আর কিছুই নন। তারা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং পবিত্র কুরআন কোন প্রাণীর কাছ থেকে আসেনি তা ভালোভাবে জানতেন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এবং কিতাবের পণ্ডিতগণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেমন উভয়ই তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু, তাদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিলেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যবাদী ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকারী পাঠ পাঠ করছিলেন যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি অধ্যয়ন করেননি, যা কিতাবধারী এবং অধ্যয়নকারী উভয়ই। -মক্কার মুসলমানরা পূর্ণরূপে জানত, এটি ছিল তাঁর নবুওয়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

যদিও মক্কার অমুসলিম এবং কিতাব উভয়ের কাছেই সত্যটি স্পষ্ট ছিল তথাপি তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের ক্ষতি ও বিরোধিতা করে চলেছেন। সব কারণ তারা তাদের বানোয়াট জীবনধারা এবং আচরণবিধি ত্যাগ করতে চায়নি যা তাদেরকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 87:

"...কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই একজন রসূল তোমার কাছে এসেছে, [হে বনী ইসরাঈল], তোমার আত্মা যা কামনা করেনি, তুমি অহংকার করেছিলে? আর একটি দলকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছিলে।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যদিও তারা মৌখিকভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত গ্রহণ করে থাকে। এটি ঘটতে পারে যখন কেউ তার জীবন এবং শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা কেবল তাঁর পরিবর্তে অন্য পথ অবলম্বন করবে। বিভ্রান্তির একটি পথ যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, কারণ তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত হবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে পরকালেও তার সাথে যোগদান করা থেকে বিরত থাকবে। এটা বোঝা যৌক্তিক যে যদি কেউ তার ব্যতীত জীবনে অন্য পথ নেয় তবে তারা একই গন্তব্যে তার সাথে একত্রিত হবে না। সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিস দ্বারা একজন ব্যক্তিকে প্রতারিত করা উচিত নয়, যেটি পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে তারা ভালোবাসে তাদের সাথে শেষ হবে। কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা দেখানো হয়। এটা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাকে কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। উপরন্তু, এমনকি পূর্ববর্তী জাতি তাদের নবী (সাঃ) কে ভালবাসার দাবি করে, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরকালে তারা তাদের সাথে একত্রিত হবে না। কাজেই বাস্তবিকভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করতে হবে, তাঁর চরিত্র ও আচার-আচরণ অবলম্বন করে যদি তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য কামনা করে এবং পরকালে তাঁর সাথে একত্রিত হতে চায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যদিও মহান আল্লাহ তায়ালা কিছু নবীকে অন্যদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তবুও তারা একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে বিভেদ না করে মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

“সেই রসূল- তাদের কাউকে আমি অন্যদের উপর ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকে তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ জিবরাঈল] দিয়ে সাহায্য করেছি..."

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একই মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তারা একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিম এই মনোভাব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পরিবর্তে, একে অপরের প্রতি হিংসা এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা থেকে, তারা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যার ফলে মুসলিম জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 53:

"কিন্তু তারা [অর্থাৎ, জনগণ] তাদের ধর্মকে তাদের মধ্যে ভাগে ভাগ করেছে [অর্থাৎ, সম্প্রদায়] - প্রতিটি দল, যা আছে তাতে আনন্দ করছে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 213:

"মানবজাতি [তাদের বিচ্যুতির আগে] এক ধর্ম ছিল; অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। আর কেউই এ বিষয়ে মতভেদ করেনি [অর্থাৎ, কিতাব] ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল - তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর - নিজেদের মধ্যে ঈর্ষান্বিত শত্রুতার কারণে ..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিংসা একটি বড় পাপ কারণ এটি সরাসরি আশীর্বাদ বিতরণকে চ্যালেঞ্জ করে যা মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল। একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন মহান আল্লাহ তায়ালা অন্য কাউকে দেওয়ার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদ প্রদানে ভুল করেছেন। একজন হিংসুক ব্যক্তিকে কখনই তাদের হিংসাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া উচিত নয় যাতে তারা অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ অপসারণ করার চেষ্টা করে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এটি তাদের অধিকার পূরণে বাধা দেয় না। পরিবর্তে, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম দান করেন। অতএব, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে

তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। যদিও, তাদের হিংসা-বিদ্বেষের উপর কাজ করা তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

"সেই রসূল- তাদের কাউকে আমি অন্যদের উপর ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকে তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেছেন..."

এই আয়াতগুলি অন্যান্য সকল নবীদের উপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বেরও ইঙ্গিত দেয়। এটি আরও অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বর্গীয় যাত্রার সময় আল বুরাক নামক একটি সাদা জন্তুকে আনা হয়েছিল পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চড়ার জন্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তারপর রওনা হলেন। অবশেষে তারা মসজিদুল আকসায় পৌঁছে যেখানে সকল নবী (সাঃ) সমবেত ছিলেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সকলকে নামাযের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, তেমনি তাঁর উম্মতকে অন্যান্য সকল উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি যা মানবজাতির [কল্যাণের জন্য] উৎপন্ন হয়েছে। তুমি সৎ কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়কে নিষেধ কর..."

তাই মুসলিম জাতিকে মানবজাতির কল্যাণে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তাদের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এটা তখনই অর্জিত হয় যখন তারা বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। এটা অর্জিত হয় যখন তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে। দুঃখের বিষয়, যত মুসলমান ইসলামি শিক্ষাগুলো শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয় তারা বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। এটি অমুসলিম এবং দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী অন্যান্য মুসলিমদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন রাজার দূত যেমন বাদশাহকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য শাস্তি পাবে, তেমনি ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপনকারী মুসলিমও শাস্তি পাবে। অতএব, সমস্ত মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের দূত হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ এই দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি দায়িত্ব যা ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

"...আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ, জিব্রাইল] দিয়ে সমর্থন করেছি..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিস্তারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তিনি যে সমস্ত অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর আসমানে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 47:

"তিনি [মারিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, "হে আমার প্রভু, আমার সন্তান হবে কিভাবে যখন কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি?" [ফেরেশতা] বললেন, "তিনিই আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার মানে এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 59:

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাকে বললেন, "হও" এবং সে হল।

এটা আশ্চর্যের বিষয় যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে মহানবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করার অধিকার বেশি, তবুও তারা এ দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ) এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করলেও হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেন না তা অদ্ভুত।

মহানবী ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক ঘটনা পবিত্র কুরআন দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট করে যে, মহানবী ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি ও আদেশে এই সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তাঁর মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হতো না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 49:

“এবং [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] বনী ইসরাঈলের জন্য একজন রসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। যা] পাখির মত, তারপর আমি তাতে শ্বাস নিই এবং আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধকে [জন্ম থেকে] এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি -

আল্লাহর হুকুমে। এবং আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনি কী খান এবং আপনি আপনার বাড়িতে কী সংরক্ষণ করেন..."

জীবিত অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে আরোহণ আরও ইঙ্গিত করে যে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাকে, যেভাবে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি ঐশ্বরিক হতেন তবে তিনি নিজের সহজাত শক্তি দিয়ে এ যাত্রা করতে পারতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 55:

"[উল্লেখ করুন] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠাব এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে মুক্ত করব..."

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে হযরত ঈসা (আঃ) কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশের উপর যাঁর ছবি দেখা গিয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) নন, বরং তাঁকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এই সময়ের মধ্যেই হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানের দিকে উঠিয়েছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 156-158:

"এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যের জন্য একটি বড় অপবাদ। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।" এবং তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশে চড়াওনি;

কিন্তু [অন্যকে] তাদের সাথে তার সাদৃশ্য করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া অর্থ, নিহত হওয়া, নিজের মধ্যেই অদ্ভুত কারণ একজন সত্যিকারের ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে। যদি একটি সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। সুতরাং বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবগতভাবে একটি ঐশ্বরিক সত্তা হল এমন কিছু যা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ, তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন নেই। যদি একটি সত্তা অন্যের দ্বারা টিকিয়ে রাখে তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। মহানবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়েই স্বর্গীয় জীব ছিলেন না কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা স্বনির্ভর সত্তা ছিলেন না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 75:

“মসীহ, মরিয়ম পুত্র, একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; [অন্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর তার মা ছিলেন সত্যের সমর্থক। তারা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি তাদের কাছে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তারপর দেখুন তারা কিভাবে প্রতারিত হয়।"

উপরন্তু, কেউ দাবি করতে পারে না যে ফেরেশতারা খায় না বলে তারা ঈশ্বর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাস্তবে, তারাও মহান আল্লাহ তায়ালা ভিন্নভাবে টিকিয়ে রেখেছেন তাই তারাও স্বাবলম্বী নয়। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাকি সৃষ্টির মতোই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করবে, এটাই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একটি জৈবিক শিশু সবসময় তাদের পিতামাতার সাথে কিছু বৈশিষ্ট্য শেয়ার করবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণের ভাগী নন। আসলে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করা হয়। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও পানি দ্বারা টিকিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি মারা যাবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন, অন্য সব মানুষের মতোই। দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য তার বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা পবিত্র নবী ঈসা (আঃ)-এর ধারণার প্রবর্তন করেছিল, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে ঐশ্বরিক হওয়ার ধারণা, যা তারা তাদের পূর্বের বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা থেকে বহন করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপুষ্ট মহানবী (সা.)-কে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো কল্পকাহিনী ও মিথ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র একটি সামান্য বিট সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন যে একটি সত্তা যা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং মরতে পারে সে কখনই ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই জিনিসগুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণের বিরোধিতা করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

“...আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তী [প্রজন্ম] তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু তারা ভিন্ন মত পোষণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছিল এবং কেউ কেউ অবিশ্বাস করেছিল..."

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, হিংসা ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার কারণে, পূর্ববর্তী জাতিগুলি তাদের ঐশী শিক্ষার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং পরিবর্তে বহু দলে বিভক্ত হয়েছিল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করেছে। দুঃখের বিষয়, ইসলামের মধ্যে অনেক আলেম একই কাজ করেছেন এবং ফলস্বরূপ মুসলিমরাও বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটি এই আলেমদেরকে আল্লাহ, মহান এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে দারোয়ান হওয়ার অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, সাধারণ জনগণ নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় উপহার এবং অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এই দারোয়ানদের খুশি করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে নেতৃত্ব ও সম্পদের স্বার্থে ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে। এটি কেবল তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে এবং ফলস্বরূপ তারা এই দুনিয়া বা পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ করবে সে জাহান্নামে যাবে। দ্বিতীয়ত, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই দলে যোগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে, বুঝতে এবং আমল করার জন্য একজন আন্তরিক শিক্ষকের সন্ধান করতে হবে। যদিও একজনকে তাদের শিক্ষককে সম্মান করতে হবে, কম নয়, তাদের আনুগত্য কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের প্রতি হতে হবে। অতএব, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা দ্বারা প্রদত্ত

মনোভাব ও আচরণ অবলম্বন করতে হবে, যদিও তা তাদের শিক্ষকের মনোভাব ও আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের কখনই পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে তাদের চিন্তাধারার সাথে মানানসই করতে হবে না এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই তাদের চিন্তাভাবনা এবং আচরণ পরিবর্তন করতে হবে যাতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে মিলে যায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে, যার মধ্যে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

"...আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তী [প্রজন্ম] তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছিল এবং কেউ অবিশ্বাস করেছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না, কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ কাউকে হেদায়েত বা বিপথগামী করতে বাধ্য করেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীর পরীক্ষাকে অর্থহীন করে তুলবে। এই দুনিয়ার পরীক্ষা, যা কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে কিনা তা কেবল তখনই অর্থবহ হয় যখন মানুষ কি করতে হবে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীন ইচ্ছা রাখে। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থে সঠিক আচরণবিধি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি তাদেরও সাহায্য করেন যারা তাঁর আচরণবিধি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালান কিন্তু যারা জীবনযাপনের জন্য ভিন্ন আচরণবিধি বেছে নিতে চান তাদের নির্দেশিকা বাধ্য করেন না। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 29:

"এবং বল, "সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।"...

মহান আল্লাহ, তারপর মুসলমানদেরকে তিনি তাদের প্রদত্ত আচরণবিধি মেনে চলার জন্য একটি সতর্কবাণী দেন যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এমন একটি দিন আসার আগে যেদিন কোন বিনিময় থাকবে না, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না..."

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, মুসলমানদের তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ একাই সব কিছু জানেন, বিশেষ করে মানুষের মানসিক ও শারীরিক

অবস্থা, তিনি একাই এমন আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই দুনিয়া হল কাজের আবাস এবং পরকাল হল পুরস্কার ও প্রতিদানের আবাস। যদি কেউ কর্মের আবাসে কাজ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে খালি হাতে থাকবে। অতএব, তাদের এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন এই পৃথিবীটি পুরস্কার ও বিশ্রামের আবাসস্থল এবং পরিবর্তে এর প্রকৃত প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বোঝা। এটি একটি সেতু যা একজনকে তাদের চিরন্তন বাড়িতে নিয়ে যায় । তাই, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদেরকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে তাদের অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে, যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং এমন একটি দিনে পরিত্রাণ লাভ করে যেদিন কারো পার্থিব আশীর্বাদ বা সম্পর্ক তাদের কোন উপকারে আসবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এমন একটি দিন আসার আগে যেদিন কোন বিনিময় থাকবে না, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না..."

এই আয়াতে উল্লিখিত জিনিসগুলির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার পার্থিব ইচ্ছা যেমন দুনিয়াতে তার কর্মের পরিণতি থেকে রেহাই পেতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু বিচার দিবসে, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এগুলির কোনটিই কবুল হবে না। এটি সেই ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে দূর করে যা মুসলিমদের মধ্যে বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে যারা

বিশ্বাস করে যে এই আয়াতে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি মহান আল্লাহ কবুল করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এমন একটি দিন আসার আগে যেদিন কোন বিনিময় নেই [অর্থাৎ মুক্তিপণ]..."

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, তারা বিচারের দিনে আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই পৃথিবীতে কেউ কেবল তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করতে পারে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 24:

" সুতরাং তারা যদি ধৈর্য্য ধারণ করে তবে আগুন তাদের জন্য বাসস্থান। এবং যদি তারা [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলে, তবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যাদেরকে সন্তুষ্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এমন একটি দিন আসার আগে যেদিন কোন বিনিময় থাকবে না, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না..."

কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কর্মের পরিণতি থেকে তাদের একটি সম্পর্কের মাধ্যমে রক্ষা পাবে, যেমন বন্ধুত্ব, আত্মীয় বা আধ্যাত্মিক গাইড। যদিও মুসলমানদের জন্য বিচার দিবসে সুপারিশের ধারণাটি একটি বাস্তবতাও কম নয়, যে ব্যক্তি এমন একটি বিপথগামী মনোভাব গ্রহণ করে যেখানে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, অন্য কাউকে বিশ্বাস করে। তাদের কর্মের পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করবে মধ্যস্থতার ধারণাকে উপহাস করছে। যে ব্যক্তি সুপারিশের ধারণাকে উপহাস করে সে হয়তো দেখতে পাবে যে এটি তাদের মঞ্জুর করা হয়নি। আর যদি তাদের মঞ্জুর করা হয়, তবে তাদের শাস্তি কমিয়ে দিলেও তা জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জাহান্নামে একটি মুহূর্তও একেবারে অসহনীয়। অতএব, একজন মুসলমানকে সকল প্রকার ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর রহমতে প্রকৃত আশা পোষণ করতে হবে। মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, এবং তারপরে আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ উভয় জগতে তাদের প্রতি দয়া করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি ইচ্ছাকৃত চিন্তা ও আশার মধ্যে পার্থক্য জামে আত তিরমিযী, 2459 নং হাদিসে এইভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যারা মহান আল্লাহর নাফরমানীর উপর অবিচল থাকে, তারা তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করে। মঞ্জুর করা হয়েছে, বিচার দিবসে অমুসলিমদের সাথে যোগ দিতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"... আর কাফেররা - তারাই জালেম।"

এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি উদ্ভিদের মত যাকে বাঁচতে হলে অবশ্যই পুষ্ট করতে হবে। একইভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যাবে যদি এটি সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও হতে পারে যে আনুগত্যের সাথে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"... আর কাফেররা - তারাই জালেম।"

উপরন্তু, অন্যায়কারী সেই ব্যক্তি যে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে ভুল জায়গায় রাখে এবং অপব্যবহার করে। যেহেতু অমুসলিমরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধি অনুসরণ করে না, তাই তারা অন্যায়কারীর শ্রেণীতে পড়ে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে যদিও তারা মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহানে বিশ্বাস করার দাবি করে, অন্যথায়, তারা পরকালে অমুসলিমদের সাথে পরিণত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি একদল লোকের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হবে।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 255

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ
مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ
ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, স্বয়ম্ভর। তন্দ্রা তাকে গ্রাস করে না, নিদ্রাও তাকে গ্রাস করে না। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? [বর্তমানে] তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পরে যা হবে তা তিনি জানেন এবং তিনি যা চান তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয়কে পরিবেষ্টন করে না। তাঁর পাদপীঠ আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে একমাত্র তাদের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে তাদের আনুগত্য করতে হবে, তিনি হলেন তাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, মহান আল্লাহ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ..."*

প্রকৃতপক্ষে, যারাই তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের জীবনকে মডেল করে তারা যাকে উপাসনা করে, যদিও তারা দাবি করে যে তারা কোনো দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের অবশ্যই কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। এই কিছু অন্য মানুষ, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা আছে কিনা. 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন ব্যক্তি যাকে বা যাকে মান্য করে এবং অনুসরণ করে তারা যাকে উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্য সকল বিষয়ের তুলনায় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে

তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় দ্বারা মানসিক শান্তি এবং সাফল্য প্রদান করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

"আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পরিবর্তে অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে সমস্ত জগতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। মজা এবং বিনোদন, যেহেতু কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" *আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ..."*

যখন কেউ নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অগণিত সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে একমাত্র একজনই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব

একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন, কারণ সূর্য তার থেকে সামান্য কাছাকাছি বা আরও দূরে থাকলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হবে না। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন...*"

দিন এবং রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বৈচিত্র্যময় দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে দেয়। দিন দীর্ঘ হলে মানুষ দীর্ঘ সময় থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাত দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকত না এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসগুলি। যদি রাতগুলি ছোট হয়, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পারবে না। দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনগুলি ফসলের উপরও প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণীদের বিধানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এই সত্য যে মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত্রি এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্বের ইঙ্গিত দেয়, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস চান, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"...একটি [মহা] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন..."

যখন কেউ নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন সৃষ্টিকর্তাকে নির্দেশ করে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে এবং তারপর ঘনীভূত হয়ে অম্লীয় বৃষ্টি তৈরি করে যা পাহাড়ের উপর নেমে আসে। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিকে নিরপেক্ষ করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় তবে এটি পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মধ্যে থাকা মৃত প্রাণীকে দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয় তবে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সাগর ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন তার মধ্যে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে যাত্রা করতে পারে। যদি পানির সংমিশ্রণ কিছুটা ভিন্ন হয় তবে একটি ভারসাম্যহীনতা ঘটত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করবে বা জাহাজগুলিকে এটির উপরে যাত্রা করার অনুমতি দেবে তবে উভয়ই একই সময়ে সম্ভব হবে না। এমনকি আজ অবধি, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের সর্বাধিক ব্যবহৃত রূপ। এই নিখুঁত ভারসাম্য তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হল মিউটেশনের একটি রূপ, যা প্রকৃতির দ্বারা অপূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অগণিত প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে তারা একটি সম্পূর্ণ

ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তারা উন্নতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটটি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানি পান করার প্রয়োজন ছাড়াই। তারা পুরোপুরি মরুভূমি জীবনের জন্য ডিজাইন করা হয়. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 17:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটি এমন নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে তার শরীরের অমেধ্যগুলি এটি থেকে উৎপন্ন দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির যে কোনো মিশ্রণ দুধকে পানের অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 66:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, গবাদি পশু চারণে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষা। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমরা আপনাকে পান করি - মলত্যাগ এবং রক্তের মধ্যে - খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতিকে একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্যদের অতিক্রম করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছিদের জীবনকাল খুব কম, 3-4 সপ্তাহ এবং 500টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়, তাহলে মাছিদের জনসংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তারা এই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে অভিভূত করে ফেলত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব

বেশি তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যাকে সংযত করার অনুমতি দেয়। এই সব একটি দুর্ঘটনা হতে পারে না বা বিবর্তনের প্রক্রিয়া এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের [তার] নির্দেশনা...*"

বায়ু পরাগায়নের জন্য বায়ু অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছকে পুনরুত্পাদন করতে দেয়। আগের দিনগুলিতে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বায়ু অপরিহার্য ছিল, যা আজও সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য রেইনক্লাউডগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে সরানোর জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বায়ুর একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টি খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টি ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 18:

"এবং আমি আকাশ থেকে পরিমাপক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা এটি কেড়ে নিতে সক্ষম।"

এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তার হাত দেখায়। যিনি এই সমস্ত নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে একক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" *আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, স্বয়ম্ভর...*"

বাস্তবে, যিনি মৃত্যু অনুভব করতে পারেন এবং কিছু বা অন্য কারো দ্বারা টিকিয়ে রাখতে পারেন তিনি দেবতা হতে পারেন না। এই বাস্তবতাই একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও পৃথিবীর সকল সত্তার জন্য ঐশ্বরিকতাকে বাতিল করে দেয়। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেমন জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তেমনি তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। একজন ব্যক্তি যে অন্য ব্যক্তির বিধানের কিছু দিক যেমন তাদের বাসস্থানের যত্ন নেয়, কৃতজ্ঞতা দেখানোর যোগ্য। অতএব, মহান আল্লাহ যেমন এই মহাবিশ্বের সমস্ত নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন, মানুষ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই কেবল ন্যায্য ও সঠিক। নিজের উদ্দেশ্যের সাথে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু করা জড়িত। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রশংসা বা ক্ষতিপূরণ আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং নিজের

কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তদ্ব্যতীত, যখন একজন ব্যক্তি একটি বস্তুর মালিক হন তখন তাদের জন্য বস্তুটি ব্যবহার করা সঠিক এবং স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় যেভাবে তারা খুশি। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষ সহ মহাবিশ্বের মধ্যে সবকিছুর মালিক, মালিক এবং টিকিয়ে রেখেছেন, তাই তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী হবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্য করাই ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনিই তাদের সহ সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক।

একইভাবে, যখন কেউ তার মালিকানাধীন জিনিস অন্যকে ধার দেয়, তখন এটি কেবল ন্যায্য যে তারা জিনিসটি তার মালিকের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। তিনি তা তাদের উপহার হিসেবে দেননি। পার্থিব ঋণের মতো এ ঋণও শোধ করতে হবে। এই ঋণ শোধ করার একমাত্র উপায় হল সেগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে, জান্নাতের নেয়ামত একটি উপহার, মানুষ তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"...এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

তাই একজন ব্যক্তিকে পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় যা জান্নাতের উপহারের সাথে ঋণ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" *আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, চিরঞ্জীব..."*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ চিরজীবী এই সত্যটি তাদের নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু প্রত্যেকেরই এই পৃথিবীতে সময় সীমিত, তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য হল তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে তাদের জীবনকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় সে একটি লক্ষ্যহীন এবং অর্থহীন অস্তিত্ব নিয়ে যাবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ, তারা আনন্দের মুহূর্ত থাকলেও তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবেন না। যেমন একটি উদ্ভাবন যা তার সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে ব্যর্থতা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যদিও তার কিছু ভাল গুণ থাকে, তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, যদিও সে কিছু পার্থিব সাফল্য অর্জন করে। এই ব্যর্থতা একটি শূন্যতা হিসাবে অনুভব করা হয় যা সমস্ত মানুষ তাদের জীবনের মধ্যে অনুভব করে, শীঘ্র বা পরে, এবং ফলস্বরূপ এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, স্বয়ম্ভর..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাছ থেকে পার্থিব ও ধর্মীয় যাবতীয় ভালো কিছু চাওয়া উচিত। এটি কেবল তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। উপরন্তু, যেহেতু লোকেরা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং খুব কম জ্ঞানের অধিকারী, তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাধারণ পার্থিব ভালো জিনিসগুলি চাইতে হবে, কারণ তারা জানে না তাদের জন্য কী ভাল হবে বা না হবে। একজনের জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা কিছু চেয়েছিল শুধুমাত্র এটি তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে ওঠে। আর যখন তারা কোন কিছুকে অপছন্দ করত তখনই তা তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, মহান আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট কিছু চাওয়ার পরিবর্তে সাধারণ ভালো জিনিস চাওয়াকে মেনে চলতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 200-201:

"আর মানুষের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের রব, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই তাদের সৃষ্ট ক্ষমতা অনুসারে মহান আল্লাহর স্ব-টেকসই ঐশ্বরিক গুণের উপর কাজ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটি অর্জন করা হয় যখন কেউ একটি অলস মনোভাব অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকে যার ফলে তারা

তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য তাদের শারীরিক শক্তির মতো তাদের প্রদত্ত সম্পদগুলি ব্যবহার করার পরিবর্তে লোকেদের উপর নির্ভর করে । শুধুমাত্র যখন কেউ তাদের সম্পদ নিঃশেষ করে দেয় তখন তাদের অন্যদের সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, আত্মপ্রতিষ্ঠাকারী। তন্দ্রা তাকে গ্রাস করে না, ঘুমও নয়...*"

এই আয়াতটি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকেও নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝা যায়। অমুসলিমরা যারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিল, তারা প্রায়শই তার কাছে মানবিক ঘাটতিগুলোকে দায়ী করে, যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়া। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহকে পার্থিব বাদশা হিসাবে বিবেচনা করেছিল। একজন জাগতিক রাজা তার রাজ্যের বিষয়গুলি নিজে নিজে পরিচালনা করতে পারে না এবং তাই সাহায্যকারী নিয়োগ করে, যেমন গভর্নরদের, তাকে তার রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, এর মধ্যে অনেকেই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যান্য জিনিসের পূজা করতে শুরু করে, যেমন মূর্তি। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 3:

"... আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অভিভাবক গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"...

এই একই ধারণা কিছু মুসলমানও গ্রহণ করেছে। এই মুসলিমরা সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করে এমন আধ্যাত্মিক লোকদের খুঁজে বের করার জন্য যারা অনুমিতভাবে মহান আল্লাহর সাথে একটি বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার সাথে একটি বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকে খুশি করা যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে পারে, যেমন একজন গভর্নর গভর্নরকে খুশি করে এমন ব্যক্তির পক্ষে রাজার কাছে সুপারিশ করতে পারে, উপহার এবং সম্মান ও ভালবাসার অপ্রাকৃতিক প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক লোকেরা সাধারণ জনগণ এবং মহান আল্লাহর মধ্যে দ্বাররক্ষক হিসাবে কাজ করে, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহানবী (সা.) দারোয়ানের মতো আচরণ করেননি। এর পরিবর্তে তারা সেই পথ ও পদ্ধতি দেখিয়েছে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের কাছ থেকে উপহারের মতো কোনো প্রকার অর্থপ্রদান চায়নি। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামিক জ্ঞান শিখতে হবে এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান দেখাতে হবে কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এমন লোকদের উপাসনা করা উচিত যারা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর এবং খুশি করার জন্য আধ্যাত্মিক বলে মনে হয়। আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা এটি আরও সমর্থিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"... আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? [বর্তমানে] তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পরে যা হবে তা তিনি জানেন এবং তিনি যা চান তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কোন জিনিসকে পরিবেষ্টন করে না..."

মহাবিশ্বের উপর একমাত্র মহান আল্লাহই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব রাখেন এবং এর মধ্যে যা ঘটে তা তিনি জানেন। তাই তার নিজের এবং মানুষের মধ্যে দারোয়ানের প্রয়োজন নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 186:

"আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি তো কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে..."

এবং অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"... *কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?..."*

উপরন্তু, যদিও শাফায়াত বিচার দিবসে ঘটবে, মহান আল্লাহ অনুমতি দেওয়ার পরে, কোন ব্যক্তিকে এর ধারণাকে উপহাস করা উচিত নয় অন্যথায় তারা এটিকে অস্বীকার করতে পারে। উপহাস করা মধ্যস্থতা একটি অলস মনোভাব গ্রহণ করে যেখানে একজন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় এবং এখনও আশা করে যে বিচারের দিনে অন্য কেউ তাদের রক্ষা করবে, যেমন একজন আত্মীয় বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। শাফায়াত গৃহীত হলেও তাদের অলস মনোভাবের কারণে তা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না, যদিও তাদের শাস্তি কমানো হয়। এবং এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে জাহান্নামের একটি মুহূর্তও সত্যই অসহনীয়। অতএব, একজনকে অবশ্যই মধ্যস্থতার ধারণায় প্রকৃত আশা থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা এবং তারপর বিচার দিবসে মানুষের কাছ থেকে সুপারিশের আশা করা। একজন ব্যক্তি যে মনোভাবই অবলম্বন করুক না কেন, মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং তাই উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"...তিনি জানেন [বর্তমানে] তাদের সামনে কি আছে এবং তাদের পরে কি হবে, এবং তিনি যা চান তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কোন জিনিসকে পরিবেষ্টন করে না..."

যেহেতু একজনের সমস্ত জ্ঞান মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দান করেননি, তাই তাদের এটি সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা অপরিহার্য। জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের জন্য উপকারের দিকে পরিচালিত করবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব ও সম্পদের মতো পার্থিব লাভের জন্য জ্ঞান, বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞানের অপব্যবহার করে, সে দেখবে যে এই জিনিসগুলি উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে সে জাহান্নামে যাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"...তিনি জানেন [বর্তমানে] তাদের সামনে কি আছে এবং তাদের পরে কি হবে, এবং তিনি যা চান তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কোন জিনিসকে পরিবেষ্টন করে না..."

উপরন্তু, এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং ভুল করা থেকে মুক্ত, তাই তিনি একাই মানবজাতিকে নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা শান্তির দিকে নিয়ে যায়। মন এবং উভয় জগতে সাফল্য। তিনি একাই মানবজাতিকে শেখাতে পারেন কীভাবে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক জায়গায় রাখতে হয় যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করতে পারে। মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না। একজন ব্যক্তি যেমন তার জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, তেমনি একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী উপদেশ ও জ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। এর কারণ হল একজনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা মানসিক এবং শরীরের

শান্তি অর্জনের জন্য একটি ছোট মূল্য দিতে হয়, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি ভাল শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে, জীবন তার জন্য অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয় যে তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেও মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়। ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ সুস্পষ্ট।

255 নং আয়াতটি সমস্ত কিছুর উপর মহান আল্লাহর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করে শেষ হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"... তাঁর পায়ের স্তূপ আকাশ ও পৃথিবীর উপর বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

ফুটস্টুল সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধান করার দরকার নেই। যা বলা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করতে হবে এবং মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী শক্তি ও জ্ঞানের প্রশংসা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যকে বাড়িয়ে তুলবে না, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"... তাঁর পায়ের স্তূপ আকাশ ও পৃথিবীর উপর বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য প্রতারিত করা উচিত নয়, মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন নয় বা তিনি লোকেদের তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার অবস্থানে নেই। এটি ঘটতে পারে যখন একজনের কর্মের পরিণতি, যেমন শাস্তি, অবিলম্বে বা এমনভাবে ঘটে না যা তাদের কাছে স্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সমস্ত মানুষ তাদের কর্মের পরিণতি একটি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে যার ফলে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখেন যারা এইভাবে আচরণ করে এবং কীভাবে তারা এই বিশ্বের বিলাসিতা পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মানুষকে অবকাশ দেন যাতে তারা তাদের আচরণ উন্নত করতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে শাস্তির জন্য বিলম্বকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 45:

"এবং আমি তাদের সময় দেব। প্রকৃতপক্ষে, আমার পরিকল্পনা দৃঢ়।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং তাদের আচরণের সংস্কার করার জন্য তাদের দেওয়া অবকাশ ব্যবহার করতে হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 255:

"...এবং তিনি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এটি এও নির্দেশ করে যে, কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করুক বা না করুক, তার অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব নেই। একজনের আচরণের প্রভাব কেবল উভয় জগতেই তাদের প্রভাবিত করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 7:

"যদি তোমরা ভালো কর, তবে তোমরা নিজেদের জন্যই ভালো করবে; আর যদি মন্দ করো, তবে তাদের [অর্থাৎ নিজেদেরই]..."

প্রতিটি ব্যক্তি উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে, তাই, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব স্বার্থে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মান্য করা বেছে নিতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও লাভ করবে যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। এই আনুগত্যের সাথে সেই আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত যা পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মতো সব কিছু জানেন, তাই তিনি একাই আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে মানসিক শান্তি আসে। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু কেউ যদি এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা বেছে নেয় তবে তা মহান আল্লাহর মহত্ত্বের সাথে কোন পার্থক্য করে না, কারণ তারা উভয় জগতেই পরিণতি ভোগ করবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে

তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কারা না অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

উপসংহারে বলা যায়, আলোচ্য মূল আয়াতটি সেই ভুল বোঝাবুঝি দূর করে যা প্রায়শই অজ্ঞ লোকদের মনে উদয় হয়, যেমন মিথ্যা ধারণা যে, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র নবীগণকে পাঠিয়েছেন, যাতে সমস্ত বৈচিত্র্য ও মতবিরোধের অবসান ঘটে। অনির্দিষ্টকালের জন্য যারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পরেও মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং সত্যের পাশাপাশি মিথ্যাও বিদ্যমান ছিল। এটি তাদের বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছিল যে এই অবস্থাটি মহান আল্লাহর পক্ষ

থেকে অসহায়ত্বের ইঙ্গিত দিতে পারে, যার অর্থ তিনি যা চেয়েছিলেন তা দূর করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এর উত্তর পূর্বের একটি আয়াতে দেওয়া হয়েছিল যে, সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন পথে চলতে বাধ্য করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। এমনটা হলে মানুষ মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারত না। এটা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 253:

"...আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ জিবরাঈল] দ্বারা সমর্থন করেছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তী [প্রজন্ম] তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছিল এবং কেউ অবিশ্বাস করেছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না, কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

তারপরে এই বিষয়টি তৈরি করা হয়েছে যে জীবনে যতই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন পদ্ধতি এবং আচরণ বিদ্যমান থাকুক না কেন, মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার

অন্তর্নিহিত বাস্তবতাই আলোচনার মূল আয়াতে বলা হয়েছে এবং এটি মানুষের ভুল ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। .

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারের অধীন এবং তার বিধি-বিধান মেনে চলা ছাড়া একজন ব্যক্তির কোন উপায় নেই। একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে থাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে একজন ব্যক্তি যেমন সমস্যায় পড়বেন, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই সমস্যায় পড়বেন। একজন ব্যক্তি একটি দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারে যদি তারা তার নিয়মে সন্তুষ্ট না হয় তবে তারা এমন জায়গায় পালাতে সক্ষম হবে না যেখানে মহান আল্লাহর বিধান এবং এখতিয়ার প্রযোজ্য নয়। একজন মানুষ হয়তো তার সমাজের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে পারবে কিন্তু তারা কখনোই মহান আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, যেভাবে একটি বাড়ির মালিক ব্যক্তি বাড়ির নিয়ম-কানুন ঠিক করে, অন্যরা যদি এই বিধি-বিধানে আপত্তি করে, ঠিক একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, তাই এই মহাবিশ্বের নিয়ম-কানুন তিনিই ঠিক করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের স্বার্থে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। একজন ব্যক্তি হয় মহান আল্লাহর হুকুম ও নিষেধাজ্ঞার পিছনের প্রজ্ঞাগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তারা কীভাবে তাদের এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যায় বা তারা তাদের উপাসনা করতে পারে। ইচ্ছা এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান. কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতে তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোন আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাদের রক্ষা করবে না কারণ কোন কিছুই মহান আল্লাহকে পরাভূত করতে পারে না। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 29:

"এবং বল, "সত্য আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয় আমি জালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন যার দেয়াল তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আর যদি তারা ত্রাণের জন্য ডাকে, তবে তারা মুখমন্ডলকে ঘোলা তেলের মতো জল দিয়ে স্বস্তি পাবে। মন্দ পানীয়, আর মন্দ হল বিশ্রামের জায়গা।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 256-257

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ
ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٥٧

“ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের মিথ্যা বস্তুকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হ্যান্ডহোল্ডটিকে আঁকড়ে ধরেছে যার কোনো বিরতি নেই। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মিত্র। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে- তাদের মিত্র হল ইবাদতের মিথ্যা বস্তু। তারা আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, যদিও মহান আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অধিকারী, তবুও তিনি কাউকে হেদায়েতের জন্য বাধ্য করেন না এবং তিনি অন্যদেরকে বিশ্বাস গ্রহণ বা কাজ করতে বাধ্য করতে দেন না। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

" ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

মানুষের উপর জোর করে নির্দেশনা দেওয়া এই পৃথিবীতে জীবনকে অর্থহীন করে তুলবে। এই পৃথিবীতে জীবনের বিন্দু মানুষের জন্য তাদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করার জন্য তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে নিজের জন্য বেছে নেওয়ার জন্য কোন জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু, বিশ্বাস গ্রহণ করা আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বিষয়, একজন ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারে না। শুধুমাত্র এটিই ভুল বিশ্বাসকে বাতিল করে দেয় যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেন যে, যেমন সঠিক পথনির্দেশ ও গোমরাহীর পথগুলো সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাই কাউকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাই প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে কোন পথ বেছে নেওয়ার। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

“ ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি করা যাবে না । সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এই আয়াতটি যুদ্ধের সাথে যুক্ত অন্যান্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বাস ইসলামের শিক্ষার প্রতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ভাল অবস্থান হল যে এটি রহিত করা হয়নি এবং এমন অনেক কারণ রয়েছে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ইসলাম এমন একটি জিনিস যা একজন ব্যক্তির হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করা উচিত কেবল তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে নয়। একজন ব্যক্তির অন্তরের বিষয় গোপন থাকায় তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা একটি অর্থহীন প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। যারা ইসলামকে জিহ্বা দিয়ে স্বীকার করে কিন্তু অন্তরে তা প্রত্যাখ্যান করে, মহান আল্লাহ তাদের বারবার নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা করেছেন। যাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে তার পরিণতি হবে। মহান আল্লাহ এই আচরণবিধিতে কখনই সন্তুষ্ট হবেন না কারণ প্রকাশ্য কুফরকে ভন্ডামির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট কারণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরটি মুনাফিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 145:

"অবশ্যই, মুনাফিকরা থাকবে আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে..."

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দেয় যে, কিতাবের লোকেরা, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে, যদিও তারা কর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ না করেও শান্তিতে এবং পূর্ণ অধিকারের সাথে বসবাস করতে পারে। যদি মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এই ট্যাক্স নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 29:

“তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের থেকে যারা সত্যের ধর্ম গ্রহণ করে না – [যুদ্ধ] ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জিজিয়া [কর] দেয়..."

উপরন্তু, যদি আয়াত 256 রহিত করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে পরিষ্কার পথটি আর ভুল পথ থেকে আলাদা নয়। এর অর্থ হবে ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়নি, যদিও তা ছিল। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 3:

"...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে অনুমোদন করলাম..."

এবং যদি পরিষ্কার পথটি আর ভুল পথ থেকে আলাদা না হয় তবে একজন ব্যক্তিকে জীবনে ভুল পথ বেছে নেওয়ার জন্য দোষারোপ করা যায় না, যা সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে স্পষ্টতই নয়। এগুলি এবং আরও অনেক প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে 256 নং আয়াতটি রহিত হয়নি।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

" ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

এটি মূর্খ বিশ্বাসকেও দূর করে যে অজ্ঞতা কাউকে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামিক জ্ঞান অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলে যাতে তারা তাদের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য অজ্ঞতাকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ সঠিক পথকে ভুল পথ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন, তাই একজন ব্যক্তির জন্য ইসলামী জ্ঞান শেখা থেকে বিরত থাকার এবং তাই জীবনে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য কোন অজুহাত অবশিষ্ট নেই। যে মুহুর্তে একজন ব্যক্তি ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে তখনই তাদের দায়িত্ব হয়ে যায় ইসলামী জ্ঞান শেখা যাতে তারা জীবনের সঠিক পথ বেছে নেয়। এটি একজন কর্মচারীর দায়িত্বের অনুরূপ যে তারা একটি কাজ গ্রহণ করার মুহুর্তে তাদের দায়িত্ব পালন করে। উপরন্তু, মানব প্রকৃতির মধ্যে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য রোপণ করা হয়েছে। জামি আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই কারণেই এমনকি অমুসলিমরাও তাদের সন্তানদের খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষা দেয়, এমনকি এমন খারাপ কাজ যা পার্থিব কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কোন পরিণতি নেই, যেমন পুলিশ। . অতএব, সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে, এমনকি অমুসলিমদেরও জীবনে সঠিক পথের সন্ধান এবং গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন অজুহাত অবশিষ্ট থাকে না, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

" ... সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

এটি বোঝার গুরুত্বও নির্দেশ করে যে পার্থিব জ্ঞান জীবনের সঠিক এবং ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত মুসলমান বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তাই তাদের জীবনে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট। এই পথটি কেবলমাত্র ইসলামিক জ্ঞানের মাধ্যমেই লাভ করা যায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অতএব, যিনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন, তাকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেমন তারা পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে। এই মনোভাব পিতামাতা এবং মুসলিম সমাজের প্রবীণদের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও প্রেরণ করতে হবে।

উপরন্তু, যেহেতু এই সঠিক পথটি নির্দেশনার দুটি উত্স: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর শিক্ষা এবং তার উপর কাজ করে, তাই একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"... *সুতরাং যে ব্যক্তি মিথ্যা উপাসনাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে...*"

এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে ইসলাম একটি জামার মতো নয় যা কেউ খুশি করে পরা এবং খুলে ফেলা যায়। ইসলাম এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা প্রতিটি পরিস্থিতি এবং শ্বাসকে প্রভাবিত করে। এর শিক্ষাগুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হবে যখন কেউ তাদের দেওয়া প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদের সাথে যোগাযোগ করে। অতএব, এই আয়াত অনুসারে, যে ব্যক্তি বেছে নেয় এবং কখন আল্লাহকে মান্য করবে এবং কখন তার অবাধ্য হবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো মিথ্যা উপাসনার বিষয়গুলি মেনে চলে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, শ্রেষ্ঠ এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হয়ে উঠতে হবে এবং কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করতে হবে না, তবে এর অর্থ তাদের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত নয় যেখানে তারা অবিচলভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নেবে কখন মহান আল্লাহকে মানতে হবে এবং কখন তাঁর উপর অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য করতে হবে। . অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, যাতে তারা তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কার্যত প্রমাণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"... *সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের মিথ্যা বস্তুগুলিতে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হ্যান্ডহোল্ডটিকে আঁকড়ে ধরেছে যার মধ্যে কোন বিরতি নেই..*"

যেহেতু মহান আল্লাহই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সব কিছু জানেন, তাই তিনি একাই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং উপদেশ একজনকে শেখাবে কিভাবে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করতে হয় যাতে এটি তাদের মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে। এই জ্ঞান অন্যের দ্বারা প্রদান করা যায় না কারণ তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"... আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জানেন।"

অতএব, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, তাদের প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও শারীরিক সমর্থন দেওয়া হবে যাতে তারা শান্তি অর্জন করে। মন এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 256-257:

"... সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের মিথ্যা বস্তুগুলিতে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হ্যান্ডহোল্ডটিকে আঁকড়ে ধরেছে যার কোনো বিরতি নেই। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের মিত্র। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে- তাদের মিত্র হল ইবাদতের মিথ্যা বস্তু। তারা আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়..."

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তাকে এই মানসিক ও শারীরিক সমর্থন দেওয়া হবে না এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। ফলে তারা ইহকাল বা পরকালে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারবে না। উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে যখন তারা একটি স্থিতিশীল মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন ও সংস্কৃতির মতো ইবাদতের ভ্রান্ত বস্তু যেমন দুর্বল ও অস্থির বস্তু, সেহেতু যে ব্যক্তি এগুলো মেনে চলে সে দুর্বল ও অস্থির হয়ে যাবে। এই ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, ভালবাসা এবং ঘৃণা সবই এই দুর্বল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল জিনিসগুলির চারপাশে আবর্তিত হবে। এটি তাদের একটি স্থিতিশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে বাধা দেবে , যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অথচ মহান আল্লাহর আনুগত্যের মূলে রয়েছে স্থিতিশীল , দৃঢ় ও নিরবধি। অতএব, যে এই নীতিগুলির সাথে সংযুক্ত হবে সে তাদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থায় স্থিতিশীলতা এবং দৃঢ়তা অর্জন করবে। এর ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। এটি ঠিক সেরকমই যখন একজন ব্যক্তি তার সমাজের মধ্যে একজন প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ফলস্বরূপ, ব্যক্তিটি তাদের সম্পর্কের কারণে তাদের সমাজে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অথচ, যে ব্যক্তি তাদের সমাজের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে কেবল দুর্বলতা অর্জন করবে। এই হল সেই ব্যক্তির অবস্থা যে উপাসনার মিথ্যা বস্তু যেমন সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত থাকে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 73:

"... দুর্বলরা অনুসরণকারী এবং অনুসরণকারী।"

এটা খুবই সুস্পষ্ট যখন কেউ লক্ষ্য করে যে যারা এই বিষয়গুলো অন্ধভাবে অনুসরণ ও মেনে চলে এবং এর ফলে তারা কীভাবে দুর্বল ও ভারসাম্যহীন মানসিক অবস্থা গ্রহণ করে। এটি অগণিত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, যেমন চরম চাপ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির উত্থান এবং প্রভাবের সাথে সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার একটি প্রধান কারণ।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর লক্ষ্য হল মানবজাতিকে উভয় জগতের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করা যখন তিনি এই লক্ষ্যে তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা থেকে কিছুই পান না। অন্যদিকে, উপাসনার মিথ্যা বস্তুর নেতারা, যেমন সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির পিছনে থাকা লোকেরা, সমাজের উপর সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব সংগ্রহের লক্ষ্য রাখে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে না। এটি বেশ সুস্পষ্ট যখন কেউ এই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে কারণ তারা এমন পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করে যা সাধারণ জনগণের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সহায়তা করবে, যেমন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি, কারণ এটি সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাবকে হ্রাস করবে। তারা পেতে পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 257:

" *যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের মিত্র। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে- তাদের মিত্র হল ইবাদতের মিথ্যা বস্তু। তারা আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়..."*

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মনের শান্তি অর্জন করবে, যা আলোর মধ্যে বসবাস করার মতো, যখন তারা সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"... তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে, অন্যথায় তারা উভয় জগতেই অসুবিধা, চাপ এবং ঝামেলার অন্ধকারে থাকবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়

সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এটা একটা বড় কারণ যে, যারা ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা পূরণ করে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা যে আশীর্বাদগুলো তাদের দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে বেছে নেবে সে জান্নাতের আলো থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার পরিবর্তে পরকালে জাহান্নামের অন্ধকারে পতিত হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই মানুষের মতামত নির্বিশেষে এই ফলাফল অনিবার্য এবং অনিবার্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 257:

"...এবং যারা অবিশ্বাস করে - তাদের মিত্ররা ইবাদতের মিথ্যা বস্তু। তারা আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

অতএব, উভয় জগতের নিজের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, একজনকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে আলোর অনুসরণ করা বেছে নিতে হবে যাতে এটি পরকালে জান্নাতের আলোর দিকে নিয়ে যায়, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের

অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

উপসংহারে বলা যায়, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি তখনই উভয় জগতে আলোকিত জীবন অর্জন করতে পারে যখন তারা সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করে। এটি তখনই যখন তারা তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করে। এই ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 257 নম্বর আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় সে হয়তো এটিকে হারাতে পারে, যা এই দুনিয়া ও পরকালে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল ঈমান হল একটি গাছের মত যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলে যেমন একটি উদ্ভিদ মরে যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মরতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 257:

" *যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের মিত্র। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে- তাদের মিত্র হল ইবাদতের মিথ্যা বস্তু। তারা আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।*"

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 258

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى
يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেননি যে ইব্রাহীমের সাথে তার পালনকর্তা সম্পর্কে [শুধু] তর্ক করেছিল কারণ আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন? যখন ইব্রাহীম বললেন, আমার পালনকর্তা তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তখন তিনি বললেন, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, সুতরাং একে পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর। সুতরাং অবিশ্বাসী [আশ্চর্যে] অভিভূত হয়ে গেল এবং আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

শুরুতে একটি আত্ম-শোষিত মনোভাব পরিহার করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি কেবল তাদের নিজের জীবন এবং বিশেষ করে তাদের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

" *তুমি কি ভেবে দেখনি..."*

যে এইভাবে আচরণ করে সে সাধারণ ইতিহাস, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং তাদের চারপাশের মানুষের অবস্থার মধ্যে পাওয়া পাঠগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। এই জিনিসগুলি থেকে শেখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি যা একজন ব্যক্তি তাদের আচরণকে উন্নত করতে পারে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারে যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি দেখেন যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তারা স্ট্রেস, মানসিক ব্যাধি, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় জর্জরিত হয়, যদিও তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করে এবং বিলাসিতা উপভোগ করে। এই বিশ্বের, পর্যবেক্ষককে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে শেখাবে এবং তারা নিশ্চিত হবে যে মনের শান্তি মিথ্যা নয়। অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী। অথবা যখন একজন ব্যক্তি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন এটি তাদের নিজের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে এবং এটি হারানোর আগে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করা উচিত। তাই, ইসলাম নিয়মিতভাবে মুসলমানদেরকে এমন লোকদের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণকারী মানুষ হতে উৎসাহিত করে যারা তাদের নিজেদের বিষয়ে নিমগ্ন থাকে যে তারা অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয় না। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 10:

"তারা কি দেশে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে?..."

মহান আল্লাহ, একটি অহংকারী মানসিকতা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব শেখান যা প্রায়শই তাদের সমাজের মধ্যে একজনের সামাজিক প্রভাব এবং ক্ষমতা দ্বারা উস্কে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

" আপনি কি তাকে দেখেননি যে ইব্রাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল [কেবল] এই কারণে যে আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? ..."

মক্কার অমুসলিমরা যারা আরব উপদ্বীপের নেতা বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং মদিনার কিতাবের পণ্ডিতরা তাদের নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসাকে ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দিয়েছিল, যদিও তারা উভয়েই এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত ঘোষণার ৪০ বছর আগে থেকে জানত এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে তিনি বিশ্বস্ত ও সৎ ছাড়া আর কিছুই নন। তারা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং পবিত্র কুরআন কোন প্রাণীর কাছ থেকে আসেনি তা ভালোভাবে জানতেন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এবং কিতাবের পণ্ডিতগণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেমন উভয়ই তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু, তাদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিলেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয়[পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যবাদী ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকারী পাঠ পাঠ করছিলেন যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি অধ্যয়ন করেননি, যা কিতাবধারী এবং অধ্যয়নকারী উভয়ই। -মক্কার মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে জানত, এটি ছিল তাঁর নবুওয়াত এবং ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শন।

অতএব, একজন ব্যক্তির কখনই তার কাছে থাকা সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসগুলিকে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। একজন ব্যক্তির উন্মুক্ত মন নিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং তাদের পূর্বনির্ধারিত পছন্দের পরিবর্তে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো যা কিছুই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তারা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারে। এতে সমাজে ন্যায়বিচার ও মানসিক শান্তির প্রসার ঘটবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া জিনিসের উপর অহংকার অবলম্বন করে সে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ এই পার্থিব জিনিসগুলো তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটা খুবই স্পষ্ট হয় যখন কেউ ইতিহাস দেখে এবং এই দিন ও যুগের মানুষ যারা পার্থিব আশীর্বাদ যেমন সম্পদ ও নেতৃত্বের অপব্যবহার করে, তাদের দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

"...যখন ইব্রাহীম বললেন, "আমার পালনকর্তা তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান," তিনি বললেন, "আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।"...

নবী ইব্রাহিম (আঃ) যা বলেছিলেন তা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে নমরুদ তাদের আলোচনা শুনে লোকদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল। মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) সৃষ্টির উৎপত্তি অর্থ, জীবন এবং স্রষ্টা ও মৃত্যুর উৎস উল্লেখ করছিলেন। নমরুদ কেবলমাত্র এই দুটি প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশের ইঙ্গিত করেছিলেন যদিও তিনি সচেতন ছিলেন যে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এই দুটি প্রক্রিয়ার জন্মগত উত্সের কথা উল্লেখ করছেন। অর্থ, এই দুটি প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশ বিশেষ কিছু নয়। বাহ্যিকভাবে, ডাক্তাররাও ওষুধের মাধ্যমে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে জীবন দিতে পারেন। বাহ্যিকভাবে, একজন হত্যাকারী মৃত্যু দেয়। তাই নমরুদ জীবন-মৃত্যুর বাহ্যিক প্রকাশকে নিজের কাছে দায়ী করা বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি কেবল তাদের আলোচনা শুনছেন এমন লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্য এটি করেছিলেন। ভুল ব্যাখ্যা করা এবং বিষয়গুলিকে তাদের প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়ার এই মনোভাব সবসময়ই তাদের পথ ছিল যারা সত্যকে মেনে নিতে অপছন্দ করেন, যেমন রাজনীতিবিদরা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই একটি সরল অগ্রগামী এবং ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা জিনিসগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে এবং বিষয়গুলিকে তাদের প্রেক্ষাপটের বাইরে না নেয়। এটি তাদের ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় পরিস্থিতিতেই সত্য থেকে উপকৃত হতে সাহায্য করবে যাতে এটি তাদের মনের শান্তি লাভ করতে সাহায্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা আসলে বিশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য এবং তাই যে কেউ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়ের কথা বল।"

নমরুদ যেমন জীবন ও মৃত্যুর উৎসের কথা বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং জীবন ও মৃত্যুর বাহ্যিক প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে শোনা লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বাহ্যিক প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে তাঁর মানসিকতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। সূর্যের অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

"...ইবরাহীম বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, তাই একে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করুন।" সুতরাং অবিশ্বাসী [আশ্চর্য হয়ে] অভিভূত হয়ে গেল..."

বাস্তবে নমরুদও বুঝতে পেরেছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সত্য কথা বলছেন। তিনি যদি সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সত্যবাদী ছিলেন না, তবে তিনি তাঁর নবুওয়াত প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করার জন্য তাকে অনুরোধ করতে পারতেন। নমরুদ এই অনুরোধ করেননি কারণ তিনি জানতেন যে এই অলৌকিক ঘটনাটি তার লোকদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করবে। আলোচ্য মূল আয়াতের শেষে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে , যাতে তারা স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ এটি তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী, সে সঠিক পথনির্দেশ পাবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

"... আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সফলভাবে যাত্রা করার জন্য সঠিক নির্দেশনা অত্যাবশ্যক যাতে কেউ জীবনে সঠিক পছন্দ করতে পারে যাতে তারা মনের শান্তি পায়। শারীরিকভাবে হারিয়ে যাওয়া একজন ব্যক্তি যেমন মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং এমনকি ভয়ও অনুভব করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন জীবনে সঠিক নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হবেন। অতএব, অন্যায়কারী, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে অবিরত থাকে, তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের জীবনযাপন করবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে

পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

"... আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 258:

"তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে [শুধু] তর্ক করেছিল কারণ আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন? যখন ইব্রাহীম বললেন, আমার পালনকর্তা তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তখন তিনি বললেন, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, সুতরাং একে পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর। সুতরাং কাফের [আশ্চর্য হয়ে] অভিভূত হয়ে গেল এবং আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

উপসংহারে, সমস্ত মানুষের মধ্যে বহুঈশ্বরবাদের ভিত্তি স্বর্গীয় দেহ এবং/অথবা মানুষের মতো জীবন্ত জিনিসের উপাসনায় ফিরে যায়। এই জীবন্ত জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত প্রতিমা হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম উত্পাদিত প্রমাণের দুটি পয়েন্ট অন্যান্য ঈশ্বরের মিথ্যাকে তুলে ধরে। মহান আল্লাহ

একাই জীবন ও মৃত্যু দেন এবং এমন একটি সৃষ্ট সত্তা যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে জীবন বা মৃত্যুর সময় তাকে ঐশ্বরিক বলে গণ্য করা যায় না। অতএব, সেই জীবের একজন সর্বশক্তিমান প্রভু আছেন যিনি সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি একাই জীবন ও মৃত্যু দেন। এটি মানুষের মতো জীবন্ত প্রাণীর প্রতিনিধিত্বকারী মূর্তি পূজা করার ধারণাটি দূর করে। উপরন্তু, স্বর্গীয় সংস্থা, সূর্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, তাদেরও একজন প্রভু আছেন এবং তারা সবই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাদের নিজেদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এটি তাদের প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা যিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, যেমন সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করা। স্বর্গীয় সংস্থাগুলি তাই উপাসনার যোগ্য নয় কারণ তারা মহান আল্লাহর দাস। অতএব, ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ
اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

“অথবা যে একজন জনপদের পাশ দিয়ে গিয়েছিল যেটি ধ্বংসস্তূপে পড়েছিল। তিনি বললেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত্যুবরণ করেন; অতঃপর তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, আপনি কতক্ষণ অবস্থান করেছেন? সে [লোকটি] বলল, আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ থেকেছি। তিনি বললেন, "বরং, তুমি একশত বছর রয়েছ। তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সময়ের সাথে তা বদলায়নি। এবং তোমার গাধার দিকে তাকাও; এবং আমরা তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করে দেব। এবং হাড়গুলোর দিকে তাকাও।" [এই গাধার] - কিভাবে আমরা তাদের বড় করি এবং তারপর মাংস দিয়ে ঢেকে রাখি।" অতঃপর যখন তার কাছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, আমি জানি আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে, এই ব্যক্তির পরিচয় যদি এই আয়াতের পাঠের সাথে প্রাসঙ্গিক হত, তাহলে মহান আল্লাহ তার নাম উল্লেখ করতেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

" *অথবা যে একজন জনপদের পাশ দিয়ে গেছে...*"

তাই একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যকে বাড়িয়ে তুলবে না, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন এই আয়াতে আলোচিত মানুষের নাম, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

" অথবা একজনের মতো যে একটি জনপদের পাশ দিয়ে গেছে যা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বললেন, "মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে একে জীবিত করবেন?"

এই প্রশ্নটি অগত্যা সন্দেহের মধ্যে নিহিত ছিল না এবং এটি এমন একটি বিষয়ের প্রতিফলনের একটি মুহূর্ত যা লোকটি ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করেছিল। এর একটি উদাহরণ পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 260:

" এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন।" [আল্লাহ] বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে [আমি জিজ্ঞাসা করছি] যাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়।"...

অতএব, আলোচনার মূল আয়াতটি সেই বিষয়গুলির প্রতি চিন্তা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যা একজনকে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে, যেমন ইতিহাস এবং অন্যান্য মানুষের জীবন, যাতে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং যারা মহান ক্ষমতা ও সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা যখন মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল ছিল তখন তারা কীভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যেমন মিশরীয় সাম্রাজ্য। এই প্রতিফলন একজনকে তাদের মতো একই ভুল করা এড়াতে এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। উপরন্তু, তারা একটি পার্থিব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করবে না, কারণ

ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায়, পার্থিব সাম্রাজ্যগুলি প্রায়শই এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে এবং তারা পরকালে মানুষকে সাহায্য করবে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 137:

"তোমার আগেও অনুরূপ পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়েছে, সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র এগিয়ে যাও এবং প্রত্যাখ্যান কর তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।"

এ সময়ের মানুষের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করাও নিজের ঈমানকে মজবুত করে। যখন কেউ লক্ষ্য করে যে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন সম্পদ, এবং কীভাবে এটি তাদের মানসিক চাপ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, তারা নিশ্চিত হবে যে মানসিক শান্তি পাওয়া মিথ্যা নয়। পার্থিব বিলাসিতা এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করা। ফলস্বরূপ, তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। সামাজিক স্বাধীনতা দাবি করার সময় যারা সমস্ত নৈতিকতা ত্যাগ করে পশুর মতো আচরণ করে এবং কীভাবে এটি মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে, যেমন হতাশা এবং পদার্থের অপব্যবহার, তখন তারা প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করবে, যা সর্বদা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়, অনুসরণ করা মিথ্যা নয়। তাদের জীবনধারা। যখন কেউ মানুষের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে সমাজের জ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, তারা কখনই এমন আচরণবিধি তৈরি করতে সক্ষম হবে না যার ফলে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা। পক্ষান্তরে, মহান আল্লাহ যেহেতু সব কিছু জানেন এবং শুধুমাত্র মানুষের উপকার করার জন্য উপদেশ দেন, তিনি একাই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং তিনি একাই মানুষকে শেখাতে পারেন কিভাবে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে

সঠিক জায়গায় রাখুন যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ তাদের প্রতি চিন্তা করে যারা জীবনের সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। অবশেষে, যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে নিখুঁত এবং অগণিত ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র, মহাসাগরের ঘনত্ব যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর যাত্রা করার অনুমতি দেয় এবং সমুদ্রের জীবনকে উন্নতি করতে দেয়। তাদের, এবং আরো অনেক, তারা একটি সৃষ্টিকর্তার হাত পালন করবে. তাই অনেক নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম এলোমেলো ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকে তাহলে তা বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু কামনা করবে। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই ইঙ্গিত করে একক ঈশ্বর, আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

উপরন্তু, যখন কেউ এই নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করবে তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়, যথা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারীরা তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তারা একটি সরকার দ্বারা শাস্তি পায়। এটা বোঝা যৌক্তিক যে একক স্রষ্টা, আল্লাহ, মহান, যিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য আনবেন, যা এই বিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য ঘটানোর জন্য, মানুষের ক্রিয়াগুলি প্রথমে শেষ হতে হবে। এই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং ভারসাম্য চিরকাল থাকবে। এই বোঝাপড়া বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য

কার্যত প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যে আশীর্বাদগুলো দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

অতএব, মানুষকে তাদের জীবনের মধ্যে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিফলন করার জন্য সময় বের করতে হবে যাতে তারা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখতে পারে যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তাদের সহায়তা করবে। অধ্যায় 38 দুঃখজনক, শ্লোক 29:

"[এটি] একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতসমূহের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

“অথবা [যেমন একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন] যিনি একটি জনপদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন যা ধ্বংসস্তূপে পড়েছিল। তিনি বললেনঃ মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছরের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, আপনি কতক্ষণ অবস্থান করেছেন? সে [লোকটি] বলল, আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ থেকেছি। তিনি বললেন, "বরং তুমি একশ বছর রয়েছ..."

এটি কত দ্রুত সময় অতিবাহিত করে তার বাস্তবতা নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তির বয়স, বিশ্বাস, জাতি বা অন্য কিছু নির্বিশেষে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার করে যে সময় খুব দ্রুত চলে যায়। সময়ই একমাত্র পার্থিব আশীর্বাদ যা চলে যাওয়ার পর আর ফিরে আসে না। অতএব, একজনকে অবশ্যই সময়ের এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে এবং ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তাদের দেওয়া সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে দেরি করা উচিত নয়। এর মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করা জড়িত যাতে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। দুঃখজনকভাবে, মুসলমানদের তাদের উদ্দেশ্য পূরণে বিলম্ব করার অভ্যাস রয়েছে এবং পরিবর্তে গৌণ বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেয়, যেমন অত্যধিক সম্পদ সঞ্চয় করা এবং একটি সাম্রাজ্য সংগ্রহ করা যা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ থেকে তাদের আরও বিভ্রান্ত করবে। যদিও একজনের উদ্দেশ্য পূরণের সাথে পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা জড়িত, যাতে একজন তার প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, তবুও একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং আমল করার জন্য সময় দিতে হবে যাতে তারা এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। . ভবিষ্যতের তারিখে এটি বিলম্বিত করা বোকামি কারণ কেউ জানে না এই পৃথিবীতে তাদের কতটা সময় আছে। এবং জীবন দ্রুত চলে যাওয়ার সাথে সাথে, যদি তারা বিলম্ব করতে থাকে তবে তাদের মৃত্যু এসে পৌঁছলে তারা খালি হাতে থাকবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন আচরণ করতে হবে যেন তারা এই পৃথিবীতে একটি অস্থায়ী কাজের ভিসায় রয়েছে। যে ব্যক্তি একটি কাজের ভিসায় রয়েছে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করে কিন্তু সর্বদা তাদের ভিসা শেষ হওয়ার আগে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব সম্পদ অর্জনের তাদের উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দেয়, কারণ এটিই তাদের কাজের ভিসার উদ্দেশ্য। . একইভাবে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির লক্ষ্য হল এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করা এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করা। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় সে দেখতে পাবে যে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার

করছে এবং এর ফলে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পাবে না এবং বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নিতে পারবে না। যেহেতু তারা পরকালে দ্বিতীয় সুযোগ নয়, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তার স্বল্প সময় কাজে লাগাতে হবে আগে তারা খালি হাতে এবং পরকালে অনুশোচনায় পূর্ণ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

"...সুতরাং আল্লাহ তাকে একশত বছরের জন্য মারা যান; অতঃপর তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, আপনি কতক্ষণ অবস্থান করেছেন? সে [লোকটি] বলল, আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ থেকেছি। তিনি বললেন, "বরং, তুমি একশত বছর বেঁচে আছ, তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সময়ের সাথে সাথে তা বদলায়নি, এবং তোমার গাধার দিকে তাকাও, এবং আমরা তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করে দেব..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি নিদর্শন অবশ্যই বুঝতে হবে এবং তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে। দুঃখের বিষয়, ইসলামের মধ্যে অনেক নিদর্শন যার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন কেয়ামতের দিনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাই কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, প্রায়শই এর উদ্দেশ্য অনুসারে বোঝা যায় না এবং ফলস্বরূপ চিহ্নটির পিছনের শিক্ষার উপর আমল করা হয় না। মহান আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন বুঝতে না পারার বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সঠিকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 21:

"এবং একইভাবে, আমরা তাদের খুঁজে বের করেছি যাতে তারা জানতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত এতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করলো এবং বললো, তাদের উপর একটি স্থাপনা নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। যারা এ ব্যাপারে বিজয়ী হয়েছিল তারা বলেছিল, "আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ গ্রহণ করব।"

এটি সেই গুহাবাসীদেরকে বোঝায় যাদেরকে মহান আল্লাহ শত শত বছর ধরে ঘুমিয়ে রেখেছিলেন যাতে মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং তা করার মাধ্যমে যে সুরক্ষা লাভ করা যায় এবং স্মরণ ও স্মরণের গুরুত্ব। কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু তৎকালীন মানুষ এবং তাদের পরে অনেক লোক এই বিষয়গুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে গুহাবাসীদেরকে একটি পর্যটক আকর্ষণে পরিণত করেছিল যেখানে কেউ তাদের সমাধি পরিদর্শন করে এবং তাদের গল্প বর্ণনা করে তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেতে পারে।

একইভাবে, সমগ্র পবিত্র কুরআন এমন নিদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ যা বিভিন্ন বাস্তবতাকে নির্দেশ করে যা মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে তবুও অনেক মুসলিম পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারে পরিণত করেছে যা কিছু আয়াত না বুঝে বা আমল না করে নির্দিষ্ট পরিমাণে বার বার পাঠ করে তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধান করে। তাদের মধ্যে লক্ষণ. অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই এই আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ মানবজাতির জন্য প্রদত্ত নিদর্শনগুলির উদ্দেশ্য বোঝার এবং কাজ করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতে তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

"...এবং [এই গাধার] হাড়ের দিকে তাকাও - কিভাবে আমরা সেগুলোকে তুলে রাখি এবং তারপর মাংস দিয়ে ঢেকে রাখি।" এবং যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, "আমি জানি যে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

কেয়ামতের দিনে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি যখন পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা সারা দিন, মাস এবং বছর জুড়ে ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ একটি মৃত অনুর্বর জমিকে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন

তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেক কিছুর প্রতিফলন বিচার দিবসে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এবং পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, বিচার দিবস প্রয়োজন মানুষের কর্মের ভারসাম্যের জন্য। যেহেতু মহান আল্লাহ, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং মানবজাতিকে জবাবদিহিতা দানকারী সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, মহান আল্লাহর জন্য সহজ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 259:

"...আর যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, "আমি জানি যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবন দেন।" [আল্লাহ] বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু [আমি জিজ্ঞাসা করছি] যাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়।" [আল্লাহ] বললেন, "চারটি পাখি নাও এবং সেগুলিকে তোমার কাছে নিয়ো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

এই আয়াতটি এমন বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা এবং শেখার গুরুত্ব নির্দেশ করে যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে, যাতে একজন ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই আনুগত্যের সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 260:

" *এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন।" [আল্লাহ] বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে [আমি জিজ্ঞাসা করছি] যাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়।"...*

অতএব, একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়াবে না। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিচার দিবসে যদি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যেমন একজনের প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 260:

" এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন।" [আল্লাহ] বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে [আমি জিজ্ঞাসা করছি] যাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়।"...

এটি ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের গুরুত্বও নির্দেশ করে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণগুলি অধ্যয়ন করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করে। এই স্পষ্ট প্রমাণগুলি সৃষ্টির মধ্যে স্থাপিত স্পষ্ট প্রমাণগুলিকেও তুলে ধরে যা একজনকে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

যার ঈমান যত মজবুত হবে, তারা তত বেশি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, তাদের প্রদত্ত নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করবে। এই সমস্ত উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 260:

"... [আল্লাহ] বললেন, "চারটি পাখি নাও এবং সেগুলিকে নিজের কাছে নিবেদন কর, তারপর [জবাই করার পর] প্রতিটি পাহাড়ে তাদের একটি অংশ রাখ, তারপর তাদের ডাক - তারা দ্রুত তোমার কাছে আসবে..."

যদিও মানুষ এভাবে পুনরুত্থানের বাস্তব উদাহরণ প্রত্যক্ষ করবে না, তবুও কম নয়, পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে পৃথিবীতে ঘটে এবং তাদের মাধ্যমেই শেষ পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যা শেষ বিচার দিবসে ঘটবে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ একটি মৃত অনুর্বর জমিকে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা

মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেক কিছুর প্রতিফলন বিচার দিবসে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং প্রজ্ঞাময়, তিনি ন্যায়বিচার পরিবেশনের জন্য তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে মৃতদের পুনরুত্থিত করতে পারেন এবং করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 260:

"...এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, বিচারের দিন এমন কিছু যা ঘটতে হবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ লক্ষ্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে রয়েছে। পৃথিবী সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকলে তা বসবাসের অযোগ্য হতো না। একইভাবে, জলচক্র, যা সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবনকে জড়িত করে যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। ভূমিটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে বীজের দুর্বল শাখা এবং অঙ্কুরগুলি এটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে যাতে সৃষ্টির জন্য শস্য সরবরাহ করা যায় তবে একই মাটি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবনগুলি প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে না বরং ভারসাম্যও নির্দেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্ম। কেউ প্রায়শই নিপীড়ক এবং অত্যাচারী লোকদের লক্ষ্য করে যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। বিপরীতভাবে, এমন অগণিত লোক রয়েছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় তবুও তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলমান যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং শুধুমাত্র একটি সামান্য অংশ পেয়ে থাকে যেখানে তারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে অমান্য করে, তারা এই দুনিয়ার বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কাজের পুরস্কার ও শাস্তিও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু এটি স্পষ্টতই এই পৃথিবীতে ঘটে না তাই এটি অবশ্যই অন্য সময়ে অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে ঘটতে হবে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে পুরস্কৃত ও শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনে একটি হিকমত হল যে, মহান আল্লাহ তাদের সুযোগ করে দেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত করেন না কারণ এই পৃথিবী

জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ একজন মুসলমানের জন্য পরবর্তী পৃথিবীতে পূর্ণ সওয়াবের অপেক্ষা করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যে বিশ্বাসই বিশ্বাসকে বিশেষ করে তোলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন কিছুতে বিশ্বাস করা, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করা বিশেষ কিছু হবে না।

পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়ার আশা মানুষকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

প্রতিদানের দিন শুরু করার জন্য এই জড় জগতের অবসান ঘটাতে হবে। এর কারণ শাস্তি এবং পুরষ্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের কাজ শেষ হয়ে যায়। কাজেই প্রতিফলের দিন সংঘটিত হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের আমল শেষ না হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে জড় জগতের অবসান হতে হবে, শীঘ্র বা পরে।

উপরন্তু, যারা পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের বিশ্বাস করা কঠিন যে একটি মৃতদেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরে এই কণাগুলি আবার একত্রিত হয়ে একটি মানুষ গঠন করবে। এই লোকদের বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ তারা প্রত্যেককে তাদের নিজেদের সীমিত ক্ষমতা এবং মর্যাদার মাপকাঠিতে পরিমাপ করে এবং তারা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিষয়ে ইচ্ছা করে না।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস করার জন্য একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র তার নিজের সত্তার প্রতি চিন্তা করতে হবে। একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আসা উপাদান ধারণ করে এমন অংশগুলির একটি সংগ্রহ। একজন ব্যক্তি যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন তা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত হয়। একজন যে ওষুধগুলি গ্রহণ করেন তা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের উপাদান দিয়ে গঠিত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেও এই সমস্ত জিনিস এক শরীরে জড়ো হয়। মহান আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করেন যাতে তারা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে কেন এটি মেনে নেওয়া কঠিন হয় যে যখন তাদের দেহ, যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জিনিসের উপর পুষ্ট উপাদান দ্বারা গঠিত, তখন মারা যায় এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা এবং হাড়ে পরিণত হয়, মহান আল্লাহ এই কণাগুলিকে একত্রিত করে পুনরায় তৈরি করতে পারেন।

যখন কেউ এই আলোচনার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে তা বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে মজবুত করবে যার ফলে তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে। নবী মুহাম্মদ সা. অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 22:

"কারণ আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন একটি উদ্দেশ্যের জন্য, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রতিদান পায়। আর কারো প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 261-266

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا
مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যার জন্য চান [তার পুরস্কার] বহুগুণ করে দেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

যারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না বা [অন্য] আঘাত করে না, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং থাকবে না। তারা দুঃখিত

সদয় বক্তৃতা এবং ক্ষমা করা দাতব্যের চেয়ে উত্তম যার পরে আঘাত করা হয়। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও সহনশীল।

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দান-খয়রাতকে উপদেশ বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না, যে ব্যক্তি তার সম্পদ [কেবল] লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। তার উদাহরণ হল একটি [বড়] মসৃণ পাথরের মত যার উপর ধূলিকণা রয়েছে এবং মুষলধারে ধাক্কা লেগে তা খালি হয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা রাখতে পারে না। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

আর যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজেদেরকে নিশ্চিত করার জন্য তাদের উদাহরণ হল উঁচু ভূমিতে একটি বাগানের মতো যা বৃষ্টিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়- ফলে তা দ্বিগুণ ফল দেয়। এবং [এমনকি] যদি এটি একটি মুষলধারা দ্বারা আঘাত না হয়, তারপর একটি গুঁড়ি গুঁড়ি [যথেষ্ট]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

তোমাদের মধ্যে কেউ কি খেজুর গাছ ও আঙ্গুরের বাগান করতে পছন্দ করবে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে যেখানে তার প্রতিটি ফল থেকে থাকে? কিন্তু সে বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং তার দুর্বল [অর্থাৎ অপরিণত] সন্তানসন্ততি রয়েছে এবং তা আগুনযুক্ত ঘূর্ণিবায়ুতে আক্রান্ত হয় এবং পুড়ে যায়। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য [তাঁর] আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।"

মহান আল্লাহ, তিনি মানুষকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

" *যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ..."*

এই পৃথিবীতে তাদের দেওয়া নেয়ামত এবং জান্নাতে পাওয়া নেয়ামতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"... এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলিম জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাত্ তাদেরকে উপহার হিসেবে এর মালিকানা দেওয়া হবে। এই কারণেই মুসলিমরা জান্নাতে যা খুশি তা করতে স্বাধীন থাকবে কারণ তাদেরকে এর মালিকানা দেওয়া হবে। অথচ এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলো মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, উপহার হিসেবে নয়। একটি উপহার মালিকানা নির্দেশ করে যেখানে একটি ঋণ মানে আশীর্বাদ অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জড় জগতের নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হল সেগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ ও করুণা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

পার্থিব নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা প্রচুর সওয়াব পাবে কিন্তু যদি তা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে, তাহলে এই নিয়ামত তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

উপহার এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক যাতে তারা এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলোকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

" *যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ..."*

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে, এই সওয়াব লাভের জন্য একটি ভালো নিয়তের প্রয়োজন। নিয়ত হল ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, যেমন হালাল উপার্জন ও ব্যবহার করা ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি। একজনের পুরস্কার পাওয়ার জন্য এই দুটিই সঠিক হতে হবে। এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করবে। যে অন্য কোন কারণে আমল করবে সে কোন সওয়াব পাবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না।

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই পুরস্কার, আশীর্বাদ ও শান্তি লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে সম্পদের মতো আশীর্বাদ ব্যবহার করতে হবে। উভয় জগতের মনের। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

" *যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ গজায়..."*

উল্লেখ্য যে, একটি উদ্ভিদ যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তেমনি একজন ব্যক্তির সওয়াব ও বরকত তাদের কাছে পৌঁছায় মহান আল্লাহর সময়সূচী অনুযায়ী, তাদের নিজস্ব সময়সূচি অনুযায়ী নয়। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান যারা ভাল কাজ করে তারা অবিলম্বে ফিরে আসার আশা করে, যা সবসময় হয় না, কারণ আল্লাহ, মহান, তাঁর সময়সূচী অনুযায়ী মানুষকে পুরস্কৃত করেন এবং আশীর্বাদ করেন, যা

উভয় জগতে তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাই মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রচেষ্টার একটি অংশ হল ভাল কাজ করার সময় ধৈর্য ধরে থাকা এবং তাৎক্ষণিক আশীর্বাদ ও প্রতিদানের আশা না করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইসলামী শিক্ষা জুড়ে নেক আমল করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু শিক্ষা দশগুণ, অন্যদের সাতশ গুণ এবং কিছু ক্ষেত্রে এমন পুরস্কারের পরামর্শ দেয় যা গণনা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করে দেন..."

এই পরিবর্তিত পুরস্কার একজনের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক হবেন, তত বেশি পুরস্কৃত হবেন। অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যত বেশি নেক আমল করবে, তত বেশি পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে সরাসরি উল্লেখিত জিনিসের ওপর যত বেশি ব্যবহার করা হয়, যেমন সম্পদের মতো, তার সওয়াবও বাড়তে পারে। , যেমন এতিম ও বিধবাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা।

তাই একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করবে, যথাসম্ভব আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করবে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

"... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।"

একজন কৃষক যেভাবে একটি ফসল রোপণ করে, তাকে তা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সর্বদা তার যত্ন নিতে হবে, একইভাবে যে ভাল কাজ করে তাকে উভয় জগতে তাদের পুরস্কার অর্জনের জন্য তাদের রক্ষা করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 262:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং তারপরে তারা যা ব্যয় করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না বা [অন্য] আঘাত করে না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে...

একজনকে অবশ্যই অন্যদের অনুগ্রহের কথা মনে করিয়ে দেওয়া এড়াতে হবে যা তারা করেছে। এমনটি করা মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অকৃত্রিমতার স্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যদের সাথে করা ভাল জিনিসগুলিকে তাদের অপমান, বিব্রত বা লজ্জিত করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা এড়াতে হবে, বিশেষ করে অন্যদের সামনে। এটি করা গর্বের একটি চিহ্ন, কারণ এই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সাহায্য করেছিল তার থেকে তারা উচ্চতর হয়ে উঠেছে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের ছোট করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা মনে রাখা জরুরী যে, সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাদের কাছে সম্পদের মতো যে নিয়ামত আছে, তা মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন ঋণ হিসেবে, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল উদ্দেশ্য এবং মনোভাব অবলম্বন করে তাদের সওয়াব নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

যে ব্যক্তি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে এবং সেইজন্য ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, সে উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 262:

" *যারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং থাকবে না। তারা কি দুঃখ পাবে।*"

মানসিক শান্তি শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে অর্জিত হয়, কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই মানবজাতিকে জীবনযাপনের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করার জ্ঞান রাখেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে। উপরন্তু, তিনি একাই একজন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিতে পারেন কিভাবে তার জীবনের সব কিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক জায়গায় স্থাপন করতে হয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করে। এই সমস্ত জিনিস উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

লোকেরা যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তারা কখনই এমন আচরণবিধি ডিজাইন করতে সক্ষম হবে না যা জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই রোগী যেভাবে ভাল শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 262:

" *...এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"*

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে চাপ এবং অসুবিধার মুখোমুখি হবেন না, কারণ এটি অনিবার্য এবং এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার অংশ। এই শ্লোকটি মনের শান্তি মঞ্জুর করাকে বোঝায় যাতে কেউ এই পৃথিবীতে যে চাপ, উদ্বেগ এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তার দ্বারা পরাস্ত না হয়। ফলস্বরূপ, তারা সাফল্যের সাথে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধা হোক, মনের শান্তি এবং উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং তার জীবনের মধ্যে জিনিস এবং লোকেদেরকে ভুল করে দেয় সে মানসিক শান্তি পাবে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির দ্বারা কাটিয়ে উঠবে, যার ফলে তাদের চাপ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলির মধ্যে গভীরভাবে না পড়ে, যেমন বিষণ্নতা, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করে। . অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ, তারপর একটি বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন যা অবশ্যই বুঝতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 263:

" সদয় কথাবার্তা এবং ক্ষমা করা দাতব্যের চেয়ে উত্তম যার পরে আঘাত করা হয়..."

একজন ব্যক্তির পক্ষে ভাল কথাবার্তার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করা থেকে নিজেকে অজুহাত দেওয়া, তারপর আন্তরিকভাবে সাহায্য করা যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা না করে তাদের কাছ থেকে এক প্রকার কৃতজ্ঞতা বা ক্ষতিপূরণ আশা করে। একজন ব্যক্তির সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করা কারো প্রতি কখনই অভদ্র আচরণ করা উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের সাহায্য করার অবস্থানে না থাকে তবে তাদের উচিত নিজেদেরকে সদয়ভাবে ক্ষমা করা এবং অন্ততপক্ষে অভাবী ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা উচিত যে যতক্ষণ তারা ধৈর্যশীল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করবেন। একজনকে আলতো করে এই উপদেশ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। এছাড়াও, কেউ একজন অভাবী ব্যক্তিকে অন্য কাউকে বা এমন সংস্থার কাছে নির্দেশ দিতে পারে যা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হতে পারে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা একটি ভাল কাজ, এমনকি যদি কেউ অন্য কাউকে সাহায্য করতে না পারে, যেমন আর্থিক সাহায্য। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন একজন অন্যকে সাহায্য করে, তখন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে না, তারা কেবল নিজের উপকার করছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

“যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার [অর্থাৎ আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং সৃষ্টির থেকে স্বাধীন এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করবেন যদি কোনো ব্যক্তি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, যদি মহান আল্লাহ তাকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার মাধ্যমে পুরস্কার লাভের সুযোগ দেন। তারা তা করার উপায় ভোগদখল. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 263:

"... আর আল্লাহ অভাবমুক্ত..."

এবং অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে, এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট খাতায় রয়েছে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 263:

“... আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সহনশীল।"

সাহায্য চাওয়া ব্যক্তি এবং অভাবী ব্যক্তি উভয়ের জন্য সহনশীলতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তার উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করা, মহান, আত্মবিশ্বাসী যে তিনি তাদের ব্যয় করার চেয়ে অনেক ভালো ক্ষতিপূরণ দেবেন। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 39:

"বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন এবং তার জন্য [তা] সীমিত করেন। তবে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" "

যদি তারা অন্যকে সাহায্য করার অবস্থানে না থাকে, তবে তাদের অবশ্যই একজন অভাবী ব্যক্তির প্রতি সহনশীলতা দেখাতে হবে যে তাদের সাহায্য না করার জন্য তাদের সমালোচনা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের জীবনের লক্ষ্য মহান আল্লাহকে খুশি করা, মানুষকে নয়। তাই যদি অন্য একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের সমালোচনা করে, তবে তাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 263:

“…আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সহনশীল।"

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাদের অসুবিধার সময় ধৈর্য ধরে সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের ভূমিকা হল তাদের প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করা, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা যে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তা সমাধান করার জন্য এবং তারপর। ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা। অধ্যায় 94 আশ শরহ, আয়াত 6:

"*নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও হবে।*"

উপরন্তু, তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি পরীক্ষা করেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই বিষয়গুলো মনে রাখা একজনকে কষ্টের সময়ে সহনশীলতা দেখাতে সাহায্য করবে।

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ, মুসলমানদেরকে তাদের সকল কাজে সঠিক নিয়ত অবলম্বন করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেন, বিশেষ করে যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

“ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দানকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না যে ব্যক্তি তার সম্পদ [কেবল] লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না...”

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা যেভাবেই হোক তাদের ক্ষতি করা, যেমন তাদের বিব্রত করা, স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করেনি। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য ভালো কাজ করে সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে মহান আল্লাহ এবং বিচার দিবসে তাদের প্রতিদানে বিশ্বাস করে না। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে কারণ তাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই, যেমন আল্লাহকে খুশি করা, বা বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি

নেওয়া। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ভাল কাজ করার মনোভাব পরিহার করা অত্যাবশ্যক, কারণ এটি একটি স্পষ্ট নিদর্শন যে তারা সত্যই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, এমনকি বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিও করে না। যদি তারা মৌখিকভাবে অন্যথা দাবি করে। অর্থ, যার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুত করার জন্য কাজ করবে।

মহান আল্লাহ, তারপর একটি খারাপ উদ্দেশ্য অবলম্বন ক্ষতির উপর জোর দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"... তার উদাহরণ হল একটি [বড়] মসৃণ পাথরের মত যার উপর ধূলিকণা রয়েছে এবং একটি মুষলধারে আঘাত করা হয়েছে যা তাকে খালি করে দেয়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই [রাখতে] অক্ষম..."

এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভাল কিছু করার সাথে একটি খারাপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের প্রচেষ্টা এবং প্রতিদান নষ্ট করবে এবং উভয় জগতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের দেওয়া সম্পদ ভোগ করবে না এবং তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সেগুলি সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে কোন পুরস্কারও পাবে না। এটা একটা বিরাট ক্ষতি। এই ব্যক্তি অন্য বৈধ উপায়ে যে সম্পদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছিল তা ব্যবহার করা ভাল ছিল যা তাদের কাছে আনন্দদায়ক ছিল এবং তারপরে ভাল জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা যেমন দাতব্য, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। উপরন্তু, মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ শেষ পর্যন্ত অন্যদের কাছে তাদের অকৃত্রিমতা প্রকাশ করবেন যার ফলে

লোকেরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারাবে। এবং তারা খারাপ নিয়তে যা কিছু ভাল কাজ করেছে তাও মানুষ সহজেই ভুলে যাবে, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা অকৃত্রিম কাজগুলোকে মানুষের হৃদয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকতে দেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট যদি কেউ ইতিহাসের প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং কিভাবে তিনি মানুষের আন্তরিক কাজগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যখন মানুষের অকৃত্রিম কাজগুলো দ্রুত বিস্মৃত হয়ে যায়, যদিও সেগুলি একটি হাসপাতাল নির্মাণের মতো বড় কাজ ছিল। এবং যেহেতু লোকেরা সাধারণত অকৃতজ্ঞ হয়, তারা সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টার সত্যই প্রশংসা করবে না যে তাদের খুশি করার জন্য ভাল কাজ করে। এটি কেবল ব্যক্তিটিকে তিক্ত এবং দুঃখিত করে তুলবে। এটি তাদের মনের শান্তি পেতে আরও বাধা দেবে । অতএব, খারাপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করলে উভয় জগতের শক্তি, সময়, সম্পদ এবং পুরস্কার নষ্ট হয়। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কৃতকর্মের বিষয়ে অবহিত করব? [তারা] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

264 নম্বর আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি খারাপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস রাখে না, এবং ফলস্বরূপ এই ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের মানসিক শান্তির জন্য পরিচালিত হবে না। এই বিশ্ব অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"... আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

এটা তার জন্য সতর্কবাণী যে ভালো কাজ করার সময় খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে, যদিও সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। ঈমান হলো এমন একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের দ্বারা পুষ্ট করতে হবে যা ভালো উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেভাবে একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হয়, যেমন জল, মরে যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও ভাল হতে পারে যে ভাল কাজের দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় যা ভাল উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে সন্তুষ্ট করা এবং বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সঠিক উদ্দেশ্য সহ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, সঠিকভাবে দান করা আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুবিধা ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 265:

"এবং যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজেদেরকে নিশ্চিত করার জন্য..."

নিজেদেরকে আশ্বস্ত করা ইঙ্গিত দেয় যে এই ব্যক্তি সঠিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করার সাথে সাথে তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করে। অর্থ, সঠিক নিয়ত অবলম্বন করা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের লক্ষণ। তাই বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য একজনকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে কারণ এটি তাদের নিয়ত, কথা ও কাজকে সর্বদা সংশোধন করতে সহায়তা করবে। ঈমানের নিশ্চিততা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে আলোচিত ইসলামের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, তারা তত বেশি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হবে। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং একজনকে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সহায়তা করে। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কেবল একজনকে ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। এটি একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় ফেলে দেয়। এর ফলে একজনকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 265:

"এবং যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের জন্য [পুরস্কারের] নিশ্চয়তার জন্য ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল উঁচু জমিতে একটি বাগানের মতো যা বৃষ্টিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় - ফলে এটি তার দ্বিগুণ ফল দেয়। এবং [এমনকি] যদি এটি একটি মুষলধারা দ্বারা আঘাত না হয়, তাহলে একটি গুঁড়ি গুঁড়ি [যথেষ্ট]..."

এই আয়াতে উল্লিখিত দ্বিগুণটি পুরষ্কার, করুণা এবং মানসিক শান্তিকে বোঝাতে পারে যখন তারা সঠিক নিয়তে সঠিক পথে কাজ করে উভয় জগতেই প্রাপ্ত হয়। উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজনের নিয়ত যত আন্তরিক হবে, সে তত বেশি সওয়াব পাবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে।

আয়াতের এই সেটটি মহান আল্লাহর সাথে সমাপ্ত হয়, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি তাদের উদ্দেশ্য এবং কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করার সাথে সাথে উভয় জগতেই তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 265:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সর্বদা তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজ সংশোধন করবে, অন্যথায় তাদের প্রচেষ্টা, সময় এবং পুরস্কার উভয় জগতেই নষ্ট হবে।

আল্লাহ, মহান, একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলোচিত মূল আয়াতগুলোর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 266:

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি খেজুর গাছ ও আঙ্গুরের বাগান করতে পছন্দ করবে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে যার প্রতিটি ফল থেকে সে আছে? কিন্তু সে বার্ধক্যে পীড়িত এবং তার দুর্বল [অর্থাৎ অপরিণত] সন্তানসন্ততি রয়েছে এবং এটি আগুনযুক্ত ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত করে এবং পুড়ে যায়..."

এই দৃষ্টান্তের অর্থ এই হতে পারে যে, যখন কেউ অকৃত্রিম কাজ করে, তখন তার সমস্ত প্রচেষ্টা, পার্থিব অর্জন, সম্পদ এবং পুরস্কার নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে যেমন পার্থিব অসুবিধার সময়, মৃত্যুর সময়, কারও উপকারে আসে না। কবরে বা বিচার দিবসে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কৃতকর্মের বিষয়ে অবহিত করব? [তারা] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 23:

"এবং তারা যা করেছে, আমরা তার নিকটবর্তী হব এবং তাদেরকে ধূলিকণার মতো করে দেব।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 266:

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি খেজুর গাছ ও আঙ্গুরের বাগান করতে পছন্দ করবে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে যার প্রতিটি ফল থেকে সে আছে? কিন্তু সে বার্ধক্যে পীড়িত এবং তার দুর্বল [অর্থাৎ অপরিণত] সন্তানসন্ততি রয়েছে এবং এটি আগুনযুক্ত ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত করে এবং পুড়ে যায়..."

মূল আয়াতগুলি যেমন একজনকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, এই দৃষ্টান্তটি সেই ব্যক্তিকেও নির্দেশ করতে পারে যে তারা অযথা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। এবং পাপপূর্ণ জিনিস এবং তাদের মনোভাবের কারণে তারা বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল করে ফেলে। তাদের মনোভাবের ফলে, তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে ওঠে, কারণ তারা

তাদের জীবনে অপব্যবহার এবং ভুল স্থান পেয়েছে। এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মনের শান্তি অর্জন করতে পারে না, যদিও তারা অনেক পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদের অধিকারী হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে, যেমন একটি পার্থিব অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া, তাদের কোন সম্পদই তাদের সেই মানসিক সমর্থন দেয় না যা তাদের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন। এবং যখন তারা তাদের জবাবদিহির জন্য পরকালে পৌঁছাবে, যেহেতু তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত ছিল না, তারা উপমায় বৃদ্ধের মতোই খালি হাতে থাকবে।

অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের এই ফলাফলগুলিকে এড়ানো নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং কার্যত তাদের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত করার সময় সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। পরকালে এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। কিন্তু ২৬৬ নং আয়াতের শেষে নির্দেশিত হয়েছে, যারা ইসলামের শিক্ষাগুলোকে খোলা মনে চিন্তা করে শুধুমাত্র তারাই এগুলো থেকে উপকৃত হবে। যদিও, যারা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বা তারা বোঝে না এমন ভাষায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে তারা এর শিক্ষা ও পাঠ থেকে উপকৃত হবে না কারণ তারা এর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে না বা তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 266:

"... *এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য [তার] আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।*"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 267-274

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا
تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ٢٦٧

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ
وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ
أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾
۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ
فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى
ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا
يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় কর। এবং তা থেকে ত্রুটিপূর্ণের দিকে লক্ষ্য করবেন না, [তা থেকে] ব্যয় করুন যখন আপনি চোখ বন্ধ করা ছাড়া তা গ্রহণ করবেন না। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।

শয়তান তোমাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। আর বুদ্ধিমান ছাড়া আর কেউ মনে রাখবে না।

আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা মানত কর, আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন, তবে তারা ভাল; কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন কর এবং গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য উত্তম এবং তিনি তোমার কিছু পাপ দূর করে দেবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত।

তাদের হেদায়েতের [দায়িত্ব] আপনার উপর নয়, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা (বিশ্বাসীরা) যা কিছু ভালো খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় কর না। আর তোমরা যা কিছু উত্তম অর্থ ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

[দাতব্য] দরিদ্রদের জন্য যারা আল্লাহর পথে সীমাবদ্ধ, দেশে চলাফেরা করতে অক্ষম। একজন অজ্ঞ [ব্যক্তি] তাদের সংযমের কারণে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করবে, কিন্তু আপনি তাদের [বৈশিষ্ট্য] লক্ষণ দ্বারা তাদের চিনবেন। তারা অবিরতভাবে লোকেদের জিজ্ঞাসা করে না [বা মোটেও]। আর তোমরা যা কিছু ভালো কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

যারা তাদের সম্পদ [আল্লাহর পথে] রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা শান্তি অর্জন করতে পারে। উভয় জগতের মনের। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 267:

“ হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় কর...”

যখন একজন মুসলমান সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে যা আছে সবই মহান আল্লাহর, তখন তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেমন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দান করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল একটি ঋণ ফেরত দিচ্ছে যা মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দাতব্য কাজকে ধ্বংস করা থেকেও রক্ষা করে। গর্ব একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে যে তারা দাতব্য দান করার মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং অভাবগ্রস্তদের উপকার করছে। কিন্তু একইভাবে গর্ব ছাড়াই ব্যাঙ্ক লোন ফেরত দিলে মুসলমানদের বুঝতে হবে তাদের দাতব্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। এ ছাড়া অভাবগ্রস্তরা তাদের দান-খয়রাত নিয়ে দাতার উপকার করছেন। অভাবগ্রস্তরা তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের একটি মাধ্যম এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মাধ্যমে সঞ্চিত হয়েছে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এগুলোও মহান আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের শাস্তি হতে পারে যা দুনিয়া থেকে শুরু হয়ে পরকালে চলতে থাকবে।

যখন কেউ দান করে তখন তাদের লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না আসলে তা মহান আল্লাহর সাথে হয়। যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা একটি অকল্পনীয় লাভের আস্থা রাখতে পারে যা তাদের ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হবে। আলোচ্য মূল আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

মহান আল্লাহ, তারপর একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন নীতি ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 267:

"... এবং সেখান থেকে ত্রুটিপূর্ণের দিকে লক্ষ্য করবেন না, [সেখান থেকে] ব্যয় করুন, যখন আপনি চোখ বন্ধ করা ছাড়া এটি [নিজেকে] গ্রহণ করবেন না ..."

একজনের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে সে নিজেই অন্য লোকেদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 13 নম্বর হাদিস অনুসারে বিশ্বাসীর সংজ্ঞা। আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সহায়তা হিসাবে।

আল্লাহ, মহান, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আয়াত ২৬৭ শেষ করেছেন যে তারা যে আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যবহার করে, যেমন অন্যদের সাহায্য করা, শুধুমাত্র নিজের উপকার করে, কারণ মহান আল্লাহ স্বাধীন এবং অভাবমুক্ত এবং সহজেই একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারেন। আরেকটি অর্থ হল, যদি কোনো ব্যক্তি পুরষ্কার অর্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে অভাবী ব্যক্তিকে সহায়তা করে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 267:

"...এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ অভাবমুক্ত..."

এবং গ অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

“যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার [অর্থাৎ আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে একটি ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, জ্ঞান এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, অন্যদের সাহায্য করার মতো ভাল কাজ করার সময় একজনের নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়, বরং তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, যিনি তাদের ভাল কাজ করতে সক্ষম করেছেন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং মানসিক শান্তি পেতে পারে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 267:

"... এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।"

মহান আল্লাহ, তারপর মানুষকে ভয় দেখিয়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে শয়তানের হাতিয়ার যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির কিছু দিক দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

"শয়তান তোমাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়..."

এই দারিদ্র্য বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যেমন আর্থিকভাবে দরিদ্র হওয়া। একজন ব্যক্তি সামাজিকভাবে দরিদ্র হওয়ার ভয় পেতে পারেন। তাদের জীবনে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠার ভয় , যেমন স্কুলের ছাত্র এবং কাজের সহকর্মীরা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। একজন ব্যক্তি মানসিক দারিদ্র্যকে ভয় করতে পারে, যার ফলে তারা ভয় পায় যে তারা যদি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করতে হারাবে, যা তাদের সুখ এবং মানসিক শান্তি থেকে বাধা দেবে। এই এবং অন্যান্য ভয়ের ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত হয় যা তাকে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

"শয়তান তোমাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়..."

কিন্তু একজন ব্যক্তিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ একাই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি একজন ব্যক্তিকে এই সমস্ত ভয়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন, যতক্ষণ না তারা প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে। সঠিকভাবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

“শয়তান আপনাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং আপনাকে অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

একটি জিনিস যা এই সমস্ত ভয় এবং তাদের নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারে তা হল মানসিক শান্তি। অন্যদিকে, মনের শান্তির অভাব একজনকে ভয়ের জীবন যাপন করতে পারে, এমনকি যদি তারা তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে। এই বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্যের ভয়ে যে বেঁচে থাকে , সে বাস্তবে বেঁচে থাকে না, এমনটা দেখা গেলেও। অতএব, এই ভয় এবং তাদের নেতিবাচক পরিণতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একজনকে অবশ্যই মানসিক শান্তি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে দেয়। এই সমস্ত মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, যা ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তিকে আগে আলোচিত ভয় এবং তাদের নেতিবাচক পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

“শয়তান আপনাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং আপনাকে অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

"... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।"

এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা

ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

এবং এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক শান্তি দেবেন যারা তিনি তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

“শয়তান তোমাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

এই আয়াতটি মহান আল্লাহর রহমতের আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যেও পার্থক্য করে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, তাঁর কাছ থেকে করুণা, ক্ষমা এবং আশীর্বাদের আশা করে। ইসলামে এর কোনো মূল্য নেই, কারণ এই ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করছে। অথচ, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা হল, যখন কেউ তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তিনি যে নিয়ামত দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এবং তারপর তাঁর রহমতের আশায়। এই আচরণে নিখুঁত হওয়া মহান আল্লাহর উপর আশা করার শর্ত নয়। কিন্তু একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যখনই তারা পাপ করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 269:

"তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, এবং যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে..."

প্রজ্ঞা হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে এটি উভয় জগতে তাদের এবং অন্যদের উপকার করে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, জ্ঞান নিজেই ভাল বা খারাপ নয়। জ্ঞান ভালোর উৎস হয়ে উঠতে পারে যখন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। যদিও জ্ঞানের অপব্যবহার হলে তা মন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে ওষুধ এবং অন্যান্য সুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার হলে অস্ত্র ও অন্যান্য বিপজ্জনক জিনিস তৈরি হয়। এটা প্রজ্ঞা যা একজনকে তাদের কাছে থাকা জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এবং এই প্রজ্ঞা ইসলামিক শিক্ষা থেকে উদ্ভূত, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে শেখায় যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি যেমন তার জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে শেখায় যাতে তারা মনের শান্তি অর্জন করে। উভয় জগত কিন্তু ২৬৯ নং আয়াতের শেষে নির্দেশিত হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই যারা ইসলামের শিক্ষাগুলোকে উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনের সাথে গ্রহণ করবে তারাই এর প্রজ্ঞা এবং উভয় জগতের মানুষকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতার প্রশংসা করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 269:

"...এবং বুদ্ধিমান ছাড়া কেউ মনে রাখবে না।"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেন যে, এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে যায় যখন সে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে অথবা এই আচরণ সমাজের দ্বারা সমালোচিত হয়, মহান আল্লাহ তাদের নিয়ত, কথাবার্তা ও

কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং ক্ষতিপূরণ দেবেন। তাদের সেই অনুযায়ী। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 270:

"এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন..."

তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মানুষের মনোভাব এবং সমালোচনার দ্বারা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয় এবং বরং তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তারা মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারবে না এবং তারা তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল করে ফেলবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি ছাড়া কিছুই পাবে না, যেমন বিষণ্নতা, পদার্থের আসক্তি এবং আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করে, এবং তাদের পার্থিব সম্পদ বা সম্পর্কগুলির কোনটিই এই

ফলাফলকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। একজন ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করলে এই শেষটি বেশ সুস্পষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 270:

"...এবং জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 270:

"এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটি ব্রত হল যখন কেউ একটি নির্দিষ্ট ভাল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয় যদি তারা তার ইচ্ছাকৃত কিছু পায়। যদিও, ইসলামে এটি বেআইনি নয়, কমও নয়, এটি যতটা সম্ভব এড়ানো উচিত একজন ব্যক্তি সহজেই এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যেখানে তারা এমন আচরণ করতে পারে যেন তাদের ভাল কাজগুলি মহান আল্লাহর কাছে মূল্যবান এবং তারা কেবল তা করবে। যখন তাদের পার্থিব জিনিস দেওয়া হয় যা তারা চায়। মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির থেকে স্বাধীন এবং কারো কাছ থেকে কিছুর প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তির কাজ কেবল তার নিজেরই উপকার করে অথচ মহান আল্লাহ তাদের থেকে কোন উপকার লাভ করেন না এবং অন্য লোকদেরও না। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

“যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার [অর্থাৎ আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

মহান আল্লাহ, তারপর দাতব্যের মতো সরকারী ও ব্যক্তিগত ভালো কাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 271:

“আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন, তবে তারা ভাল; কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন করে গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য উত্তম...”

উভয় ক্ষেত্রেই, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি ভাল কাজ কবুল হওয়ার জন্য, একজনকে অবশ্যই একটি ভাল উদ্দেশ্য অবলম্বন করতে হবে, যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং ভাল কাজটি অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও বিধান অনুসারে করা উচিত। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে কোন প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য জনসাধারণের ভালো কাজ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি তাদের অনুপ্রেরণার উপর কাজ করে তার দ্বারা অর্জিত একই পুরস্কার একজন ব্যক্তি লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 85:

“যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করবে তার একটি অংশ [অর্থাৎ, পুরস্কার] পাবে; আর যে কেউ মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে তার জন্য তা থেকে একটি অংশ [অর্থাৎ বোঝা] পাবে। আর সর্বদাই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে রক্ষক।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যে ব্যক্তি অন্যকে খারাপ কিছু করতে উত্সাহিত করে সে তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করার মতো শাস্তি পাবে। অতএব, একজনকে কেবল অন্যকে ভাল কাজ করার উপদেশ দিতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 271:

"আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন তবে তারা ভাল..."

কিন্তু যারা ভয় করে যে তারা তাদের ভাল কাজ প্রচার করে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করবে, তাদের উচিত যথাসম্ভব গোপন করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 271:

"...কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন করে গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য ভালো..."

উপরন্তু, যে ক্ষেত্রে একজন অন্য একটি উপকার করছে, যেমন তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা, তাদের ভাল কাজটি গোপন করা ভাল, যাতে অভাবী ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে বিব্রত হতে না পারে। জনসাধারণের বিব্রতবোধ একজন অভাবী ব্যক্তিকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে উত্সাহিত করতে পারে।

যেভাবেই হোক, একজনকে অবশ্যই একটি ভাল উদ্দেশ্য বজায় রাখতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাতে তারা তাদের পুরষ্কার নষ্ট না করে, যেমন অভাবী ব্যক্তিকে তারা যে অনুগ্রহ করেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ এই নেক কাজের কারণে তাদের কিছু গুনাহ মুছে দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 271:

"...এবং তিনি তোমাদের কিছু অপকর্ম দূর করবেন..."

এবং অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 114:

"...প্রকৃতপক্ষে, ভাল কাজগুলি খারাপ কাজগুলিকে দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি একটি অনুস্মারক।"

ছোটখাট পাপগুলো ভালো কাজের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়, যেখানে বড় পাপগুলো মুছে ফেলার জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের মধ্যে গুলিকে ছোট এবং বড় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে একটি বড় পাপ ঠিক কী তা সম্পর্কে অনেক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল যে কোন পাপের জন্য ইসলাম ইসলামী সরকারকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোন পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপ উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি বড় গুনাহ। গুনাহকে ছোট করা বা সেগুলোর উপর অটল থাকাও সেগুলোকে বড় গুনাহ করতে পারে। সঠিক সংজ্ঞা মানবজাতির কাছে প্রকাশ করা হয়নি যাতে তারা একটি বড় পাপ হতে পারে এই ভয়ে সমস্ত পাপ এড়াতে চেষ্টা করে।

যেহেতু মহান আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তাদের নিয়ত, কথাবার্তা এবং কাজ সংশোধন করবে যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 271:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে [সম্পূর্ণ] অবহিত।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 272:

"তাদের হেদায়েতের [দায়িত্ব] আপনার উপর নয়, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন..."

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, প্রাথমিকভাবে তাদের অমুসলিম আত্মীয়স্বজন বা অন্যান্য অমুসলিমদের যারা অভাবগ্রস্ত ছিল তাদের সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। তারা মনে করত যে শুধুমাত্র মুসলমানদের সাহায্য করাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করবে। উপরন্তু, কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে তারা যদি শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের জন্য দান করা সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে অমুসলিমরা বিশ্বাস গ্রহণে আরও বেশি ঝুঁকবে যাতে তারাও দান গ্রহণ করতে পারে। এই আয়াত তাদের মনোভাব সংশোধন করেছে। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই নির্দেশ করা যে মুসলমানরা মানুষের উপর সত্যিকারের দিকনির্দেশনা চাপানোর জন্য দায়ী নয়। মানুষের কাছে তাদের কর্মের মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া তাদের উপর দায়বদ্ধ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তখন তারা সত্যকে অনুসরণ করতে চায় কি না তা মানুষের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি সত্যের অনুসরণ করবে, তাকে ইসলামের শিক্ষা বোঝার এবং তার উপর আমল করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে তাদের মনোনীত পথে চলতে দেওয়া হবে, কারণ মহান আল্লাহ কাউকে নির্দেশনা দিতে বাধ্য করেন না। উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত নয় যে তারা প্রকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করছে না বলে দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে। তারা গরীব লোকদের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যা কিছু সাহায্য করে তার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা পুরস্কৃত হবে। তাফসির ইবনে কাথির, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 63 এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 272:

"...আর তোমরা [বিশ্বাসীরা] যা কিছু ভালো খরচ কর তা নিজেদের জন্যই, এবং তোমরা আল্লাহর মুখ [অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভের জন্য] ব্যয় করো না..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি কেবল তখনই নিজেদের পক্ষপাতিত্ব করে যখন সে ভালো কাজ করে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের ভালো কাজের কোনো প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, একজন অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। যদি অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে দাতা কিভাবে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে? অতএব, একজন ব্যক্তিকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা যে সমস্ত ভাল কাজ করে তা তাদের নিজের স্বার্থে, কারণ এটি তাদের উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 272:

"...এবং আপনি যা কিছু ভাল ব্যয় করবেন - তা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হবে এবং আপনার প্রতি জুলুম করা হবে না।"

এই ক্ষতিপূরণটি মনের শান্তির সাথে সাথে অন্যান্য আশীর্বাদ ও সুযোগের আকারে আসে, যেমন আর্থিক সুযোগ, যার সকলের লক্ষ্য একজন ব্যক্তির মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করা, যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখে। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আত্মমগ্ন হওয়া এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করেন যেখানে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে এবং

ফলস্বরূপ তারা তাদের চারপাশের লোকদের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 273:

"[দান] দরিদ্রদের জন্য যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ, দেশে চলাফেরা করতে অক্ষম। একজন অজ্ঞ [ব্যক্তি] তাদের সংযমের কারণে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করবে, কিন্তু আপনি তাদের [বৈশিষ্ট্য] লক্ষণ দ্বারা তাদের চিনবেন। তারা ক্রমাগত লোকদের জিজ্ঞাসা করে না [বা মোটেও]..."

অধিকাংশ অভাবী মানুষ বিজ্ঞাপন দেয় না বা অন্যদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করে না। তাই, মুসলমানদের তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য উত্সাহিত করা হয় যাতে তারা একে অপরকে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যাতে তাদের সহায়তা প্রয়োজন। ইসলামি শিক্ষায় মসজিদে জামাতের সাথে ফরয নামায পড়ার বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি মুসলমানদের অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং এই সংযোগগুলির মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে দেয় যারা তাদের প্রয়োজনকে স্পষ্ট করে তোলে না। এছাড়াও, এই সংযোগগুলি একজন অভাবী ব্যক্তিকে অন্যের কাছে নির্দেশ করতে দেয় যারা তাদের সাহায্য করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে কেউ চাকরি খুঁজছেন তাকে সম্প্রদায়ের একজন সদস্যের সাথে লিঙ্ক করা যেতে পারে যিনি একজন কর্মচারী খুঁজছেন।

উপরন্তু, এই আয়াতটি শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অন্যদের কাছে সাহায্য চাওয়ার আগে একজন ব্যক্তিকে প্রথমে তাদের প্রদত্ত সমস্ত সম্পদ যেমন তার শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার উপর অবিচল থাকা একজন মানুষের উপর বেশি

নির্ভরশীল এবং মহান আল্লাহর উপর কম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত। উপরন্তু, যে ব্যক্তি সাহায্যের জন্য অন্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সেও তাদের আত্মসম্মান এবং মর্যাদা হারাতে পারে, যা প্রায়শই অন্যান্য পাপের দিকে নিয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আবার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি একজন ব্যক্তির অভিপ্রায়, কথা ও কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 274:

"... আর তোমরা যা কিছু ভালো কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিয়ত, কথাবার্তা এবং কাজকে সংশোধন করতে হবে এবং যথাসম্ভব ভাল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং পুরস্কার লাভ করে। যেহেতু এই কল্যাণের সাথে একজনকে দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, কেউ ভাল কাজ থেকে নিজেকে অজুহাত দিতে পারে না, কারণ প্রত্যেককে কিছু পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তারপর বিভিন্ন উপায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন যে একজন ব্যক্তির তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের সম্পদ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 274:

"যারা তাদের সম্পদ [আল্লাহর পথে] রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে...

তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে কখন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তা বেছে নেওয়া উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে তারা যে কোনও পরিস্থিতিতে মুখোমুখি হবেন। ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা এবং একজন ব্যক্তি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাকে অবশ্যই প্রভাবিত করতে হবে। ইসলামকে কখনই এমন একটি কোটের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরা এবং খুলে ফেলা যায়। যারা এমন আচরণ করে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে না, তারা কেবল নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

তাই ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, তাদের দিন-রাত্রি জুড়ে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তাদের দেওয়া আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 274:

"যারা তাদের সম্পদ [আল্লাহর পথে] রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে...

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারও উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের কথাবার্তা ও কাজ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী হয়, ততক্ষণ তারা প্রকাশ্যে ভাল কাজ করতে পারে। , অন্য লোকেদের উত্সাহিত করার জন্য, বা গোপনে, যাতে তাদের উদ্দেশ্য কলুষিত না হয়। যেভাবেই হোক, তারা উভয় জগতেই তাদের পুরস্কার পাবে। পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এই পুরস্কারের একটি দিক হল উভয় জগতের মানসিক শান্তির অমূল্য আশীর্বাদ অর্জন করা। ইসলামি শিক্ষা অনুসারে যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখন এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের পরকালের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সহায়তা করে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 274:

"...এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

একজন ব্যক্তি এখনও এই পৃথিবীতে চাপ এবং অসুবিধার সম্মুখীন হবে, কারণ এটি এই পৃথিবীতে বসবাসের পরীক্ষার একটি অংশ। কিন্তু তাদের মানসিক শান্তি এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠবে যাতে তারা উভয় জগতে পুরষ্কার, আশীর্বাদ এবং আরও মানসিক শান্তি লাভ করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যেহেতু মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সব বিষয়েই জানেন, তাই তিনি একাই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। যেখানে, সমাজ প্রদত্ত আচরণবিধি তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার ঘাটতি এবং তাদের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের কারণে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় না। অতএব, একজনকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগী হিসাবে কাজ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 275-281

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না এমন একজন দাঁড়ানো ছাড়া যাকে শয়তান প্রহার করে পাগলামিতে পরিণত করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, "বাণিজ্য সুদের মতই। কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছে এবং তা থেকে বিরত রয়েছে তার অতীত হতে পারে এবং তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কিন্তু যারা [সুদ বা সুদের কারবারে] প্রত্যাবর্তন করে, তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে এবং নামায কায়েম করে এবং জাকাত দেয় তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

আর যদি তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে [তোমাদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধের খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি আপনি অনুতপ্ত হন, তবে আপনার প্রধান হতে পারে - [এভাবে] আপনি কোন অন্যায় করবেন না, আপনার প্রতি অন্যায়ও হবে না।

আর যদি কেউ কষ্টে থাকে, তবে [একটি ঋণ] স্বস্তির সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক। অতঃপর যদি তোমরা সদকা কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

"যারা সুদ খায়, তারা দাঁড়াতে পারে না এমন একজন ব্যতীত যে দাঁড়ানো অবস্থায় শয়তানের দ্বারা প্রহার করা হয় পাগলামিতে..."

এটি সতর্ক করে যে সম্পদ অর্জনের বেআইনি উপায়গুলির সাথে মোকাবিলা করা, যেমন আর্থিক স্বার্থ, শুধুমাত্র একজনকে একটি লোভী এবং স্বার্থপর মানসিকতা অবলম্বন করতে উত্সাহিত করে যেখানে তারা তাদের এবং অন্যদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব নির্বিশেষে কেবলমাত্র আরও সম্পদ অর্জনের বিষয়ে চিন্তা করে। এই লোকেরা আর্থিক স্বার্থ খায়, যেমন একজন লোভী ব্যক্তি যখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করে। তারা যে কোনও উপায়ে আরও সম্পদ উপার্জনের জন্য এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে তারা স্বাভাবিক মানের দ্বারা পাগল বলে মনে হয়। যে মুসলিমরা এই মানসিকতা অবলম্বন করবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের ঈমান নষ্ট করবে কারণ তারা এমন কাজ করবে যা এর বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের ঈমানের জন্য ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে যা ভেড়ার পালকে মুক্ত করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই উন্মাদ মনোভাব একজনকে মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা প্রচুর সম্পদ অর্জন করে। এর কারণ হল তাদের মনোভাব তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং তারা নিঃসন্দেহে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল করে ফেলবে। অধিক ধন-সম্পদ লাভের নিরন্তর চিন্তা এবং তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা হারানোর ক্রমাগত ভয় তাদের মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা এবং উভয় জগতেই কষ্ট বাড়িয়ে দেবে। চরম দীর্ঘ ঘন্টা কাজ এবং ঘুম এবং বিশ্রামের অভাব জিনিসগুলিকে আরও খারাপ করে তুলবে। তারা যতই সম্পদ এবং অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জন করুক না কেন, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না। যারা সম্পদ অর্জনের তীব্র লোভকে অবলম্বন করে তাদের লক্ষ্য করলে এটা খুবই স্পষ্ট। অতএব, একজন মুসলিমকে তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের স্বার্থে আর্থিক স্বার্থের মতো সব ধরনের অবৈধ সম্পদ পরিহার করতে হবে।

এছাড়া এটাও খেয়াল রাখা জরুরী যে, ব্যক্তির নিয়ত যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, তেমনি হালাল জিনিস উপার্জন ও ব্যবহার করাও ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি।

যদি কারো ভিত্তি কলুষিত হয়, তাহলে তারা যা কিছু করবে তা কলুষিত হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন, যেমন দান করা। একজনের বিশ্বাসের ভিত্তি কলুষিত করা পাপ করার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ যা তাদের বিশ্বাসের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে এবং তাই সর্বদা এড়ানো উচিত।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেন যেন তারা কোনো অজুহাত না দাঁড় করান কারণ তারা তাঁর কাছে গৃহীত হবে না। বাণিজ্য ও আর্থিক স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি আগেও আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু ইসলামের কিছু নিষেধাজ্ঞা বা আদেশের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারলেও একজন মুসলিম হিসেবে সেগুলি মেনে নেওয়া এবং কাজ করার অধিকার তাদের নেই। কোন আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে বাছাই করতে এবং বেছে নিতে। তাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে যদি কিছু হালাল হয় তবে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ভাল। আর যখন কিছু হারাম হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ক্ষতিকর, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

"যারা রসূলকে অনুসরণ করে, নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে লিখিত দেখতে পায়, যিনি তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য ভাল জিনিস হালাল করেন এবং হারাম করেন। তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে এবং তাদের বোঝা থেকে মুক্তি দেয় এবং তাদের উপর যে শেকল ছিল..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 275:

"...এর কারণ তারা বলে, "বাণিজ্য হল [শুধু] সুদের মতো।" কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন..."

এবং তার উপর কাজ করার পরিবর্তে তর্কের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্য রাখে । ইস্যুটি আর্থিক স্বার্থ, বাণিজ্য নয়, তবুও লোকেরা দুটির তুলনা করার সময় বাণিজ্যকে প্রথমে রাখে যাতে এটি প্রদর্শিত হয় যে আর্থিক স্বার্থ নিষিদ্ধ করা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার মতোই অযৌক্তিক। যারা শুধুমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করে যেখানে তারা চরম উদাহরণের মাধ্যমে সত্যকে বোকা বলে মনে করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি যিনি দাতব্য দান করতে চান না, অন্য একজন দ্বারা তা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তারা দাবি করবে যে তাদের তাদের সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার এবং গৃহহীন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপদেশটিকে প্রসঙ্গ থেকে বের করে নেয় যাতে এটি অযৌক্তিক মনে হয়। অথবা যখন মানুষকে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন ও আমল করার জন্য উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের চরিত্র উন্নত করে, তখন তারা দাবি করবে যে তারা নিখুঁত হতে পারে না, যেমন উপদেষ্টার দাবি। যদিও উপদেষ্টা পরিপূর্ণতা দাবি করেননি তবুও ব্যক্তি পরামর্শটিকে প্রসঙ্গ থেকে বের করে এবং চরম পর্যায়ে নিয়ে যায় যাতে এটি অযৌক্তিক বলে মনে হয়, কারণ তারা পরামর্শে কাজ করতে চায় না। এই মনোভাব অবশ্যই পরিহার করতে হবে কারণ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সঠিক নির্দেশনা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ সত্যকে গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে। সঠিক দিকনির্দেশনা ছাড়া কেউ জীবনে সঠিক এবং ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না। তারা ক্রমাগত ভুল পছন্দ করবে যা তাদের উভয় জগতেই আরও চাপ, উদ্বেগ এবং সমস্যা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

"...সুতরাং যে তার প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং তা থেকে বিরত আছে তার অতীত হতে পারে, এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভর করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অকপট অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। উপরন্তু , এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে , মহান আল্লাহর বাণী যেহেতু পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ইসলামের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি শেখা এবং তা পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, কারণ অজ্ঞতা বা অন্য কোন অজুহাত দাবী করা যাবে না। মহান আল্লাহ কবুল করুন। একজন লাইসেন্সধারী চালক যেমন রাস্তার নিয়ম-কানুন শিখতে বাধ্য, তেমনি মুসলিমরাও ইসলামের বিধি-বিধান শিখতে ও মানতে বাধ্য, সে বুঝুক বা না বুঝুক।

অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা আর্থিক সুদ নিয়ে লেনদেনের মতো বড় পাপের উপর অটল থাকার মহা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

"... সুতরাং যে তার প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং তা থেকে বিরত থাকে সে অতীত হতে পারে, এবং তার বিষয় আল্লাহর উপর নির্ভর করে। কিন্তু যারা

[সুদ বা সুদের কারবারে] প্রত্যাবর্তন করে, তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

একজন মুসলিম চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, যদিও তারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে। অতএব, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা বড় পাপের উপর অবিচল থাকা এড়িয়ে চলুন অন্যথায় তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এর কারণ হল ঈমান হল একটি গাছের মত যাকে ভালো কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। একটি উদ্ভিদ যেমন পুষ্টি লাভে ব্যর্থ হয় বা ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা পায় না, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মরতে পারে যদি তা ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট না হয় বা পাপ থেকে রক্ষা না হয়। পরবর্তী আয়াতে এই সতর্কবাণীর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 276:

" আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক পাপী কাফেরকে পছন্দ করেন না।"

মহান আল্লাহ, দানশীলতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুদ বিনষ্টকারী সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তবে সংক্ষেপে বলা যায়, যেহেতু মহান আল্লাহ একাই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি নিশ্চিত করবেন যে যে ব্যক্তি দান করবে তার দ্বারা তাদের দেওয়া নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করে, উভয় জগতের বরকত ও রহমত বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিসের সাথে লেনদেন করে সে দেখতে পাবে যে তাদের জীবনের প্রতিটি পার্থিব জিনিস এবং ব্যক্তি তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার উত্স হয়ে উঠবে। এমনকি যদি এই ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে তাদের মানসিক সুস্থতা ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয় এবং

এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করে। এটা খুবই সুস্পষ্ট যখন কেউ লক্ষ্য করে যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবে, তেমনি

সেই ব্যক্তিও অর্জন করবে যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আমল করবে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই মহান। সমাজের অধিকারী মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা করা সত্ত্বেও, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শও একটি কারণ হতে পারে না। সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সব ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে। একমাত্র মহান আল্লাহই এই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের আকারে দান করেছেন। এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ, মানুষকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। জীবন তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

"... সুতরাং যে তার প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং তা থেকে বিরত থাকে সে অতীত হতে পারে, এবং তার বিষয় আল্লাহর উপর নির্ভর করে। কিন্তু যারা [সুদ বা সুদের কারবারে] প্রত্যাবর্তন করে, তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

এই আয়াতটি মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য করে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা, উভয় জগতে তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা। ইসলামে এই মনোভাবের কোনো মূল্য নেই। যেখানে, প্রকৃত আশার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণের সংস্কার করা এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা। . এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিহার করে, কারণ এটির নেই। ইসলামে মূল্য।

মহান আল্লাহ, তারপর মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 277:

" নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করা অত্যাবশ্যক কারণ ভাল কাজগুলি হল প্রমাণ এবং মুদ্রা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে..."*

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমান হল একটি উদ্ভিদের মত যাকে ভাল কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে অন্যথায় এটি ভালভাবে মারা যেতে পারে, যেমন একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি পায় না যেমন সূর্যালোক মারা যায়। কাজেই ইসলামে বিশ্বাসের দাবী করার বিভ্রান্তিকর মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং বাস্তবে এর উপর আমল করতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলমানের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং এই সংজ্ঞাটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ব্যবহারিক বশ্যতাকে সঠিকভাবে মঞ্জুর করা আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই সাধারণ জমা তারপর নির্দিষ্ট উদাহরণ সঙ্গে উল্লেখ করা হয়. অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 277:

"... এবং নামায কায়েম কর..."

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

"তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 277:

"... এবং যাকাত দাও..."

বাধ্যতামূলক দাতব্য হল একজনের সামগ্রিক আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার একটি উদ্দেশ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা তাদের

ইচ্ছামত ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, এবং তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে , একজনের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতই কেবল একটি ঋণ যা তার সঠিক মালিক মহান আল্লাহকে পরিশোধ করতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছিল, যেমন তাদের সম্পদ, সেগুলি তাদেরই এবং তাই বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির মুখোমুখি হবে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব ঋণ একটি জরিমানা সম্মুখীন. উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দান না করে, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

“আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, তারা যে সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যারা আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার পাবে, যতক্ষণ না তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 277:

" নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে।

একটি ভাল উদ্দেশ্য হল যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি অন্য কোনো কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দেওয়া নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সময় তারা প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। যেহেতু মহান আল্লাহই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সকল বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী, তাই তিনি একাই নিখুঁত আচরণবিধি উপদেশ দিতে পারেন যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তা মেনে নেয় এবং মেনে নেয় যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনেও কাজ করে, যদিও তাদেরকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ওষুধ দেওয়া হয়। খাদ্য পরিকল্পনা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 277:

"...এবং তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে কেউ এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার অংশ। বরং, এর অর্থ হল যে তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধার সাথে মোকাবিলা করার জন্য তাদের শক্তি এবং নির্দেশনা প্রদান করা হবে যাতে তারা উভয় জগতে অগণিত পুরস্কার এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে দেখতে পাবে যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি চাপের পরিস্থিতির দ্বারা পরাস্ত এবং পরাভূত হয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা সময়ের সাথে সাথে মানসিক শান্তি থেকে দূরে সরে যাবে এবং সেইজন্য তারা স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং মানসিক ব্যাধিতে পূর্ণ জীবন যাপন করবে, যেমন বিষণ্নতা, পদার্থের আসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পূর্বের একটি আয়াতে, মহান আল্লাহ, বড় পাপের সাথে জড়িত, যেমন আর্থিক স্বার্থে লেনদেন, অবিশ্বাসের সাথে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 275:

"... কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছে এবং তা থেকে বিরত রয়েছে তার অতীত হতে পারে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কিন্তু যারা [সুদ বা সুদের কারবারে] প্রত্যাবর্তন করে, তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

অতঃপর মহান আল্লাহ বড় পাপের উপর অবিচল থাকাকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 278:

" হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রমাণ হল আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেনের মতো বড় পাপের উপর অবিরত থাকা এড়ানো। অতএব, বড় পাপের উপর অবিচল থাকা সত্য বিশ্বাসের পরিপন্থী। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই ব্যক্তিকে অবশ্যই ভয় করতে হবে যে তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই মারা যেতে পারে, যা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে। একটি গাছ যেমন ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা না করায় মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও মারা যেতে পারে যদি তারা তাকে চিরস্থায়ী পাপ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

মহান আল্লাহ তখন সবাইকে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 279:

" আর যদি না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে [তোমাদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধের খবর পাওয়া যাবে..."

যার কাছে মহান আল্লাহ আছে, দুনিয়া ও পরকালে তার বিরোধিতা করে সে সফলকাম হতে পারে না এবং মনের শান্তিও পেতে পারে না, সে যতই পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করুক না কেন। যেহেতু মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ

করেন, যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস, তাই তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে আর কে পাবে না। এই সত্যটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং কিভাবে তারা পার্থিব বিলাসিতা ভোগ করেও দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যুদ্ধ, তাঁর ইন্তেকালের পর, বিচারের দিনে একজন মুসলমানের পক্ষে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সাক্ষ্যের ফলাফল কী হবে তা উপসংহারে আসতে একজন পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

“এবং [উল্লেখ করুন] যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের উপর তাদের (অর্থাৎ তাদের নবী) থেকে একজন সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করব। এবং আমরা আপনাকে, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে এগুলোর [অর্থাৎ আপনার জাতির] সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব...”

যথারীতি, অনুশোচনার দরজা সর্বদা মানুষের জন্য খোলা থাকে, যতক্ষণ না তারা তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এটি ব্যবহার করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 279:

"...কিন্তু যদি আপনি অনুতপ্ত হন, তবে আপনার প্রধান থাকতে পারে - [এভাবে] আপনি কোন অন্যায় করেন না, আপনার সাথে অন্যায়ও হয় না।"

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, 17-18 আয়াত:

“আল্লাহ তাওবা কবুল করেন শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত [অর্থাৎ গাফিলতিতে] অন্যায় করে এবং তারপর [পরে] তওবা করে। তারাই যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তওবা তাদের [কবুল করা হয় না] যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, "নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করেছি" অথবা যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

যেহেতু আর্থিক সুদের অধিকাংশ লেনদেন ঋণের সাথে যুক্ত, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে যে ঋণে আর্থিক সুদ জড়িত নয় সেগুলো বৈধ এবং পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন নম্রতা দেখানো হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 280:

" এবং যদি কেউ কষ্টে থাকে, তবে [স্বাচ্ছন্দ্যের] সময় পর্যন্ত স্থগিত করা হোক..."

যখন অন্যরা আর্থিক সমস্যায় পড়ে, তখন একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা, কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় নম্রতা এবং ভাল আচরণ দেখানো একজনের ব্যবসায়িক খ্যাতি উন্নত করবে, যা তাদের ব্যবসায়কে সাহায্য করবে। সুতরাং ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই লাভ হয়। ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করাও একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা তাদের জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার নয়। এটি শেষের উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়, শেষ হচ্ছে পরকালের জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করা। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা দেখাতে ব্যর্থ হবে, সে লোভী হয়ে উঠবে। এবং লোভ সর্বদা একজন ব্যক্তির মনোযোগকে বস্তুগত জগতে উপার্জন এবং মজুদ করার দিকে নিবদ্ধ করে। এটি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। এটি তখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, যা তাদের এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে মানসিক শান্তি অর্জন করতে বাধা দেয়। যে ব্যক্তি এটি বোঝে এবং তাই জড়জগতকে সঞ্চয় করার চেয়ে উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঋণ ত্যাগ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে উত্সাহিত হবে। যে ব্যক্তি এটি করবে সে মহান আল্লাহ তায়ালা উভয় জাহানে উপশম পাবেন। সুনানে ইবনে মাজা, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 280:

“এবং যদি কেউ কষ্টে থাকে, তবে [স্বাচ্ছন্দ্যের] সময় পর্যন্ত স্থগিত করা হোক। অতঃপর যদি তোমরা দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি সর্বদা মানুষের কাছ থেকে নিজের পূর্ণ অধিকার দাবি করা থেকে বিরত থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যদিও একজন ব্যক্তির অন্য কারো কাছে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার জন্য দাবি করার অধিকার রয়েছে, তবে সর্বদা নম্রতা পছন্দ করা হয় না, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের অধিকার ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে আশীর্বাদ করবেন। উভয় জগতেই উচ্চতর। এবং এই পুরস্কারটি তার চেয়ে উত্তম হবে যদি ব্যক্তি অন্যদের কাছে তার পূর্ণ অধিকার দাবি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানদের কাছ থেকে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করা উচিত নয় এবং যখনই সম্ভব উদারতা দেখান। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার অধিকার রয়েছে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে তাদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করার জন্য দাবি করার কিন্তু যদি তারা নিজেরাই এটি করতে সক্ষম হয় তবে তাদের উচিত এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সন্তানকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। এটি মানুষের কাছ থেকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের পাওনা অধিকারের বিষয়ে অন্যদের প্রতি নম্রতা দেখানোর জন্য একটি মহান পুরস্কার।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 280:

"... তাহলে এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

এটি মুসলিমদেরকে ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে সেরা ফলাফল অর্জন করতে পারে। একজন ব্যক্তি যেমন বিনিয়োগ থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা কামনা করে, তেমনি একজন মুসলমানের উচিত তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে সর্বোত্তম ফলাফল এবং পুরস্কার কামনা করা। এটি তখনই সম্ভব যখন একজনের কাছে ইসলামিক জ্ঞান থাকে যা তাকে শেখায় কিভাবে আচরণ করতে হয় যাতে তারা সর্বোত্তম ফলাফল পেতে পারে। অথচ, ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতাই কেবল এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে যা উভয় জগতের সর্বোত্তম ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় না।

অতঃপর আল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলেন যে, আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলোর প্রতি একমাত্র তিনিই মনোযোগ দেবেন যে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতাকে ভয় করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

অতএব, আর্থিক স্বার্থ পরিহার করার মতো ইসলামের শিক্ষাগুলোকে তারা কতটা মেনে চলে তা পর্যবেক্ষণ করে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহির প্রতি তারা কতটা বিশ্বাসী তা মূল্যায়ন করা যায়। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে

প্রত্যেকেই উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হয়। এই পৃথিবীতে, এই পরিণতিগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হয় এবং ফলস্বরূপ অনেক লোক তাদের অবাধ্যতাকে মহান আল্লাহর সাথে, তারা যে চাপ এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার সাথে সংযুক্ত করে না। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহকে অমান্য করার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, যেমন ধন-সম্পদ, তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যদিও তারা আশা করেছিল যে এই পার্থিব জিনিসগুলি তাদের জন্য স্বস্তির উৎস হয়ে উঠবে। তাদের অজ্ঞতার কারণে, তারা তাদের জীবনের কিছু ভাল জিনিসকে দায়ী করবে, যেমন তাদের জীবনসঙ্গী, তারা যে মানসিক ব্যাধিগুলির মুখোমুখি হচ্ছে, যেমন বিষণ্নতার জন্য। যখন তারা তাদের জীবন থেকে এই কয়েকটি জিনিস বাদ দেয়, তখন তাদের মানসিক ব্যাধিগুলি আরও খারাপ হবে এবং এমনকি তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। যদিও পরকালে ব্যক্তির কর্মের পরিণতি খুব স্পষ্ট হবে কিন্তু ততক্ষণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে দেরি হয়ে যাবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পাওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণগুলি অধ্যয়ন করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, যা বিচার দিবস নিয়ে আলোচনা করে, যাতে তারা এতে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এটিতে একজনের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

“আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

বিচার দিবসে কোন ব্যক্তিকে যে অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে, সেই অবস্থায় সে যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অনুযায়ী হবে। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২

নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল যে মৃত্যুবরণ করবে। মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা অবস্থায়, পুনরুত্থিত হবে এবং আনুগত্যের অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং অবাধ্য অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এই আলোচনার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির ফলাফল উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিত লাগে না। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার চেষ্টা করতে হবে, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। একজনকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকতে পারে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তবুও আনুগত্যের অবস্থায় মারা যায় এবং তাই আনুগত্যের অবস্থায় পুনরুত্থিত হতে পারে। এটা ইচ্ছাকৃত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয় যার ইসলামে কোন মূল্য নেই।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

উপরন্তু, আলোচনার অধীনে প্রধান আয়াতগুলি সম্পদ উপার্জন সম্পর্কে ছিল, আয়াত 281, মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের ভাল কাজ উপার্জন এবং পাপ এড়ানোর বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, কারণ এটি সংজ্ঞায়িত করে যে

কেউ উভয় জগতেই মনের শান্তি অর্জন করবে কি না। প্রত্যেকেই তাদের বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে মনের শান্তি পেতে চায়, এমনকি তারা বিভিন্ন জায়গায় এটি অনুসন্ধান করলেও। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি অনেক পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ অর্জনের সাথে সম্পর্কিত নয়, এটি কেবল ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে, তারা যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা বা না করার সাথে যুক্ত। . অতএব, সম্পদ বা অন্যান্য পার্থিব জিনিস উপার্জনের চেয়ে ভাল কাজের মাধ্যমে উভয় জগতে মানসিক প্রশান্তি অর্জনের বিষয়ে একজনকে বেশি চিন্তিত হতে হবে। পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তিনি একাই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। মানুষ, তারা যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, সম্পূর্ণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে কখনই এটি অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

বিচার দিবসে যেমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান অন্য লোকেদের সাথে অন্যায় করে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা উভয় জগতেই পরিত্রাণ পাবে কারণ তারা ফরজ নামাজের মতো মহান আল্লাহর অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করে। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, বিচারের

দিনে অন্যায়কারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচারের দিনে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

অনেক পণ্ডিতের মতে, এটিই শেষ আয়াত যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানদের এই আয়াতের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশিত চূড়ান্ত শব্দ। তিনি মানবজাতিকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তিনি যে কথা বলতে পারতেন তার চেয়ে তার জন্য প্রস্তুত করা। কেননা

কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত করাই এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য। যেমন একজন কাজের ভিসা নিয়ে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র অন্য দেশে ভ্রমণ করে যতটা সম্ভব সম্পদ অর্জনের জন্য তার নিজ দেশে ফেরত নিতে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একটি কাজের ভিসায় রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব ভাল কাজ জমা করা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তখনই এই ভালো কাজগুলো পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অতিরিক্ত রহমত হল যে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে এবং এই পৃথিবীতেও তাকে মানসিক শান্তি দেওয়া হবে। অতএব, কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিলে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে এমন আশঙ্কা করা উচিত নয়। বরং তারা উভয় জগতেই ধন্য হবে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু একইভাবে কাজের ভিসায় থাকা কর্মচারী অন্য দেশে কাজ করার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কঠোরভাবে সমালোচনা করা হবে, যা তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব সম্পদ অর্জন করতে হবে, সেইভাবে ব্যর্থ ব্যক্তিও হবে। এই পৃথিবীতে ভাল কাজ সঞ্চয় করা. কিন্তু এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থতার তীব্রতার উপর নির্ভর করে, তাদের সমালোচনা জাহান্নামে শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

উপরন্তু, একইভাবে একটি উদ্ভাবন যা তার সৃষ্টির প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাকে ব্যর্থতার শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, একইভাবে যে ব্যক্তি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, যা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য কার্যত প্রস্তুত করা। . ব্যর্থ উদ্ভাবন যেমন পরিত্যাগ করা হয়, তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তাকেও পরিত্যাগ করা হবে। যেহেতু বিচার দিবসে একজন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা হবে শুধুমাত্র একটি জায়গা আছে, তাই মানুষকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে এই পরিণতি এড়াতে চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা শান্তি অর্জন করে। মন এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 281:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 282-283

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى
عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের চুক্তি কর, তখন তা লিখে রাখ। আর একজন লেখক ন্যায়বিচারে তোমাদের মধ্যে লিখুক।

কোন লেখক যেন আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার করে। তাই সে লিখুক এবং যার বাধ্যবাধকতা আছে তাকে নির্দেশ দিতে দিন। আর সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর বাইরে কিছু না রাখে। কিন্তু যার বাধ্যবাধকতা আছে সে যদি সীমিত বোধের অধিকারী হয় বা দুর্বল হয় বা নিজেকে হুকুম দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়বিচারে আদেশ করুক। আর তোমাদের লোকদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীকে সাক্ষী কর। আর যদি দুইজন পুরুষ [উপলব্ধ] না থাকে, তবে একজন পুরুষ এবং দুজন নারী যাদেরকে আপনি সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেন- যাতে তাদের একজন [অর্থাৎ নারীদের] ভুল করলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে যখন তাদের ডাকা হয়। এবং এটি লিখতে [খুব] ক্লান্ত হবেন না, তা ছোট হোক বা বড়, তার [নির্দিষ্ট] মেয়াদের জন্য। এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে আরও ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণ হিসাবে শক্তিশালী এবং আপনার মধ্যে সন্দেহ রোধ করার সম্ভাবনা বেশি, যখন এটি একটি তাৎক্ষণিক লেনদেন যা আপনি নিজেদের মধ্যে পরিচালনা করেন। কেননা [তাহলে] আপনি না লিখলে আপনার কোন দোষ নেই। এবং যখন আপনি একটি চুক্তি শেষ করেন তখন সাক্ষী নিন। কোন লেখক বা কোন সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না. কারণ আপনি যদি তা করেন তবে তা আপনার মধ্যে [কবরের] অবাধ্যতা। আর আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

এবং যদি আপনি সফরে থাকেন এবং একজন লেখক না পান, তবে একটি জামানত নিতে হবে। আর যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর ন্যস্ত করে, তবে যার উপর অর্পণ করা হয়েছে সে যেন তার আমানত পালন করে এবং সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ্য গোপন করো না, কেননা যে তা গোপন করবে, তার অন্তর প্রকৃতপক্ষে পাপী, আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। যেমন একটি ফল ধারণকারী গাছ তখনই উপযোগী হয় যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান তখনই কার্যকর হয় যখন সে ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ন্যায়সঙ্গত ও সৎভাবে বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

" হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের চুক্তি কর, তখন তা লিখে রাখ। এবং একজন লেখক ন্যায়বিচারে তোমাদের মধ্যে লিখুক..."

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে তা বোঝা অত্যাবশ্যক। ইসলাম নিছক কিছু ধর্মীয় রীতি নয় যা একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন প্রভাব ফেলে না। দুঃখজনকভাবে, এই সত্যটি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, অনেক মুসলমান যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো ধর্মীয় অনুশীলনগুলি সম্পাদন করে, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে, যেমন তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনে ইসলামের শিক্ষাগুলিকে এড়িয়ে চলে। ইসলাম এমন কোনো আবরণ নয় যা নিজের ইচ্ছা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরা ও খুলে ফেলা যায়। ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড জুড়ে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে কেবল তাদের ইচ্ছার আনুগত্য ও উপাসনা করে, যদিও তারা দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

" হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের চুক্তি কর, তখন তা লিখে রাখ। আর একজন লেখক ন্যায়বিচারে তোমাদের মধ্যে লিখুক। কোন লেখক যেন আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার না করেন..."

এটি বোঝার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যে সমস্ত জ্ঞান, তা ধর্মীয় বা পার্থিব, মহান আল্লাহ দ্বারা শেখানো হয়েছিল। অধ্যায় 96 আল আলাক, আয়াত 3-5:

"আবৃত্তি কর, তোমার প্রতিপালক সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি কলম দিয়ে শিখিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

অতএব, একজন মুসলমানের এমন চরম মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান বর্জন করে পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা

নিবেদন করে এবং পার্থিব জ্ঞান ত্যাগ করে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে না। একজন মুসলমানের পরিবর্তে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা সারা জীবন ধর্মীয় জ্ঞান শিখে এবং তার উপর কাজ করে এবং দরকারী পার্থিব জ্ঞান শেখে যাতে তারা একটি ভাল বৈধ চাকরি পেতে পারে যা তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে। তাই একজনের উচিত তাদের দেওয়া পার্থিব জ্ঞান অর্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, যেমন একটি বিনামূল্যে শিক্ষা, এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এই বিশ্বাস করে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। যে একটি ভাল পার্থিব শিক্ষা অর্জন করে যা একটি ভাল বৈধ কাজের দিকে নিয়ে যায় যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে এবং অন্যদের সাহায্য করতে পারে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক যে একজনের পার্থিব জ্ঞান অর্জনের যাত্রার সময়, তারা অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে , কারণ ইসলামী জ্ঞান তাদের পার্থিব জ্ঞান এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে যাতে তারা একটি অর্জন করতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা এবং সঠিকভাবে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে রাখুন। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"...এবং একজন লেখক ন্যায়বিচারে তোমাদের মধ্যে [এটি] লিখুক। কোন লেখক যেন আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার না করেন। তাই সে লিখুক এবং যার বাধ্যবাধকতা আছে তাকে নির্দেশ দিতে দিন। আর সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর বাইরে কিছু না ফেলে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ প্রায়শই তাকে ভয় করার সাথে পার্থিব লেনদেন যেমন আর্থিক লেনদেনের সাথে যুক্ত করেন। এর কারণ হল ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে পরিবেষ্টন করে এবং তাই বিচারের দিনে তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ এবং প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে, সেগুলি ধর্মীয় বা পার্থিব বিষয়ের সাথে যুক্ত হোক না কেন। তাই একে মনে রাখা উচিত এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা উচিত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"...তবে যার বাধ্যবাধকতা আছে সে যদি সীমিত বোধশক্তিসম্পন্ন হয় বা দুর্বল হয় বা নিজেকে নির্দেশ দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়বিচারে আদেশ করুক। আর তোমাদের লোকদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীকে সাক্ষী কর। আর যদি দু জন পুরুষ [উপলব্ধ] না থাকে, তবে একজন পুরুষ এবং দু জন মহিলা যাদেরকে আপনি সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেন - যাতে তাদের একজন [অর্থাৎ মহিলারা] ভুল করে, তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে..."

যেহেতু বেশিরভাগ মহিলারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেননি এবং তাই ব্যবসায়িক চুক্তির সাথে অপরিচিত ছিলেন, তাই একজন পুরুষ সাক্ষীর জায়গায় দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসাবে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, যেহেতু মহিলারা মূলত তাদের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তাই তারা আইনি মামলায় অংশ নেওয়ার জন্য খুব কম সময় পেত। তাই দুজন নারীকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যে কোনো একজন আইনগত মামলায় সাক্ষ্য দিতে পারবে যদি তাদের

দুজনকেই ডাকা হয়। তাই নারীকে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র বক্তব্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"... অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে তার মধ্যে নিহিত। এর মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি যত বেশি মহান আল্লাহকে মান্য করে, সে তত বেশি উন্নত। অন্য কোন জাগতিক মান যা মানুষকে আলাদা করে, যেমন লিঙ্গ, জাতিগত বা সামাজিক মর্যাদা, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের উদ্দেশ্য এবং কিছু কাজ লুকিয়ে থাকায় কাউকে নিজের বা অন্যের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা উচিত নয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"... সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"... আর সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে যখন তাদের ডাকা হয়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ একটি সমাজ তখনই উন্নতি করে যখন এর সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করে। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে হবে, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর নিরন্তর সমর্থন পাবে। সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যার কাছে মহান আল্লাহর সমর্থন রয়েছে, তিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হবেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"...এবং এটি লিখতে [খুবই] ক্লান্ত হবেন না, তা ছোট হোক বা বড়, তার [নির্দিষ্ট] মেয়াদের জন্য। এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে আরও ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণ হিসাবে শক্তিশালী এবং আপনার মধ্যে সন্দেহ রোধ করার সম্ভাবনা বেশি, যখন এটি একটি তাৎক্ষণিক লেনদেন যা আপনি নিজেদের মধ্যে পরিচালনা করেন। কেননা [তাহলে] আপনি না লিখলে আপনার কোন দোষ নেই। এবং যখন আপনি একটি চুক্তি শেষ করবেন তখন সাক্ষী নিন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, লোকেদের সর্বদা একে অপরের সাথে পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে যোগাযোগ করা উচিত। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়ের কথা বল।"

কাজগুলি প্রায়শই শব্দের অনুসরণ করে, যে ব্যক্তি তাদের কথাবার্তায় ন্যায়পরায়ণ এবং স্পষ্ট, তারা তাদের কর্মেও ন্যায়পরায়ণ এবং স্পষ্ট হবে। এটি অন্য ব্যক্তির চরিত্র এবং শব্দ সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং নেতিবাচক অনুমান এড়ায়। নেতিবাচক অনুমান প্রায়ই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

নেতিবাচক ধারণাগুলিও ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে যা একজন মুসলিমকে অন্য মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেয়। এটি একটি পরিবার এবং সমগ্র সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের সমস্ত মিথস্ক্রিয়া এবং লোকেদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং উন্মুক্ত হতে হবে, ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে হোক বা আর্থিক হোক।

আল্লাহ, অতঃপর মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন যে একজন লেখক যিনি ব্যবসায়িক চুক্তি সংকলন করেন, যেমন একজন আইনজীবী বা সাক্ষী যিনি চুক্তিতে অংশ নেন এবং যাকে আইনি আদালতের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে তাকে চাপ দেবেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"...কোন লেখক বা সাক্ষীর ক্ষতি না হোক। কারণ আপনি যদি তা করেন তবে তা আপনার মধ্যে [কবরের] অবাধ্যতা। আর আল্লাহকে ভয় কর..."

এটি প্রায়শই ব্যবসায়িক জগতের মধ্যে ঘটে, যেখানে শক্তিশালী কর্পোরেশনগুলি পার্থিব লাভের জন্য, যেমন সম্পদের জন্য ব্যবসায়িক চুক্তিতে জড়িত বিভিন্ন লোককে ঘনিষ্ঠ করে। যদিও এটি একটি পার্থিব বিষয়, তবুও কোনটিই কম নয়, যথারীতি, মহান আল্লাহ, ধর্মীয় বা পার্থিব সকল বিষয়কে তাঁর আনুগত্য বা অবাধ্যতার সাথে সংযুক্ত করেন। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং মানুষের সাথে আচরণ করার সময় একটি সরল চরিত্র বজায় রাখতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের কর্মের ফল ইহকালে এবং পরকালে ভোগ করে। এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা তাদের জন্য মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলো অনুভব করলেও। যখন কেউ অন্যদের উপর অন্যায় করে তাদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য অন্যদের উপর অন্যায় করে তারা সর্বদা ভীত এবং বিভ্রান্ত হবে যে কেউ তাদের ক্ষমতার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেবে। এটি তাদের মনের শান্তি পেতে বাধা দেয়, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। এবং পরকালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সাথে অন্যায়কারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচারের দিনে

অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

ব্যবসায়িক চুক্তিতে জড়িত ব্যক্তিদের ক্ষতি করার মধ্যে তাদের ঘুষ দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যে ব্যক্তি ঘুষ দেয় বা গ্রহণ করে সে অভিশপ্ত হয়েছে, তাই অন্যকে ঘুষ দেওয়া তাদের ক্ষতি করার একটি গোপন উপায়। জামে আত তিরমিযী, ১৩৩৭ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অভিশপ্ত ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত হারাবেন। মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত উভয় জগতে মানসিক শান্তি ও সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 282:

"...আর আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।"

এই আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করে যে তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে উভয় জগতে সফলতা পাওয়ার জন্য, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মতো জ্ঞানের অধিকারী, মানবজাতিকে নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করার জন্য যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং সবকিছু

এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের মধ্যে স্থান দেয়। পর্যাপ্তভাবে বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতির সময় জীবন. উপরন্তু, এই আচরণবিধি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং সমাজের মধ্যে শান্তির বিস্তার নিশ্চিত করবে কারণ এটি ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং সমতার উপর ভিত্তি করে এবং কোনো পক্ষপাত থেকে দূরে সরে যায়, যা কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে অন্যদের উপর সমর্থন করে, যেমন ধনীদের। এই আচরণবিধি তাই একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজের জন্য মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় যতক্ষণ না লোকেরা এটি মেনে চলে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে যেকোন মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই এই ফলাফলগুলি অর্জন করতে পারে না। তাই এর ব্যাপক ও অতুলনীয় উপকারিতাকে চিনতে হলে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধির সুস্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণ অধ্যয়ন করতে হবে। এমনকি যদি কেউ ইসলামী আচরণবিধির পিছনের কিছু প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয় বা তাদের ইচ্ছা এটির সাথে বিরোধী হয়, তবে তাদের উচিত একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে কাজ করে, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন সুস্বাস্থ্য অর্জন করবে, তেমনি যে ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণ করবে এবং আমল করবে সে উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি লাভ করবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে 282 আয়াতটি পবিত্র কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত। মজার ব্যাপার হল, এতে আল্লাহ, মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি যুক্ত কর্তব্য, যেমন প্রার্থনা বা পবিত্র তীর্থযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। পরিবর্তে, এটি অন্যদের সাথে সঠিকভাবে আচরণ করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে বিশেষ করে, ব্যবসায়িক লেনদেনের সময়। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা ঈমানের অর্থের উভয় অংশ, আল্লাহ, মহানের প্রতি কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। পরেরটি অন্যদের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে যেভাবে একজন মানুষের সাথে আচরণ করতে চান।

মহান আল্লাহ, তারপর ভ্রমণের সময় ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এবং কীভাবে একজনকে সরলভাবে আচরণ করতে হবে তা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 283:

"এবং আপনি যদি ভ্রমণে থাকেন এবং একজন লেখক না পান, তবে একটি জামানত নিতে হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের উপর ন্যস্ত করে, তবে যার উপর অর্পিত হয়েছে সে যেন তার আমানত পালন করে এবং সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কারো বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা ভন্ডামীর একটি দিক। সহীহ বুখারী, ২৭৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আস্থাগুলি পূরণ করার একমাত্র উপায় হল দোয়াগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ এবং করুণার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুঃখজনকভাবে, এটি প্রায়শই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়। একজনকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসগুলি পূরণ করতে হবে যেমন তারা চায় যে অন্য লোকেরা তাদের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করতে চায়।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এসব মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই আমানতগুলো পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে, বুঝতে এবং আমল করতে উত্সাহিত করা। সমস্ত বিশ্বাস অবশ্যই পূরণ করতে হবে কারণ উভয় জগতেই একজনকে তাদের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রত্যেক] বিশ্বাস পূরণ কর। প্রকৃতপক্ষে, আমানত সর্বদা [যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে]।"

যেহেতু কেউ এই পৃথিবীতে বা পরকালে তাদের আস্থার খেয়ানত করার পরিণতি থেকে রেহাই পেতে পারে না, তাই তাদের পক্ষে তাদের সর্বোত্তম সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করা অত্যাবশ্যক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 283:

"এবং আপনি যদি ভ্রমণে থাকেন এবং একজন লেখক না পান, তবে একটি জামানত নিতে হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের উপর ন্যস্ত করে, তবে যার উপর অর্পিত হয়েছে সে যেন তার আমানত পালন করে এবং সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে।

পবিত্র কুরআন জুড়ে, মহান আল্লাহ, তাকে ভয় করা এবং এই নিয়ম ভঙ্গের পরিণতিকে ভয় করার সাথে ইসলামী নিয়মগুলিকে একত্রিত করেছেন। কারণ সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি বিস্তারের জন্য একটি উত্তম আইন ব্যবস্থা এবং মহান আল্লাহর ভয় উভয়ই প্রয়োজন। মহান আল্লাহর ভয় ব্যতীত একটি ভাল আইন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, কারণ যারা আত্মবিশ্বাসী যে তারা সরকার কর্তৃক আইন ভঙ্গের জন্য দায়বদ্ধতা থেকে রক্ষা পেতে পারে, তারা অপরাধ করবে। উপরন্তু, যখন কেউ মহান আল্লাহকে ভয় করে না তখন একটি ভাল আইন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যদিকে, মহান আল্লাহকে ভয় করলে একজনকে অন্যের অন্যায় করা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিরত রাখবে কিন্তু একটি ভালো ও ন্যায্য আইন ব্যবস্থার অভাবে জনগণ সরকারের দ্বারা জুলুমের শিকার হবে। উদাহরণস্বরূপ, ট্যাক্স ব্যবস্থা সর্বদা সমাজের বাকি অংশের চেয়ে ধনীদের পক্ষে। অতএব, সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির বিস্তার নিশ্চিত করার জন্য উভয়ই একটি উত্তম আইন ব্যবস্থা, যা একমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে, কারণ তিনি সব কিছু জানেন এবং মহান আল্লাহর ভয় প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ তারপর আইনি আদালতের মামলায় সাক্ষ্য গোপন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 283:

"...এবং সাক্ষ্য গোপন করবেন না, কারণ যে ব্যক্তি এটি গোপন করবে- তার অন্তর প্রকৃতপক্ষে পাপী..."

এর মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অন্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে হস্তগত করার জন্য যে ব্যক্তি এই আচরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে, যদিও সে তাদের কাছ থেকে একটি গাছের ডালও নিয়েছিল, এটি সতর্কতা হিসাবে যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ৩৫৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 283:

"...এবং সাক্ষ্য গোপন করবেন না, কারণ যে ব্যক্তি এটি গোপন করবে- তার অন্তর প্রকৃতপক্ষে পাপী..."

এই আয়াতটি অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন লোভকে বাহ্যিক পাপের সাথে সংযুক্ত করে। এটি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে শুদ্ধ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এটি ভাল এবং বিশুদ্ধ কর্মের দিকে পরিচালিত করে। এই শুদ্ধিকরণের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শেখা এবং গ্রহণ করা, যেমন ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন লোভ, হিংসা এবং অহংকার এড়ানো। এটি করা অত্যাবশ্যক কারণ যার একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় রয়েছে সে ভাল কাজ করবে যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অথচ যার আধ্যাত্মিক হৃদয় অপবিত্র সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন থেকে বাধা দেবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে আসে যে পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসে।"

যেহেতু মহান আল্লাহ একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থা, তাদের উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ জানেন, তিনি উভয় জগতে তাদের জবাবদিহি করবেন। তাই একজনকে অবশ্যই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থার পরিণতি মোকাবেলার জন্য ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখে এবং আমল করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারে, যার ফলস্বরূপ ভাল উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের দিকে পরিচালিত হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 283:

"... আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারাহ, 286-এর 284-286 আয়াত

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ
ٱللَّهُۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ
﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن
نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرٗا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

রসূল তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছেন এবং মুমিনগণও। তারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, [বলেছে], "আমরা তাঁর রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।" এবং তারা বলে, "আমরা শুনলাম এবং মেনে

চললাম। [আমরা] তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা, এবং তোমারই [শেষ] গন্তব্য।

আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত তার উপর ভার দেন না। এটি যা [ভাল] অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং এটি যা [মন্দ] অর্জন করেছে তার [পরিণাম] বহন করবে। "হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করে থাকি, তাহলে আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিও না। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যেটা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। সহ্য করার ক্ষমতা এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আপনি আমাদের অভিভাবক, তাই আমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করুন।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারের অধীন এবং তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলা ছাড়া একজন ব্যক্তির কোন উপায় নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 284:

" *আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর...*"

একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে থাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে একজন ব্যক্তি যেমন সমস্যায় পড়বেন, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই সমস্যায় পড়বেন। একজন ব্যক্তি একটি দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারে যদি তারা তার নিয়মে সন্তুষ্ট না হয় তবে তারা এমন জায়গায় পালাতে সক্ষম হবে না যেখানে মহান আল্লাহর বিধান এবং এখতিয়ার প্রযোজ্য নয়। একজন মানুষ হয়তো তার সমাজের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে পারবে কিন্তু তারা কখনোই মহান আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, যেভাবে একটি বাড়ির মালিক ব্যক্তি বাড়ির নিয়ম-কানুন ঠিক করে, অন্যরা যদি এই বিধি-বিধানে আপত্তি করে, ঠিক একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, তাই এই মহাবিশ্বের নিয়ম-কানুন তিনিই ঠিক করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের নিজের স্বার্থে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। একজন ব্যক্তি হয় মহান আল্লাহর হুকুম ও নিষেধাজ্ঞার পিছনের প্রজ্ঞাগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তারা কীভাবে তাদের এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যায় বা তারা তাদের উপাসনা করতে পারে। ইচ্ছা এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান. কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী বিধি-

বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতে তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনো আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাদের রক্ষা করবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 284:

"... *তোমরা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা দেখাও বা লুকিয়ে রাখো না কেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তার হিসাব নেবেন..."*

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এই আয়াতটি অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 286 দ্বারা বাতিল করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

তারা এটা বিশ্বাস করে যে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আয়াত 284 এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের অভ্যন্তরীণ চিন্তার জন্য দায়বদ্ধ করবেন, যা প্রায়শই অনিচ্ছাকৃত এবং প্রকৃতিতে অনিয়ন্ত্রিত এবং ফলস্বরূপ 286 নং আয়াত। প্রকাশিত হয়েছিল। তাফসীর ইবনে কাসীর, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 96-97-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতগুলো রহিতের প্রয়োজন ছাড়াই মিলিত হতে পারে। আয়াত 286 শুধুমাত্র তাদের ভুল বোঝাবুঝি স্পষ্ট করেছে, এটি 284 শ্লোককে রহিত করেনি। 284 নং আয়াতটি বোঝানো হতে পারে যখন কেউ কিছু করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং তারা হয় তা করে বা তাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকা বাহ্যিক কারণগুলির দ্বারা তারা তা করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির

অপরাধ করার দৃঢ় অভিপ্রায় থাকতে পারে কিন্তু পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতির কারণে তাদের মন পরিবর্তন হয় যা তারা আশা করেনি। উভয় ক্ষেত্রেই, এই ব্যক্তিকে জবাবদিহি করা হবে, এমনকি তারা শারীরিকভাবে কিছু না করলেও, কারণ তাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল এবং যেখানে বাহ্যিক কারণের কারণে কাজ করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সঠিক উদ্দেশ্য অবলম্বন করা এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এটিকে ভাল কাজের সাথে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা উভয় জাহানে পুরস্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি অন্য কোন কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি ভাল উদ্দেশ্যের একটি চিহ্ন হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বা ক্ষতিপূরণ আশা করে না।

আখেরাতে নিজের নিয়ত, কথা ও কর্মের উপর জবাবদিহি করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনকে এই পৃথিবীতেও জবাবদিহি করা হয়, যদিও এটা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যদিও তারা আশা করেছিল যে এগুলো তাদের জন্য শান্তি ও স্বস্তির উৎস হয়ে উঠবে। যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা এই ফলাফলের মুখোমুখি হতে পালাতে পারে না। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তখন এটি তাদের একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তাদের জীবনের সমস্ত কিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় ফেলে দেয়। এই জিনিসগুলি তাদের মনের শান্তি অর্জন থেকে আরও বাধা দেবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। যে কোন বিকল্পই বেছে নিন উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 284:

“… তোমরা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা দেখাও বা লুকিয়ে রাখো না কেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।”

যতদিন কেউ এই পৃথিবীতে আছে, আন্তরিক অনুতাপের দরজা সবসময় খোলা থাকে এবং তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ব্যবহার করা উচিত। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাভাবনা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা, উভয় জগতে তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা। যেখানে, মহান আল্লাহর প্রতি আশা রাখার অর্থ হল, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করা, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যখনই তারা কোন পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করে। , মহিমান্বিত, উভয় জগতে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে আশা ও ইচ্ছাপূরণের পার্থক্য এইভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ, তারপর পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের নিশ্চিততা অবলম্বন করার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি একজনকে এর শিক্ষা অনুযায়ী কাজ নিশ্চিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছেন এবং মুমিনগণও..."

সম্ভবত এই কারণেই মুসলমানদের পরিবর্তে বিশ্বাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়, কারণ ইসলামি শিক্ষার মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বাসীদের শক্তিশালী বিশ্বাস রয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই নিয়মিত সময় ও শক্তি উৎসর্গ করতে হবে পবিত্র কুরআনে পাওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণ অধ্যয়নের জন্য যাতে তারা ঈমানের নিশ্চিততা অর্জন করতে পারে। বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে উত্সাহিত করে। এতে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অথচ যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে ঈমানের নিশ্চয়তা পাবে না। ফলস্বরূপ, তারা সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। এটি একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা ন্যূনতম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না, কারণ তারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছেন এবং মুমিনগণও..."

যখন কেউ মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তখন তারা নিঃসন্দেহে এর অলৌকিক প্রকৃতির প্রশংসা করবে। পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য

নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছেন এবং মুমিনগণও..."

এটি উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্বের গুরুত্বও নির্দেশ করে। অন্যদের যেমন একজনের সন্তানদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শনে কার্যকর হওয়ার জন্য, একজন মুসলিমকে সর্বদা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে, ঠিক যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) করেছিলেন। এটি তখনই সম্ভব যখন তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে, যাতে তারা কেবল

মৌখিকভাবে উপদেশ না দিয়ে অন্যদের জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে ওঠে। ভাল করা অন্যদের অনুসরণ করার জন্য ব্যবহারিক রোল মডেল হয়ে তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের মৌখিক পরামর্শের বিরোধিতা করা উচিত নয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"... তারা সবাই আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে..."

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা। যারা মহান আল্লাহকে তাদের রব বলে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দাসত্ব গ্রহণ করবে। একজন সত্যিকারের বান্দা তাদের নিজের আনন্দের সন্ধান করে না, তারা অন্যের কাছেও তাদের খুশি করার আশা করে না। তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে, যেমন মানুষের আনুগত্য করা এবং অনুসরণ করা, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। একজন বান্দার একমাত্র চাওয়া হচ্ছে তাদের প্রভুকে খুশি করা। উপরন্তু, একজন বান্দা স্বীকার করে যে তাদের নিজের জীবন সহ তাদের যা কিছু আছে সবই তাদের স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহর। অতএব, তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে তারা ত্বরা করবে। একজন প্রকৃত বান্দা বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু এবং সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং প্রভু, তাই তারা তাঁর অবাধ্য হয়ে মানসিক শান্তি পেতে পারে না, কারণ তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তির আবাস। তাই তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা তাঁর আনুগত্যের

জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটিই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন ব্যক্তি যত বেশি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাস তত বেশি শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিত হবে যে বিচারের দিন তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে। এটি তাদের আরও উৎসাহিত করবে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"... *তারা সবাই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এনেছে..."*

অদৃশ্যে বিশ্বাস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরের জিনিসগুলি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কারণ যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং বোঝা যায় সেগুলির প্রতি বিশ্বাসের মূল্য নেই এমন কিছুতে বিশ্বাস করার মতো যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। ইন্দ্রিয়, যদিও তারা তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে লক্ষণ. এ কারণেই মহান আল্লাহ তার বিশ্বাসকে কবুল করবেন না যে বিচার দিবসে তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয় কারণ তারা জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতাদের মতো অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে। তাই ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে সৃষ্টির অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে অদেখা জিনিসগুলিতে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণার বাইরে চলে যাবে এবং এর পরিবর্তে তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হবে কারণ এটি তাদের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে উত্সাহিত করে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি নিশ্চিত যে দু'জন ফেরেশতা ক্রমাগত তাদের সাথে আছেন যারা বিচার দিবসের প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ লিপিবদ্ধ করছেন, তারা একা থাকা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"... তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে..."

মানবজাতির কাছে অবতীর্ণ সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস করতে হবে। বিশেষ করে, পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের সাথে এর বিভিন্ন দিক পূরণ করা জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা, এটি বোঝা এবং এর শিক্ষার উপর আমল করা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রথম স্তরে থাকা এড়িয়ে চলতে

হবে যেখানে তারা কেবলমাত্র এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে যা তারা বোঝে না। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কিতাব নয়, এটি একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এর থেকে হেদায়েত তখনই অর্জিত হতে পারে যখন কেউ এটি বুঝতে পারে এবং তার উপর আমল করে। যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র একজনকে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে যদি তারা এটি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করে, পবিত্র কুরআন কেবল তখনই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন তারা এটি বুঝতে এবং আমল করে। দুঃখজনকভাবে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা নিয়মিত এটি পাঠ করে তাদের মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা এর শিক্ষাগুলি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এর উপর কাজ করা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা এর শিক্ষাগুলো বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"... তারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ এবং তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, [বলেছে], "আমরা তাঁর রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না..."

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কার্যত তাঁদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাঁদের আচার-আচরণ ও শিক্ষা যা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সুন্দর আচার-আচরণ সংক্ষিপ্ত, পরিপূর্ণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ আচরণ দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং মহৎ চরিত্রের উপর কার্যত শিক্ষা ও কাজ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের ওপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়া এই মৌখিক দাবির পরিপন্থী। সবাই যেমন বিচারের দিনে তাঁর সুপারিশের আশা করে, তারা অবশ্যই বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করবে যদি তারা তাঁর ঐতিহ্য এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, পবিত্র কুরআনের উপর শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 30:

"আর রসূল বলেছেন, "হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

বিচার দিবসে যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পরিবর্তে তার সুপারিশ কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্যের শিক্ষা শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, মৌখিকভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর চরিত্র ও আচার-আচরণ অনুসরণে ব্যর্থ হওয়া ইসলামে কোনো মূল্য নেই, কারণ পূর্ববর্তী জাতিগুলোও তাদের নবী-রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে। তাদের কিন্তু তারা তাদের শিক্ষাকে কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরকালে তারা তাদের সাথে একত্রিত হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাকে পরকালে বাস্তবিকভাবে তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুসরণ ও আমল করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"...[বলেছি], "আমরা তাঁর রসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না..."

পূর্ববর্তী জাতিগুলির থেকে ভিন্ন, মুসলিমরা মহান আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রাসূলগণকে বিশ্বাস করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি বাছাই করা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং কোন ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করতে হবে এবং কোনটি নিজের ইচ্ছার ভিত্তিতে উপেক্ষা করতে হবে তা বেছে নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলাম এমন কোনো জামা নয় যা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী খুলে ফেলা বা পরানো যায়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে, এমনকি যদি এটি কারও ইচ্ছার পরিপন্থী হয়। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলোকে মেনে নিতে হবে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে যদিও তা তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হয় বা যখন তারা ইসলামী শিক্ষার পেছনের প্রজ্ঞাগুলো পালন করতে ব্যর্থ হয়। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তেতো ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। এই রোগী যেমন সুস্বাস্থ্য অর্জন করবে, তেমনি যে মুসলিম ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ একাই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে, কারণ তিনি একাই তা করার জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অধিকারী। অদূরদর্শিতা, জ্ঞানের অভাব এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ খোলা মনের লোকেদের দ্বারা তৈরি আচরণবিধির প্রতি প্রতিফলিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"...এবং তারা বলে, "আমরা শুনি এবং মান্য করি..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতে উল্লিখিত শ্রবণ হল যখন কেউ যা বলা হয়েছে তার উপর মনোনিবেশ করে, এটির উপর প্রতিফলন করে, বিবৃতিটিকে তাদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে, তাদের জীবনে যা বলা হয়েছে তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নির্ধারণ করে এবং তারপর কার্যত এটা করার জন্য s প্রচেষ্টা . এই প্রক্রিয়া এবং ফলাফল 285 শ্লোকে নির্দেশিত হয়েছে। অথচ, এই ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া ছাড়া যা বলা হয়েছে তা শুনলে কখনোই কারো আচরণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। পরিবর্তে, শব্দগুলি তাদের চিন্তাভাবনা বা ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত না করে তাদের কানের মধ্য দিয়ে যাবে। দুঃখজনকভাবে, অনেকে বিশ্বাস করে যে এইভাবে কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষাগুলি শোনা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। 285 নম্বর আয়াতে যেমন স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সঠিকভাবে শুনতে হবে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নিয়ে যান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"...এবং তারা বলে, "আমরা শুনি এবং মান্য করি..."

এই আনুগত্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন শুনতে হবে এবং তারপরে তার উপর আমল করতে হবে। কিন্তু যখন কেউ এটি বুঝতে পারে না তখন এর উপর কাজ করা সম্ভব নয়। অতএব, যে ভাষায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা বা শোনা যায় না এমন ভাষায় মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ভাল নয়। মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শুনতে, পাঠ করতে, বুঝতে এবং তারপরে আমল করার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর মিডিয়া

বিষয়বস্তু উপলব্ধ রয়েছে যা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, তাই মুসলমানরা যদি পবিত্র কুরআন বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হন এবং সম্প্রসারণ করে, পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, শান্তিতে ব্যর্থ হন তবে তাদের কোন অজুহাত থাকবে না। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"...এবং তারা বলে, "আমরা শুনি এবং মান্য করি..."

অবশেষে, শ্রবণ এবং আনুগত্য অন্যদের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তে অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিভ্রান্তিকর মনোভাবের বিরোধিতা করে, কারণ যে সঠিকভাবে শুনেছে সে নিজেই নির্ধারণ করবে যে আনুগত্য করা সঠিক কাজ কিনা। অন্ধ অনুকরণ হল এমন একটি বিষয় যা ইসলামী শিক্ষায় অত্যন্ত সমালোচিত হয় কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আশা করেন যে ইসলাম যে সত্য তা নির্ধারণ করার জন্য মানুষ খোলা মন নিয়ে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করবে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং পৃথকভাবে [সত্যের সন্ধানে] দাঁড়াও এবং তারপর চিন্তা কর।" তোমার সঙ্গীতে নেই কোন উন্মাদনা। কঠিন শাস্তির পূর্বে তিনি তোমাদের জন্য সতর্ককারী মাত্র।"

তাই, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের সত্যতা নির্ধারণের জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে এবং তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর শিক্ষার উপর কাজ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি সর্বাবস্থায়, সহজে বা অসুবিধার সময়, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। এটি ফলস্বরূপ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চিত করে যে একজন তার জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে রাখে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অথচ, ইসলামে অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা শুধুমাত্র দুর্বল ঈমানের দিকে পরিচালিত করে। এই ব্যক্তি সহজেই তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পারে যখনই তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা হয়, যেমন তারা যখন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। এটি তাদের উভয় জগতের মানসিক শান্তি অর্জন থেকে বিরত রাখবে।

কেবলমাত্র যখন কেউ এইভাবে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করে তখনই তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"...এবং তারা বলে, "আমরা শুনলাম এবং মেনে চললাম। [আমরা] তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রভু..."

এটি স্পষ্ট করে যে ক্ষমা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে। ক্ষমা পাওয়া যায় না যখন কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং তারপর ক্ষমা পাওয়ার আশা করে। এটা নিছক ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে অপরাধ বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

তাই একজন ব্যক্তিকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যেমন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করা এড়িয়ে চলুন, কারণ প্রত্যেকেই তাদের উদ্দেশ্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে। , উভয় জগতের বক্তৃতা এবং কর্ম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 285:

"... এবং তারা বলে, "আমরা শুনলাম এবং মেনে চললাম। [আমরা] আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা, এবং আপনারই [শেষ] গন্তব্য।"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, একজন ব্যক্তিকে যে সকল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেসব নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করা যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে এবং ধৈর্য সহকারে প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করা তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

" আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

অতএব, মানুষ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের কোন অজুহাত থাকবে না। একজনকে অবশ্যই তাদের সেরা চেষ্টা করার দাবি করার অলস মনোভাব ত্যাগ করতে হবে যখন তারা স্পষ্টতই তাদের সেরা চেষ্টা করছে না। তারা থাকলে নিঃসন্দেহে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সব কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতেন। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং তাদের কাছ থেকে কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"... এটি [অর্থাৎ আত্মা] যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] পাবে, এবং এটি যা [মন্দ] অর্জন করেছে তার [পরিণাম] বহন করবে..."

মজার ব্যাপার হল ভাল উপার্জন এবং মন্দ উপার্জনের জন্য ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলি আলাদা। ভাল উপার্জনের জন্য ব্যবহৃত শব্দটি নির্দেশ করে যে ভাল কাজ সংগ্রহ করা সহজ। অন্যদিকে, মন্দ উপার্জনের জন্য ব্যবহৃত শব্দটি নির্দেশ করে যে পাপ উপার্জন করা ভাল কাজ উপার্জনের চেয়ে কঠিন। কারণ ইসলামে ভালো কাজ করার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা, সময়, সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ ভাল কথা বলে বা চুপ করে সওয়াব অর্জন করতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে চুপ থাকে, কারণ তাদের বলার মতো ভাল কিছু নেই, সে তার নীরবতার সওয়াব পাবে। উপরন্তু, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার বহুগুণ হয় যেখানে, পাপের পরিণতি হয় না, তাই, ভাল কাজ উপার্জন পাপ উপার্জনের চেয়ে সহজ। এতে ভালো কাজ করার মাধ্যমে মানসিক শান্তি ও উভয় জগতে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বিস্মৃতি বা দুর্ঘটনার মাধ্যমে ঘটে যাওয়া ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের জন্য বিষয়গুলোকে আরও সহজ করে দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"... আমাদের প্রভু, আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিও না..."

মহান আল্লাহ অতঃপর পুনরায় বলেন যে তিনি শুধুমাত্র মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"...আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এমন বোঝা অর্পণ করবেন না যেভাবে আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর আমাদেরকে এমন বোঝা দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই.."

এই প্রার্থনাটি মুসলমানদের ধৈর্যের সাথে জীবনের অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজের অসুবিধাকে ছোট করার জন্য একজনকে সর্বদা অন্যের কঠিন অসুবিধাগুলি দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজনকে সর্বদা সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার কথা মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যা তাদের পরবর্তী মুসলিমদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই মনোভাব একজনকে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে একজনের কাজ বা কথাবার্তার সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, এই মনোভাব তাদের কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করতে উত্সাহিত করবে, কারণ তারা যে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে তা আরও খারাপ হতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিজের উদ্দেশ্যের কৃতজ্ঞতা বলতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। একজনের বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং একজনের কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"...আমাদের পালনকর্তা, এবং আমাদেরকে এমন বোঝা দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই..."

মুসলিমদের অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসগুলি এড়িয়ে এই প্রার্থনাকে সমর্থন করতে হবে যা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের কারণ হতে পারে। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি কারণ হল যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ। একজন ব্যক্তি একটি সাধারণ জীবনধারা অবলম্বন করার মাধ্যমে চাপ এবং অসুবিধা এড়াতে পারে যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী হালাল রিজিক অর্জন করতে পারে এবং অতিরিক্ত অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে চলতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের পেছনে ছুটছে, যেমন অধিক ধন-সম্পদ, সে কেবল

তাদের জীবনে চাপ বাড়াবে এবং এই মনোভাব তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে যা তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অবলম্বন করতে বাধা দেয় এবং তাদের বাধা দেয়। সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করা থেকে। তাই এই মনোভাব তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। অতএব, যে মুসলমান এই দোয়াটি বাস্তবায়িত করতে চায় এবং তাদের জীবনের চাপ কমাতে চায় তাদের উচিত একটি সহজ জীবনধারা অবলম্বন করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"...এবং আমাদের ক্ষমা করুন; এবং আমাদের ক্ষমা করুন; এবং আমাদের প্রতি রহম করুন..."

ক্ষমা হল যখন কেউ অন্যায়কারীকে তাদের পাপের জন্য দায়বদ্ধ না করে তবে এটি ভবিষ্যতে তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। যেখানে, ক্ষমা হল যখন পাপের পরেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে। সম্ভবত এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ 4250 নং হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি পাপ থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পাপ করেনি।

ইসলামের একটি সহজ নীতি আছে, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে। যদি কেউ ক্ষমা করতে এবং অন্যের প্রতি দয়া করতে শিখে তবে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাকে অবশ্যই তার থেকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ সে তাকে স্থায়ীভাবে ছেড়ে চলে যায়। সে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার পরে, যদি সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে তার অতীতের ভুলগুলির জন্য ক্ষমা করতে পারে তবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর ক্ষমা পাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"...এবং আমাদের ক্ষমা করুন; এবং আমাদের ক্ষমা করুন; এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা ..."

এটি ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হচ্ছে যখন কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং তারপর উভয় জগতে তাঁর সুরক্ষা, করুণা ও ক্ষমা আশা করে। ইসলামে এই মনোভাবের কোনো মূল্য নেই। যেখানে ২৮৬ নং আয়াতে নির্দেশিত মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আশা হল, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যে কোন পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর সুরক্ষা, করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশা করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা এবং আশার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করে, সে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য পাবে যাতে তারা শান্তি পায়। উভয় জগতের মন। কারণ এই মনোভাব তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা নিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"... আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন।"

মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণকারী মুসলমানরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বও নিশ্চিত করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139 *:*

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

যদি শ্রেষ্ঠত্ব মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে এর কারণ হল প্রকৃত ঈমানের শর্ত তাদের দ্বারা পূর্ণ হয়নি। ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক দাবি দ্বারা এই শর্ত পূরণ হবে না। এটি কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এই মনোভাবই সাহাবায়ে কেরামকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"... আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন।"

উপরন্তু, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে হয় এবং এটি ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমন একটি উপায়ে যা মানুষের জন্য সর্বোত্তম হয়, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, মুসলমানদেরকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে হবে, যদিও তিনি তাদের মনের শান্তি এবং উভয় জগতে বিজয় দান করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 500 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks: https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe